জিজ্ঞাসা সংকলন

'জিজ্ঞাসা' সংকলন

স ম্পা দ না

শিবনারায়ণ রায়

প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

ভূমিকা

বিলাতি কিতায় সময়কে দশকে এবং শতকে পর্ববিভাগ করা হয়; এদেশে তার জায়গায় বারো বছরে এক যুগ। 'জিজ্ঞাসা'র বারো বছর পূর্ণ হলো। সেই উপলক্ষে এই নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন।

বাংলাভাষা ইংরেজির প্রায় সমবয়সী, কিন্তু মননশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ-ভাষা এখনো অপুষ্ট। অমিত সামর্থ্যসম্পন্ন সংস্কৃতভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলে বাংলাভাষার বিকাশ-সম্ভাবনা প্রচুর, এবং ইংরেজির সূত্রে শিক্ষিত বাঙালি মনে আধুনিক দর্শনবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটার ফলে এই সম্ভাবনা উপচীয়মান। বাঙালিদের ভিতরে কৃতবিদ্য এবং বিদ্যানুরাগীদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। কিন্তু জ্ঞানচর্চার ব্যাপারে ইংরেজি তাঁদের একমাত্র না হলেও মুখ্য অবলম্বন। ফলত বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাদীপ্ত প্রযত্ন সত্ত্বেও বাংলাভাষায় চিন্তনশীলতার ঐতিহ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এই অভাববোধের বেদনা থেকেই 'জিজ্ঞাসা' ত্রৈমাসিক পত্রিকার উদ্ভব। এটি প্রকাশের পিছনে যে উদ্দেশ্য ছিল প্রথম সংখ্যাতে সেটি "পত্রসূচনা"য় ব্যক্ত হয়। স্রেফ গ্রাহকদের চাঁদা থেকে কোনো পত্রিকার ব্যয়নির্বাহ হয় না; প্রবন্ধপত্রিকার ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা একেবারেই নেই বলা চলে। তা সত্ত্বেও এই পত্রিকা যে একযুগ ধরে নিয়মিত-ভাবে বেরিয়েছে এবং বর্তমানে আর্থিক দিক থেকে অনেকটাই স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে তার কারণ একদিকে মনস্বী লেখক-লেখিকাদের অকুণ্ঠ সহায়তা, অন্যদিকে জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকাদের সোৎসাহ সমর্থন। এই পত্রিকার যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য অথবা আজীবন সদস্য তাঁরা আমাদের উদ্যোগে যুক্ত না হলে জমে-ওঠা লোকসানের ভার বওয়া আমাদের সাধ্যে কুলোতো না; এবং শুধু উভয় বঙ্গ নয়, ভারতের এবং বাইরের বহু বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন নবীন এবং প্রবীণ ভাবুক নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ পাঠানোর ফলেই জিজ্ঞাসার মান বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। এই পত্রিকায় কোনো দল, মত বা গোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যাপারে আমার কাছে মুখ্য নির্ণায়ক ছিল দুটি : লেখকের চিন্তার স্বকীয়তা এবং প্রমাণিত বিদ্যাবত্তা।

বারো বছরে প্রকাশিত তিনশো-র বেশি প্রবন্ধের ভিতর থেকে এই সংকলনের জন্য মাত্র একদশমাংশ নির্বাচন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। গ্রন্থের কলেবর এবং মূল্যের কথা বিবেচনা করে অনেক উৎকৃষ্ট লেখাই বাদ দিতে হয়েছে। যেসব সম্মানিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের রচনা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা গেল না তাঁদের কাছে আমি মার্জনাপ্রার্থী। এঁদের ভিতরে বিশেষভাবে উল্লেখ্য প্রয়াত নীহাররঞ্জন রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সন্তোষকুমার ঘোষ, মিহিরবিকাশ চক্রবর্তী, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল ও কালিদাস ভট্টাচার্য, এবং সর্বশ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়, রাজ্যেশ্বর মিত্র, অশ্রুকুমার সিকদার, অলোকরঞ্জন

দাশগুপ্ত, অলোক রায়, গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, মৃণালকান্তি ভদ্র, রমাকান্ত চক্রবর্তী, রাজলক্ষ্মী দেবী, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, অরুণ বসু, উদয়নারায়ণ সিংহ, অশোকদেব চৌধুরী, হাসনা বেগম, সুজিত মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী রায়, কামাল হোসেন, অতীন্দ্রিয় পাঠক, প্রিয়তোষ মৈত্র, স্বপনকুমার মজুমদার, সুতপা ভট্টাচার্য, অতীন্দ্রমোহন গুণ, সের্গেই সেরিব্রিয়ানি প্রভৃতি। ভবিষ্যতে যদি 'জিজ্ঞাসা : প্রবন্ধ সংকলন' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হয় তাহলে এঁদের রচনা অবশ্যই তার অন্তর্ভুক্ত হবে। যাঁদের লেখা এখানে সংকলিত হলো, তাঁরা অনেকেই 'জিজ্ঞাসা'য় একাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন; স্থানাভাবে প্রত্যেকের একটির বেশি প্রবন্ধ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

'জিজ্ঞাসা'র সম্পাদক হিসেবে আমি কয়েকজন বিশিষ্ট ভাবুক, শিল্পী এবং সাহিত্যিককে তাঁদের নিজেদের জীবন এবং সাধনা বিষয়ে লিখবার জন্য অনুরোধ করি। বর্তমান সংকলনের প্রথম অংশে এই ধরনের নয়টি লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কর্নাটকের যুগন্ধর কবি গোপালকৃষ্ণ আদিগা তাঁর যে আত্মপরিচয় পাঠান সেটি কন্নাড় থেকে ইংরেজি করেন শারদাপ্রসাদ; এবং তা থেকে বাংলায় ভাষান্তর করেন গৌরীরানী সোম। দু'একটি কন্নাড় শব্দের অর্থ নিয়ে খটকা ছিল; প্রশ্নের উত্তরে আদিগা নিজেই সে শব্দগুলির ব্যাখ্যা করে দেন। গুজরাতের প্রথিতনামা কাহিনীকার প্রয়াত সুরেশ যোশী ভালোভাবেই বাংলা জানতেন; তাঁর সহায়তা নিয়ে 'আত্মকথা'র তর্জমা করেন প্রয়াত কবি কল্যাণ দাঁ। এলিজাবেথ বাচ্‌কোভ্‌স্কিও যত্ন করে বাংলা শিখেছেন; অদির উপরে লেখা তাঁর প্রবন্ধটির অনুবাদ আমি তাঁর সহযোগিতায় করেছি। বীণা আলাসে মারাঠি এবং বাংলা দুটি ভাষাতেই পারদর্শিনী; এই দুই অঞ্চলের ভিতরে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানে তিনি বিশেষভাবে সক্রিয়। লোকহিতবাদীর উপরে লেখাটি তাঁর নিজেরই বাংলারচনা।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের, দুই বাংলার সঙ্গে ভারতের এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানস আত্মীয়তা নির্মাণে 'জিজ্ঞাসা' জন্মাবধি ব্যাপৃত। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, ভাষাবিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে তিনশো'র বেশি প্রবন্ধ গত বারো বছরে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন বহু লেখকের তেমনই বহু বিষয়ের আলোচনা এখানে গ্রন্থভুক্ত করা গেল না, তবু আশা করি বর্তমান সংকলন থেকে পাঠক-পাঠিকারা জিজ্ঞাসার বিশিষ্টতা ও বহুমুখ কৌতূহলের কিছুটা পরিচয় পাবেন, এবং নির্বাচিত প্রবন্ধগুলি তাঁদের মনের দিগন্তকে প্রসারিত করবে।

এই প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য শ্রীমান অরিজিৎ কুমার এবং প্যাপিরাস কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯১ *শিবনারায়ণ রায়*

শান্তিনিকেতন।

রচনাসূচি

পত্রসূচনা

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখছেন এবং লিখবেন, এই পত্রিকার যাঁরা সম্ভাব্য গ্রাহক-গ্রাহিকা, এবং অন্যান্য নানাভাবে যাঁদের সহযোগের আমরা প্রত্যাশী, সম্পাদক হিসেবে তাঁদের কাছে এই পত্রিকার উদ্দেশ্য এবং পবিকল্পিত কর্মসূচী বিষয়ে আমাদের নিবেদন পত্রসূচনায় সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা আমাদের দায়িত্ব মনে করি ।

বাংলাভাষায় মননশীল মৌলিক এবং পরীক্ষামূলক রচনার নিয়মিত প্রকাশ এই ত্রৈমাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য । আমরা চাই পাঠক-পাঠিকাদের মনের দিগন্ত প্রসারিত হোক, তাঁরা বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ সম্পর্কে অধিকতর জিজ্ঞাসু হয়ে উঠুন, তাঁদের বোধ-বিচারে আরো সূক্ষ্মতা আসুক, মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, সমস্যা ও সম্ভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রে তাঁদের চেতনা সমৃদ্ধতর হোক, তাঁদের কল্পনা এবং বিবেক, ব্যক্তিগত এবং সমবায়ী উদ্যম সমৃদ্ধতর হয়ে উঠুক । মনের উজ্জীবনের সূত্রে ব্যক্তির এবং সমাজের উজ্জীবনের কাজে এই পত্রিকাকে নিষ্ঠাব সঙ্গে নিযুক্ত করতে আমরা আগ্রহী ।

আমাদের এই উৎকাঙ্ক্ষার কিছুটা নির্দেশ পত্রিকার নামকরণের মধ্যে নিহিত । জিজ্ঞাসা মানুষের স্বভাবজ বৃত্তি, কিন্তু তার বিকাশ অধ্যবসায় এবং অনুশীলনের উপরে নির্ভরশীল । অমিত কৌতূহল নিয়েই শিশুরা পৃথিবীতে আসে বটে, কিন্তু সেই কৌতূহলের পোষণ এবং প্রবর্ধন আপনা থেকেই ঘটে না । চৈতন্যের চাইতে জাড্যের ব্যাপকতা বেশি প্রকট; সেই জড়তা থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণ আমাদের কাম্য । যা প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত তাকেই নিত্য এবং প্রশ্নোর্ধ বলে মেনে নেওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে জিজ্ঞাসার অভিযান ।

কিংবদন্তীকে উপাত্ত হিসেবে ধরে নিয়ে সমাজস্বীকৃত প্রকরণে তার ব্যাখ্যা করতে আমরা অনেকদিন থেকে অভ্যস্ত । অপরপক্ষে জিজ্ঞাসার নির্দেশ হলো নূতন নূতন তথ্যের অনুসন্ধান, সেইসব তথ্যের যথার্থ্য নির্ণয়, তাদের নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপরে বিবিধ সম্ভাব্য প্রকল্পের উপস্থাপন এবং সেইসব প্রকল্পের অধ্যবসায়ী পুনর্বিচার । জিজ্ঞাসা এইভাবে বিজ্ঞানের জন্ম দেয়, এবং বিজ্ঞান কোনো চরম সিদ্ধান্ত আঁকড়ে থাকে না । সব সিদ্ধান্তই প্রশ্নসাপেক্ষ, এবং প্রশ্নই চৈতন্যকে ও মানবসমাজকে জরার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে । কিন্তু জিজ্ঞাসা শুধু তথ্যানুসন্ধান এবং তথ্যনির্ভর প্রকল্প বিচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । ন্যায়নীতি, ঔচিত্য-অনৌচিত্য, মূল্যনির্ণায়কের ভিত্তি, এ সকলই অন্বেষণের বিষয় । বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের উৎস যে জিজ্ঞাসাবৃত্তি তার প্রবর্ধনের কাজে আমরা সকলকে আহ্বান করি ।

জিজ্ঞাসার সঙ্গে কল্পনা, স্বাধীনতা এবং সৃজনীশক্তির অনুবন্ধ সুস্পষ্ট। যা আছে তাকেই চরম বলে গ্রহণ না করে যা সম্ভব এবং কাম্য তার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসার অন্যতম দায়িত্ব, এবং এই সম্ভব ও কাম্য অস্তিত্বকে মানবচেতনায় প্রত্যক্ষ করে তোলে কল্পনা। আবার বিকল্পের ভিতরে বাছাইয়ের দ্বারাই মানুষ নিজের স্বাধীনতাকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করে, এবং প্রশ্নের সূত্রেই বিকল্প গ্রাম উদ্ভাসিত হয়। যা নেই অথচ সম্ভব, অনুপাত্ত অথচ কাম্য, জিজ্ঞাসার উদ্দিষ্ট, কল্পনার দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত, স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নির্বাচিত, সেই বহুবেধ জগৎকে মানুষ কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পেসঙ্গীতে, ব্যক্তিজীবনে এবং সমাজসম্পর্কে যতটা রূপ দিতে পারে ততটাই সে প্রকৃত স্রষ্টা। ফলত পরিচিতের পুনর্বিচার, অজ্ঞাতের অনুসন্ধান, সম্ভাব্যের উদ্ভাবনা, কাম্যের রূপায়ণ—এ সবই জিজ্ঞাসার কর্মসূচীর অন্তর্গত। যে উদ্যোগে এই পত্রিকা সমর্পিত তাতে ভাবুক এবং কবি, অন্বেষক এবং উদ্ভাবক, শিল্পী এবং বিবেকী প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

এই উদ্যোগের পথে বাধা কম নয়। বিভিন্ন সংগঠিত ধর্ম আপন আপন শাস্ত্রপুরাণ, প্রত্যয়-নির্দেশকে প্রশ্নোর্ধ বলে দাবি করে। এই দাবি আজো অধিকাংশ সমাজে প্রবলভাবে অধিষ্ঠিত। ভক্তি এবং শাস্তির সম্পূরক ক্রিয়া এই দাবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকে সম্মোহিত এবং নিরুদ্ধ করে রেখেছে। অপরপক্ষে আধুনিককালে মতবাদের প্রচার এবং প্রভাব নিতান্ত প্রত্যক্ষ, এবং মতবাদের প্রধান লক্ষণ প্রশ্নবিষয়ে উগ্র অসহিষ্ণুতা। ধর্মীয় সংগঠনের পাশাপাশি দেখা দিয়েছে মতবাদাশ্রয়ী রাজনৈতিক দলগুলি; অবতার, পয়গম্বর, পোপ, জগদ্‌গুরুদের পাশে ঐতিহাসিক নিয়ন্ত্রণের দাবিদার নেতারা; বাইবেল, গীতা, কোরানের পাশে কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো জাতীয় ঘোষণাপত্র। তাছাড়া সব সমাজেই কায়েমী স্বার্থ বিদ্যমান; প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা যাঁদের সপক্ষে তাঁরা সেই ব্যবস্থা সম্পর্কে যে-কোনো মৌলিক প্রশ্নের নিরোধে সচেষ্ট। আধুনিক যুগে সাধারণ মানুষের চেতনাকে ভোগবৃত্ত এবং আচ্ছন্ন করে রাখবার উপায়গুলি অত্যন্ত প্রবল, এবং সেই উপায়গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছু শক্তিশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কবলে। মনের আলস্য, পরনির্ভরতা, অপরিচিত সম্পর্কে ভয় এবং চেনা গণ্ডীর স্বস্তির প্রতি লোভ, দায়িত্ববিমুখতা, চিন্তার অপরিচ্ছন্নতা—এ সবই জিজ্ঞাসার প্রতিবন্ধক।

এইসব প্রতিবন্ধক বিষয়ে আমরা সচেতন, এবং সচেতন বলেই বাংলাভাষায় জিজ্ঞাসাকেন্দ্রিক একটি পত্রিকার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করি। ইংরাজি এবং বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষায় এই জাতীয় কিছু পত্রিকা আছে। বাংলাভাষাতেও পূর্বে এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, এবং আধুনিক বাংলার মানস-ইতিহাসে তাদের ভূমিকা থেকে আমরা যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাই। শুধু পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাভাষাভাষী যেসব ভাবুক, শিল্পী এবং জিজ্ঞাসু আছেন, যাঁরা নানা বিষয়ের এবং শিল্পকলার চর্চায় নিবিষ্টচিত্ত এবং সমাজের সমৃদ্ধিসাধনে মনস্বীদের দায়িত্ব সম্পর্কে যাঁরা সচেতন, আমাদের উদ্যোগে আমরা তাঁদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করব। এই ত্রৈমাসিক কোনো দল বা মতবাদের মুখপত্র নয়। এর পৃষ্ঠায় নানা বিষয়ে নানাধরনের ভাবনাকল্পনার প্রকাশ এবং আদানপ্রদান আমাদের অভীষ্ট। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, প্রাচীন, অর্বাচীন, সমকালীন দুই বাংলা, বাংলার বাইরে স্থানেকালে বিস্তৃত যে বিরাট, বিচিত্র বহুবেধ মানবীয় জগৎ এবং তার উপক্রান্ত ও ভবিষ্য সম্ভাবনারাজি

—এর যে-কোনো ক্ষেত্র নিয়েই মৌলিক, পরিচ্ছন্ন এবং প্রশ্নোদ্দীপক রচনা আমাদের কাছে স্বাগত।

এই উদ্যোগের ফলপ্রসূতা সম্পর্কে কোনো প্রত্যাভূতি আমাদের জানা নেই। বিবেকী লেখকলেখিকা এবং সুবেদী গ্রাহকগ্রাহিকার সহযোগের উপরে এই পত্রিকার ধারকত্ব নির্ভর করে। আকাঙ্ক্ষিত সেই সহযোগ জিজ্ঞাসাকে নিরলস, অনতিদিষ্ট, অনাপত্তিক এবং অর্থান্বিত করে তুলুক।

ভারতবিদ্যা বিভাগ
মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়

শিবনারায়ণ রায়

বৈশাখ ১৩৮৭। প্রথম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা

গোপালকৃষ্ণ আদিগা

কবির আত্মপরিচয়

আপন রচনার অর্থায়ন বা মূল্যায়নে কবির অংশ থাকার কথা নয়। তাই তো ভাবছি আমার কবিতার উপরে আমার কী বক্তব্য থাকতে পারে! কাব্যে যে ভাব বা কল্পনার প্রকাশ হয় কবির মনোভূমিতে কোনো পূর্বপরিকল্পিত নক্সার ছকে তা আঁকা থাকে না। রচনার সঙ্গে সঙ্গে এমন সব বিষয় আপনিই এসে যায় কবি আগে থেকে যাদের কথা কিছুই ভেবে রাখেননি। রচনাকালে স্বতঃস্ফূর্ত হয় এমন বাক্যবন্ধ যা কবির অগোচর। কবির সৃষ্ট রূপবন্ধ অভিনব আভাস নিয়ে উদয় হয়; উপমাগুলিও বহুতল হীরার আলোর দ্যুতির মতো অর্থগৌরব বিচ্ছুরিত করে। কবিতায় কথা কত যে সূক্ষ্ম তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়, আর মানবিক আবেদনে ভরে যায়—কবি নিজের লেখার আবেগে তা জানতেও পারেন না। এইভাবে কাব্য লাভ করে প্রাণের স্পন্দন—জীবনের উত্তাপ। পুরাকালে একেই বলা হতো দৈব আশীর্বাদ বা প্রেরণা।

কবিকে যদি তাঁর কাব্যের ব্যাখ্যা করতেই হয়, তাহলে কেবল এইটুকুই তিনি বলতে পারেন যে তাঁর রচনায় তিনি কী করতে চেয়েছিলেন। এর বেশি কিছু তো তাঁর বলার নয়। তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা তিনি পেরেছিলেন কি না—এটা তাঁর বলবার কথা নয়। পাঠকের উপরেই সে ভার ন্যস্ত থাকা সঙ্গত। কবি লেখেন তাঁর প্রাণের তাগিদে তো বটেই, তবে পাঠকের কাছেও তাঁর লেখার প্রত্যাশা কম নয়। কবির এই পাঠকসমাজ কেবল বর্তমানের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ভবিষ্যতের পাঠকের দিকেও তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত। পরে যাঁরা আসবেন তাঁদের কাছেও সেইসব কবিতার আবেদন, তাদের মূল্যের স্বীকৃতি—এর উৎস বড়ো রহস্যময়, দুরধিগম্য। এই রহস্যকে ধরে দেওয়াই তো সমালোচকের ধর্ম। অবশ্য কবিও নিজের কাব্যের নিজেই বিচারক। সৃষ্টি ও তার মূল্যায়ন একই উৎস থেকে উৎসারিত। সব চাইতে অহংকারী কবিরও এই আত্মসমীক্ষার হাত থেকে নিস্তার নেই। সৃষ্টি ও গ্রহণ-বর্জনের নিরীক্ষা কবির মনে একসঙ্গেই চলতে থাকে। কোন শব্দটিকে রাখতে হবে, কোনটিকে বা বাদ দিতে হবে, কবির সৃষ্ট রূপকল্পনাটির প্রাসঙ্গিক আবেদনই বা পাঠকের কাছে কিরকম হবে, কোথায় ছন্দোভঙ্গ হলো, কোথায় বেসুরের অনুপ্রবেশ ঘটল—সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ এ-ভাবনা কবিকে সদাসতর্ক রাখে। তবে লেখা শেষ হওয়ার পরে নিজের রচনা বিষয়ে এই নিরপেক্ষ বিচার টিঁকিয়ে রাখা কবির পক্ষেও খুব কঠিন। আপন সৃষ্টির গৌরবে কবি তখন আত্মহারা। কঠিন তখন কবির পক্ষে আত্মজের নিরপেক্ষ বিচার। তাই তো দেখা যায় অতীতেরই বা কি, আধুনিক কালেরই বা কি কবিরা আপন রচনার সামনে প্রণত হয়ে তাকে বিচারের ঊর্ধে লোকচক্ষে তুলে ধরেন। এটা স্বাভাবিক, যদিও এই আচরণ মোটেই পরিশীলিত মনের পরিচায়ক নয়। এইসব কারণেই, অনুরুদ্ধ হয়েও আমার

কবিতা সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না । যে পরিপ্রেক্ষিতে ও প্রকরণে আমার কবিতারা রচিত হয়েছে, কবিতা লেখার সময়ে আমার ভেতরে-বাইরে যা ঘটছিল, কেবল তাদের কথাই এখানে বলব ।

কাব্য বা শিল্পকর্ম তখনই সার্থকতা লাভ করে যখন শিল্পী তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে পলাতক কোনো মুহূর্তকে চিরন্তনের মহিমায় উত্তরণ করেন । এই প্রক্রিয়ায় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় । শিল্পে ত্রিকালের এই নাভিকরণ বা ফোকাসিং ক্বচিৎ ঘটে । কিন্তু এ না-হলে সার্থকতা বোধও আসে না । আমার কোনো কোনো কবিতায় আমি এই সার্থকতা অর্জন করেছি কি না ভবিষ্যৎ কালই সে বিচার করবে । সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সমকালীন কোনো কোনো বোদ্ধার উপলব্ধিতেও তার বিচার হতে পারে । সেই কবিতাই রসোত্তীর্ণ বা সার্থক শতবর্ষ পরের পাঠকের মনেও যা সাড়া জাগাতে পারে, কিংবা শতবর্ষ আগেকার কোনো কাব্যনুরাগী যদি আজ উপস্থিত হতে পারতেন তাঁর মনেও যে কবিতা সাড়া তুলত । যে কবি একথা স্মরণে রাখে সে নম্র এবং বিনয়ী হতে বাধ্য । কোনো বিশেষ সুবিধা বা প্রতিপত্তি সে চাইতে পারে না ।

এখন থেকে পঁয়ষট্টি বছর আগে দক্ষিণ কানাড়ার উত্তর-সীমান্তে এক গ্রামে আমার জন্ম । আমার জন্মস্থান সমুদ্রের থেকে খুব দূরে নয় । গ্রামের নাম মোগেরি । ঐ অঞ্চলের গ্রামগুলিব বিশেষত্ব এই যে, গ্রামের বাড়িগুলি এক জায়গায় পরস্পরের কাছাকাছি নির্মিত হয় না । তারা দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া ভাবে সারা গ্রামে ছড়িয়ে থাকে । এক বাড়ি থেকে অন্যটিতে যাওয়ার জন্য পথ বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছুই থাকে না । ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে হেঁটে যে পথ তৈরি হয়েছে--এছাড়া ঐ বাড়িগুলিতে যাওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই । আমাদের বাড়িও এইরকম একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো । অন্য দ্বীপগুলোর সঙ্গে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথের যোগ থাকলেও আমাদের বাড়িটা অন্য বাড়িগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন । বাড়ির পিছনে এক মস্ত খোলা মাঠ, বাড়ির দক্ষিণদিকে ফলের বাগান, বাড়ির সামনে আর পশ্চিমে ধানের ক্ষেত । বাড়ির অদূরে উত্তর আর উত্তর-পূর্বদিকে বড়ো বন । সেই বনের ঠিক কিনারায় একটি ছোট পুকুর । পুকুরটিকে দেখলে মনে হয় কেউ যেন একটা বড়ো গামলা এনে বসিয়ে দিয়েছে । তার কিনারা ঘিরে রয়েছে নারকেল, 'আমতে' আর শালগাছের সারি । ঝাঁকড়ানো ডালপালা মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে সেখানে এক বকুলগাছ । তার নীচে পাথরের স্তূপে সাপেদের আস্তানা । পাথরগুলোর উপরে ঝরে পড়ে গাছের হলদে হয়ে আসা পাতা আর ফুলের রাশি । মাঝে মাঝে সেখানে আবার সাপের খোলসের দেখা পাওয়া যায় ।

আমাদের বাড়ির হাতার ভিতরে দু' সারি গাছ লাগানো । আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি, কলা, পেয়ারা, নেবু এইরকম সব ফলের গাছ । এ এক নিবিড়, মনকাড়ানো, প্রাণময় জগৎ । এই গাছপালার সমারোহের সঙ্গে মানানসই আমাদের গোলাবাড়ির উঠোনে জীবজন্তুর ভীড় । আমাদের ক্ষেত-খামারের অঙ্গ হয়ে আছে গাইগোরু, বলদ, মহিষ আর তাদের বাছুরের পাল । গুটিছয় কুকুর-বেড়ালও তাদের নিত্যসঙ্গী । এইসবের মধ্যেই আমার শৈশবকাল কেটেছে । আমার অষ্টপ্রহর এদের নিয়েই ভরেছিল । দিনের চব্বিশ ঘণ্টাও যেন যথেষ্ট দীর্ঘ মনে হতো না । এরা প্রত্যেকেই ছিল আমার আগ্রহ, সেবা-ভালোবাসার এক-একটি কেন্দ্র ।

* এই ধরাছোঁয়ার জগতের কিনারায় নূতন অন্য কিছু জগৎ মাঝে মাঝে উঁকি দিত আমার শৈশবজীবনের শেষের দিকে। সেইসব অভিনব জগতের আভাস মেলে, কিন্তু অর্থ বুঝি না। তারা ইন্দ্রিয়গোচর কিন্তু রহস্যময়, কিছুটা দৃশ্য অনেকটাই অদৃশ্য। আমার শৈশব পা টিপে-টিপে কৈশোরে পৌঁছনোর সময় এই রহস্যময়তা বিষয়ে আমি সচেতন হয়ে উঠি। মেঘের আড়াল পেরিয়ে দূরে পশ্চিমঘাটের গিরিশ্রেণী। বাড়ির সদর দরজার সামনে চাতালে বসে তাদের দেখতে দেখতে মন যেত উধাও হয়ে। পাহাড়ের চূড়াগুলি আকাশের নীলিমায় মেশামিশি হয়ে কখনো-বা মেঘের মাঝে আধঢাকা পড়ে যেত। চেয়ে চেয়ে আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ লাগত। এক অজানা অনুভূতির অভিজ্ঞতা আমার বোধশক্তি আর চেতনায় রূপান্তর ঘটিয়ে দিত। খোলামেলা প্রাঙ্গণের উপরে দেখতে পেতাম নীল আকাশের গহন গভীর বিস্তার। ভেসে চলে যাওয়া মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে দিনের বেলায় প্রায়ই আমার সময় কেটে যেত। কোথায় যে ওরা চলে যাচ্ছে, যেতে যেতে কতবার যে ওদের রূপ বদলে যাচ্ছে! অবিরাম মুহুর্মুহু এই পরিবর্তন, এই চঞ্চলতা, গতির আবেগে বহমান মেঘেদের অন্তহীন মিছিল—আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো। সন্ধ্যার অন্ধকারে অসংখ্য নক্ষত্রের বিন্যাস মনে জাগিয়ে তুলতো যেন যুগান্তরের হারিয়ে যাওয়া মণিরত্নের পুনরাধিকারের আনন্দ। ওরা আমার কাছ অন্ধকারের গর্ভে জ্যোতির্ময় জগতের ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে আসতো। নভস্তলের এই আলোকবিন্দুদের কোনোটি বা আমার মনকে ভীষণ আলোড়িত করে তুলতো। কী যেন সুপ্রাচীন বেদনা নতুন করে উদ্বেলিত করতো আমার মন। অথচ এই বেদনার ভিতরেই মিলতো সুমহৎ শান্তির স্বাদ। এখনও আমার স্মরণে জীবন্ত হয়ে আছে সেই আনন্দের মূহূর্তগুলি—সেই মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা নিঃশব্দে কেটে যাওয়া, সেই আকাশের উত্তাল ঢেউয়ে চাঁদের সাহসী সন্তরণ, সেই তারাদের পাঠানো সংকেতে আকুল হয়ে ওঠা। প্রকৃতির এই মোহিনীমায়ার অন্তরালে, এই উৎসব আর আতসবাজীর পশ্চাৎপটে নিয়ত বেজে চলেছে পশ্চিম সমুদ্রের অবিচ্ছিন্ন কল্লোল। এ জলধ্বনি তানপুরার একটানা সংগীতের রেশের মতো ক্লান্তিহীন। আমাদের বাড়ি থেকে সমুদ্রের দূরত্ব প্রায় এক মাইলের মতন। নিদ্রায় বা জাগরণে সবসময় সেই সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি আমাদের বাড়ি থেকে শোনা যায়। কখনো শুনি তার একটানা অব্যক্ত আর্তনাদ—তা খাদে নেমে যায় আবার তীব্রতর ঝংকারে ধ্বনিত হয়। কখনো সে গর্জনে ফেটে পড়ে, কখনো বা তার করুণ সুরের কান্না বাতাসে ভেসে আসে। শীতকালে এবং গ্রীষ্মকালে এই জলধ্বনিই আবার বনমর্মরের মৃদু মাধুর্যে ভরে যেত। কিন্তু বর্ষার ঝড়ের দাপটে সে অন্যমূর্তি। ঝড়ের ঘাড়ে চড়ে সে যেন আমাদের কানের কাছ এসে গর্জে উঠতো। মুক্ত আকাশ, অদূরবর্তী সমুদ্র, আর মাঝখানে পাহাড়ের সারি : আমার চেতনার এরাই স্থানাঙ্ক। এদের স্থায়িতা ও বিলীয়মানতা আমার কবিতার পটকে নিরূপিত করেছে।

আমার অক্ষর পরিচয়ের পরেই বই পড়ার জন্য আমি পাগল হয়ে উঠলাম। বাড়িতে এবং গ্রামে যত বই ছিল সব আমি পড়ে শেষ করে ফেলি। পানজে মাঙ্গেশ রাওয়ের শিশুপাঠ্য অনেক কবিতাই আমাদের স্কুলের পাঠ্যবইয়ে ছিল। কারো সংগ্রহ করা একটি সাময়িক পত্রিকায় বেন্দ্রের [১] কয়েকটি কবিতা প্রথম পড়ে আমি যে কী মুগ্ধ হয়েছিলুম, সে আমার আজও মনে পড়ে। ঐ বয়সে আমার স্মৃতিশক্তি ছিল দারুণ। আমার ছোট

ঠাকুর্দার কাছে আমি সংস্কৃত পড়তাম। তিনি তো আমাকে শ্রুতিধর আখ্যা দিয়ে দিলেন। পরে কিন্তু বুঝতে পারি যে এই ক্ষমতা আমার খুব কাজে আসেনি। এর ফলে এই হলো যে আমার অমনোমতো বিষয় আমি মনে রাখতে পারতাম না। শুধু যা আমার মনের ক্ষিদে মেটাতো তাই আমি ধরে রাখতাম। স্মৃতি ভালো হলে কী হবে, স্কুলের পরীক্ষার ফল বিশেষ ভালো হতো না।

খুব ছেলেবেলা থেকেই আমি ছিলাম নির্জনতা-প্রিয়। কারো সঙ্গলাভের চেয়ে নিজেকে নিয়ে একলা থাকতেই আমার খুব ভালো লাগত। তবে আমাদের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে আমার তো একলা হওয়ার অবকাশ ছিল না। আমার ক্লাসের ছেলেদের কি অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আমি বেশ মানিয়ে নিয়েই চলতাম কিন্তু মুস্কিল হতো নতুন কারো সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেওয়ার বেলায়। এ ব্যাপারে আমি বড়ো মুখচোরা ছিলাম। নিজে আগ বাড়িয়ে গিয়ে জায়গা জোড়বার কথা ভাবতেই পারতাম না। বয়স বাড়ার সঙ্গে এ বোধও আমার হলো যে আমার ভিতরে যদি সত্যিই কোনো গুণপনা থাকে, আমার যদি কোনো দাম থাকে—তাতেই তো অন্যের মন টানবে। আমাকে কেন সে-কথা লোককে মনে করিয়ে দিতে হবে? আমার চারপাশের লোকজন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আমি আরও নিজের ভিতরে ডুবে গেলাম। গ্রামের মন্দিরটিতে বেশ আমার নির্জের মনের মতো জায়গা বেছে নিলাম। এই নির্জনে বসে আমার ভাবনা কল্পনা, দিবাস্বপ্ন মুক্তি পেত। এখানে বসে নানা জিনিসের তুলনা করতাম, তাদের ভিতরে নানা প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক আবিষ্কারের আনন্দে মন ভরে যেত। মন্দিরের জনশূন্য নীরবতায় মৌমাছির গুনগুন আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যেত না। সে গুঞ্জরণ যেন নীরবতার অন্তরের প্রতিধ্বনি। কতদিন যে আমার কেটে গেছে সেখানে আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে আর একই চিন্তার রোমন্থনে। আমি তখন ছিলাম একেবারেই সরল, অনভিজ্ঞ, আমার ভক্তিও ছিল তাই অপরিসীম। নিজের উপর নিজেরই চাপানো নির্দেশ ভেঙেছি বলে কতবারই না বিগ্রহের সামনে অনুতাপে লুটিয়ে পড়ে মার্জনা চেয়েছি। তারপরে আবার নতুন নতুন অবিশ্বাস্য শপথ নিয়েছি। প্রতিটি শপথ নিজেই আবার ভেঙেছি, আর কিছু দিনের মধ্যে আমার সেই মূঢ় বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়েছে।

এই রকম যখন আমার মনের অবস্থা, আমার ধর্মবিশ্বাসের পুরোনো জগৎ যখন চূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আমি বেইনড়ুর-এর মাধ্যমিক স্কুলে এসে ভরতি হলাম। এইখানে বিবেকানন্দের লেখা প্রথম আমার হাতে আসে। গান্ধীর প্রভাবও এই সময়েই আমার উপর পড়ে। দেশের জন্য এবং দশের জন্য আত্মত্যাগের আদর্শ এইখানেই আমার মনে সাড়া তোলে। চিন্তায়, কথায় এবং আচরণে অভিন্ন হওয়ার আদর্শ আমার মনে জাগে। মিলের ধুতি পরা ছেড়ে দিলাম, বিলাসদ্রব্য বলে চিনি অস্পৃশ্য হয়ে গেল আমার কাছে; হোটেলে বা রেস্তোরাঁয় যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলাম। এই মূঢ় আত্ম-নিপীড়নপ্রায় সংযম—পূর্ব-অভিজ্ঞতার উপরে যার প্রতিষ্ঠা হয়নি—তারজন্য পরে আমাকে কড়ায় গণ্ডায় দাম দিতে হয়েছে। পরবর্তীকালে মহীশূরে থাকাকালীন এরই প্রতিক্রিয়ায় আমাকে খুব ভুগতে হয়েছিল। এই যে সংযমের বাড়াবাড়ি এবং তার থেকে মুক্তি, এই দুই ঘটনাই আমার জীবনে ছাপ রেখেছে।

পুরোহিতের বংশে আমার জন্ম হলেও চাষবাসই ছিল আমাদের জীবিকার প্রধান

অবলম্বন। পরিবারের সকলকেই—শিশুরাও তার থেকে বাদ পড়ত না—ক্ষেত খামারের কাজে কোনো না কোনোভাবে হাত লাগাতে হতো। আমরা অল্পবয়েসিরা মাটি খুঁড়তাম, নারকেল গাছ লাগাবার গর্তকে খুঁড়ে খুঁড়ে আরও গভীর করতাম, আমাদের গাছে চড়ে নারকেল পেড়ে আনতে হতো, নারকেলের ছোবড়া ছাড়িয়ে ছোবড়ার তন্তুগুলিকে আলাদা করতে হতো, ক্ষেতে নিড়ানি দিতে হতো, লাঙল দেওয়া জমির মাটির চাঙড়কে ভেঙে ধুলো করে সমান করতে হতো, বীজতলা থেকে তুলে-আনা ধানের চারা আঁটিগুলিকে গোছা করে চাষীদের হাতে হাতে দিতে হতো ক্ষেতে সেগুলিকে আবার লাগাবার জন্য। ধানকাটার সময়ও আমাদের হাত লাগাতে হতো। আবার সেই কাটা পাকা ফসলের আঁটিগুলিকে বাড়িতে বয়ে নিয়ে আসতে হতো। শীতের ভোরে পাঁচটায় বড়োরা ঘুম থেকে টেনে তুলতেন আমাদের। গজগজ করতে করতে উঠে সবৎস গোধন নিয়ে চরাতে যেতাম। খাল থেকে সেচের জল তুলবার সময় তাতে ধুলোময়লার সঙ্গে আমাদের ঘামও মিশে থাকত। গ্রীষ্মঋতুতে দিনের শেষে আমাদের কুয়োর ভিতরে ছেলেদের কাউকে নামতে হতো কুয়ো পরিষ্কার করার জন্য। শুকনো কুয়োর একেবারে নীচে একহাঁটু থক্‌থকে কাদায় দাঁড়িয়ে থিতিয়ে থাকা পচা তলানি পাঁক ঝুড়ি করে তুলে ফেলে কুয়োর জলের বদ্ধ উৎসমুখ পরিষ্কার করতে হতো। এইসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মাটির বিচিত্র তথ্যের সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় হয়। কখনো কখনো বড়দের পীড়নে হলেও এইসব কাজ আমি স্বভাবত বেশ খুশি হয়েই করেছি। আজ পেছন ফিরে দেখছি—এ স্মৃতিতে নিরানন্দের কিছু নেই।

দক্ষিণ কর্নাটিক 'যক্ষগণ'-এর দেশ ২। বর্ষার পরে আকাশ নির্মেঘ আর বাতাস সুখশীতল। ফসল কাটা হয়ে ঘরে এলে মাঠে আর বিশেষ কাজ থাকে না। এই সময়েই 'ভাগবত' পালার দল গ্রামে-গঞ্জে যায় পালা-নৃত্যাভিনয় দেখাতে। এই মুক্ত-মঞ্চ অভিনয় গ্রামবাসীদের ভাবজগতের এক পরম সম্পদ। নৃত্যনাট্যগুলি তাদের মনে ভয়ভক্তির, বিস্ময়ের, আনন্দের এক অপরূপ বিশ্ব সৃষ্টি করে। এই জগৎ যেমন বহুদূরের অপহৃত শতাব্দীর, তেমনিই তা পরিচিত প্রাত্যহিক জগতের সঙ্গে কোনো রহস্যময় বন্ধনে যুক্ত। যক্ষগণ-এর ছোট বড় ঢোলের আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসে, সুপ্ত গ্রামবাসীদের ঘুম ভাঙিয়ে বাইরে টেনে আনে। শরৎকালে আমাদের বাড়ির চার-পাঁচ মাইলের ভিতরে যত পালা অভিনয় হতো আমি কোনোটিকেই না দেখে ছাড়তাম না। এখনো মনে পড়ে সেই অর্জুনের যুদ্ধ, সঙ্গে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ, সেই বভ্রুবাহন, সেই বালি-সুগ্রীবের যুদ্ধ, সেই প্রহ্লাদের কাহিনী, আরো কতো যে পালা। যক্ষগণ-এর সেই গানের তালের এবং সুরের দোলার অনুরণনে আমার দিন-রাত্রি ভরে থাকতো। অনুক্ষণ সেগুলি আউড়ে যেতাম। অভিনেতাদের নাচের ভঙ্গি আর পা ফেলার ধরন আমার চোখের সামনে যেন ভাসত। অজান্তে আমার হাত-পা এমনকি আমার সর্বশরীরে তাদের চলাফেরার ধরন এসে গেল। চোদ্দ পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে আমি বাড়ির ভিতর এসব পালা-অভিনয়, "প্রসঙ্গ"-অভিনয়ে মেতে ছিলাম। আমি কুণ্ডাপুর হাইস্কুলে পড়ার সময়ে একবার কয়েকজন বন্ধু মিলে সিন-সিনারি যোগাড় করে এক মঞ্চ খাড়া করলাম। সেই মঞ্চে স্থানীয় নাট্যকারের লেখা "বিশ্বামিত্রের বীরত্ব" নাটক অভিনয় হলো। সাজপোষাক নাচগান কিছুই বাদ দেওয়া হলো না। এখন ভাবতে মজা লাগে যে বিশ্বামিত্রের ভূমিকায় আমিই অভিনয় করেছিলাম।

বাড়িতেও এক কবিত্বের পরিমণ্ডলেই আমরা বড়ো হয়ে উঠেছি। রোজ রাত্রে আমরা ঘুমোনোর আগে আমার খুড়িমা নারানাপ্পা কিংবা জেমিনীর মহাভারত অথবা তোরভে রামায়ণ থেকে মুখে মুখে সুর করে শ্লোক বলে যেতেন। তাঁর মধুর স্বরের মাদকতা প্রায়ই আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দিতো। আমার ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, বাবা, কাকা, পিসীমা সকলেরই পদ্য লেখার ঝোঁক ছিল। আমার বাবা সংস্কৃত শ্লোক লিখতেন। তিনি কন্নড় ভাষায় স্বদেশপ্রেমের সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। আমার ঠাকুরমার ভাই 'যক্ষগণের' অভিনয়ের উপযাগী দু-তিনটি পালাও লিখেছিলেন। তিনি সুন্দর গাইতে পারতেন, ঢোল বাজাতে পারতেন, পদের ব্যাখ্যানেও দক্ষ ছিলেন। এই পরিবেশই নিশ্চয় আমার তেরো বছর বয়সে পদ্য লেখার মূলে আছে, মনে হয়। ছয় পংক্তির ভামিনী ষট্‌পদী এবং বর্ধিকা ষট্‌পদী রীতিতে কবিতা লিখেছি। চার পংক্তির 'কাণ্ড' রীতির কবিতার স্তবকও লিখেছি। কবিতার বিষয় নিয়ে তখন আমার সমস্যা ছিল না, ছন্দ নিয়েই বেশ সাবধান হ'তে হতো। এই সময় আমি কুণ্ডাপুর স্কুলের ছাত্র। আমি সংস্কৃতের ছাত্র ছিলাম বটে। কিন্তু আমি একদিকে কন্নড় ভাষায় প্রাচীন সাহিত্য ঘেঁটে বেড়িয়েছি, অন্যদিকে সাময়িক পত্রে নতুন কবিতা খুঁজে খুঁজে পড়েছি। কবিতা-পাঠে আমি যে আনন্দ পেতাম সে আনন্দ আমি অন্য কিছুতেই পেতাম না। একদিন হঠাৎ-ই আমি কাডেনগডলুর লেখা নালমে-র দেখা পেয়ে গেলাম। তারপরে একদিন মাস্তির লেখা ছোট গল্পগুলিও আমার হাতে এসে গেল। এরাই আমার দৃষ্টিকে এক নতুন দিগন্তের দিকে প্রসারিত করে দিল।

আমাদের পরিবারের কেউই উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। আমার বিদ্যাশিক্ষা হাইস্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। বাড়ির সকলে চেয়েছিলেন যে আমি সংস্কৃত এবং জ্যোতিষে পণ্ডিত হয়ে উঠি। কি করে যে তাদের সেই পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো তা আমার কাছে আজও এক রহস্য বটে। সাংসারিক বুদ্ধি চিরদিনই আমার কম। ছোট ছোট সুখ-সুবিধার দিকে আমি মোটেই উদাসীন নই, কিন্তু মনে হয় আরামের বস্তুগুলি বাগিয়ে আনবার পটুতা আমার নেই। তবে পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়ার এক প্রবল ইচ্ছা আমার ছিল। যাই হোক কতকগুলো ঘটনার যোগাযোগে আমার মহীশূরে পড়তে যাওয়া হয়ে গেল। সাধারণভাবে কার্যকারণ খুঁজতে গেলে ১৯৩৬ সালে আমার মহীশূরে যাওয়ার পিছনে কোনো যুক্তিই পাই না। এ সময়ে আমার বয়স ছিলো আঠারো।

তখনকার দিনে এত দূরে যাওয়া মোটেই সহজ ছিল না। একে তো জায়গা নতুন। তার উপরে স্থানীয় লোকেদের বোলচাল, ধরণ-ধারণও আমার অজানা। যেন সম্পূর্ণ এক অচেনা জগৎ। পাঁচ-ছ বছর খুবই অনিশ্চয়তার আর দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটে। নিয়ত চরম অর্থাভাবের সঙ্গে আর নিজের স্বভাবগত সংকোচের সঙ্গে লড়তে হয়েছে আমাকে। নিত্যদিনের আহারের যোগাড় এক সমস্যা, তক্কে তক্কে থাকতে হয় সেদিনকার আহারটি কার উপর দিয়ে জোটানো যায়! আজ এত বছর বাদে সেইসময়কার স্মৃতি স্বপ্নের মতন মনে হয়। কিন্তু তখন আমার প্রতিটি দিন ছিল সন্দেহে, অনিশ্চয়তায় কণ্টকাকীর্ণ--একটা কিছু উপায় খুঁজে পাওয়ার জন্যে হন্যে হ'য়ে ওঠা। সে কী মনের অবস্থা, কী তার তীব্রতা। নতুন বন্ধু আঁকড়ে ধরা, নিত্য নতুন অপমানের আঘাত সহ্য করা।

মহারাজার কলেজ তখনকার দিনে শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। ঐ প্রতিষ্ঠানের

আওতায় অনেক প্রতিভাই সেদিন তাঁদের সৃজনীশক্তির পুষ্টি সংগ্রহের সুযোগ পেয়েছিলেন। আমার জীবনের এই পর্যায় আমি লিখি আমার আবেগমথিত কবিতাগুলি। ঐখানে আমার পরিচিত কয়েক ব্যক্তি আমার কাব্যোপলব্ধিতে এবং আমার বৌদ্ধিক বিবর্তনে সাহায্য করেন। এতে আমার বড় উপকার হলো। বইয়ের জগতের অফুরন্ত সম্পদে আমারো যে উত্তরাধিকার আছে, এদের কল্যাণে সেকথা বুঝতে শিখি। কবিমনের নিবিড় চিন্তা এমনভাবে প্রকাশ পাবে যাতে সে ভাব অবাধে পাঠকের মনেও সাড়া জাগায় —এই ছিল তখনকার দিনের কাব্য বিষয়ে প্রচলিত ধারণা। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তখন আমি অনেক কবিতা লিখি। তাদের মধ্যে "ওলাথোটি" (দ্বন্দ্ব) নামে কবিতাটি বি. এম. শ্রীকান্তিয়া পদক লাভ করে।

এই সময়েই আমার জীবনের লক্ষ্য নিয়ে আমি চিন্তা করতে থাকি। আমার নিজের শক্তি সামর্থ্য এবং ত্রুটি ও অক্ষমতা বিষয়ে আমার ধারণা কিছুটা স্পষ্ট হয়। আমি ক্রমে বুঝতে পারি যে কাব্যসাধনাতেই আমার মুক্তি। কবিতা লেখাই আমার জীবনের অভিপ্রায়। সকলের জীবনে সার্থকতালাভের ধারণা তো একরকম নয়। সম্পদ-সংগ্রহ বা ইন্দ্রিয়বিলাস অথবা আক্রোশের অভিব্যক্তি কিংবা অন্যের উপরে প্রভুত্ব খাটানো —এসবে আমি কোনো সার্থকতার সম্ভাবনা খুঁজে পাইনি। আমি বুঝতে পারলাম যে আমার যেটুকু ক্ষমতা তার সংরক্ষণ ও বিকাশ ঘটিয়ে মানুষের ভালোর জন্য তার প্রায়োগই আমাব জীবনসাধনা। আমি আরও বুঝতে পারলাম যে, যে সাহিত্যের কিছু মূল্য আছে সে সাহিত্য কেবল স্বাধীনতার মুক্ত পরিমণ্ডলেই সৃষ্টি হতে পারে। এ স্বাধীনতা তো কেবলমাত্র অপরের প্রভুত্ব থেকে মুক্তি নয়, এ স্বাধীনতা অহমিকার, আপনার বাসনার, উচ্চাকাঙ্ক্ষার, লোভের নাগপাশ থেকে মুক্তিও বটে। আমি বুঝতে পারলাম যে জীবনধারণের অপরিহার্য উপাদান তৈল-তণ্ডুল-লকড়ির বিনিময়ে কাব্যকে বিকিয়ে দেওয়া যায় না।

পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে একসময়ে আমি ঠিক করে ফেললাম যে আমি অধ্যাপনার বৃত্তিই গ্রহণ করবো। এতে আমার বিবেক এবং মূল্যবোধের সঙ্গে আমার জীবিকার কোনো বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। আমি আমার কবিতার কাছে সৎ থাকতে পারবো। বাইরের অবস্থা বা ঘটনার জগতে নয়, অন্তরের জগতেই কবিতার অধিষ্ঠান। এই কারণেই মনে হয় কাব্যে সেই অমরত্বের আভাস পাই যা হয়তো সব মানুষের ভিতরে আছে। যদি অমরত্বেব মতো গুরুগম্ভীর শব্দ-ব্যবহারে সঙ্কোচ হয়, তাহলেও নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, কাব্য হচ্ছে বিরাট মানব-জীবন-প্রবাহের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যে প্রবাহ অতীত এবং বর্তমানে ব্যাপ্ত হয়ে ভবিষ্যতের দিকে বয়ে চলেছে। কেবল বর্তমানেই কবিতার আবেদন সীমাবদ্ধ নয়—কবিতার অর্থ এবং আবেদন ভবিষ্যতেও প্রসারিত। আমি আরও বলতে চাই যে কবিচরিত্র সহ্য-ধৈর্য গুণে পরিশীলিত হতে হবে যাতে তাচ্ছিল্য, অবহেলা, স্তুতি-নিন্দায় তার মন অবিক্ষুব্ধ থাকতে পারে। কবিকে সারাজীবন এই বিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে হবে যে যখন সে আর থাকবে না তখনও তার কাব্যের আবেদন ফুরিয়ে যাবে না।

যখন আমার বত্রিশ বছর বয়স তখন আমি আমার 'নদেদু-বন্দ দারি' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। তার আগেই আমার 'ভারতরঙ্গ' এবং 'কট্টুবেবু নাবু'

নামে দু'টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় । ঐ সময়ে আমার মধ্যে এক বিপর্যয় ঘটেছিল। সেই অভিজ্ঞতার ফলে আমি আমার বিশ্বাসের বা জীবনদর্শনের একটি দৃঢ় এবং নির্দিষ্ট ভিত্তি গড়ে তুলতে পারি । আমার বিশ্বাস বা দর্শনকে বোধহয় সংক্ষেপে এইভাবে পেশ করা যেতে পারে ।

১. মনের উপরতলা নিয়ে যে কবিতা লেখা হয় তা সার্থক নয় । চেতনার সঙ্গে চেতনার নীচে কিংবা আশেপাশে যেসব অনুভূতি বিরাজ করে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত দহন থেকেই কবিতার জন্ম হয় । এর জন্য একদিকে দরকার নিরন্তর অনুশীলন, অন্যদিকে ঠিক মুহূর্তটির জন্য অসীম সধৈর্য প্রতীক্ষা ।

২. লোকের বাহবা পাওয়ার আশায় যে লেখা, সে রচনা কাব্য নয় । কাব্য হচ্ছে কবির স্বকীয়ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ । প্রতিদিনের কথাবার্তায় ব্যবহার করা সাধারণ শব্দগুলিই রূপান্তরিত হয় কবির নিজস্ব অনুভূতির বিশ্বস্ত প্রতিরূপে—এবং এই-ভাবেই তারা কবির স্বকীয়তার ঘোষণা করে ।

৩. ঐতিহ্যকে বোঝবার চেষ্টা না করে তাকে কেবল অস্বীকারের দ্বারা নবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নূতন মূল্যবোধের অভ্যুদয় সম্ভব নয় । ঐতিহ্যকে ভিতর থেকে ধ্বংসের চেষ্টা বিশৃঙ্খলারই নামান্তর । বুদ্ধিজীবীকে গতানুগতিক সামাজিকসংস্কারের আবরণকে বিদীর্ণ করে তার ভিতরকার বীজকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব নিতে হবে । তারপর নতুন জমিতে সেই বীজ বপন করে তা যাতে আবার গাছ হয়ে উঠতে পারে তার জন্যে যত্ন নিতে হবে ।

৪. লিখিত কবিতার সংখ্যার প্রাচুর্য দিয়ে কবিতার মূল্যায়ন হয় না । প্রকাশিত বইয়ের প্রদর্শনী করে লোকের নজর কাড়বার চেষ্টা অপরিণত মনের পরিচয় দেয় । অভিজ্ঞতার নির্যাসকে রূপ দিতে পারা হলো কবিতার যথার্থ কাজ । কবিতা সংখ্যায় অনেক নাই বা হলো, কি যায় আসে তাতে ? কবির ভাবনা হবে কালের নিরিখে সে লেখা মূল্য পেলো কি না—সে যা লিখেছে তা কি তার মৃত্যুর পরেও বাঁচবার সামর্থ্য রাখে?

৫. অতি সংবেদনশীল কবির লেখার গুরুত্ব সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক দিক থেকেও অনেকখানি । কিন্তু সেই গুরুত্ব স্বয়ংসিদ্ধ, বাইরের কোনো মাপকাঠি দিয়ে তার বিচার চলে না । সমাজে কবির বিশিষ্ট অবদান হলো শব্দবন্ধের যথাযথ প্রয়োগ। মানুষের কাছে ভাষার মতো অমূল্য সম্পদ আর কী আছে ? যুগে যুগে সমাজ চেতনায় যেসব ভাবনাকল্পনা অস্পষ্ট আকারে ভেসে বেড়ায়, যেসব অভিজ্ঞতা সমাজের অবচেতন মানসের গভীরে ছায়া ফেলে তারাই ঐ যুগের কবিদের সংবেদনশীল চৈতন্যে অনেক বেশি তীব্রতায় ও স্পষ্টতায় ধরা পড়ে । কবিরা সেইসব ভাবনা ও অভিজ্ঞতাকে উপযোগী ভাষার রূপবন্ধে মূর্ত করেন । এই প্রক্রিয়ায় শব্দের রূপবন্ধে কবির আদর্শও সঞ্চারিত হয় । এমনি করেই কবি বাক্‌প্রতিমার ভিতর দিয়ে মানবজীবনের উন্নতিসাধন করেন, কবিতা জীবনের জয়গান গায় । কবির রচনায় প্রত্যেক নতুন যুগ তার নিজস্ব ধ্যানধারণার প্রতিফলন দেখে । কবি তাই সব যুগেরই সমকালীন । সমকালীনতা মানে নয় শুধু তাৎক্ষণিকে বেঁচে থাকা । যা নিত্য ও কালোত্তীর্ণ তাকে বিশেষযুগের পোষাকে উপস্থিত করবার

সামর্থ্য কবির আছে বলেই কবিরা নিয়ত সমকালীন ।

৬. যা আমরা অনুভব করি এবং যা আমরা প্রকাশ করি, এই দুইয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানকে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টাই সৎ কবিতার লক্ষণ । এই চেষ্টার মধ্যেই কবির চারিত্রশক্তি নিহিত— এটিই তাঁর সততার অভিজ্ঞান । চিন্তায়, কথায় ও কাজে ঐক্য যেমন উৎকৃষ্ট জীবনের পরিচায়ক, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের নৈকট্য তেমনি সৎ কবিতার বৈশিষ্ট্য ।

আমার কবিতার বিবর্তনের ইতিহাসে একথা খুবই প্রাসঙ্গিক যে আমার এই বিশ্বাসাবলী বা দর্শন যেসময়ে আমার মনে গড়ে ওঠে সেইসময়ে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের নুতনত্বের আবেদন-উচ্ছ্বাস চিন্তাশীল মানুষদের মনে ক্রমশ থিতিয়ে আসছিলো । আমাদের সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতা বিষয়ে অনেকের যে তখনো মোহভঙ্গ হয়নি তার জন্য আমাকে অথবা যাঁরা আমার মতো ভাবছিলেন তাঁদের দায়ী করা চলে না। ইতিমধ্যে ইংরাজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে । এলিয়ট, ইয়েটস এবং অডেনের দ্বারা আমি স্পষ্টতই প্রভাবিত হয়েছি । কিন্তু অনুরূপ ভাবেই আমি পম্পা, রন্না, জন্না, ব্যাস, কালিদাস, উপনিষদ, রাসেল, হাক্সলি, শ এবং রাসকিনের চিন্তাধারা থেকে পুষ্টিলাভ করেছি । আমরা তো যা কিছু দেখি, শুনি বা পড়ি তার প্রভাব এড়াতে পারি না, কিন্তু আসল কথা হলো এই প্রভাবের প্রকাশ কি ভাবে হয় । আমি এলিয়টের অনুকারক, এই বদনাম দিয়ে কেউ কেউ আমাকে খারিজ করতে চেয়েছেন। এইসব সমালোচকদেব বিষয়ে আমি কেবল এইটুকুই বলতে চাই যে—এঁরা ইংরেজিও জানেন না কন্নাড়াও জানেন না । আমার কাব্য এবং এইসব ইংরেজ কবিদের কবিতার মধ্যে যদি কোনো সাদৃশ্য থাকে তবে সে সাদৃশ্য এই ধরনের : প্রচলিত সমাজ-সংগঠন ও সাংস্কৃতিক প্রাধিকারের ভাঙন সম্পর্কে আমরা পূর্ণ সচেতন ; ব্যক্তিত্বের উৎস এবং মৌল স্বাধীনতার সংরক্ষণ বিষয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ; জীবনকে কোনোভাবেই এড়ানো যায় না একথা আমরা মানি ; আর কবিতা যাতে শুধু কথার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে এক ধরনের ক্রিয়া হয়ে ওঠে তার জন্য আমরা নিয়ত চেষ্টিত ।

কবিতা মানুষের সঙ্গে মানুষের এক ধরনের আত্মিক লেনদেনের ব্যাপার । আত্মিক লেনদেন সব যুগে সব দেশে একই রকমের । যেসব ইন্দ্রিয়ানুভূতি, ভাবনাচিন্তা, স্বপ্ন ইত্যাদি এর উপাদান তা মূলত সব মানুষের ক্ষেত্রেই এক । মৌলিক আবেগ-অনুভূতির, আশঙ্কা-আকাঙ্ক্ষার, সুখদুঃখের, সুস্থ মানসিকতার ও প্রমত্ততার জাতি-ভাষা-ধর্ম বা দেশভেদে মানুষে মানুষে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না । এ তত্ত্ব তো কোনো যুক্তিতেই টেঁকে না যে এক আবহাওয়া বা ধর্মবিশ্বাসে লালিত মানুষের কাছে অন্য আবহাওয়ায় বা ধর্মবিশ্বাসে রচিত কাব্য নেহাৎ অবান্তর । অথবা এক দেশের কবির কবিতার রসগ্রহণ ভিন্ন দেশের পাঠকের কাছে ব্যাহত হবে । তাই যদি হতো তাহলে ব্যাস, বাল্মীকি, বাসব, কবীরের মতো সুদুর অতীতের কবিরা আজও কি করে আমাদের মনে সাড়া জাগান ? কি করেই বা দান্তে, সেক্সপীয়র বা ইয়েটস জন্মসূত্রে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান সত্ত্বেও আমাদের মনের গভীরে এসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ? ভাষার ব্যবধান, ভৌগোলিক সীমানার বাধা, ঐতিহ্যের ভিন্নতা, সব কিছুই কবির কবিতার পক্ষে গৌণ ব্যাপার । মানব হৃদয় এবং সেই হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বই কাব্যসৃষ্টির মূল উপাদান ।

এই বিশ্বাস নিয়েই আমার কাব্য সাধনা। আর এই বিশ্বাস নিয়েই আমি লিখে চলেছি। কাব্য রসিক ব্যক্তিরা আমার রচনা গ্রহণ করেছেন এবং কষ্টস্বীকার করে আমার কাব্য-অনুধাবনের প্রয়াস করেছেন। এমনটি হলে সকলেই সুখী হয়, আমিও হয়েছি। কিন্তু আত্মসমীক্ষার প্রয়াস আমার নিজের কাছে আমার দীনতা, আমার অক্ষমতাকে গোপন রাখেনি। কখনো ভয়ে পিছিয়ে যাই। আপন সীমাকে তো কেউ ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। ছোট এই সীমিত জীবনে কোনো মানুষ কি পারে পূর্ণতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে? আমার কাব্যের পরিধি ধীরে ধীরে তার পূর্ব-বিস্তারকে ছাড়িয়ে ব্যাপকতর হবে এবং তার মানবিক আবেদন বিশ্বব্যাপী হবে, এই আশাতেই আমি আজও লিখে যাই, লিখে যেতে পারি।

পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্য নীচের তথ্য দুটি দেওয়া হলো—সম্পাদক

১. বেন্দ্রে : দত্তাত্রেয় রামচন্দ্র বেন্দ্রে (১৮৯৬—১৯৮১) : কন্নাড় ভাষার অন্যতম প্রধান কবি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কৃষ্ণকুমারী' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। ধারওয়ারে জন্মেছেন, পড়াশুনো করেছেন পুনায়। ধারওয়ার-এর মুখের ভাষা এবং লোককবিতার ছন্দকে বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে কবিতায় ব্যবহার করেন। তাঁর ভাবনাকল্পনা কিছুটা রবীন্দ্রনাথ এবং অরবিন্দের ধারা প্রভাবিত। 'সাখী গীতা' নামে আত্মজীবনীমূলক কবিতায় নিজের কবিজীবনের বিকাশের কথা বলেছেন। ১৯৭৪ সালে 'নকু তান্তি' কাব্যগ্রন্থের জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান। কবিতা ছাড়াও অনেকগুলি নাটক ও ছোটগল্প লিখেছেন। পঞ্চাশের দশকে আদিগা বেন্দ্রের কবিতাকে আক্রমণ করে সমালোচনা প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু বেন্দ্রে মৃত্যুর পরে আদিগা লিখেছেন, "বেন্দ্রে শুধু এই শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন না, তাঁর ব্যক্তিত্বও ছিল অসামান্য। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কৌতূহল নিত্যজাগ্রত ছিল। তিনি শব্দের শিকড়ে পৌঁছে শব্দের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক আবিষ্কার করতেন, তাদের নতুন অর্থে প্রয়োগের সম্ভাবনা খুলে দিতেন।" বেন্দ্রে সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচয়ের জন্য ইংরেজি ভাষায় দ্রষ্টব্য :
L. S. Seshagiri Rao And Sumathendra Nadig, *The Jananpith Laureates of Karanataka: Selections*, Viswa Kannada sammelana, Bangalore. 1983.

২. যক্ষগণ : এক ধরনের দক্ষিণী নৃত্যনাট্য। অন্ধ্রদেশে তের শতকে "বহু নাটক" নামে গীতাভিনয়ের একটি বিশিষ্ট রীতি গড়ে ওঠে। তা থেকেই পরে "যক্ষগণ" নৃত্যনাট্যের উদ্ভব। গোড়াতে শৈব ব্রাহ্মণরাই যক্ষগণ করতেন ; শিবের মন্দিরের মণ্ডপে শিবের নানা কাহিনী নেচে দেখানো হতো। পরে কর্ণাটকে এবং তামিল নাড়ুতেও যক্ষগণের ধারা ছড়িয়ে পড়ে। তখন কৃষ্ণের কাহিনী এবং রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্র এবং ঘটনা নিয়েও যক্ষগণ নৃত্যনাট্য রচিত হতে থাকে। এতে নর্তকরা খুব বর্ণাঢ্য, পাথর-পুঁথি বসানো জমকালো পোষাক পরেন, মুকুটে ময়ূরের পালক লাগানো থাকে। নৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে বাজে মৃদঙ্গ মুরলী তানপুরা, কর্তাল ইত্যাদি।
দ্রষ্টব্য : Enakshi Bhavnani, *TheDance in India*, Bombay, 1965.

গৌরকিশোর ঘোষ

জীবন, সত্য, সাহিত্য

'সাগিনা মাহাতো' বলে একটা গল্প লিখেছিলাম অনেকদিন আগে, সম্ভবত্ বছর পঁয়ত্রিশেক আগে। এই গল্পটা আমাকে নানাবকম ভাবে ভাবিয়েছে। গল্প লেখার আগে তো বটেই, তারপরেও নানাভাবে বহুবার। মনে হয় গল্পটা, এত ভালো সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শুধু লেখার দোষে একটা ভালো গল্প হয়ে দাঁড়াতে পারল না। কোথায় যেন ছেতবে গেল, যার ফলে সাগিনা মাহাতোর পুরো চরিত্রটা যেমনভাবে বলা উচিত ছিল তেমনভাবে বলা গেল না। অথচ এই গল্পেই আমি প্রথম আমার জীবনের অভিজ্ঞতাকে অনেকটা মেলে ধরতে চেষ্টা করেছিলাম। সত্যকে অনেক স্পষ্ট করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম·। সাগিনার চরিত্রে যে একটা বন্যভাব ছিল, একটা অপর্যাপ্ত সরলতা ছিল, দুর্দান্ত নেতৃত্ব ছিল, যৌনতৃপ্তিতে তার কোনও বাছবিচার ছিল না, তার বিচার বিবেচনা সভ্যজগতের যুক্তি শৃঙ্খলার ধার ধারত না, মদের নেশা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত, এবং মারদাঙ্গায় সে পিছপা হতো না, এইসব নিয়েই সাগিনা ছিল অতি বিশ্বস্ত এবং স্নেহপরায়ণ বন্ধু এবং একটা নিটোল মানুষ—এই ব্যাপারটা আমার গল্পে যতটা গভীরতা নিয়ে ফুটে ওঠা উচিত ছিল বলে আমাব মনে হয়েছে, আমার গল্পটায় ঠিক তেমনভাবে এই চরিত্রটা ফুটে ওঠেনি ।

আমার এই গল্প নিয়ে তপন সিংহ যে ফিল্মটা করেছিলেন, আমি এখানে বাংলা ছবিটার কথাই বলছি—সেখানে দেখা গেল যে অভিনেতা দিলীপকুমার আশ্চর্য দক্ষতায় আমার খামতি মিটিয়ে দিয়ে সাগিনার চরিত্র অনেকটা কাছাকাছি চিত্রিত করে তুলেছেন। মজা এই যে সাগিনার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় আমারই ছিল । তপন বা দিলীপ তাকে চোখে দেখেননি । সৃষ্টি যে কোথায় কেমনভাবে হয় সেটা আমার কাছে রহস্যই থেকে গিয়েছে ।

আমি যে সাগিনাকে কেন আমার মনের মতো করে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি, তার কয়েকটা ব্যাখ্যা আমি এখন হয়ত দিতে পাবি । একটা কথা তো বলতেই হয়, সাগিনা গল্পটা আমি যখন লিখি (এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে আমি গল্পই লিখেছিলাম, আমার সাগিনা মাহাতো দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের দুর্ধর্ষ এক ইঞ্জিন চালকের জীবনী নয়) তখন আমার মন যথেষ্ট মুক্ত হয়নি । বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের সংস্কারের নানা বাধানিষেধ, যাকে ইনহিবিশন বলা হয়, থেকে আমার মন মুক্ত হতে পাবেনি । নারী সম্ভোগের ব্যাপাবে আমার দ্বিধা বা বাধা বা ইনহিবিশন কাটতে সময় নিয়েছে অনেক । গেরস্থ জীবনে যাঁরা থাকেন, কথাটা তাঁদের কাছে রুচিকর হয়ত ঠেকবে না, কিন্তু জীবনের সত্য এই যে মনের পরিণতি ও প্রসারে মেয়েদের দান, অর্থাৎ প্রেম প্রীতি ভালোবাসা, তাঁদের নিষ্ঠুরতা, প্রবঞ্চনা, ঘৃণা ইত্যাদি অপরিহার্য । অন্যের কাছে

এটা সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু যাঁরা ভাবনা করে তাকে রূপ দেন, তা সে ভাষা দিয়ে হোক, কি রেখা দিয়ে হোক, কি অভিব্যক্তি দিয়ে হোক আর কি সুর দিয়ে হোক, এদের জগতে নারী ঈশ্বরীর তুল্য। যে আগুনে পুড়ে ভাজা ভাজা না হলে একজন লেখক কি কবি কি চিত্রকর, ভাস্কর, সুরকার, কলাকার, অভিনেতা, অর্থাৎ স্রষ্টা জগৎরহস্যের মধ্যে যেটা গভীরতম রহস্য সেই মানুষের রহস্য অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের স্বর্গবাস নরকবাসের রহস্য, এইসব রহস্যের উৎসের সন্ধান পেতেই পারেন না, সেই আগুনই নারী।

জীবনরহস্যের যেহেতু কোনও অন্ত নেই, তাই এই যাত্রারও কোনো শেষ, সৃষ্টির কাজে যাঁরা জীবনকে সমর্পণ করেছেন, তাঁদের কাছে নেই। এই সত্য জেনেছি জীবনের পথে চলতে গিয়ে। কিছু অভিজ্ঞতা পার হয়ে আজ ষাট বছরে এসে পৌঁচেছি। সামনে চেয়ে দেখি এখনও অনেক রাস্তা বাকি। এমনকি এও তো বলতে পারিনে যে কতটুকু পথ পাড়ি দেওয়া হলো। একজন লেখক হিসেবে শুধু এইটুকু বলা যায়, হয়তো, জীবনের পথ বলে আমরা যাকে বলি, সেটার চেহারা ঠিক মাটির পথের মতো নয়। কাজেই দৈর্ঘ্যের উপমা দিয়ে সেটা বোঝাতে গেলে ভুল ধারণারই সৃষ্টি করা হবে। আমাদের মনের পথ যেহেতু অভিজ্ঞতা দিয়ে তৈরি, আমাদের যন্ত্রণা দিয়ে তৈরি, তাই তার পরিচয় আমাদের সৃষ্টির মধ্যেই প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। আমরা আমাদের গল্পে উপন্যাসে কবিতায় ছবিতে সুরে বা গানে যাই ব্যক্ত করে তুলি অথবা তোলবার চেষ্টা করে থাকি, সেটা আমাদের যন্ত্রণারই প্রকাশ।

আমি কখনোই ছক বেঁধে লিখতে পারিনে। একটা ভাবনা কি একটা অনুভব কখনো বা একটা চরিত্রের অস্পষ্ট আদল এক টুকরো মেঘের মতো আমার মনের একটা কোণায় জমা হতে থাকে। দিনের পর দিন একটু একটু করে মনের আকাশে সেটা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঘটনাটা ঘটতে থাকে কখনো অতি ধীরগতিতে, আবার কখনো বা অতি দ্রুতই। গল্পটা, প্রায় পুরো গল্পটাই একসময় এইভাবে মনের মধ্যে যখন দানা বেঁধে আসে তখন আমি লিখতে বসি। যে দুটো বড় উপন্যাস আমি লিখেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে', আর 'প্রেম নেই', সে দুটো লিখতে আমার সময় লেগেছে প্রচুর। ১৯৫১ সালে আমার মনে ইচ্ছা জাগে যে দেশ বিভাগের যে ট্র্যাজেডি তার উপরে একটা বড় উপন্যাস লিখতে হবে। এই ইচ্ছেটাকেই শানিয়ে যাচ্ছিলাম। '৫৬ সাল থেকে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' ধীরে ধীরে আমার মনে দানা বাঁধতে থাকে। তারপর দেশ পত্রিকায় ওটা ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। '৫৮ সালের মধ্যে বই হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে'-র পর 'প্রেম নেই' লেখা হতে প্রায় কুড়ি বছর কেটে গিয়েছে। এখনও উপন্যাসটা নিয়ে ভেবে চলেছি। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' আর 'প্রেম নেই', যদিও দুটো স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু আদতে ওটা একই উপন্যাসের দুটো পৃথক খণ্ডমাত্র। পটভূমিও প্রায় এক। একই গ্রামের কাহিনী। একটা হিন্দুপাড়ার অন্যটা মুসলমানপাড়ার। তফাৎ যা কিছু কালের। হিন্দুপাড়ার কাহিনী ১৯২২ থেকে ১৯২৫ সালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বলা হয়েছে। মুসলমানপাড়ার কাহিনী বলা হয়েছে ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে। একই গ্রামের দুটো পাড়া, হিন্দুর এবং মুসলমানের, অথচ এই দুইয়ের মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই, কেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে গড়ে উঠেছে উভয় সম্প্রদায়ের

জীবনযাত্রা। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে অপরিচয়ের বেড়া। যা ভেদ করে ভালোবাসা প্রবেশ করতে পারে না। আমাদের দেশবিভাগের ট্রাজেডির এই হচ্ছে উৎস।

যেসব চরিত্র আমার গল্প উপন্যাসে ফুটে ওঠে তাদের সঙ্গে আমার জীবনের যোগ কতটুকু ? এরা সকলে বা কেউ কেউ আমার চেনা কিনা ? এমন ধরনের প্রশ্ন এক ধরনের পাঠকের কাছ থেকে প্রায়ই এসে থাকে। বিশেষত, যেসব চরিত্র কোনো পাঠকের কাছে খুব জীবন্ত বলে ঠেকে, সেই চরিত্রগুলো পাঠকেরা ধরে নেন, এরা হয়তো লেখকের দেখা চরিত্র। এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা মুশকিল। দেখা চরিত্র তো বটেই। কিন্তু কোথায় দেখা ? বাস্তব জীবনে, না কল্পনায় ? আমার 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসের মেজকত্তার মতো একটা চরিত্র আমি দেখেছি। কিন্তু তিনি আমার দাদু নন। যদিও আমার দাদুকেও গ্রামে মেজকত্তাই বলত। উপন্যাসের মেজকত্তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের মেজকত্তার মিল যদি কিছু থেকে থাকে তবে হয়তো চেহারাগত মিল থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু মন বা মেজাজে এই দুই মেজকত্তার কোথাও কোনো সাদৃশ্য নেই। বরং 'প্রেম নেই' উপন্যাসের হাজী সাহেবের মধ্যে আমার দাদুর মন ও মেজাজের বেশ খানিকটা এসে গিয়েছে। কিন্তু চেহারাতে কোনো মিল নেই। হাজী সাহেবের মতো কোনো চরিত্র আমি বাস্তব জীবনে দেখিনি। হাজী সাহেবের জন্ম যদিও আমার কল্পনায়, কিন্তু হাজী সাহেবের অস্তিত্ব আমার কাছে সূর্যের মতোই সত্য। একমাত্র সাগিনা মাহাতোর মধ্যেই বাস্তব জগতের কিছুটা ঢুকে গিয়েছিল। 'ব্রজদার গুল্প সমগ্র' বলে একটা ব্যঙ্গ গল্পের সংকলন আমার আছে। ওখানে ব্রজদা হচ্ছেন প্রধান চরিত্র। আসলে এটা কোনো বাস্তব চরিত্র নয়। আমার ব্রজদা হচ্ছে বাঙালির মনে 'বাঙালিই শ্রেষ্ঠ' এমন একটা যে অহংবোধ আছে, আমার ব্রজদার গুল্প সমগ্রের ব্রজদা সেই বাঙালির সেই অহংবোধেরই প্রতীক। ঘটনাক্রমে আমি যেসময় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কাজ করি সেইসময় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এক পুরানো দিনের সাংবাদিক, ক্রীড়া সাংবাদিকও কাজ করতেন। তিনি খুব খ্যাতনামা লোক ছিলেন। তাঁর প্রথম নামও ছিল ব্রজ। এবং আমার বন্ধু চিত্রশিল্পী ও কার্টুনিস্ট অহিভূষণ মালিক ব্রজদা গল্প সিরিজে যেসব ছবি এঁকেছিলেন তাঁর মধ্যে আমার ব্রজদার মুখে আসল ব্রজদার গোঁফটা জুড়ে দিয়েছিলেন। আর তাইতে অনেকে ধরে নিয়েছিলেন যে গুল্প সমগ্রের ব্রজদার কাহিনীসমূহ বুঝি আসল ব্রজদার জীবন কাহিনী। অনেকে মনে করে থাকেন যে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসে আমার নিজের জীবনের ঘটনা বোধহয় অনেকখানি আছে। আমার ছেলেবেলা বা কিশোর বয়সের কিছুই নেই 'জল পড়ে পাতা নড়ে'তে। অর্থাৎ শারীরিক ভাবে আমার কোনো কিছুই সেখানে উপস্থিত নেই। তা বোলে কি কিছুই একেবারে নেই ? আছে যা তা অস্বীকার করি কী করে ? যে গ্রাম এই উপন্যাসের পটভূমি, যশোর জেলার সেই গ্রামটা তো আছে। চরিত্রের মধ্যে কি আমার কোনো আত্মীয়স্বজন উপস্থিত আছেন ? আমার মাকে আমার যতদূর মনে পড়ে তাতে নিঃসন্দেহেই একথা বলা যায় গিরিবালার সঙ্গে আমার মায়ের সামান্য সাদৃশ্য নেই। মেজকত্তার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই উপন্যাসে এক দারোগা দাদুর উল্লেখ আছে, যাঁর স্ত্রী ছিলেন পাগল। আমার ছোটদাদু দারোগা ছিলেন, তাঁর স্ত্রীরও সাময়িক মাথার গোলমাল ছিল। আমি আমার ছোটদাদুকে দারোগা রূপে দেখিনি। বরং তার শেষ জীবনে তাঁকে দেখেছি মুদিখানা চালাতে। আমার

বাবা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার । তাঁর নামের মধ্যে ভূষণ কথাটাও আছে । কিন্তু 'জল পড়ে পাতা নড়ে'-র যে ভূষণ ডাক্তার তার সঙ্গে আমার বাবার মিল খুঁজতে যাওয়া অতিশয় ব্যর্থ পরিশ্রম হবে । কতকগুলো নাম ছেলেবেলা থেকে আমার মনে গাঁথা হয়ে রয়েছে, যেমন চম্পি, যেমন ফেদি। চম্পি অবিশ্যি আমার এক দিদিরই নাম । যদিও দেখাশুনা খুব কমই হয় তাঁর সঙ্গে । 'জল পড়ে পাতা নড়ে'তে এইসব নাম এসে পড়েছে লেখার মুখে। এটা বলতে পারি, আমার উপন্যাসের চম্পি বা ফেদি বাস্তব জগতের কেউ নন ।

তা বলে আমার পরিবারের ছায়া কি আমার কোনো উপন্যাস গল্পের উপর এসে পড়েনি ? পড়েছে বৈকি ? 'গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে দুজনে' উপন্যাসে আমার স্ত্রী এবং আমি স্বয়ং উপস্থিত আছি । স্বামী এবং স্ত্রী দুজনে দুজনকে গভীরভাবে ভালোবাসা সত্ত্বেও পরিবারের মধ্যে বাস করতে থাকলে, ক্রমাগত বাস করতে থাকলে, কেমন এক ধরনের তিক্ততা উঠে এসে জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তার ফলে দুটো ব্যক্তিত্বের মধ্যে টানাপোড়েনই বা চলে কী ভাবে, আবার বাইরের ঘটনার চাপ, সময়ের প্রবল পীড়ন দুজনকে কাছে টেনে আনে বা দূরে ছুঁড়ে দেয়, এই চিত্রই আঁকা আছে 'গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে দুজনে' উপন্যাসটাতে । আমার সংশয়, সময়মতো সিদ্ধান্ত নিতে না পারার নপুংসকতা, ভয়ের হাতে পীড়িত হওয়ার অনুভব নিয়ে লেখা 'লোকটা' । এক নারীর সঙ্গে প্রেমের অভিজ্ঞতা নিয়ে গড়ে উঠেছে আমার 'এক ধরনের বিপন্নতা' উপন্যাস। ওখানে যে তিনটে রমণীকে দেখানো হয়েছে, আদতে তা একজনেরই চেহারা । বলাই বাহুল্য কোথাও কোনো অভিজ্ঞতারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ উপরে দেওয়া নেই । অনেকখানি কল্পনা মিশে আছে সকল সৃষ্টির মধ্যেই । এইসব উপন্যাসের পাঠকেরা অবশ্য জানতে চাননি যে 'গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে দুজনে'-র মধ্যে, কি 'লোকটা'র মধ্যে, কি 'এক ধরনের বিপন্নতা'র মধ্যে আমি কতটা আছি । শুধু আমার এক আত্মীয়া, তিনি অতিশয় সতর্ক পাঠিকা, গড়িয়াহাটের ব্রিজে আমার স্ত্রীর উপস্থিতি টের পেয়েছিলেন। এবং আমার এক বান্ধবী প্রশ্ন তুলেছিলেন 'এক ধরনের বিপন্নতা' পড়ে, যে দিনের পর দিন একটি পুরুষ এবং একটি মেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করে গেলেও উভয়ের মধ্যে দেহগত সম্পর্ক ঘটে না, পরস্পর পরস্পরের দেহ সম্পর্কে উদাসীন থেকে যায়, এটা সম্ভব হয় কী করে ? মানুষের সমাজে কি ঘটে আর কি ঘটে না, এটা বলা সম্ভব কিনা আমি আজও জানিনে ।

অন্যান্য উপন্যাসে, অর্থাৎ আমার লেখা কাহিনীগুলির মধ্যে আমি আছি কিনা, এ প্রশ্ন দেখা দিলেও আমার 'প্রেম নেই' উপন্যাসটি যেহেতু মুসলিম সমাজ নিয়ে লেখা এবং লেখকের নাম যেহেতু গৌরকিশোর ঘোষ, তাই একবারও এ প্রশ্ন কারো মনে আসেনি যে আমার এই কাহিনীতে আমি কোথাও আছি কিনা ? হিন্দু এবং মুসলমান এই অভিধা বাদ দিয়ে দেখলে আর যা অবশিষ্ট থাকে তাতো রক্তমাংস মন বুদ্ধি দিয়ে গড়া একটা মানুষই । দেহে এবং মনে যে ক্ষুধা জেগে ওঠে তার কিন্তু আলাদা কোনো চেহারা নেই, তার চেহারা একটাই । সেটা মানুষের ক্ষুধা । সেই কারণেই বলতে পারি 'প্রেম নেই'-এর দাউদ চরিত্রের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা সচ্ছন্দে মিশে গিয়েছে । মেয়েদের টানে হঠাৎ দিগভ্রষ্ট হওয়া এবং ক্রমে ক্রমে নিজেকে প্রচণ্ড চেষ্টায় আবার শক্ত মাটিতে এনে দাঁড় করানো, এটা আমারই জীবনের অভিজ্ঞতা । এমন-

কি, কণ্ট্রাক্টরি করাও। ফটিকের জীবনেও আমার জীবনের কিছু ছায়াপাত ঘটেছে। ফটিকের মতো আমারও প্রথম সন্তান মারা যায়। আমি সে ছেলের মুখ দেখিনি, যদিও নিজের হাতেই তার সৎকার আমাকে করতে হয়েছিল। মুখ যে দেখিনি তার কারণও এক, সফিকুলের বা ফটিকের মতো আমিও ভয় পেয়েছিলাম। কারণ আমরা দুজনেই জানতাম, আমাদের সন্তানহারা স্ত্রীরা আমাদের কাছে জানতে চাইবেন, যে এসেছিল সে দেখতে কেমন ছিল। সেই বিবরণ দেবার মতো সাহস আমাদের কারোরই ছিল না। সফিকুল বা ফটিকের সঙ্গে আমার আর একটা মিলও আছে। জীবনের পথে অভিজ্ঞতা আমাদের দুজনকে যত সমৃদ্ধ করেছে, ততই আমরা একা হয়ে গিয়েছি। জনক জননীর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছি, সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করেছি, সংসারের সঙ্গে সংযোগ আলগা হয়ে গিয়েছে, বোধ বিশ্বাস নিরন্তর বদলাচ্ছে, ভালো মন্দ বিচারের দায়িত্ব নিজের বিবেকের কাছে সমর্পণ করে পথ পাড়ি দিয়ে যাচ্ছি। এটা বলা ভালো যে সফিকুল সন্ন্যাসী নয়। সে সংসারেই আছে, সমাজেই আছে। আমিও তাই আছি।

জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক যে নিবিড়, এই কথাটা শুনি অন্নদাশংকর রায়ের মুখে। ৩৬/৩৭ বছর আগে। তখনও লেখালেখির ব্যাপারে আমি খুব একটা বিশেষ জড়িত হয়ে পড়িনি। সেই তরুণ বয়েসে কথাটা শুনেছিলাম বলেই হোক, কিংবা অন্নদাশংকর কথাটা খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন বলেই হোক, আমার কাছে ওটা লেখক জীবনের মন্ত্র হিসেবেই রয়ে গেল। তাই যেদিন থেকে আমি সাহিত্য রচনা করতে বসেছি, সেদিন থেকেই আমি সত্যের মুখোমুখি হতে চেষ্টা করেছি। প্রথম দিকে লজ্জা, ভয়, আড়ষ্টতা ইত্যাদি আমাব এবং সত্যের মাঝখানে এসে দাঁড়াত। অনেক সময় পাশ কাটিয়েও গিয়েছি। এই বিবরণের প্রথম দিকেই বলেছি, মধ্যবিত্ত সংস্কার একসময় আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সেই সংস্কার আমার মনের মধ্যে একটা সেনসরকে বসিয়ে দিয়েছিল। সে সর্বদাই আমার মনের মধ্যেই একটা কাঁচি হাতে বসে থাকতো আর তার ইচ্ছামতো 'এটা বলা উচিত নয়' বলে তার যেটা অনুচিত বলে মনে হতো সেটা কচাং করে ছেঁটে দিত। তা সে শব্দই হোক, বা বাক্যই হোক, কোনো চরিত্রই হোক, বা কোনো ঘটনাই হোক। এই সেনসরটির হাত থেকে এখনও যে পুরো রেহাই পেয়েছি তা বলা মুশকিল। তবে সেটা যে আমার মনে আছে, সে সম্পর্কে সতর্ক হয়েছি। সে যে সত্যকে প্রকাশ করার পথে বড় বাধা, সে সম্বন্ধেও হুঁশিয়ার হয়েছি। তারই সঙ্গে চলেছে আমার নিরন্তর সংগ্রাম। লেখাটা আমার কাছে যে যন্ত্রণা, সে কথাও আগে বলেছি। লেখাটা আমার কাছে যন্ত্রণা তার কারণ লেখাটা আমার কাছে নিরন্তর সংগ্রাম। নিজেকে উত্তীর্ণ হওয়ারই সংগ্রাম। নিজেকে ভালো করে চেনার সংগ্রাম। সত্য মোহমুক্তি ঘটায়। মোহ থেকে মুক্ত হতে না পারলে নিজেকে চেনা যায় না। নিজেকে চিনতে চিনতেই মানুষকে চেনা যায়। মানুষকে ভালোবাসাও যায়।

সেলিনা হোসেন

সোনালী ভুবন

'জিজ্ঞাসা'র সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে নিজের কথা লিখতে বলেছেন। কেন লিখছি, কি কি উপজীব্য বিষয় নিয়ে লিখছি, নারী হওয়ার কারণে লেখালেখিতে বাধা বা সমস্যা কি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লিখতে হবে। আমি খুশি যে নিজের কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেলো। এই ধরনের রচনা আমি আগে লিখিনি।

আমার বাবার নেশা ছিলো মাছ ধরা, শনিবার বিকেলে ছিপ নিয়ে বসলে গড়িয়ে যেতো রাত, পরদিন রোববার, ঘরে ফিরতেন সোমবার সকালে। নেশা ছিলো শিকার, বিলের মধ্যে বুক-সমান পানি ভেঙে এগোতেন, মাথায় কচুরী পানার আড়াল, কাঁধে দো-নলা বন্দুক। ফিরতেন বিশাল ঠোঁটের অধিকারী মদনট্যাক বা ধনেশ নিয়ে। বাবার পেশা ছিলো রেশম শিল্পের অফিসে চাকুরি, ঘুরতেন হাজারো বসনীদের বাড়িতে। সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকতাম আমি। বাবা আপত্তি করতেন না। করতোয়ার জেলেদের নৌকায় কতদিন যে মাছ-ধরার সঙ্গী হয়েছি। নদীর পাড়ের ধান ক্ষেত, মিষ্টি আলুর ক্ষেত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৈরি অব্যবহৃত হেলিপোর্ট কিংবা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের লম্বা সড়কের মাথায় দাঁড়িয়ে কেন যে বুক ফেটে কান্না আসতো বুঝতাম না। কৈশোরের সেইসব দিনগুলো আমার সোনালী সময়। ঘোরার নেশা থেকে একদিন মনে হলো এসবই তো লিখতে পারি, ভোলাহাটের বসনীদের কথা লিখি না কেন? তারপর পনেরো বছর বয়সে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হলে মিশন হাসপাতালের ধূসর দিনগুলোয় বুকের কান্না নদীর মতো বইলো। শিশুর মতো সম্পূর্ণ নতুন করে হাঁটা শিখতে হলো আবার। বাবা বলতেন, খাটের কাছ থেকে টেবিল পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারলে দশ টাকা পাবে। পারতাম না। দশ টাকার লোভেও কাজ হতো না। দু'পা এগুলে ধুপ করে পড়ে যেতাম। কি প্রাণান্ত প্রয়াস ছিলো নিজেকে পুনরায় দাঁড় করাবার। সেজন্যে বোধহয় হাল ছাড়তে শিখিনি। কৈশোরে পঙ্গু হয়ে স্বাভাবিক জীবনের বেড়ে ওঠা থেকে ছিটকে পড়েছিলাম বলে বারবার মনে হতো আমার অন্য কিছু চাই, অন্য ভুবন, একান্তই নিজের হাতে গড়া।

বিধাতা সবাইকে দেয় বিশ। আমাকে দিয়েছিলেন বাইশ। জন্মেছিলাম বাইশ আঙুল নিয়ে। কেউ বলতেন এটা শুভ। কেউ বলতেন অশুভ। আমি বুঝি শুভ-অশুভের মুহূর্তিক ধারাবাহিকতাই জীবন হয়ে টানে, ছাড়ে, লাটুর মতো অনবরত ঘোরায়। এই দুটো শব্দের প্রতিযোগিতা আমার জীবনে ব্যাপক, ক্রমাগত একে অপরকে অতিক্রম করে। ফলে স্থিতি নেই। বগুড়ায় করতোয়া নদীর পাড়ে গণ্ডগ্রাম নামের গ্রামে আমার শৈশব-কৈশোরের বেড়ে ওঠা। মাঠ-ঘাট প্রান্তর, বালুচর, গাছগাছালি, খেয়াঘাট, নদীর পাড় ইত্যাদি জায়গাগুলোয় ঘুরে বেড়ানোর অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে কৌতূহলী জিজ্ঞাসার সামঞ্জস্য ঘটেছিলো বলে অভিজ্ঞতার আশ্চর্য সমৃদ্ধি অনেক ঘাটতি পুষিয়ে দিয়েছিলো।

ভুলতে পারি না শৈশব এবং কৈশোরের সেইসব আশ্চর্য দিনগুলো যা এখন নানারঙে সামনে এসে দাঁড়ায়। মেঘের ফাঁকে বিদ্যুৎ চমকের মতো মুহূর্তে আলোকিত করে দেয় জীবনের পোড়খাওয়া বিষণ্ন প্রান্তর। গ্রামে কাটিয়েছি চৌদ্দ বছর, মফস্বলে বারো, এখন রাজধানীতে। লেখালেখির জগতে এসে দেখি গ্রাম আমাকে টানে বেশি। মনে হয় এই তো আমার শেকড়। আমি শেকড়ের বিস্তার চাই। শেকড়ের জন্যে শক্ত মাটি চাই। যার ওপর নির্ভর করে বিস্তৃত হয় ধারাবাহিক জীবনযাত্রার স্বচ্ছ চালচিত্র। যেটা ঐতিহ্য এবং সভ্যতা। আমি ভালোবাসি সেইসব দরিদ্র মানুষের কথা যারা নিরন্তর পোড় খেতে খেতে কালো পাংসুটে হয়ে যায়। যাদের ভিন্ন আদল হারিয়ে গিয়ে যারা একের ভেতর অনেক।

সে তাগিদ থেকেই কৈশোরে কবিতা দিয়ে শুরু করেছিলাম। যা মনে আসতো অবলীলায় লিখে ফেলতাম, কানে একটা ছন্দ বাজতো তার ওপর নির্ভর করে, এর বেশি কিছু জানতাম না। কবিতায় খাতা ভরে যেতো, মফস্বল থেকে পাঠালে রাজধানীর কাগজে ছাপা হতো। তার জন্যে খুব বড় উচ্ছ্বাস ছিলো তা নয়, শুধু একটু বুক কাঁপানো সুখ-সুখ ভাব ঐ পর্যন্তই। বরং ছাপানো লেখা গুরুজনেরা যেন না দেখে এই ভয়ে কাগজ হাতে পেলে লুকিয়ে রাখতাম। কাছের বন্ধু কেউ ছিলো না, যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যেতো,অন্তত কবিতার কথা। সেই নিঃসঙ্গতা এখনো জাপটে আছে। কিছুতেই ছাড়াতে পারি না। আড্ডায় টিকতে পারি না, হৈ-চৈ থেকে পালিয়ে থাকতে ভালোবাসি। কবিতা লেখার দিনগুলোয় থাকতাম রাজশাহীতে। উত্তরবঙ্গের অত্যন্ত অবহেলিত শহর। এখানকার প্রকৃতি ভিন্ন, ধু-ধু রুক্ষ দিন, প্রচণ্ড গরম, কেবলই ধূলোর ঘূর্ণি ওড়ে, টমটমের খটখট শব্দ কেড়ে নেয় মনোযোগ। আস্তে আস্তে একদিন নিজের অজান্তে কবিতা ঝরে গেলো। যেমন করে বালুময় হয়ে গেলো পদ্মা, শুকিয়ে সরে গেলো শহর থেকে অনেক দূরে, কীর্তিনাশা নাম মুছে দিয়ে। প্রচণ্ড পদ্মার দু'কূল ভাঙা গর্জনে ভেসে যেতো জনপদ, তাই নাম হয়েছিলো কীর্তিনাশা। টের পেলাম নিজের মধ্যে তার স্পর্শ। কবিতার কীর্তিনাশা আবেগে তখন ভীষণ চড়া, বাঁধানো খাতা অবহেলায় পড়ে থাকে। বুকের মধ্যে অতৃপ্তি, বড় অবয়বের কিছু করতে চাই। এখানকার খা-খা করা, ফেটে চৌচির হয়ে যওয়া মাটি চায় গদ্য, পাথুরে মাটিতে ফসল ফলানো মানুষ চায় বিশাল বিস্তৃত পটভূমি। তাই কথাসাহিত্য হয়ে গেল প্রিয় আবাস। যেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বাতাসীরা, ফটিকচাঁদেরা—সন্তান, সংসার ইত্যাকার হাজারো ঝামেলার গোঁজামিল। অল্প কথায়, ইঙ্গিতে, প্রতীকে উপমায় তাকে কি ধারণ করা যায়? শুধু অনুরাগ নয়, কথাসাহিত্যের জন্যে আছে আরো বাড়তি কিছু, যা একজন ভীষণ নিঃসঙ্গ লেখকের একাকিত্ব ঘুচিয়ে বেঁচে থাকার অবলম্বন হয়।

এখন প্রকাশের আঙ্গিক ভিন্ন। চোখ বুঁজলে দেখতে পাই টানা মেঠো পথ, দু'পাশে ফসলের ক্ষেত। কখনো রোদে পুড়ে যাওয়ায় লালচে বিবর্ণ, কখনো উপচে-পড়া সোনালী ঐশ্বর্যময়। কখনো চাপাই নওয়াবগঞ্জ, কাগসাট, শিবগঞ্জ হয়ে চলে যাই রাজশাহীর সীমান্তে, দাঁড়িয়ে থাকি মহানন্দার পাড়ে, দেখি ভিন্ন দেশের মানচিত্র। খুব পার্থক্য চোখে পড়ে না—মাটির রঙ এক, গাছের সবুজ এক, মানুষগুলো খাটতে খাটতে মুখে ফেনা তুলছে। কখনো খেপুপাড়া, তালতলী হয়ে সাগর মোহনা লালদিয়ার চরে এসে শেষ

করি ঠাঁই। পেছনে পড়ে থাকে লোকালয়, বিলখালি ও হরিণঘাটা নদী। সামনে আর ভূমি নেই। মানুষগুলো নৌকোয় দিন কাটায়, মাছ ধরে শুটকি বানায়, ঘরে ফেরে। নুন-ভাতের জীবনের জন্যে আমৃত্যু হাড়-ভাঙা পরিশ্রম। তবুও পোড়-খাওয়া, পাঁজর-ওঠা নিরন্ন জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে প্রত্যাশা নিয়ে তাকায়। জীবনের তেইশ বছর কেটেছে পলু পোকা, গুটি, চন্দ্রকী, তুঁত গাছ এবং গরদ, তসর, মটকা, এণ্ডি, সিল্ক কাপড় তৈরির পরিমণ্ডলে। কৈশোরেই তো ভেবেছিলাম রেশমচাষকারী বসনীদের নিয়ে লিখবো। ভাবতে ভাবতে আটত্রিশ বছর পেরিয়েছি, লেখা শুরু করতে পারিনি। রাজশাহীর সাঁওতাল পাড়ার বুড়িটার শনের মতো শাদা চুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওদের বিদ্রোহের কথা মনে হয়েছে। জরাজীর্ণ ঘরের ছাউনির সামনে পিঁড়িতে বসে কত আবোলতাবোল গল্প করেছি, বারুয়ামাসির চোয়াল-ওঠা ভাঙা গালের আঁকাবাঁকা রেখায় বিশাল জনপদ খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু লেখা হলো কৈ ? না, নারী বলে লেখালেখির জন্য আমি আমার আশেপাশের হাজারো মানুষের কাছ থেকে কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত হইনি, বরং প্রকাশের অক্ষমতার মর্মজ্বালা আমাকে পীড়িত করে বেশি।

আমাকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিলো এইরকম, "অনেকে বলেন, আমাদের লেখকদের মধ্যে যারা মহিলা তাদের অনেকের লেখার মধ্যে এক ধরনের ফেমিনিন দুর্বলতা থাকে বা তাদের রচনাকে প্রায়শই অনাকর্ষণীয় করে তোলে। আপনিও কি এর সঙ্গে একমত ? যদি হন তবে এই দুর্বলতাটা কোনখানে, বা কি ?" কথাটা এক অর্থে সত্যি। তবে আগে একটু বলে নেওয়া ভালো যে দোষটা একতরফা চাপানো ঠিক নয়। অসংখ্য পুরুষ লেখক আছেন যাঁদের রচনাও এই একই ধরনের ত্রুটির ফলে ম্লান। সবার লেখনীই যে চকচকে উজ্জ্বল হীরে তাতো নয়। তবে মহিলাদের বেলায় দুর্বলতা বেশি এটা মানতেই হবে। কেননা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের সীমাবদ্ধতা অনেক। অর্থনৈতিক দিক থেকে মহিলারা পরনির্ভরশীল। ফলে দায়ভার তাদের বেশি, ভোগটাও অনেক। এসব কথা বলছি কারণ একজন মহিলা সমাজের কোনো বিচ্ছিন্ন অংশ নয় এবং সমাজের এ ধরনের সমুদয় দায়ভার বহন করেই তিনি লেখক। লেখালেখিতে যাঁরা আসবেন তাঁদের আমরা ধরে নেবো আলাদা বা এক্সেপশন। তখন তিনি অন্য আরো একশজন মহিলা থেকে পৃথক। একটি বিশেষ জায়াগায় তার বৃত্ত টানা আছে। সে গণ্ডীতে কেউ ঢুকতে পারে না। সেখানে তিনি স্রষ্টা। ব্যক্তিসত্তায় একক এবং অনন্য। তখন তাঁর প্রচেষ্টা সমষ্টির পর্যায়ে থাকে না। একক প্রচেষ্টায় এসে দাঁড়ায়। শিল্প তো সমষ্টিগতভাবে হয় না। একজন ব্যক্তি, মহিলা অথবা পুরুষ যাই হোন না কেন, যখন শিল্পের ভুবনে এসে দাঁড়ান তখন যাবতীয় সীমাবদ্ধতা বা সমাজব্যবস্থার বিধি নিষেধ কাঁধে নিয়েই দাঁড়ান। সুতরাং তাঁদেরকে শুধুমাত্র ফেমিনিন দুর্বলতা বা অন্য যে কোনো দুর্বলতার জন্যে ক্ষমা করে দেবো এমন উদারতা না থাকাই ভালো। একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার জীবনযাপনের পার্থক্য অনেক। সে জীবনের প্রতিফলন তাঁদের লেখায় ছাপ ফেলে। পুরুষের যে অবাধ বিস্তার এবং অনায়াস যাতায়াত জীবনের সব ক্ষেত্রে, মহিলাদের গতি সে তুলনায় অনেক সীমিত। তবে আমি মনে করি এটা খুব একটা বড় কথা নয়। সাধারণ মেয়েদের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে কিন্তু একজন মহিলা লেখক এটা অতিক্রম করতে পারেন বা নানাভাবে তা

পুষিয়ে নিতে পারেন। শুধুমাত্র দৃষ্টি এবং ইন্দ্রিয়কে প্রতি মুহূর্তের জন্যে সজাগ রাখতে হবে। কেননা তাঁর ভুবনেও মুক্তো অনেক, প্রয়োজন কেবল কুড়িয়ে নেবার যোগ্যতা অর্জন করা। শিল্পকে জীবনযাপনের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করলে, পর্যবেক্ষণে ডারউইন হতে পারলে এবং পড়াশুনার পরিসর বিস্তৃত করলে মহিলাদের পক্ষে ফেমিনিন দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা কোনো কঠিন কাজ নয়। দরকার নিরলস প্রচেষ্টাব। সব লেখকের ক্ষেত্রেই যা সমান প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মহিলারা কিছুটা পিছিয়ে আছেন বলে ফেমিনিন দুর্বলতা নামক শব্দ তাঁদের ঘাড়ে চাপানো হয়। ফেমিনিন দুর্বলতাকে আমি সমস্যা মনে করি না। বরং সমস্যা ভাঙতে আমার আনন্দ। দুর্বলতার অর্থ আমার কাছে আরো ব্যাপক। আমি বুঝি, সাহিত্যে কেবল ফেমিনিন নয়, যে কোনো দুর্বলতাই ক্ষমাহীন। শিল্প তো ডিডেলাসের গোলকধাঁধা। ঢুকলে বেরুবার পথ জানা থাকে না। কখনো সে পথ অন্ধকারে ঢাকা, কখনো পিচ্ছিল, কখনো ভাঙাচোরা। অতিক্রম করার জন্য যথেষ্ট সৎসাহসের প্রয়োজন। এ সমস্যা লেখক-মাত্রেরই। তাই আমি লেখায় যে কোনো ধরনের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার পক্ষপাতী।

কেন লিখি ? কার জন্যে লিখি ? লিখি নিজের প্রয়োজনে। বড় গলায় তো বলতে পারি না যে লিখি জীবিকার প্রয়োজনে। এখানে লিখে দিন চলে না বলে কেন লিখি এ প্রশ্নের জবাব এককথায় দেওয়া যায় না। জবাব দিতে কতো ভাণ করতে হয়, কতো বানোয়াট কথা সাজাতে হয়। সর্বদাই কি কনফেশন হয় ? আসলে নিজের কিছু কথা সারাক্ষণ শরীরের অভ্যন্তরে বিষের মতো কাজ করে, সেই প্রকাশের তাগিদ থেকে লিখি। লিখি বলে বেঁচে থাকা কিছুটা সহজ হয়, অন্তত অস্থির ছটফটানি নামের যন্ত্রণা কমে। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে থাকার কষ্ট থেকে মুক্তি পাই, ঘুম আসে। জনান্তিকে বলি তবুও কখনো সিডেটিভ্ খেতে হয়। যখন ঠিকমতো গুছিয়ে উঠতে পারি না, শব্দ হাতড়ে মরি, মাথাকুটেও আঙ্গিকের কাঠামো ধরতে পারি না। লিখে ভলটেয়ার, রুসোর মতো বিপ্লবের পটভূমি তৈরি করবো, আমূল পাল্টে যাবে সমাজব্যবস্থা এমন বোধ থেকে অবশ্যই লিখি না। অথবা ঈশ্বর আমাকে দিয়ে লেখান, আমি এক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, এমন বাণী উচ্চারণ করারও স্পর্ধা নেই। পাঠক যদি কখনো বিরক্ত হয়ে শাসায়, এই শূয়োরের বাচ্চা তোর লেখার অধিকার নেই, তাহলে কি থেমে যাবো ? বলবো কি তথাস্তু ? একটুও না, কখনো না। যতদিন শরীরে কুলোয় কেন লিখি এই প্রশ্নের ঘানি টেনে যাবোই, অন্তত একজন পাঠকও যদি অবশিষ্ট থাকেন। লেখা তো জনপ্রিয় হয়ে ওঠার আকাঙ্খায় পাঠকের মুখ চেয়ে নয়, লেখালেখি নিজের ক্ষমতায়, যোগ্যতায় শিল্পিত বস্তু তৈরি করে মুগ্ধ পাঠককে নিজের কাছে নিয়ে আসা। নইলে লেখালেখি অর্থহীন। পাঠকের বোধ, বিবেচনা এবং মননের ওপর দৃঢ় আস্থা রেখেই লিখি। ব্যর্থ যদি হই সে দায়ভার আমার, পাঠকের নয়।

কার জন্যে লিখি ? অবশ্যই পাঠকের জন্যে। কিন্তু প্রশ্ন হলো তাঁরা কারা ? উত্তরটা আমার ভাষায় দিতে চাই না, দিতে চাই গোর্কির ভাষায়। তিনি বলেছিলেন . "The foreign and internal enemies will no doubt rejoice and say : Here is Gorky, too, giving us some enjoyable spiritual food ! But their rejoicing will be misguided. I have no intention of feeding pigs" (Maxim Gorky, *Culture and*

the People. p. 198). আমিও চেঁচিয়ে বলতে চাই, I have no intention of feeding pigs. তাঁদের জন্যেই লিখি যাঁরা নিজের কথা আমার লেখায় খুঁজে পেয়ে মানসিক আশ্রয় পান কিংবা কখনো কোনো কারণে প্রয়োজন মনে করেন । যাঁরা একটি লাইনও না পড়ে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বইটি পাশে ঠেলে বলেন, এই যে আর একজন আমাদের জন্য আত্মার খাবার তৈরি করেছেন, বিনীতভাবে বলতে চাই তাঁদের জন্য আমার কোনো দায়িত্ব নেই ।

কি নিয়ে লিখি ? লিখি সাধারণ মানুষের সাধারণ কথা । যারা টমটমে জুতে-দেওয়া ঘোড়ার মতো মুখে গাঁজলা উঠিয়ে অনববত ছোটে, যাদের আদি-অন্তের হদিশ নেই, যারা দু'পায়ে ভর করে দিগন্তের সীমানা খোঁজে । সেখান থেকে উঠে আসে চাঁদ, ফারাক্কার কারণে পদ্মা শুকিয়ে ধূ-ধূ বালুময় হয় গেলে যাদের জীবনযাপন কঠিন হয়, যারা জোতদারের মাথাটা ফুটবলের মতো লাথি দিয়ে নদীতে ফেলে দেয় । খুঁজে পাই কাহ্নুপাদকে, স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বপ্নে যে জীবন উৎসর্গ করে । খুব কাছের মানুষ জাফর, নিজের অস্তিত্বরক্ষার জন্যে যাকে রাজপথে বুকের রক্ত দিতে হয় । কি করে ভুলি বুড়িকে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দেয় । জামেবীর পদশব্দ তো বুকের ভিতর পাই, 'আপস' কথাটির সঙ্গে যার পরিচয় নেই । দেখি সালমাকে, যে এস্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে সোচ্চাব, নীতিহীন বুদ্ধিজীবী পিতার কার্যকলাপের বিরোধিতা করে ঘর ছাড়ে । লিখি শাহ্পরি দ্বীপের মালেকের কথা, যে রুখে দাঁড়াবাব শক্তি নিয়েও মানুষ এবং প্রকৃতির কাছে পরাজিত হয় । একজীবনে সব অভিজ্ঞতা হয় না, তাই ভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে নিজ কল্পনার মিশেল একজন লেখকের জন্য অত্যন্ত জরুরি । লিখতে চাই অনেক কিছু, চেষ্টা করি, ব্যর্থতার গ্লানি বুকে নিয়ে দিন কাটাই । তবু অবিরাম অনলস খেটে যাই । আকাঙ্ক্ষা আকাশসমান, যদি কখনো কোনো এক উজ্জ্বল চকচকে মুহূর্তে পরিশ্রমের সমুদ্র মন্থন করে উঠে আসে একটি শিল্পিত বালুর দান ! তেমন নীলকণ্ঠ কি হতে পারবো, তেমন দিন কি আসবে ? বুকের ভেতর টমটমের শব্দ শুনতে পাই, কালো পীচের রাস্তার ওপর দিয়ে মুখে গাঁজলা উঠিয়ে ঘোড়াটা ছুটছে, পেছনে ক্লান্ত ম্রিয়মাণ যাত্রী আমি, কেবলই ঝিমোই । বাম কানের ভেতর থম-ধরা ব্যথা সারাক্ষণই থাকে, বুকে কীর্তিনাশার গর্জনের জন্যে তীব্র পিপাসা ।

সামাজিক দিক থেকে মহিলা হবার কারণে আমাকে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি । আমি যখন শাহপরি দ্বীপের জেলেপাড়ায় ঘুরে বেড়াই কিংবা ওদের কারো মাছ ধরার ট্রলারে সেন্টমার্টিন যাই ওরা আমাকে দেখে বিব্রত হয় না, বরং আমার কৌতূহলী জিজ্ঞাসার জবাব দেয় । আমাকে অনুচিত প্রশ্ন করে না শ্রীমঙ্গলের খাসিয়া পাহাড়ের খাসিয়ারা কিংবা ভানুগাছের মণিপুরীরা । বরং করকটে আগে রাঁধা কালবাউসের ঝোল দিয়ে পাইজল চালের ভাত খেতে দেয় । কোনো মাপকাঠিতে ওদের আন্তরিকতার বিচার হয় না । এমন সহযোগিতা পাই বলেই নিজের দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানোর সাধ নিয়ে বারবার ছুটে যাই । কিন্তু আমি লেখক না লেখিকা এ প্রশ্ন নিয়ে একাধিকবার তর্কযুদ্ধে নামতে হয়েছে । আসলে যে সমাজব্যবস্থায় নারী পণ্যের দরে বিকোয় এবং প্রয়োজনীয় পণ্য হিসেবে সমাজে তার অবস্থান নির্ধারিত হয় সেখানে মহিলারা যাঁরা লেখালেখি করেন তাঁদেরকে পুরুষের চাইতে কিছুটা ভিন্নভাবে দেখা হয় এবং লেখিকা

হিসেবে গণ্য করা হয় । স্বীকার করতে হবে শুধু যে ব্যাকরণের প্রয়োজনে তা নয়, বাঁকা চোখে দেখার কারণেও । আমার যুক্তি হলো লেখক লেখকই । যাঁরা নিজের ক্ষমতায় টিকতে পারবেন না তাঁরা আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত হবেন । পুরুষ এবং মহিলা যেই হোন না কেন । শুধুমাত্র পুরুষ হওয়ার জন্য ইতিহাস কোনো লেখককে ক্ষমা করেছে এমন নজীর ইতিহাসে নেই । আসলে সামাজিক অবস্থার রূপান্তর না ঘটলে এ ধরনের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটবে না । অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে মানসিকতার ব্যাপারটি নিবিড়ভাবে জড়িত বলে এই সমাজব্যবস্থা কোনোদিনই এগুবে না, যতই নিজেদের আমরা শিক্ষিত বলে দাবি করি না কেন ।

মাঘ-চৈত্র ১৩৯১ । পঞ্চম বর্ষ । চতুর্থ সংখ্যা

সুরেশ যোশী

আত্মকথা

ছোট্ট মিৎসু আমার পাশে এসে বসে তার খেলনাটায় দম দিয়ে দিতে বলে । আমি দম দিলে সে তখন তার হেনারাঙানো দুহাতে তালি দিয়ে ওঠে, আর সেই তালে নাচতে শুরু করে । নাচের তাল আমার শরীরেও সঞ্চারিত হয়, কিন্তু আমি তার নাচে যোগ দিই না । সকালের কোমল আলো মিৎসুর নিষ্পাপ মুখ আর খেলনাটার উপরে ছড়িয়ে যায়—আমি এই সব দেখি । মুহূর্তের জন্য সবকিছুই এক অদৃশ্য সূত্রে গ্রথিত হয় ; পূর্ণতা অনুভব করি । আমার প্রাণশক্তিতে মেশে সেই অনুভূতি । অদৃশ্যভাবে আমার ভিতরে এক পরিপূর্ণ প্রক্রিয়ার সূচনা হয় । কোনোদিন হয়তো সেই প্রক্রিয়া রূপ পাবে । এই মুহূর্তে তা আমার কাম্য নয়।

এই দৃশ্যের পরপরই আরেকটা দৃশ্য আসে : রোদে পোড়া বৈশাখের দিনে পিচগলা রাস্তায় আমি হাঁটছি । বাঁদিকে একটা বাংলোব কুঁকড়ে যাওয়া ছায়ায় বসে আছে বারোঘর কুষ্ঠী পরিবার । তাদের মধ্যে একজনের মা রেগে তার আঙুলহীন ঠুঁটো হাত দিয়ে নিজের সাত বছরের ছেলের সরল মুখে জোরে একটা চড় কষালো । 'গালে চড়ের দাগ বসিয়ে দেওয়া'—এই কথাটার অর্থ এই প্রথম বুঝলাম : মায়ের চেটোর ছাপ ছেলের গালে স্পস্ট হয়ে ফুটে উঠেছে । কিছু দূরে মজুররা পিচ ঢালছে, সড়কে তাদের পায়ের ছাপ । এ সব পূর্ণতার স্বাদ আনে ।

আমার বাড়ির বারান্দায় বসে ধীরে ধীরে এক বিষন্ন ভাবনায় তলিয়ে যাই, নিঃসঙ্গতা ঘিরে ধরে সবদিক থেকে । দমকা বাতাস ওঠে । দক্ষিণের জানলায় একটা জাসুদ ফুল আমাকে হাতছানি দিয়ে অদৃশ্য হয় ; যেন তার ওই ছোট্ট ভঙ্গীটুকুই আমার নিঃসঙ্গতার রহস্যকে ধরে রেখেছে ; যেন তার ক্ষণিক উপস্থিতির সইটুকু না পড়লে ঐ বিশেষ মুহূর্তটি বিশ্বাসযোগ্য হয় উঠতো না ।

কখনো কখনো মনে হয় নিঃসঙ্গতার আঙরাখা পরেই হয়তো আমি জন্মেছিলাম । শৈশবের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে । একই সঙ্গে তিনটে মৃত্যুর—ছেলের, মেয়ের, জামাইয়ের—প্রচণ্ড আঘাতে বিহ্বল ঠাকুর্দার কথা ভাবি; ভাবি তাঁর বোবাকালা অকালে বিধবা বোনের কথা । ঐ বাড়ির প্রত্যেকটা ঘর উপছিয়ে পড়তো নীরবতা, আমি যেন আমার প্রথম নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই নীরবতা নিজের ভিতরে টেনে নিয়েছিলাম । নীরবতা আর রাগী বিষাদ—পালানোর পথ নেই, অবস্থা পালটে দেওয়ার উপায় নেই । বোবা বিষাদ আমার শিরায় শিরায় প্রবেশ করেছিল । যৌবনের দিনগুলোয় কখনো কখনো সেই বিষন্নতা রাগে ফেটে পড়তো ; কিন্তু বেশীরভাগ সময়েই আমি ডুবে যেতাম তার গভীরে । জীবন আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই সে-আনন্দে আঘাত হেনেছে বিষাদের অন্ধকার । আবার এই একই বিষাদের অন্ধকার অন্যের নীরবতা বুঝতে

সাহায্য করেছে আমাকে। আমার অভিজ্ঞতায় মাঝে মাঝেই এমন একটা বিন্দুতে পৌঁছই যেখানে আনন্দ আর বিষাদ মিলিত হয়ে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। ওই বিন্দুটা পেরোলে প্রত্যক্ষ রূপান্তরিত হয় অতীন্দ্রিয়ে। সে-কারণেই বারে বারে আমি অতীন্দ্রিয়ের জগতে ফিরে যাই।

একদিকে বাড়িটা'র আর্ত নীরবতা, অপরদিকে তাকে ঘিরে প্রতুল প্রকৃতির বেষ্টনী। পিছন ফিরে মনে হয়, আমার ছেলেমানুষ-মন খেলার মাঠ এড়িয়ে নিশ্চয় এসবেরই মানে খুঁজতো। সে-সময়ে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম আমি। অর্থ খোঁজার জন্য ভাষার ব্যবহার তখনো আমার অনায়ত্ত ছিল। ওই বাড়িটাতেই সম্ভবত কোনো ভাষার চল ছিল না। তাই আমি ভাষাপূর্ব চেতনায় বিশ্বাসী। এখন আমি অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের ব্যাপারে প্রতীতিবাদের সহায়তা নিই, কিন্তু সে-সময়ে আমার জগতে শুধু অব্যাখ্যাত ইন্দ্রিয়ানুভূতিই ছিল। আমরা ভাষাপদ্ধতি পাই সমাজের কাছ থেকে; স্কুলের পাঠ্য বইয়ের জগৎ নানা অর্থের দ্বারা আক্রান্ত। যে জগৎ অগঠিত তাকে আবিষ্কার করে তার ভিতরে অনুসন্ধান করবার গভীর আকুতি সম্ভবত গোড়া থেকেই আমার মধ্যে নিহিত ছিল। আমার জগৎ তখনো নির্দিষ্ট রূপাবলীর দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়নি। সুলভ উপমার খাপেখোপে সে জগত তখনো ভরা হয়নি। আমার উচ্ছল প্রাণশক্তি চারপাশের সবকিছুতেই সংক্রমিত হয়ে তাদের জীবন্ত করে তুলতো। মগরা গাছের ফিসফিসানি আমি শুনতে পেতাম, টের পেতাম আমার ভিতরে তার পাতা মেলা, ডাল থেকে ডালে পাখির ছন্দে লাফিয়ে পড়তাম, পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে করে নিতে পারতাম জলের সাথী। ঝরাপাতা বাতাসে তরঙ্গ তুললে তা আমার দৃষ্টি এড়াতো না। এ সবই আমাকে টানতো, বর্ণমালার খুলে দেওয়া জগতে আমার মন বসতো না। সংখ্যা-রাজ্যের অনেক দূর দিয়ে ছিল মনের গতায়াত।

তা সত্ত্বেও বর্ণমালাই আমাকে নিয়ে যায় শব্দের বিচিত্র কম্পমান ধ্বনির জগতে। একটা শব্দের সঙ্গে আরেকটা শব্দের জোড়-মেলার রহস্য আমাকে বিস্মিত করতো। বাড়িতে ছেলেবেলায় গল্প শোনানোর কেউ ছিল না; তাই নিজে নিজেই পড়ে নেওয়ার অভ্যাস করি। ঠাকুর্দা গ্রামের গ্রন্থাগার দেখাশোনা করতেন। মনে পড়ে যেসব বইয়ের প্যাকেট তিনি পেতেন সেগুলো খোলার সময়ে কীভাবে উদগ্রীব হয়ে আমি অপেক্ষা করতাম। এখম আমি নিজের জন্য আর একটা নতুন জগৎ খুঁজে পেলাম। ছন্দ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানলাভও ঘটে তাঁর কাছেই; তাঁর কাছে শিখি কাকে বলে 'মন্দাক্রান্তা' আর কাকে বলে 'শিখরিণী'। লুকিয়ে পাঠানো আমার একটা পদ্য-রচনা সে-সময়ে 'বালমিত্র' পত্রিকাতে ছাপাও হয়েছিল; কিন্তু কীভাবে যেন ঠাকুর্দা ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলেন। আমাকে ডেকে গালে একটা চড় কষিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তোমাকে আর কবি হতে হবে না।" সে সময়ে তাঁর ওরকম আচরণের অর্থ বুঝিনি। আমার এক কাকা লিখতেন; অল্প যেটুকু লিখেছিলেন—একটা কি দুটো গল্প—আমি দেখেছিলাম তাঁর অকালমৃত্যুর পরে। এই মৃত্যু ঠাকুর্দাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো। তাঁর চড়ে স্নেহ ছিল—যা অনেক পরে বুঝেছি।

ছন্দ শেখার আগেই গ্রামের উপকথা, ভূত-প্রেত নিয়ে জনশ্রুতি, কাছের দুর্গটায় বাঘের গর্জন, হোলি উৎসবের সময়ে ঢাক আর বড়ো বড়ো কাঁসির প্রাণমাতানো

বৃন্দবাদন—এ সবই আমার মনে ক্ষণস্থায়ী বিভিন্ন আবেগের সমাবেশ ঘটিয়েছিল ।

শিক্ষকতার কাজে করাচী যেতে হয়েছিলো আমাকে ; সেখানে থাকার মতো কোনো জায়গা খুঁজে পাইনি । অধ্যাপক ভবানীশঙ্কর ব্যাস তখন আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন । ইয়োরোপীয় লেখকদের লেখার প্রতি তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ; তাঁদের লেখা আগে কখনো পড়িনি ; রোজ পাঁচ থেকে ছ' ঘণ্টা গ্রন্থাগারে কাটাতাম। সৃষ্টিশীল লেখক হতে গেলে কী বিশাল পরিমাণ অনুশীলনের প্রায়োজন, এই সব বই পড়ে তার একটা হদিশ পাই । সে পর্যন্ত যা কিছু লিখেছিলাম, সবই ছিঁড়ে ফেললাম। নিজেকে ঠিকমতো প্রস্তুত করার আগে কলম ছুঁতে আর সাহস হলো না । তারপরে বারো বছরের যে নীরবতা পালন করি তা ছিল আমার লেখক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য।

একটা শব্দের সঙ্গে আরেকটা শব্দের সংশ্লেষ যে কতো জটিল কাজ অধ্যয়ন আর চিন্তন তা আমার কাছে স্পষ্ট করে তুললো । চেখভ আর হেমিংওয়ের রচনার সংযম দেখে অভিভূত হলাম। ছোটগল্পে একই সঙ্গে তারবার্তার সংক্ষিপ্তি আর মহাকাব্যের বিস্তার রাখতে হবে, এই ধারণা আমাকে চমৎকৃত করলো, এরপরে ব্যর্থতার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও লেখার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হলাম। কখনো ভুলিনি, ব্যর্থতা একজন লেখকের বিশেষ অধিকার। যা-কিছু লিখেছি তাকে সব সময়েই অসম্পূর্ণ খসড়া বলে ভাবি। আমার এই মনোভাবকে অনেকে বিদ্রূপ করেন। তাঁদের বিদ্রূপের মধ্যে আমি কিন্তু সদিচ্ছার প্রকাশ দেখি। 'গৃহপ্রবেশ' প্রকাশিত হবার পরে যখন মন্তব্য করা হলো 'এভাবে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না' — তখন আমি অনুভব করেছিলাম যে সাফল্য বা ব্যর্থতা, স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিতে কিছুই আসে যায় না। আসল কথা হলো সৃষ্টির কাজ যেন এলোমেলো না হয়। প্রেরণাতাড়িত লেখায় তাই আমি বিশ্বাসী নই। এতে অসনন্ধ শিথিলতাই প্রশ্রয় পায়। আমার লেখা বা ব্যবহার করা প্রতিটি শব্দের দায়িত্ব আমার নিজের।

নিজস্ব রচনাশৈলীর খোঁজ করতে হয়েছে ; যা আমি পড়েছিলাম বা শিখেছি তার অনেকটাই ভুলতে হয়েছে। আমার আগের প্রজন্মের লেখকদের আমি শ্রদ্ধা করতাম। তাঁরা যা অর্জন করেছিলেন তার কাছে আমাকে পৌঁছতে দেওয়ার জন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ । তবু তাঁদের প্রজন্মের কারো ছায়ায় আশ্রয় নেওয়া মোটেই কাম্য ছিল না। নিন্দা-প্রশংসার সাহিত্যিক ডামাডোলে সৃষ্টিশীল থাকা বেশ শক্ত; অথচ এই কোলাহলের মধ্যেই তো আমাদের থাকতে হবে। নিজেকে তাই অনাসক্ত ও অসম্পৃক্ত থাকতে শিখিয়েছি। সব সময়েই যে সফল হয়েছি সেকথা বলতে পারি না।

ছোটগল্প হলো অক্ষরশিল্পীর হাতে খোদাই করা দুশোটা অতিসূক্ষ্ম অক্ষরসমন্বিত একটা চালের মতো ছোট। এই কাজের ঝুঁকি আমাকে মাতায়। সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে আমি লিখি না; আমার গল্পের সমস্যা নান্দনিক। আমার মতে, নান্দনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে অভিজ্ঞতার বিন্যাস ধরা পড়ে নিশ্চিতভাবে । মানুষের নিয়তি আমাকে আকৃষ্ট করে। মানবিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়াই যে সব থেকে কষ্টের, আমি তা জেনেছি। ধর্ষিত মানবতা, স্থূল স্বার্থের কারণে মানুষের পশুর স্তরে অবতরণ—এ সবই আমি দেখেছি। মনে হয় আমাদের কালে ট্রাজেডির প্রধান প্রকাশ মানুষের মনুষ্যত্ববিলোপে। কিন্তু মিলন কুন্দেরার মতো হাসির সঙ্গে বিস্মৃতিকে মিশিয়ে এই ট্রাজেডিকে আমি দেখাতে পারিনি।

ভাষা একটা সাতমহলা বাড়ি, যার অনেক দরদালানে মানুষের পায়ের ছাপ পড়ে

না ; ছি-ছি মানসিকতা-সম্পন্ন সমাজ তাদের এড়িয়ে চলে। ভাষা সম্পর্কে আমাদের মনোভাব সব সময়ে সৃষ্টিশীল প্রকাশের সহায়ক হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ কিছু অঞ্চল অবহেলিত রয়ে গেছে। ছেলেবেলায় যখনই কোনো শব্দ উচ্চারণ করতাম তা আমার মনে ঢেউ তুলতো। মনে হতো শব্দ যেন পাশের পর্বতমালায় মনের সুখে উড়ে যাওয়া পাখি। পরে শহরে মফস্বলে নিষ্প্রাণ শব্দসমারোহের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো, আদবকায়দায় চাপে সেইসব শব্দ আকারহীন। তবে আমার সঙ্গে নিঃসঙ্গতাও রইলো। আমি প্রায়ই অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বের পিছনে চলে যাই। অস্তিত্বকে উদ্ধার করবার জন্যে চাই কবিতার একটা পঙতি, আঁকড়ে ধরবার উপযোগী একটা বাক্য।

যুবাকাল থেকেই শরীর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এসেছে—হাঁপানি নষ্ট করেছে শ্বাসক্রিয়ার স্বাভাবিক ছন্দ। সহজভাবে শ্বাস নেওয়ার জন্য তাই আমাকে পরিশ্রম করতে হয়, যেমন হয় বিভিন্ন শব্দকে সন্নিবিষ্ট করতে গিয়ে। হাঁপানির কষ্ট ভুলে থাকার জন্য এমন কিছুতে ডুবে থাকার প্রয়োজন ঘটে যা আমাকে পুরোপুরি নিমগ্ন করে রাখবে। অন্তর্জীবনের প্রবল তাগিদগুলো নিয়ে তাই গল্প লিখতে আরম্ভ করলাম। সুসঙ্গত কাঠামোয় ধরবার প্রয়োজনে বাক্যবিন্যাসকে ছোট ছোট টুকরোয় ভাঙতে হলো ; আমার সময়ের অনুভবও বহুখণ্ডিত। ফলে বাক্যগুলো হয়ে উঠলো আরো প্রামাণিক, আরো অকৃত্রিম। ভাষার তন্তুই পাল্টে গেল। তবু নিজের ভিতর থেকে কোনো বাহবা পেলাম না। ব্যর্থতার এই নাছোড় অনুভবই আমাকে সৃষ্টিশীল রাখে।

ইচ্ছে করেই নিজেকে ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছি। আত্ম-সমালোচনা ও নিজের প্রতি ব্যঙ্গের মনোভাব বজায় নিঃসঙ্গতার এই মাতৃভূমিতে আমার বাস। এক জর্মান কবির ধরন আমার ভালো লাগে : আগে থেকে অনুমান করা যায় এমন বিশেষণ ব্যবহার না করে তিনি বরং জায়গাটা খালি রেখে দিতেন। আমার ব্যবহার্য শব্দটিকে পাঠক যদি আগে থেকে অনুমান করতে পারে, তাহলে শব্দটা নিঃসন্দেহে একটা ক্লীশে বা গতানুগতিক কথা। তার প্রয়োগে লাভ কী ? অপরপক্ষে উপমা যখন তার হুল ফোটানোর শক্তি হারিয়ে সাধারণ ভাষার সঙ্গে মিশে যায়, তখন ভাষা থেকে উপমার নির্বাসন জরুরি। আমাদের চারপাশে জমে ওঠা গতানুগতিক শস্তা পদের বা ক্লীশের জঞ্জাল যে কতোখানি দুর্বহ, সে বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার।

পৃথিবীর দুটো গতি : নিজের চারপাশে আর সূর্যের চারপাশে—এরা পরস্পর সম্পর্কিত। প্রবন্ধ লেখার সময়ে নিজের চারপাশে পাক খেতে আমার ভালো লাগে। সব কিছুই কাব্যময়। আমার সৃষ্টিশীলতা সেই সূর্যের খোঁজ করে যার চারপাশে প্রদক্ষিণ করার অর্থ সেই সূর্যই দিতে পারে। নীরবতা আর শব্দরিক্ততা তাই আমার কাছে এত মূল্যবান।

আমি দার্শনিক আলোচনা পছন্দ করি, কিন্তু যে রচনা একজন ব্যক্তিকে তার কেন্দ্রে রাখে তা থেকে দূরে থাকি। অবশেষে জরায়ুর নিঃসঙ্গতায় প্রবেশ করার মুহূর্ত একদিন ঘনিয়ে আসবে।

দেবেশ রায়

উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে

ইংরাজিতে যাকে বলে সেন (Sane) বাংলায় তাকেই ত আমরা বলতে পারি সৎ । এই সৎ শব্দটির পেছনে সদসতের কোনো নিরিখ নেই, আছে সামাজিক জীবন-যাপনের কতকগুলি সভ্য রীতির চর্চার প্রতি সমর্থন । কোনো সৎ সমাজের সম্ভাবনা ও সঙ্কট নিয়ে একজন ঔপন্যাসিকের কী বলার থাকতে পারে ? চ্যাপলিনের 'দি কিড' ছবিটিতে বাচ্চা জ্যাকি কুগান ঢিল মেরে-মেরে জানলার কাঁচ ভাঙছে, যাতে চ্যাপলিন সেগুলো সারাতে পারে । জানলার সার্সি সারানোর পেশায় সাফল্যের ওটাই ছিল চ্যাপলিনি কৌশল । একটি সম্পূর্ণ সৎ সমাজে একজন ঔপন্যাসিক তো লিখতে চান তখন, যখন শুধু জানলার সার্সি নয়, গোটা-গোটা বাড়ি, বহুতল বাড়িও ঝুরঝুর ভেঙে পড়ে। যে দুঃসময়ে সময়ের গ্রন্থি ভেঙে যায়, তখনই ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস লেখার সুসময়।

কিন্তু কেন ? ঔপন্যাসিকরা কি ঘোলাজলে মাছ শিকার করতে ভালোবাসেন ? অথবা কাসান্দ্রার মতো চেতাবনী দিতে ? কাসান্দ্রা যে-কোনো উপন্যাসের পক্ষেই একটু বেশি বানানো চরিত্র, তার জন্যে মঞ্চ দরকার, মহাযুদ্ধের পট দরকার, রাজপ্রাসাদের অলিন্দ, সোপান, অন্ধকার আর মুক্ত বাতায়ন। উপন্যাসে এত কিছু সাজিয়ে তোলা চলে না । যদি কোনো কাসান্দ্রাকে উপন্যাসে নেহাৎ লাগেই, তাহলে ঔপন্যাসিক আর-একটু নমনীয় কাসান্দ্রা চাইবেন ।

অথচ প্রশ্নটা তো প্রশ্নই থেকে গেল—একটা দুঃসময়কেই কেন ঔপন্যাসিক বেছে নেন, বা বেছে নিতে চান ? বা সময়টাকে উল্টে দিতেই তিনি চান কেন ? সময়কে গোলমেলে করে না দিলে তাঁর চরিত্র আর ঘটনাগুলোর কেন্দ্র বিকেন্দ্রিত হতে পারে না ? একজন কোনো মানুষের অকারণ বাসনা ঔপন্যাসিককে টানে, সমুদ্যত সর্বনাশ ঔপন্যাসিককে টানে । তার মানে কখনোই এই নয় যে ঔপন্যাসিকরা সর্বনাশের পরিস্থিতিই পছন্দ করেন ; বরং উল্টো—ঐ সর্বনাশে আর বাসনায় তিনি এমন এক মানবসত্যের দেখা পান, যুক্তির দিক থেকে যে সত্য, সত্য হয়ে ওঠার কথা ছিল না । কিন্তু সত্য তো ভালোমন্দ-নির্ভর নয় । কোথাও যুক্তির বিপর্যয় ঘটে গেছে । কোথাও সম্ভাব্য সত্য ধ্বস্ত হয়েছে আর তার জায়গায় নতুন এক সত্য জেগে উঠেছে যা ভয়ঙ্কর হলেও সত্য, অনভিপ্রেত হলেও সত্য, অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও সত্য । ঔপন্যাসিক সত্যের সেই বামমুখ দেখে ফেলেছেন ।

কিন্তু যা সম্ভাবনা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল, অভিপ্রেত ছিল, যুক্তিযুক্ত ছিল—তার কথা মনে না রাখলে সর্বনাশ ও সময়নাশের কাহিনীও মানবসত্য হয়ে ওঠে না । সেই আকাঙ্ক্ষা আর সম্ভাবনা, অভিপ্রেত আর সঙ্গত—উপন্যাসে সব সময়ই মনে পড়ে, উপন্যাস সব সময়ই মনে পড়িয়ে দেয় । তা যদি মনে না পড়ায় তাহলে উপন্যাসের কাহিনী তো

হয়ে দাঁড়ায় আলগা গল্প। ঔপন্যাসিক মানুষের এই দুই সত্যের সংযোগস্থলের চড়াই ভাঙেন—যুক্তির সত্য আর সর্বনাশের সত্য। সেই কারণেই একজন ঔপন্যাসিক উপন্যাস-রচনাকর্মী হিশেবেই সব সময় তাঁদের সহযাত্রী যাঁরা তাঁদের নিজ-নিজ ক্ষেত্রে মানবসংসারে যুক্তি আর কাণ্ডজ্ঞানের খোঁজে ফেরেন। কাণ্ডজ্ঞানই সবচেয়ে দুর্লভ—চরম সঙ্কটে সে-কথাই বারবার জানতে হয়।

কিন্তু একজন বাংলা ঔপন্যাসিক হিশেবে কোন শিল্পের আমি চর্চা করি, কী আমার আত্মপরিচয়? খুব আল্গাভাবে আমি বলতে পারি—আমি গল্প-উপন্যাস লিখি বা আমি একজন ঔপন্যাসিক। কিন্তু আমার পেশার বা ব্রতের এই বিবরণে কি আমার আত্মপরিচয় সম্পর্কে আমি নির্দ্বিধ? "গল্প-উপন্যাস লিখি" বা "আমি একজন ঔপন্যাসিক" একথা তো বলি এই কারণে যে এই কথাগুলোতেই আমার কাজটা সবচেয়ে সহজে বোঝানো যায়। বলি, কারণ এ-রকমই বলা হয়ে থাকে। এ-রকম বললেই সহজে বোঝানো যায়। এ রকম বললেই কাজ চলে যায়। এই শব্দগুলির বা বাক্যগুলির সহজবোধ্যতা বা কার্যকারিতা তিনশ বছরের পুরনো। এমন-কি, আরো একশ বছরও পেছিয়ে যাওয়া যায়। নিজের পরিচয় দেওয়ার ব্যাপারে এত পুরনো কতকগুলি শব্দে নিরাপদ বোধ করা যায়।

ইয়োরোপ থেকে যাঁরা উপনিবেশ তৈরি করতে এসেছিলেন, তাঁদের কাছে এই শব্দগুলি আমরা শিখেছি। তাঁরা এদেশে এসেছিলেন, আরো নানা দেশে গিয়েছিলেন —আফ্রিকায়, এশিয়ায়। এইসব দেশেই তাঁদের কাছ থেকে আমরা শিখেছি এইরকম ভাষায় নিজের কাজের পরিচয় দিতে—'আমি গল্প-উপন্যাস লিখি', 'আমি একজন ঔপন্যাসিক'। তার আগে তো আমরা জানতাম না উপন্যাস কাকে বলে, লিরিক কাকে বলে, ট্র্যাজেডি-কমেডি কাকে বলে। ইয়োরোপের এই উপনিবেশ নির্মাতারা আমাদের শেখালেন—দেশের অর্থনীতি বলতে বোঝায় শিল্প, দেশের শাসন বলতে বোঝায় গণতন্ত্র, দেশের শিল্প-সাহিত্য বলতে বোঝায় এ-রকম সব ভাগ-উপভাগ—লিরিক, ট্র্যাজেডি-কমেডি, নভেল। এখন, গত তিন-চারশ বছরে এগুলো সাধারণ সত্য হয়ে গেছে। ইয়োরোপীয় আলোকপর্বের, এনলাইটেনমেন্টের, 'আবিষ্কৃত' এইসব সাধারণ সত্য বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তির যুগ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছে। ধারণা ও জ্ঞানের সেই বিস্তারে শিল্পায়ন, প্রশাসন, শিল্পসংজ্ঞাই যেন প্রধান বাক্য আর ঔপনিবেশিকতা যেন উপবাক্য। কার্তেসীয় যুক্তিবিজ্ঞানের এমনই কৌতুক যে কোন বাহনের মাধ্যমে এই ধারণাগুলি এমন সর্বজনীনতা পেল সে-প্রশ্ন যেন অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক, অবৈজ্ঞানিক। এখন, যদি কোনো ভারতবাসী প্রশ্ন তোলেন যে সাহেবরা আমাদের ভাষাগুলিকে তাঁদের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে বা আমাদের সাহিত্যগুলিকে তাঁদের তুলনামূলক সাহিত্যতত্ত্বে বা আমাদের ধর্মগুলিকে তাঁদের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে যে-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেই ব্যাখ্যাই কেন একমাত্র ব্যাখ্যা বলে মানবো তখন তাঁকে বোঝানো হবে যে ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম এই সব তো সনাতন বিষয়; সাহেব এলেও যা, সাহেব না এলেও তা; কলোনিয়ালিজম বা উপনিবেশবাদ দিয়ে এই সর্বজনীন সিদ্ধান্তকে খাটো করে বুঝো না। অর্থাৎ উপনিবেশের সুবাদে সাহেবরা আমাদের যা শিখিয়েছিলেন, সেগুলোই এখন উপনিবেশ-নিরপেক্ষ সাধারণ সত্য হয়ে গেছে। আমাদের এখন বোঝানো হবে যে

পরিণতিটাই মুখ্য, পদ্ধতিটা নয়। আমাদের বোঝানো হবে, সভ্যতার বিস্তারে দুই সভ্যতার বিনিময় সব সময়ই উপকারী। আমরাও এগুলো মেনে নিতে পারি যদি আমরা 'সভ্যতা' ও 'প্রগতি' ও এ-সব শব্দের অর্থ নিয়ে কান একটু বন্ধ রাখি বা 'সভ্যতার প্রগতি' এ-রকম শব্দ ব্যবহারে কলম একটু খোলা রাখি। কিন্তু সবসময় তো সবাই এতটা সুবিধেজনক পদ্ধতিতে কান বা কলম খোলা বা বন্ধ রাখতে পারেন না। তাই এমন কথাও আজকাল উঠছে যে সাহেবরা যে-অঙ্ক আমাদের শিখিয়েছেন তাও সাম্রাজ্যবাদী 'অঙ্ক'। ১৯৯০-এর ৩২ (২) সংখ্যার 'বেস এ্যাণ্ড ক্লাস' সাময়িক পত্রে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগের অধ্যাপক অ্যালান জে. বিশপ তাঁর 'পশ্চিমি গণিতবিদ্যা: সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের গোপন অস্ত্র' রচনাটিতে স্পষ্টই বলেছেন, 'পশ্চিমি গণিতবিদ্যার পরিচয় আবিষ্কার প্রয়োজন, কারণ এই পাশ্চাত্য সংস্কৃতিই, বিশেষত পশ্চিম ইয়োরোপিয় সংস্কৃতিই সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যসাধনে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে।'

উপন্যাস কাকে বলে এটাও আমাদের শিখিয়েছেন ইয়োরোপিয়রাই, তাঁদের অ্যাংলো-স্যাকসন চেহারায়, যদিও ইয়োরোপ মহাদেশে এ্যাংলো-স্যাকসন উপন্যাসের ঐতিহ্য তেমন উঁচু মাপের নয়, কিন্তু আমরা স্কটের কাছ থেকেই যখন উপন্যাস শিখছি, তখন আমাদের হাইল্যাণ্ড ও ব্যারন না থাকলেও, উপন্যাসে হাইল্যাণ্ড ও ব্যারন আমাদের তৈরি করে নিতে হলো। ১৮৬৫-তে আমরা উপন্যাস লিখতে ও পড়তে শিখি। কলোনির 'শিক্ষিত প্রজা'র এই শিক্ষার ভিতর কী নির্মম কৌতুক নিহিত ছিল। মাত্র তার বছর তিরিশ আগে সমগ্র বাঙালি-ভারতীয় সমাজ অসম দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল —বিধবাদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা চালু থাকবে কি না, এ-রকম একটি প্রশ্নে। কোম্পানির সরকার যে সতীদাহ নিষিদ্ধ করে একটা আইন বানাতে পেরেছিলেন সে তো মাত্র সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুর সমর্থনের জোরে। মাত্র তার বছর দশেক আগে কোম্পানির সরকার বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সমর্থনে বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন সঙ্গত ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। আর ১৮৬৫-তে প্রথম বাংলা উপন্যাসের নায়িকা বিশ্বের কাছে ঘোষণা করে দিল, 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'। এ ঘোষণা মিথ্যা ঘোষণা—যেমন এমন ঘোষণা এমনই মিথ্যা ছিল পৃথিবীর অন্যান্য উপনিবেশে ও মহাদেশে। কিন্তু ঘোষণার বিষয়টা যত মিথ্যেই হোক, ঘোষণার ভাষা ত সত্য।। সে-ভাষায় এই মিথ্যা-ঘোষণাকেও তো সত্যের মতোই শোনাত। বাক্ আর অর্থের মধ্যে এক ঔপনিবেশিক শক্তি ঢুকে পড়ে তাদের বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমরা তখন থেকেই আমাদের নিজেদের কাহিনীকার হওয়ার পরিচয় হারাতে শুরু করি। আমরা ধরে নিলাম—ঐ ভাষা আর ঐ ঘোষণার নামই উপন্যাস। ঐ ভাষা আর ঐ ঘোষণার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে 'অর্থ' গলে গেল। ইংরেজরা আমাদের এই উপন্যাস শিখিয়েছে। আমরা আমাদের নিজেদের কাহিনী হারিয়ে ফেলেছি।

ব্রতকথা, পাঁচালি, কথকতা, কীর্তনে আমাদের একটা কাহিনীর ধরন তো ছিল। এগুলোর ছক ছিল বাঁধাছক কিন্তু প্রত্যেকবার প্রত্যেক ব্রতকথক বা পাঁচালিকার বা কথক ঠাকুর বা কীর্তনিয়ার বলার সঙ্গে সঙ্গে এই কাহিনীগুলি অদ্ভুতভাবে বদলে যেত। এই কাহিনী ভিন্ন কথকের গলায়-ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী হয়ে যেত। একই বাঁধা ছকের কাহিনী এমনই অব্যর্থতায় কাহিনীকারের ব্যক্তিত্বের ছাঁচে আরো একবার ঢালাই হয়ে

যেত। যেন ছৌ নাচের মুখোশের অপরিবর্তনীয়তা আর এক নিয়ত পরিবর্তমান ছাঁচের আকার পেত। গল্পগুলো এত চেনা, এত জানা, এত শোনা। কিন্তু সেই গল্প আরো একবার না বললে ব্রতপালন সম্পূর্ণ হবে না, ব্রত ভাঙা যাবে না। পাঁচালি, কথকতা, কীর্তন সম্পূর্ণ হবে না। এরই ভিতর, সেই অপরিবর্তনীয় ছাঁচের ভিতর কথক তাঁর নিজের কাহিনীটা ঢুকিয়ে দিতে থাকেন, দেবদেবীদের নিয়ে রঙ্গরসিকতা করতে থাকেন, প্রায় কেচ্ছা শোনানোর ভঙ্গিতে শিব বা কৃষ্ণের নানা কাহিনী শোনাতে থাকেন, আর সেই প্রক্রিয়াতে ঐ কাহিনীর অপরিবর্তনীয় ছাঁচের ভিতর সময়কালীনতা সঞ্চারিত হয়ে যায়। ঐ একই অপরিবর্তনীয় কাহিনীর অর্থের একটা স্তর তৈরি হয়। এই মৌখিক কাহিনীর ধারা ইংরেজ আক্রমণের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পেরেছিল। এড়িয়ে থাকতে পেরেছিল। কলকাতার মতো নতুন শহরে আখড়াই, হাফ আখড়াই, কবি, খেমটা, খেউর-এর মতো কীর্তনের নানা ধরন তৈরি হয়েছিল। সঙ্গে বিভিন্ন কাহিনীর দৃশ্য-শ্রাব্য চেহারা দেওয়া হতো। সমকালীনের এ-ছিল কাহিনীগত প্রতিক্রিয়া। কিন্তু ইংরেজরা এইসব কাহিনীর আঙ্গিকের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। আমরাও তাই আমাদের পরিচয় ভুলে যেতে শুরু করলাম। গত শতকের মাঝামাঝি যখন ডিরোজিয়ানরা বাঙালি-ভারতীয় সংস্কৃতির দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেন, তখনই এই সমস্ত দেশি আঙ্গিক অব্যবহারে নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে।

লাতিন আমেরিকায়, আফ্রিকায়, একই ঘটনা ঘটেছে। উপনিবেশ বিস্তারের নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মনের উপনিবেশ প্রায় সর্বত্রই সমান। ভারতীয় উপনিবেশ, উপনিবেশ সত্ত্বেও ভারতই ছিল। কিন্তু হাজার হাজার বছরের সেই ভাষা-সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র, তত্ত্ববিদ্যা ইত্যাদির ওপর পাশ্চাত্যবিদ্যার আক্রমণ ঘটেছিল এমনই সর্বাত্মক যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভিতসুদ্ধ নড়ে গিয়েছিল। কবিরাজ আর তাঁর বিধান দেওয়ার জন্য আয়ুর্বেদের প্রাচীনগ্রন্থের চর্চা করতে পারতেন না। স্মার্ত আর তাঁর বিধান দিতে ন্যায়ের প্রাচীনশাস্ত্র ঘাঁটতে পারতেন না। স্মার্ত পণ্ডিতের কথা না হয় থাক। কারণ তিনি যে-সমাজকে বিধান দেবেন সেই সমাজটাই অত্যন্ত দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিল। কিন্তু আয়ুর্বেদ ? তার সঙ্গে তো আমাদের বাঁচামরার সম্পর্ক। দর্শনশাস্ত্র, সৌন্দর্যতত্ত্ব বা অন্যান্য তত্ত্বচিন্তা—সেগুলোর ইতিহাস তো হাজার-হাজার বছর ধরে ছড়ানো। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্রতাপ এমনই সর্বব্যাপক যে ঐ হাজার-হাজার বছর মাত্র গুটিকয়েক বছরের হিন্দু স্কুলি-বিদ্যার কাছে অবান্তর হয়ে যেতে পারে।

তবু ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের মতোই প্রকাণ্ড বলে আর চীন, চীনের মতোই দুপ্রবেশ্য বলে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাম্রাজ্যের লক্ষ হওয়া সত্ত্বেও ও আমাদের হাজার-হাজার বছরের ইতিহাসের ভিতর সাম্রাজ্যবাদের কার্যকারণ ঢুকে যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের ভাষাগুলি আমাদের ভাষাই থাকতে পেরেছে ও সেই ভাষায় যে-সাহিত্য লেখা হয়েছে, তা আমাদেরই ভাষায় সাহিত্য হয়েছে। সেখান থেকে এক নতুন আরম্ভ আমরা চিনে নিতে পারি।

আফ্রিকাতে হয়তো সবটা এ-রকম হয়নি। সেখানে ইয়োরোপিয়রা আফ্রিকার মানুষদের নিজস্ব উপজাতিত্ব আর ভাষা নিয়ে বনেজঙ্গলে থাকতে দিয়েছে, যখন দরকার তাদের শহরে এনে খাটিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাহাজবন্দী করে নিয়ে গেছে শুধু শ্রমিক

হিশেবে । ইয়োরোপিয়রা আফ্রিকানদের ভিতর থেকেই একটা 'এলিট' শ্রেণী তৈরি করে নিয়েছে । এই এলিটরা ইয়োরোপীয় ভাষা শিখেছে, সামাজিকতা আয়ত্ত করেছে, শিক্ষা পেয়েছে । বাকি আফ্রিকানদের কাছে এই এলিট আফ্রিকানই হয়ে গেছে লক্ষ, তাদের জীবনযাত্রাই হয়ে উঠেছে দেশের জীবনযাত্রা ।

ফলে, স্বাধীন আফ্রিকার দেশগুলিতে এই বিরোধটাই ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছে—আফ্রিকার ভাষা কি হবে ইয়োরোপিয় ভাষাই ? তার প্রধান লেখকরা—আচেবে, সোয়ইঙ্কা, অলুকো, ন্‌গুগি ওয়া থিয়োঙ্গো, লেগুমা—কি ইংরেজি ভাষাতেই লিখে যাবেন, যেমন লিখছেন । নাকি আফ্রিকার উপজাতীয় নিজস্ব ভাষা একটা সর্বজনীন রূপ পাবে—এখন না হলেও, কোনোকালে ?

একটা প্রতীকী ঘটনা মনে পড়ছে । ১৯৭০-এর মার্চে জেমস ন্‌গুগি নাইরোবিতে পূর্ব আফ্রিকার প্রেসবাইটেরিয়ান চার্চের পঞ্চম সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতা শুরু করেছিলেন, "আমি গির্জার লোক নই । আমি এমন-কি খ্রিস্টানও নই ।" তাঁর প্রায় নাস্তিক বক্তৃতার শেষে এক বুড়ো হলের পেছন থেকে লাঠি উঁচিয়ে প্রায় তাড়া করে আসেন । তিনি চিৎকার করে বলেন, "নিজের নামটা তো দিব্বি খ্রিস্টান রেখেছ, অথচ বক্তৃতা দিচ্ছ ধর্মের বিরুদ্ধে" । এর আগে কখনো ন্‌গুগি এই আত্মবৈপরীত্যের কথা ভাবেননি । ন্‌গুগি তাঁর প্রথম নাম 'জেমস' ছেড়ে দিলেন । তিনি নিজের নামটাকে আফ্রিকান করে নিলেন—'ন্‌গুগি ওয়া থিয়োঙ্গো' । নামটা বদলালেন ন্‌গুগি ; কিন্তু লিখতে তো হচ্ছে তাঁকে এখনো ইংরেজিতেই, আর, ইংরেজিতে লিখেই তো তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে আফ্রিকার সত্য—'দি রিভার বিটউইন', 'উইপ নট চাইল্ড', 'এ গ্রেইন অব হুইট' ।

ক্যারিবিয়ান বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ বিস্তার কোনো স্থানীয় অভ্যাস বা ভাষাকেই রক্ষা করতে দেয়নি । সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের আদি সমাজ আদি ভাষা কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে । এখন ইংরেজিই তাদের মাতৃভাষা ও পিতৃভাষা । কিন্তু তৎসত্ত্বেও তো তারা ইংরেজি ভাষী ইয়োরোপিয় আমেরিকার প্রধান ভূখণ্ডের অধিবাসী নয়। অন্যদিকে তারা বংশপরম্পরায় তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছ থেকে শিখেছে—আফ্রিকার সঙ্গে তাদের সম্পর্কটাই কলঙ্কের । স্বাধীনতার পর তাদের ঘৃণা আর সংলগ্নতার দ্বন্দ্বে নিজ বাসভূমে এক পরবাসীর জীবন কাটাতে হয় । অন্তত তাদের উপন্যাসে সেই পরবাসের কথাই তো বারবার ঘুরেফিরে আসে । নাইপল, ল্যাসিং, উইনটার, প্যাটারসন—এই সব লেখকই এক আফ্রিকান এশিয়ান অতীতের সন্ধানে যান, ইহুদি পুরাণের সঙ্গে তাঁদের উপন্যাসের গল্পের এত মিল ।

আজও ব্রাজিল, সুরিনাম ও ফ্রেঞ্চ গিনিতে পর্তুগিজ, ফ্রেঞ্চ ও স্পেনীশ বলা হয়, লেখা হয় । দেশের পর দেশে, মহাদেশের পর মহাদেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে মাতৃভাষা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে । সন্দেহ হয়, সে-মাতৃভাষার সাহিত্যিক পুনরুদ্ধার আর কখনোই সম্ভব নয় ।

কিন্তু এই সব দেশেই, আমাদের দেশেও আমাদের ভাষায় ও ঔপনিবেশিক প্রভুদের ভাষায় জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহিত্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিয়েছে । সাহিত্য, স্থানীয় ইতিহাস, ভূগোল ও জনজীবন কল্পনা করতে ও তাকে আকার দিতে সাহায্য করেছে । বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রেরণা সাহিত্য তো দিয়েইছে,

তা ছাড়া, উপনিবেশের প্রজার ভিতরে চিন্তার আলো জ্বালিয়ে তুলতে, তাকে আকার দিতে, সে-আগুনের উৎস হিসেবে সাহিত্য পরাক্রান্ত কাজ করেছে (এডোয়ার্ড ডবলু সয়ীদ-এর প্রবন্ধ 'রেস অ্যাণ্ড ক্লাস' কাগজের ৩২(১), ১৯৯০ সংখ্যায়)।

কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা বড় জটিল। কার্পেন্তিয়ার, আস্তুরিয়াস, হুয়ান রুলফো, মার্কোয়েজ, কোর্তাজার, ফুয়েন্তেস ও লাতিন আমেরিকার আরো অনেক লেখক ; ন্‌গুগি ওয়া থিয়োঙ্গো, ইমোস তুতুওলা, আচেবে, সোয়িংকা ও আফ্রিকার আরো অনেক লেখক তাঁদের নিজের দেশের ও ভাষার প্রাক্‌-কলোনি কাহিনীব ফর্ম আবিষ্কারের চেষ্টা করে গেছেন, যাচ্ছেন। তাঁরা নিগ্রো, ইণ্ডিয়ান, মেসতিসো ঐতিহ্যের কাছে গেছেন। লাতিন আমেরিকার কলোনি-উত্তর পর্বের প্রধানতম সাহিত্যিক পুরুষ কার্পেন্তিয়ার-এর একটি উপন্যাস আছে 'হারানো পথরেখা' নামে। যেমন এক সময় টমাস মানের টোনিও ক্রুগার ইয়োরোপিয় শিল্পীর আত্মিক সংকটের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, তেমনি কার্পেন্তিয়ারের 'হারানো পথরেখা' লাতিন আমেরিকার লেখকদের আত্মদ্বন্দ্বের এক প্রতীকী কাহিনী হয়ে উঠেছে। কার্পেন্তিয়ার তাঁদের নিজেদের বিষয় সন্ধানকেই তাঁর উপন্যাসের বিষয় করেছিলেন।

চলচ্চিত্রের এক বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক তাঁর পেশাগত কারণে অথচ সাঙ্গীতিক এক টানে গিয়ে পৌঁছুলেন ওরিনোকো অরণ্যের গভীরে। সেখানে তখনো এক উপজাতি আছে যারা প্রাক্‌-কলম্বাস পর্বের গান ও বাদ্য গায় ও বাজায়। এই লুপ্ত পথরেখা খুঁজে বের করা হলো। কিন্তু আধুনিক শিল্পী হিশেবে তো তাঁকে ফিরে আসতে হলো শহরে যেখানে তিনি সেই সঙ্গীতের সমঝদার শ্রোতা পাবেন। পথরেখা আবার হারিয়ে গেল। সঙ্গীত-পরিচালক আর ওরিনোকোতে ফিরে যেতে পারলেন না—বন্যা আর ধসে ওরিনোকো আবার সঙ্গীত-পরিচালকের কাছে লুপ্ত হয়ে গেল। কার্পেন্তিয়ার একটা কথা বলতে চেয়েছিলেন—যদি কোনো ঔপন্যাসিক কোনো কথা কখনোই বলতে চান—প্রাক্‌-কলোনি অতীতের সঙ্গে সংযোগ পুনরাবিষ্কার করতে হবে, এবং আবার হারাতে হবে। এই পুনরাবিষ্কারে কোনো মোহ বা অতীত মায়া নেই, এই পুনর্বিরহে কোনো নতুন বেদনা বা বিধুরতা নেই। আমাদের পক্ষে, এই দুটোই সমান সত্য—এই পুনরাবিষ্কার আর এই পুনর্বিরহ। পুনরাবিষ্কার ছাড়া আমরা আমাদের অস্তিত্বের শিকড় খুঁজে পাব না, চিরকাল মেট্রপলিটান সংস্কৃতির পরগাছা হয়ে থাকব। পুনর্বিরহ ছাড়া আমরা আমাদের অস্তিত্বের আধুনিক সঙ্গতি পাব না, চিরকাল আমাদের অতীত-বিলাসী হয়ে থাকতে হবে।

আরব জগতে "কলোনির মানুষের ভিতর থেকে ছড়িয়ে পড়া আলো" যে-সাহিত্য, তার গতি নানা আঁকাবাঁকা পথে এগিয়েছে। সেখানে নেগুইব মেহফৌজ, মোহম্মদ দরবেশ ও আরো কয়েকজন লেখক তাঁদের নিজেদের দেশেই নিষিদ্ধ। মেহফৌজকে যখন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো ইজিপ্টের সরকার বেশ অপ্রস্তুত হয়েছিলেন, কারণ ইজিপ্টে মেহফৌজ নিষিদ্ধ। প্যালেস্তাইন যুদ্ধের কর্তৃপক্ষের অন্যতম মোহম্মদ দরবেশ এতদিন নিশ্চয়ই বুড়ো হয়ে গেছেন। কিন্তু এই লেখকরাই ইসলাম-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নতুন আরবসত্য আবিষ্কার করছেন। আর সালমন রাশদির মতো অনারব লেখক প্রাক্‌-কলোনি আরব ভাঙিয়ে খাচ্ছেন। এ-কথা মনে রাখা দরকার যে রাশদি ইংরেজিতেই লেখেন ও ইংরেজি জানা দুনিয়া ইসলাম-বিরোধিতা থেকেই তাঁকে সমর্থন করেছে।

যাঁরা রাশদির সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছেন, তাঁরা কেউ কোনোদিন সেই সব আরব

লেখকদের সম্পর্কে কোনো কথা বলেননি যাঁদের আমেরিকার অনুগত ইজরায়েলে বা আমেরিকার বিরোধী লিবিয়া-ইরান-সিরিয়ায় খুন করা হয়েছে, আটকে রাখা হয়েছে, আক্রমণ করা হয়েছে। মেহফৌজ ও দরবেশ আরব বাস্তবতার ভূমিতে দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে রাশদিকে সমর্থন করেছেন ও রাশদির বিরোধিতা করেছেন। সেখানেই মেহফৌজ ও দরবেশের স্বাদেশিক ভিত্তির মহত্ত্ব।

অন্যান্য প্রাক্তন বা আধা-উপনিবেশে সাহিত্যে, বিশেষ করে উপন্যাসে, যে-ধরনের চিন্তাভাবনা কাজ করছে তার এই বর্ণনাতে আমরা নিজেকে কোথায় দাঁড় করাব, আমরা যারা ভারতবর্ষের একটি প্রাদেশিক ভাষায় গল্প-উপন্যাস লিখি কিন্তু সেই ভাষাভাষীর সংখ্যা সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে ষষ্ঠ।

আরব লেখকদের মতোই আমাদের স্বদেশ ও সমাজকে আমাদের মতো করেই বুঝে নিতে হবে—আমাদের স্বদেশের অখণ্ডতা ও সমাজের বহু বৈচিত্র্যকে। আর এই বুঝে নেওয়ার কাজটিই আমাদের এক অনুত্তরণীয় দ্বন্দ্বের মধ্যে ঠেলে দেয়। ইয়োরোপিয় উপন্যাসের মডেল আমাদের স্বাদেশিক অখণ্ডতাকে একটা ছাঁচে ফেললেও, সেই অখণ্ডতা সম্পর্কে একটা ধারণা দেয় আর আমাদের সামাজিক বহুবৈচিত্র্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণাও ধ্বংস করে। ইয়োরোপিয় সেই মডেল আমাদের সমাজের মানুষ ও সেই মানুষের জীবন বুঝে নেওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা যখন আমাদের আদিবাসী জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখি তখন সেও হয়ে দাঁড়ায় ইয়োরোপিয় মডেলের নৃতাত্ত্বিক উপন্যাস, সেও সাহেবরা এক রকম শিখিয়েছিল। ভারতের প্রধান মানবধারার অন্তর্গত হয়ে সেই আদিবাসী আসে না।

উপন্যাসের ফর্ম বা মডেল বলব কাকে? ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানকে যা উপন্যাসে পরিণত করে সেটাই তো ফর্ম। প্রায় তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছরের ওপর উপন্যাস লেখার নানা চেষ্টায় বারবার হয়তো এখানেই ঠেকে গেছি। ঠেকে যে গেছি তাও হয়তো সব সময় বুঝিনি, বুঝি না। এখন যখন নিজের অতীতটাকে একসঙ্গে দেখার মতো চড়াইয়ের দিকে চলছি আর যতই চোখের সামনে বাংলা উপন্যাসের সমতল বিস্তৃততর হচ্ছে, ততই অসহায় ও ক্ষমতাহীন ক্ষোভে বুঝতে পারছি—ইয়োরোপিয় মডেলে আমাদের পরিত্রাণ নেই। আমি আগেও বলেছি, কাহিনী বলার একটা নিজস্ব ধরন আমাদের ছিল পাঁচালি, কথকতা, কীর্তন আর কবিগানে। এই সব ধরন কী ছিল তা আন্দাজ করাও আজ কঠিন—অপরুচির উদাহরণ হিশেবে এই সব প্রকরণকে এমনই অবশেষহীন লোপাট করে দিয়েছে ইঙ্গনেসাঁসের আত্মগৌরব-পুষ্ট হিন্দু ও ব্রাহ্মণরা। রাজধানীর নেপথ্যে জনরুচি ক্লেদ আর আত্মরতির কামনায় এই ফর্মগুলিকে আবিষ্কার করেছিল—এই শিক্ষা এতদিন আমাদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন একবার উল্টো দিক থেকে ভাবা দরকার। নব্য রাজধানী কলকাতার দেশী নেপথ্যে এগুলো ছিল জনপ্রতিবাদেরই এক-একটি ধরন, প্রতিরোধহীন জনপ্রতিবাদের এক-একটি ধরন। এমনকি যাকে বলে সমাজের এলিট, তাঁদেরই আঙিনায়, ঠাকুদালানে এ-সব বলা হতো, গাওয়া হতো। তাঁরাই টাকা-পয়সা দিয়ে এই সব গানের দলকে বাঁচিয়ে রাখতেন। তাঁদের বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত এই সব কাহিনী শুনত। তারপর, সেই সম্ভোগের শেষে তাঁরা এই ফর্মগুলিকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিলেন। ততদিনে ইংরেজ আমাদের ছাপাখানা

দিয়েছে, বাংলা হরফে বাংলা গল্প আমরা পড়তে শিখেছি ।

কিন্তু আমার তাত্ত্বিক জ্ঞান এই পর্যন্তই । অথবা ইতিহাসের কিছু তথ্যকে একটু উল্টোপাল্টা করে নিয়ে আমি যদি কোনো তত্ত্ব বানিয়ে তোলার চেষ্টা করি, তাও এইখানেই শেষ । এর বেশি আমি কিছু জানি না । জানার উপায় নেই । আমি চাইলেও তো এখন আর মঙ্গলকাব্য লিখতে পারব না, কথকতা লিখতে পারব না । মঙ্গলকাব্য আর কথকতার সঙ্গে আধুনিকতার সব সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে । কার্পেন্তিয়ারের উপন্যাসের আদিবাসীরা জীবনের সঙ্গে আর তাদের বাসভূমির সঙ্গে যে সংরাগে বাঁধা ছিল, শেষ-আঠারো শতকে বা আদি উনিশ শতকের কলোনির শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি সে সংরাগে তার বাসভূমির সঙ্গে বাঁধা ছিল না । প্রথম থেকেই তো সে নিজ বাসভূমে পরবাসী, প্রথম থেকেই তার ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ । সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে সেই পরাশ্রয়ী অস্তিত্বের লোভ এত প্রবল আর ক্ষমতা এত কম যে লোকশিল্পকেও সেই শহুরে জীবন গ্রাস করে নিয়েছে । কিন্তু ভারতবর্ষের মতো দেশে লোকজীবনও এত বিচিত্র, জটিল ও বিস্তৃত যে সাম্রাজ্যবাদের আশ্রিত মধ্যবিত্তও তা শেষ করে দিতে পারেনি । এই সেদিনও তো মীরা মুখোপাধ্যায় মধ্যপ্রদেশের বস্তার থেকে ডোকবা শিল্পকে উদ্ধার করে আনলেন এক নতুন ভাস্কর্যের প্রধান ভিত হিশেবে ।

আমার কোনো সিদ্ধান্ত নেই । আমি শুধু একজন ঔপন্যাসিকের শিল্প সঙ্কটের কথা ভাবছি—এমন কোনো ঔপন্যাসিক যে আজ বা আগামীকাল উপন্যাসের এমন এক ভাষার অধিকার চাইতে পারে যে ভাষায় তার কথা সত্য মনে হবে, বানানো মনে হবে না । আমি এমন একজন ঔপন্যাসিকের শিল্পসঙ্কটের কথা ভাবছি যে আজ বা আগামীকাল চাইতে পারে সে যে-বাক্যটি রচনা করবে আর সেই বাক্যের ভিতরে যে অর্থটি ভরে দিতে চাইবে তার মাঝখানে একমাত্র সংযোজক হিশেবে সেই থাকবে, লেখক হিশেবে, কথক হিশেবে ; সে কোনো কলোনির প্রজা হিশেবে কলোনির কোনো শিক্ষা তার বাক্যের ভিতরে ভরে দেবে না । আমি এমন একজন ঔপন্যাসিকের কথা ভাবছি যে আজ বা আগামীকাল চাইতে পারে—সে স্বাধীন, তার লেখা স্বাধীন ও সেই লেখায় নিহিত অর্থও স্বাধীন ।

কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৯৮ । দ্বাদশ বর্ষ । তৃতীয় সংখ্যা

শাঁওলি মিত্র

নাট্যশিল্পের উজ্জীবন ও কথকতার ঐতিহ্য : একটি চিঠি

শ্রীশিবনারায়ণ রায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি থিয়েটার নিয়ে একটা ভালো লেখা লিখতে বলেছিলেন অনেকদিন আগেই, লোকনাট্য নিয়ে আমার গবেষণামূলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে । কথকতার বিভিন্ন ধারা দেখার অভিজ্ঞতা এবং তা থেকে বর্তমান থিয়েটারের কাজে আমার ভাবনার প্রকাশ —এইটিই বোধহয় মূল কথা । কথাটা ভারী, আর আমার ক্ষমতা কম । বুঝতে পারছিলাম না বলার কথাটা ঠিকমতো বলে উঠতে পারব কি না । আজ ভাবছি চেষ্টা করি—কারণ আপনার কথা অনুযায়ী—জলে না ডুবলে সাঁতার কাটা যায় না ।

যে-কথাটা বলব ভেবেছি তা বলতে গেলে বোধহয় আমাদের আজকের থিয়েটারের প্রেক্ষাপটটা একটু ভেবে নিতে হবে । বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস যা পাওয়া যায় তাতে সাধারণভাবে তো এইরকম মনে করা হয়ে থাকে যে এক বিদেশী ভদ্রলোকের শুভ প্রচেষ্টায় এই কলকাতায় প্রথম বাংলা নাটকাভিনয় হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ! কিন্তু এই প্রচেষ্টায় সহযোগী ছিলেন একজন বাঙালি । আর এই সম্পর্কে যেটুকু খোঁজখবর পাওয়া যায় তাতে আশ্চর্য হতে হয় যে এ যদি সম্পূর্ণ বিদেশী প্রচেষ্টা তবে ঐ বাঙালি ভদ্রলোকটির মাথায় এত পরিকল্পনা খেলা করল কী করে ? তাইতেই আন্দাজ হয় যে এ দেশে এই জাতীয় মাধ্যমে নিজেকে মেলে ধরবার প্রয়াস ছিলই, পুরোটাই বিদেশ থেকে আমদানি করা নয় । এর পর ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যখন নাটক লেখা এবং নাটকাভিনয়ের চল বাড়ল তখন যেসব নাটক বিখ্যাত হয়েছিল তার মধ্যে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' আছে, 'নীলদর্পণ' আছে, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' আছে — যেগুলো তৎকালীন বাঙালি সমাজের সমস্যা নিয়ে লেখা । বুঝতে পারি নাট্যকাররা কী পরিমাণ দায়বোধ করতেন সমাজ সম্পর্কে । এই এক একটা নাটকের নামেই আমাদের মনে পড়ে যায় না কি অনেক ইতিহাস ? অনেক গল্প ?

আবার ক্রমে এমন মহৎ নাট্যকারও আমরা পেয়েছি যাঁর নাটকে পরিস্ফুট হয় মানবিক সমস্যা । যিনি অক্লেশে বলতে পারেন 'মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের।' আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলাম নাট্যকার হিশেবে । তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা দিয়ে তিনি এমন সব নাটকের জন্ম দিয়েছেন আজকের পরিপ্রেক্ষিতেও যেগুলো প্রকৃত অর্থে অত্যন্ত আধুনিক । রবীন্দ্রনাথ নিবিড়ভাবে চেষ্টা করেছিলেন নাট্যশিল্পে এক ভারতীয় অনুভবের সঞ্চার ঘটাতে । কেবল আঙ্গিকের ক্ষেত্রেই নয়—বোধ এবং মননের ক্ষেত্রেও । 'রক্তকরবী', 'রাজা', 'ডাকঘর' এগুলো পড়লেই মনে হয় যে নাটকগুলো ভিন্ন জাতের । রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার ছিল সাধারণ থিয়েটার থেকে ভিন্ন, অন্য এক স্রোত, অন্য থিয়েটার ।

এইরকম অন্য থিয়েটার আবারও সাধারণ থিয়েটারের পাশাপাশি চলেছে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে। 'নবান্ন' তখন তুলনাবিহীন নজির সৃষ্টি করেছিল। তারপর সেই ধারার প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়নি। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অনেক সফল প্রচেষ্টা হয়েছিল যা ব্যাপকভাবে সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম। সেইমতো অনেক দর্শক তৈরি হয়ে উঠেছিলেন যাঁরা এই নাট্যকর্মের মধ্যে মননশীলতা খুঁজে পেতেন। এই শিল্প একাধারে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের এবং আগত দর্শকের চিন্তার মান উন্নত করত। আর এই কাজের অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে চলেছিল আমার সামনে—কিন্তু তখন আমার বোধের বাইরে। যখন আমি কোলে, যখন আমি সবে দাঁড়াতে শিখছি, তারপর স্কুলে যাচ্ছি—ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ সেই আবছা অনুভবগুলোও কিন্তু অর্থ বহন করে আমার কাছে ; কার আশীর্বাদে জানি না তাদের সবটাই বৃথা হয়ে যায়নি।

এখন আবার বেশ কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে অবস্থাটা একটা জায়গায় আটকে গেছে। কোনো জায়গায় একভাবে আটকে থাকলে সেটা তো ক্রমশ নীচের দিকেই টেনে নিয়ে যায়। তাই এখন একটা শিকড় খুঁজে পাবার চেষ্টা করা খুব প্রয়োজন।

আমরা জানি আমাদের দেশের যে গ্রামীণ সভ্যতা ও তার মধ্যে যে সংস্কৃতি লুকিয়ে আছে তা তার আপন জোরেই অত্যন্ত অভিজাত। ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই এই ধরনের মূল্যবান মণিমুক্তা ছড়িয়ে আছে। এই কথা মনে করে এই সমস্ত ক্ষেত্রে শিকড় খোঁজার ইচ্ছে হয়েছিল। মনে হয়েছিল থিয়েটারের কাজ করতে গেলে হয়তো এরই মধ্যে আমি আমার নিজের কাঠামো তৈরি করবার রসদ খুঁজে পাব। আমি যে আবহাওয়ায় বড় হয়েছি তা তো পুরোপুরি নাট্যের আবহাওয়া—আর সেই আবহাওয়ায় সব সময়ই চলত এক নিজস্বতার অন্বেষণ তা থিয়েটারের ক্ষেত্রেও বটে, জীবনধারণের ক্ষেত্রেও বটে। জানি না সেইটাই আমার এই অনুসন্ধিৎসার উৎস কি না।

ভাবনাগুলো তো অন্তরের মধ্যে বাসা বাঁধেই। কোনো কারণে নাড়া পড়লে সেই নানারকমের ভাবনা চোখের সামনে খেলা করে ওঠে। তারপর চিন্তার একটা সুস্পষ্ট ধারা তৈরি হয়, ক্রমে ক্রমে। সেইরকমভাবে আমার ভাবনাগুলোও একটা স্পষ্ট রূপ নিল। ভাবনাগুলো এইরকম :

আমরা সংস্কৃতির যে-ধারাগুলো দেখতে অভ্যস্ত তার মধ্যে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত আছে, ওডিশি, ভরতনাট্যম্‌, কত্থক ইত্যাদি ধারার নাচ আছে, অনেক ধরনের বাদ্যযন্ত্র আছে। এগুলোর সুর, ভঙ্গি, ছন্দ দর্শকদের ওপরে মোহবিস্তার করে। কথার প্রয়োজন এখানে তত তীব্র নয়। কথা না থাকলেও অনেক সময়ই কোনো উচ্চপর্যায়ের নৃত্যানুষ্ঠান দেখতে দেখতে আমরা বুঝতে পারি এই অনুষ্ঠান কী কাহিনী বর্ণনা করছে। আবার কবিতা আবৃত্তিও আমাদের অত্যন্ত প্রিয়—মানুষ ভালোবাসে আবৃত্তি শুনতে—এই আবৃত্তি সম্পূর্ণই কথার শব্দনির্ভর। এই সমস্ত শিল্পের আলাদা আলাদা অনুভবগুলো অনেক সময় মিলিত হতে দেখি সার্থক নাট্যসৃষ্টিতে। মঞ্চের পাত্রপাত্রী উঠে দাঁড়িয়ে চলে বসে এক চলমান ছবি তৈরি করেন প্রতি মুহূর্তে। সেটাও ঐ শিল্পসৃষ্টির একটা অঙ্গ। উচ্চপর্যায়ের নাট্যসৃষ্টিতে আমরা দেখেছি এই সমস্ত অনুভবগুলো অতি সূক্ষ্মভাবে আমদের চেতনাকে নাড়া দেয়। এই নাড়া খাওয়ার জন্যেই তো থিয়েটারকে ভালোবাসা! 'রক্তকরবী' নাটকের শম্ভু মিত্র-কৃত প্রযোজনায় পর্দা উঠলেই দেখা যেত মঞ্চের বাঁদিকে, যাকে বলে এ্যাকটরস্‌

লেফট-এ, শ্বেতপাথরের চাতালের ওপরে ধানী কাপড় পরা একটি মেয়ে বসে কুঁদফুলের মালা গাঁথছে—আর দূরে লোহালক্কড় দিয়ে এক অদ্ভুত সঙ্গীতের সৃষ্টি হতো সেই সময়—সেই আওয়াজ ছাপিয়ে কিশোরকণ্ঠ ডেকে উঠত 'নন্দিনী-ই ই !' আওয়াজে রঙে সঙ্গীতে সে এক কাব্যময় শুরু। পুরো মঞ্চটায় নানান স্তরের ব্যবহারে, রঙের ব্যবহারে, পাত্রপাত্রীর চলা বসায় সব সময়ই যেন ছবি তৈরি হচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে, নতুন তৈরি হয়ে উঠছে। তারই সঙ্গে ধ্বনির ব্যবহার। ধ্বনি মানে বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের বিভিন্ন আওয়াজই কানে অর্থময় শব্দের কাঠামো তৈরি ক'রে এক ব্যঞ্জনা এনে দেয়। এক্ষুণি 'রক্তকরবী'র উদাহরণ মনে পড়ল। কিন্তু এরকম আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। পাঠকদের মধ্যে যাঁরা নাট্যদর্শক তাঁদের আপনিই মনে পড়বে।

'৮২ সালে যখন নিজে নাটক করব বলে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করলাম, কী করলে ভালো হয় ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছিল আমাদের দেশের পুরোনো গ্রামীণ নাট্যধারা—কথকতার কথা। বীজটা বপন করে দিয়েছিলেন বাবা। বাবাই কথা প্রসঙ্গে একদিন কথকতার কথা বলছিলেন—কথকতার ধরন করে করে দেখাচ্ছিলেন। এই আলোচনা থেকেই মনে হলো আধুনিক থিয়েটারে এই নাট্যধারার ব্যবহার অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে। সেই থেকেই শুরু হলো পরীক্ষানিরীক্ষা। মনে হলো এই বর্ণনামূলক ভঙ্গিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশ করা যায়। আরও মনে হলো এতে গান এবং নাচের খুব বড় ভূমিকা থাকবে। এই ক্ষেত্রে তা অপ্রাসঙ্গিক না হয়ে দর্শকের কাছে পৌঁছনোর সুবিধা করে দেবে। এই থেকে আমার একটা কথা মনে হয়—বোধহয় কথাটা সম্পূর্ণ ভুল নয়—মনে হয় আমাদের ভেতরেই বোধহয় আমাদের শিকড়ের কাজ কোথাও চলে। নইলে এই শহরে-মানুষ-হওয়া আমার কল্পনায়, যে কখনো এসব দেখেনি, পুরো ব্যাপারটা এত অর্থবহ, এত দামী হয় উঠল কেন ? —এই কল্পনা থেকেই 'নাথবতী অনাথবৎ' তৈরি হলো এবং '৮৩-র মাঝামাঝি মঞ্চস্থ হলো।

এরপর ফোর্ড ফাউণ্ডেশন-এর একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি কিছু বর্ণনাত্মক লোকনাট্যধারা দেখবার জন্যে ভারতবর্ষের কয়েকটি অঞ্চলে যাবার সুযোগ পেলাম—'৮৫-তে। প্রথমে বিহারে গেলাম, তেমন কিছু পাওয়া গেল না। মহারাষ্ট্রে গিয়ে সেই প্রথম এইরকম ধারাব অনেক ধরন দেখতে পেলাম। বোম্বাই থেকে বহু দূরে পরবনী একটি জেলাশহর ! সেখানে প্রথমেই আটানব্বুই বছরের বৃদ্ধ রাজারাম ভট্ট কদমের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি 'গোন্দেল' শিল্পী। 'গোন্দেল' একটি বহু পুরোনো লোকনাট্য, যাকে রিচ্যুয়াল ড্রামা বলা যায় সেইরকম। দেবী অম্বার পূজার পর এই নাট্য অভিনীত হয়। এরও আবার দুরকম ভাগ আছে। অত খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে বলি এই লোকনাট্য আমি যা খুঁজছিলাম তাই-ই—কথানির্ভর। এর মধ্যে নাচ আছ, গান আছে, কিন্তু প্রধান অবলম্বন 'কথা'। রাজারামজির বাড়ির উঠোনে আমি আরও কয়েকরকমের নাট্যধারা দেখলাম দুদিন ধরে। তার কোনোটা হয়তো শুধুই গান-নাচ নির্ভর। বৃদ্ধ তখন নাক কুঁচকে আমাকে বলতেন, 'বেটি এইরকম গান তো হতেই পারে। আসল মজা হলো —'কথা'—'কথা'।' এই সময় 'কথা' শব্দটা উনি এত দরদ দিয়ে উচ্চারণ করতেন !

আমি পৌঁছবার পরের দিন রাত ১০টা থেকে রাজারামজি আমাকে দুটি পালা করে দেখালেন, দু ঘণ্টা ধরে—নেচে, গেয়ে অভিনয় করে। এঁর সঙ্গে একটা জুড়ির

দল থাকে। তারা সঙ্গে গান করে, বাজনা বাজায়, কোনো কোনো সময়ে প্রয়োজন হলে এগিয়ে এসে কোনো একটি চরিত্রে অভিনয় ক'রে আবার পিছিয়ে পূর্ব-ভূমিকায় চলে যায়—জুড়ির দলে। চার পাঁচরকমের যন্ত্র বাজে সঙ্গে। সে সমস্ত যন্ত্রগুলো বাজাতে জানতে হয় গোন্দেল শিল্পীকে, ছোট্টবেলা থেকে তাদের শিখতে হয় এই শিল্প। রাজারামজি এখন শেখাচ্ছেন তাঁর নাতির ছেলেকে। পুরো পরিবারের আশা এই নামদেও একদিন রাজাবামজির মতোই গুণীর সম্মান অর্জন করবে। রাজারামজির ছেলে, নাতি, সবাই ওঁর সঙ্গে জুড়ির দলে থাকে কিন্তু কেউই ওঁর পর্যায়ের শিল্পী নয়।

এই জুড়ির ব্যাপারটা ভাবলে আমার মজা লাগে—আমি অন্যত্রও দেখেছি কথাকারের সঙ্গে ছোটো হোক বড় হোক এক জুড়ির দল থাকেই। তাই ভাবলে আমার ভীষণ আশ্চর্য লাগে যে গোড়াতেই আমার সঙ্গে একটা জুড়ির দল থাকবে এইরকম একটা কল্পনা হয়েছিল—এই কথাটা একেবারে অজানা থাকা সত্ত্বেও। কী করে ? কেন ঐ জুড়ির দলের কল্পনাটা আমি করেছিলাম ? জানি না এইসব জন্যেই মনে হচ্ছিল শিকড় কোথাও কাজ করে।

যাই হোক, রাজারামজির কথায় ফিরি। পালা অভিনয়ের সময়ে তাঁর পরণে থাকে ষাট-মিটার কাপড়ে তৈরি এক পোষাক—গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা পুরো হাতা একটা আলখাল্লা মতন জামা। কোরা কাপড়ের। গলায় অনেকগুলো কড়ির মালা, মাথায় লাল পাগড়ি, কপালে তিলক, একটা ফাগরঙা শাল, পায়ে ঘুঙুর। নাচ গান কথা এবং অভিনয়ে এই বৃদ্ধ এই বয়সেও অত্যন্ত সজীব—আমাদের কাছে এক বিস্ময়। কিন্তু তাঁর বলা কাহিনী শুনলে আমাদের মন ঠোক্কর খায়। কীরকম বলব ? তাঁর প্রথম পালা 'রাধা বিলাস'। বক্তব্য : কৃষ্ণের শৈশবেই যুবতী রাধা তার প্রেমে পড়েছিল। তাকে কোলে নিয়ে রাধা আদর করত। (এই সময়ে রাজারামজি ফাগরঙা শালটি দিয়ে ঘোমটা দেন আর বিরাট একজোড়া সাদা গোঁফ নিয়েও রাধা হয়ে যান আর তার সঙ্গে আলখাল্লার কুঁচির খানিকটা তুলে অদ্ভুত কায়দায় পাকিয়ে শালের অপর অংশ দিয়ে ঢেকে সেটাকে শিশু কৃষ্ণ তৈরি করেন—সেটা কোলে দুলিয়ে নাচেন)। তারপর কৃষ্ণ যুবক হলো (রাজারামজি বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিলেন)—তখন রাধা প্রায় জোর করে নিয়ে গেল তাকে নিজের ঘরে এবং শিকল তুলে দিলে। কিন্তু ঠিক সেইসময়ে রাধার স্বামী এসে পড়ল। কৃষ্ণ তো আগে গোরাই ছিল—রাধার এই পাপে কৃষ্ণ লজ্জায় কালো হয়ে গেল।

ঠিক তেমনি তাঁর দ্বিতীয় পালা 'জাম্বুলাখ্যান'। এটি দ্রৌপদী-সম্পর্কিত কাহিনী। তাতে বলা হয় দ্রৌপদী কর্ণকে ভালোবেসেছিল পঞ্চস্বামী থাকা সত্ত্বেও—এতই অসতী সে। অথচ এই কাহিনী মহাভারতে নেই। এই লোককাহিনীর সত্যতার প্রতিবাদ করেছেন মহারাষ্ট্রেরই বিদুষী ইরাবতী কার্ভে যথেষ্ট যুক্তি দিয়ে। অথচ রাজারামজির নাচ গান অভিনয় দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হারিয়ে গেলেও আফশোশ হবে না।

ওখানে 'বাসুদেও', 'বরাট', 'ডাকা' প্রভৃতি আরো অনেক ধারা দেখেছিলাম। আর দেখেছিলাম 'বৈঠকি চিলাওনি' এক বিশেষ পল্লীতে গিয়ে। দুবার সেই পল্লীতে আমি গিয়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা আমার এক অমূল্য সম্পদ। এইসব লোকেব সঙ্গে, সমস্ত ধারাব শিল্পীদের সঙ্গে আমাব যে বন্ধুত্ব হয়েছিল, ভালোবাসা হয়েছিল তা আমার কাছে উজ্জ্বল করে এখনো। কিন্তু নাঃ এখন তো আমি শক্ত কথা লিখছি।

এরপর আসি মধ্যপ্রদেশের কথায় । প্রথমে ভোপাল গেলাম । সেখানে কলা পরিষদে ভিডিও টেপ-এ ধরা অনেক নাট্যধারা দেখলাম । সেখান থেকে উজ্জয়িনী । সেখানে মাচ্ছ বলে একটা চার পাঁচশো বছরের প্রাচীন ধারা দেখলাম । তারপর গেলাম রায়পুর হয়ে তিজনবাঈ-এর গ্রামে, গনেয়ারীতে । তিজনবাঈ পাণ্ডোয়ানি করেন অর্থাৎ পাণ্ডবদের গল্প বলেন—কথায়, নাচে, গানে । সঙ্গে সেই জুড়ির দল । চৈত্রশেষের এক দুপুরে পৌঁছলাম তাঁর বাড়ি । সেই মাটির বাড়ির মাটির উঠোনে তিজনবাঈ তাঁর পালা শোনালেন কিছুক্ষণ। আমি দ্রৌপদীকে নিয়ে পালা করেছি শুনে তিনি পাশাখেলার অংশ করে দেখালেন । আর তাঁর হাতের তম্বুরাকে বাজিয়ে এবং নানানভাবে ব্যবহার করে পরতের পর পরতে ছবি তৈরি করতে লাগলেন । কিন্তু তাঁর পালায় তিনি বললেন দুর্যোধনের দ্রৌপদীকে অপমান করবার বাড়াবাড়িতে ধৃতরাষ্ট্র নাকি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন—ত্যাজ্য করতে চেয়েছিলেন । এটা ঠিক মহাভারতে নেই । তিজনবাঈকে আমি পরেও অনেকবার অভিনয় করতে দেখেছি । আর দেখেছি ঝাড়ুরামকে আর পুনারামকে । এঁরাও পাণ্ডোয়ানির শিল্পী । এঁরা দুজনেই সঙ্গে কাঠকরতাল বাজান—এক হাতে তম্বুরা তো থাকবেই । এঁরা কিন্তু কখনো উঠে দাঁড়ান না নাচেন না—বড়জোর হাঁটুতে ভর দিয়ে অর্ধোত্থিত হন । আর সামান্য ভঙ্গি, সামান্য অভিব্যক্তি দিয়ে অসামান্য গভীর ছবি তৈরি করেন । যেমন পুনারাম দেখান—অভিমন্যুকে চক্রব্যূহ ভেদ করার জন্যে বিদায় দিচ্ছেন সুভদ্রা ও উত্তরা । দুজনে আরতি করছেন । সুভদ্রা হয়ে পুনারাম একবারও সামনের কল্পিত অভিমন্যুর মুখ থেকে চোখ সরান না । চোখদুটো যেন যতটা পারে পুত্রকে দেখে নিচ্ছে । আর উত্তরা হয়ে তিনি চোখ তুলে তাকাতে পারেন না অভিমন্যুর দিকে, আর অন্যদিকে তাকিয়ে আরতি করতে গিয়ে প্রদীপ পড়ে নিভে যায় । আমরাও অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠি ।

মধ্যপ্রদেশে আরো অনেকগুলি ধারা দেখেছি । সেসবের বর্ণনা থাক । কেবল রামকিস্‌সার কথাটি না বলে পারছি না । দেখেছিলাম বিলাসপুরে । দুজন শিল্পী রামায়ণের কাহিনী বলেন । এর মধ্যে জওহর বাঘেল প্রধান এবং অসাধারণ শিল্পী, ইনি আবার চমৎকার বাঁশী বাজান অন্যত্র প্রয়োজন পড়লে । এঁর সহকারী লক্ষ্মণ খাণ্ডে । পিছনে বেশ বড় জুড়ির দল । এই দুজন শিল্পী যে কীভাবে নিজেদের শরীরকে ব্যবহার করেন সে না দেখলে বিশ্বাস করবার নয় । যা ইচ্ছে করেন নিজেদের গলা এবং শরীর নিয়ে । দেখবার সময়ে একটু শিথিল হলেই কোনো এক অসাধারণ মুহূর্ত হারিয়ে যাবে এমনি ব্যাপার । কাহিনী বোনার ঢংটাও ভারী সুন্দর । দুজনেই কথাকার আবার দুজনেই দুটি চরিত্র । যখন যেমন ইচ্ছে ।

অন্ধ্রতেও গিয়েছিলাম । ওখানে হরিকথা, বুড়াকথা এই দুই বর্ণনামূলক নাট্যধারা দেখেছি ।

এইরকম কাজ কীরকম যেন নেশা ধরিয়ে দেয় । যতদূরই এগোই মনে হয় এগোবার রাস্তা আরো অনেক অনেক দূর গেছে ।

এইরকম নানান নাট্যধারা দেখে আমার মনে হয়েছে দর্শকের কাছে একজন কথকের সরাসরি উপস্থাপনা খুব তাড়াতাড়ি কাহিনীর ও তার বক্তব্যের সঙ্গে দর্শকের সেতুবন্ধন করে দেয় । এদের মধ্যে যে গান নাচ সম্পৃক্ত হয়ে আছে তা আমাদের আধুনিক

দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যবহার করলে অনেক গভীরতা এনে দিতে পারে । সুর এমন একটি বস্তু যা দিয়ে মানুষের অত্যন্ত গভীর বোধকে নাড়া দেওয়া সম্ভব । আর নৃত্য বা ভঙ্গি—তারও এমন একটা আলাদা ছন্দ আছে যা কেবল চোখের ভালোলাগা ছাড়াও মানুষকে আরো কিছু দেয় । যেমন আমি যদি কোনো নারীর রূপবর্ণনার সময় মুখে শুধু বলি—"সুকেশিনী '—আর নাচের মুদ্রায় সেই কেশের বর্ণনা করি—তার দৈর্ঘ্য, তার ঘনত্ব—তাতে অভিনয় এমন একটা মাত্রা পায়, দর্শকের কল্পনাকে এমন এক জায়গায় পৌঁছে দেয় যা হয়তো অন্য পদ্ধতিতে অত সহজে হতো না । তার ওপরে আছে 'কথা'—বর্ণনা এবং সংলাপ । এখানে কিছুটা বলা আর অনেকটা দর্শকের কল্পনার ওপর ছেড়ে দেওয়া । তখন একটা ফাঁকা মঞ্চ—এক নিমেষে হয়ে উঠতে পারে ঘন জঙ্গল, পরমুহূর্তে সেখানে তৈরি হতে পারে সুসজ্জিত প্রাসাদ । এক রূপবতী তরুণী হয়ে উঠতেও অসুবিধা নেই, অসুবিধা নেই হয়ে উঠতে এক ভয়ঙ্কর যোদ্ধা ।

সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে আমার কাছে সেটা হলো—আমরা এই সব দেশজ ধারা মাথায় রেখে এমন কিছু পাণ্ডুলিপি রচনা করতে পারি যা সমাজের অনেক গূঢ় কথা গভীর কথা প্রকাশ করে দেবে অতি সহজে । এইসব নাট্যধারাগুলো এখনো যেসব কথা বলে সেই বলা কথাটির সঙ্গে আমাদের এই একবিংশ শতাব্দীতে পা-দিতে-যাওয়া সমাজের কথার সঙ্গে বিশেষ যোগ নেই । আমাদের এই আধুনিক সমাজের যা সমস্যা, যা জটিলতা তার সঙ্গে এই প্রাচীন লোকনাট্যধারার বক্তব্যের কোনো সম্বন্ধ নেই । বরং আমরা যেসব জিনিস এখন আর সংগত মনে করি না, এমনকি অন্যায় মনে করি, অনেক সময়ই সেইসব ব্যাপারকে যুক্তিসংগত বলে প্রকাশ করা হয়।

আমরা যদি নাট্যশিল্পের কর্মী হই আমাদের তো সমাজের সম্পর্কে একটা দায় থাকবে। থিয়েটার কেবল বিনোদনের জন্যে একথা তো আমরা মনে করি না । তাই আমরা আমাদের ভারতবর্ষকে জানব, তার সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে উপলব্ধি কবব, আর তাকে অবলম্বন করেই আমরা আমাদের জীবনের জটিলতাকে প্রকাশ করতে দায়বোধ করব, পুরোনো সংস্কারগুলোকে মুছে, তার সঙ্কীর্ণতাগুলোকে ভেঙে—এইটাই আমার এখনকার ভাবনা ।

আমি জানি না আপনি যা চেয়েছিলেন আমার লেখার মাধ্যমে তা আমি আমার দুর্বল কলমে প্রকাশ করতে পারলাম কি না । অনেকটা ভাবনার ফসল আমার এইটুকুই ।

প্রণাম নেবেন ।

জুলাই ১৯৮৬

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯০ । সপ্তম বর্ষ । দ্বিতীয় সংখ্যা

সেলিম আলদীন

কিত্তনখোলা ও ঢাকা থিয়েটার

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু
শিবনারায়ণ রায়,

সালাম নেবেন। আমাদেব কাশেমের কাছে লেখা আপনার চিঠিটি পড়েছি। পড়ে ঘাবড়ে গেছি একদম। এমনিতে প্রবন্ধাদি আমি সহজে লিখি না। তদুপরি আপনি আমাদেব ঢাকা থিয়েটারের নাটক কিত্তনখোলা'র গঠন, প্রযোজনার বৈশিষ্ট্য, আখ্যানের সংক্ষিপ্তসার ও নাটক লিখিয়ে হিসেবে আমার উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিষয়ে আমাকেই লিখতে বলেছেন। ভয় পাচ্ছি যদি আত্মতৃপ্তির নিশ্বাসে বাক্যবন্ধগুলি কেঁপে উঠে! কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের শপথ নিষ্পত্তির বিধানে দেখি আত্মহত্যা ও আত্মশ্লাঘা সমার্থক। তাই প্রবন্ধাকারে নয় আপনার কাছে লেখা এই চিঠিতে আপনার নির্দেশিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কখনো আলাদা কখনো বা মিশ্রিতভাবে আমার বক্তব্য আমি তুলে ধরব। যেসব বিষয়ে আমার ক্রোধ আছে, আশা আছে, বাস্তব ক্ষেত্রে নাটকের যেসব কর্ম ও চিন্তায় আমার প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে সেসব বিষয় সম্পর্কে আমি নির্ভয়ে বলব।

প্রথমে অবশ্য মনে মনে আমি উল্লিখিত বিষয়গুলিকে আমার নাটক সম্পর্কিত ভাবনার মর্মে লীন করে দিয়েছিলাম—ইচ্ছে ছিল 'উৎস-মঙ্গল' এই নামে একটি বৃহৎ প্রবন্ধ দাঁড় করিয়ে ফেলি। পরে ভাবলাম সর্বতোভাবে যাঁর দার্শনিক রচনা সম্পর্কে আমার আকৈশোর আগ্রহ তাঁর নির্দেশের মধ্যে আমার জন্য নিশ্চয়ই কোনো মঙ্গল রয়েছে। কাজেই আমাব সাধ্যমতো তাঁর ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা করা উচিত।

আমি ১৯৭৮ সাল থেকে 'কিত্তনখোলা' লেখা শুরু করি। নাটকটি সমাপিত হয় ১৯৮০ সালের মধ্যভাগে। এ নাটকের গঠন পদ্ধতিতে আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পূজা-উৎসব-কেন্দ্রিক অলিখিত বাংলা নাটকের সম্ভাব্য নির্মাণরীতিকে ব্যবহার করতে চেয়েছি। এক্ষেত্রে ইউরোপিয় নাটকের প্রচলিত আঙ্গিকের মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়েছে আমাদের। নিজস্ব রীতি তৈরিতে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পাঁচালী ইত্যাদি ছিল আমাদের আশ্রয়।

এ প্রসঙ্গে বিনীতভাবে আপনাকে জানাতে চাই যে, গ্রাম-গ্রামান্তরের শ্রমজীবী নাট্য-কর্মীরাও আজ জানে যে বাংলাদেশের মানুষদের কথা, তাদের জীবনের বহুমুখী অভি-ব্যক্তির চিত্র ঢাকা থিয়েটার জাতীয় রীতিতেই বলতে চায়। ইতোমধ্যে মফস্বল ও গ্রাম অঞ্চলে ইউরোপিয় রীতির অক্ষম অনুকরণ-প্রসূত মঞ্চগুলোকে আমাদের সৃষ্ট সংগঠন-সমূহ প্রায় অকেজো করে দিয়েছে। যে আঙ্গিকের জন্য আমরা পরিশ্রম করেছি তার খবর ঢাকা থিয়েটার পৌঁছে দিচ্ছে মেলায়, গ্রামেগঞ্জে। এযাবৎ ঢাকা থিয়েটার-সৃষ্ট শতাধিক গ্রাম থিয়েটারের শত শত কর্মী ও হাজার হাজার দর্শক আমাদের জাতীয় নাট্য

আঙ্গিকের ধ্যানধারণার সঙ্গে ক্রমশ পরিচিত হয়ে উঠছে ।

কিত্তনখোলার আঙ্গিকের প্রস্তুতি ঢাকা থিয়েটারের আগের নাটকগুলিতেই ছিল । মুনতাসীর—এই নামের গীতিরঙ্গ নাটকটির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃশ্যপট সৃষ্টির ব্যাপারটা একটা-মাত্র মঞ্চদৃশ্যে সাধারণীকৃত হয়েছিল । পরের নাটকটি ছিল শকুন্তলা (মান্যবর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা যাবার সময় এর একটি পাণ্ডুলিপিও নিয়ে গিয়েছিলেন) ! তাতে আমরা নাটক কথাটার বদলে ব্যবহার করেছিলাম দৃশ্যকাব্য । পরে 'রাস্তা নাচাও' আন্দোলনের নাটক 'চর কাঁকড়া'য় সচেতনভাবে বর্ণনাত্মক ভঙ্গির প্রয়োগ করি । সে নাটকটি আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত হয়েছিল ।

এভাবে দৃশ্য, মঞ্চভঙ্গি ও ভাষা-বিষয়ক ভাবনা থেকে আমরা খুব সচেতনভাবে উৎসপ্রবণ হয়ে উঠি ।

কিত্তনখোলায় আমাদের অভিপ্রায় ছিল বৃহত্তর । এজন্য নাটকের নয়টি সময়গত বিভাজনকে আমরা 'সর্গ' নামে চিহ্নিত করেছি । সর্গের বহুবিধ অর্থের মধ্যে 'সৃষ্টি' বা 'নির্মাণ' কথাদু'টি আমাদের উদ্দিষ্ট । এদিক থেকে প্রথমত গঠন নয়, 'সর্গ' শব্দটি দ্বারা মূল চরিত্র 'সোনাই'র ক্রম পরিণতির ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা ছিল । একজন যে নানান রূপান্তরের নায়ক মৃগী রোগাক্রান্ত সোনাই কিত্তনখোলার মেলায় এসে আমাদের সংস্কৃতির অবজেকটিভ রূপের সঙ্গে পরিচিত হয় । প্রতিটি নতুন ঘটনার মুখোমুখী হলে সে নিজেকে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতায় নির্মাণ করে । সে নায়কসুলভ কোনো গুণ নিয়ে কিত্তনখোলার মেলায় আসেনি, তবে পূর্বপুরুষের রূপান্তরের কথা তার বুকের ভেতর আবৃত ছিল । এখানে এসে সে পরিচিত হয় লাউয়া সম্প্রদায়, যাত্রাদল, মহাজনী নৌকার মাঝিদের সঙ্গে । ইদু যেন তার জন্মান্তরের ও রূপান্তরের অসুর ।

অন্যদিক থেকেও কিত্তনখোলায় ব্যবহৃত 'সর্গ' কথাটির তাৎপর্য আপনার চোখে পড়ে থাকবে হয়তো । রূপান্তরকে আমরা এই নাটকে আবহমানকালের বাংলায় সর্বগ্রাসী বিষয় হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছি । বৌদ্ধ জাতকের গল্পে কি জীনপরীর গল্পে রূপান্তর একটি ফ্রিকোয়েন্ট ব্যাপার । ওভিদের 'মেটামরফসিস' কাব্যে এই রূপান্তর র‍্যাডিকাল। এইজন্য ভূমিকায় আমরা পূর্বঋণ স্বীকারের জন্য বলেছি —

: পূর্বেত এই কিসসা কইছে নানা মহাজন।

শুরুতেই আমাদের মনে হয়েছিল যে এই বিষয়টি নিয়ে বাংলা নাটকের চলতি আঙ্গিকে নাটক রচনা সম্ভব নয় । বরং এই বিষয়টি অনেকাংশে মহাকাব্যের । এমনকি এ নিয়ে একটি উপন্যাসও রচনা করা যায় । সুতরাং নাটক লিখিয়ে হিসেবে স্বভাবতই চাইলাম ঐসব বিভিন্ন আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যগুলি নাটকেও ব্যবহার করতে । মহাকাব্যের স্বভাবজ শিল্প ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যকে নাটকের ভিতরে স্থাপনের দুর্মর বাসনা ছিল। উদাহরণস্বরূপ আপনাকে কিছু প্রসঙ্গ নিবেদন করছি । ক. এ নাটকে নবরসের প্রয়োগ করেছি, খ. এপিক সিমিলিও প্রয়োগ করেছি অনেকবার, গ. স্বর্গমর্ত্যের বিষয়ও পরোক্ষভাবে আছে এ নাটকে ।

প্রিয়কাব্য 'ঈনিদ'-এ স্থান ও ব্যক্তির নামের এক বিশাল মিছিল দেখেছি । 'ঈনিদ'-এ স্থান ও ব্যক্তির এক বিচিত্র ও বিশাল জনপদ অতীত ও বর্তমান থেকে বিস্তৃত হয়ে ভবিষ্যতে পৌঁছেছে । কিত্তনখোলায় আমরা এই নাম ও ব্যক্তির একটি বিস্তৃততর পটভূমি

রচনা করতে চেয়েছি । এর সঙ্গে যোগ করবার চেষ্টা করেছি মধ্যযুগীয় ও সাম্প্রতিক জনপদের কাব্য গল্প গাথা প্রবচন রূপকথা ।

আমরা সব সময়ে মনে রেখেছি—অজস্রতা যেন বৈশিষ্ট্যবিহীন না হয় । আমাদের মাটিতে ধানের অজস্র প্রজাতি ফলে । আমরা চেয়েছি সেরকম অজস্রতা । এসবের উদ্দেশ্য ছিল দুটি :

১. নাটকের চলতি পরিসরকে ভেঙে ফেলা ।

২. ইউরোপিয় নাটকের তীব্র ঘটনাবৃত্তের বদলে এ নাটকের কাহিনীকে মঙ্গলকাব্য বা গাজীর গানের গল্প-গাথুনীর সমান্তরাল করে তোলা ।

কিত্তনখোলার সর্গ বিভাজন, দৃশ্য বিভাজন নয় । উপরন্তু সর্গকে অঙ্ক ধরলেও দেখব যে এতে কোনো গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যভাগ নেই । আমাদের মতে দৃশ্য বিভাজন ইউরোপিয় নাটকের জন্য যেমন প্রয়োজনীয় ও যতটুকু দরকারি, ভারতীয় রীতি বা বাংলাদেশী নাটকের জন্য ঠিক ততটুকুই অপ্রয়োজনীয় ও অদরকারি । এর কারণও কিন্তু দু'-অঞ্চলের আঙ্গিক ও ঘটনা উপস্থাপনার আদর্শ ও রীতিগত পার্থক্য ।

আমাদের রীতির গল্পে দৃশ্য বিভাজন কাহিনীর গায়ে অনাবশ্যক কর্তনের দাগ ফেলে। দৃশ্য বিভাগের প্রয়োজন হয় ঘটনার ঐক্য ও সময়ের কারণে । ভারতীয় রীতিতে ঘটনার ঐক্যে দৃশ্যভাগের দরকার হতে দেখিনি । সময়ের ঐক্যকে তো ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয়নি । উপরন্তু মঞ্চে দেখেছি দৃশ্য ও দৃশ্যপটের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার । আলো নেভাবার এমন যে তাগিদ দেখি ঢাকা-কলকাতার নাটকে তার কারণও একটাই । মূলত পাশ্চাত্য-রীতিতে রচিত দৃশ্য বিভাজিত নাটকের জন্যই পরিচালক আমাদের চোখের উপর এরকম স্বেচ্ছাচারী কাজটা করেন । আমি তরুণ বয়সে একবার যখন কলকাতা যাই আকাদেমি মঞ্চে বের্টোল্ট ব্রেখট-এর 'ককেশিয়ান চক সার্কল-এর বাংলা রূপান্তর দেখার সৌভাগ্য হয়। চমৎকার অভিনয় কুশলতা সত্ত্বেও অজস্রবার সিনেমাটিক কায়দায় আলো জ্বালানো-নেভানোর ফলে নাটক দেখার পুরো আনন্দটাই মৃত্তিকা লুণ্ঠিত হয় । আমি তখন কাউকে বলেছিলাম একথা যে, মঞ্চে এতবার আলো যদি নিভলো তাহলে তা আদৌ জ্বালাবারই বা কি দরকার ছিল ।

কিত্তনখোলায় দৃশ্য বিভাজনের কাজটি সতর্কতার সঙ্গে আমরা পরিহার করেছি । একই 'সর্গে' একসঙ্গে একাধিক প্রসঙ্গ আনলে বোধহয় দৃশ্যসৃষ্টির দায় এড়ানো যেতে পারে। আমরা আগের নিষ্ক্রমণের পেছনে একটি প্রবেশ যোগ করে অতি সংক্ষেপে, এমনকি একটি সংলাপেই একটি দৃশ্যসৃষ্টির কাজ সেরে ফেলতে পারি । দৃশ্য ও দৃশ্যপটের বৈচিত্র্য ইউরোপীয় নাটকের বৈশিষ্ট্য হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা সুপারফিসিয়াল। রবীন্দ্রনাথ নাটকে যে দৃশ্যপটের বাহুলা সইতে পারতেন না এ তো আমাদের সবারই জানা। 'বিসর্জনে'র পরবর্তী নাটকগুলো দেখলে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় ।

অবশ্য রূপক বা সাংকেতিক নাটকের শরীর আর প্রচলিত নাটকের শরীর এক নয়। সেখানে দৃশ্য ও দৃশ্যান্তরকে সহজে এড়ানো যায় । একটি রিয়ালিস্ট নাটকে একাজ খুব সহজ নয় । পট পরিবর্তনের বাস্তবতাকে রক্ষা করেই দৃশ্যভাগহীন নাটক রচনা করা যেতে পারে ।

বাংলাদেশের যাত্রা-নাটকের দিকে তাকালেই সব জটিল প্রশ্নের উত্তর মেলে । যাত্রার

আঙ্গিক কতই না নির্ভার সরল । দৃশ্য নয়, দর্শন—ঘটনা নয়, বর্ণনামুখীন উপস্থাপনা। এই রীতি আমাদের চোখের চেয়ে মনকে সজাগ করে । কৃষ্ণ থাকেন দূরে, শুধু তাঁর সুরটি এসে রাধার মনে আলোকলতার বাঁধন দেয় । সে বাঁধন দেখার অধিক বাঁধন। যাত্রা-দর্শকের কান তাই চোখের চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ হয় ।

এবার আপনার কাছে আমাদের ঢাকা থিয়েটারের নাট্য আঙ্গিকের ভিন্ন চেতনার উৎসের কথা নিবেদন করতে চাই । উনিশ শতকে ইউরোপ-প্রভাবিত শহুরে নাটকের যে ধারা বাংলা নাটকে সৃষ্টি হয়েছিল আমরা সে সম্পর্কে কম উৎসাহী ।

আমাদের ঢাকা থিয়েটার আদি ও মধ্যযুগের বাংলা নাটকের স্বরূপটি আবিষ্কার করতে চায় । আমার দল আর আমার নাটক লেখা সবসময় অভিন্ন । কথাটা এখানে বলে রাখা ভালো।

আদি বাংলা নাটকের গঠন কেমনতর ছিল ? এ প্রশ্নের উত্তরে তর্জনী তুলে নমুনা দেখাতে পারি না বটে, কিন্তু সে নাটকের সম্ভাব্য রূপটির চিত্র তুলে ধরতে পারি ।

নাট্যশাস্ত্রে ওড্রমাগধী রীতির কথা ভরতমুনি উল্লেখমাত্র করেছেন, এর কোনো বিস্তৃত বিবরণ দেননি । কেন দেননি ? কারণ হতে পারে দুটি :

ক. হয়তো এদেশীয় নাট্যরীতি অনার্য বিধায় তা ভরতমুনির অপরিজ্ঞাত ছিল।

খ. হয়তো এদেশীয় নাটকগুলি নিতান্তই লোকজ স্তরে ছিল । এসব নাটক লেখা হতো না । (পৃথিবীর বহু প্রাচীন ও কালজয়ী গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি ছাড়াই মুখে মুখে রচিত হয়েছিল) ।

এসব নাটক ছিল শুধুমাত্র অভিনয়ভিত্তিক । চরিত্রভিত্তিক হলে তার লেখ্যরূপ থাকত। এর জন্য কাউকে দায়ী করা চলে না । কাবণ বাংলাভাষা তখনও সৃজ্যমান যুগে ছিল। এ ভাষার লেখ্যরূপই ছিল না ।

কাজেই ভরতমুনি এই ওড্রমাগধী রীতির নাটক ও তার বৃত্ত সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

১৩৫০-এ লেখা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে একটা নাটকেব সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যায় । এতে পাই তিনটি চরিত্র । নিশ্চয়ই তদ্দিনে বাংলা নাটক একচরিত্র ও দুইচরিত্র-বিশিষ্ট নাট্যরীতির স্তর অতিক্রম করেছিল ।

আমরা বাংলা নাটকেব সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে বাংলা নাটকে বর্ণনাধর্মিতা ও সংলাপমুখিতা পরস্পরের পরিপূরক । অথচ ইউরোপিয় সংজ্ঞায় উৎকৃষ্ট নাটকে এটা হবে নিতান্ত দূষণীয় । এজন্যই বোধহয় বাংলা নাটকে ঘটনার তাড়া থাকে না, নৃত্য ও সংগীতের ব্যাপক প্রয়োগে নাটক হয়ে ওঠে মঞ্চের অলংকার ।

গান দর্শককে চিত্র ও ভাবের দিকে, পরিবেশ ও অনুভূতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। রবীন্দ্র-নাটকেও তাই দেখি গানের উজ্জ্বল ব্যবহার । সে গানে শুধু সঙ্গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে পাই না, সেখানে দেখা মেলে আদি নাটকের আঙ্গিকপূজারী আমাদের এক পিতৃপ্রতিম নাট্য-দার্শনিককে ।

অভিনয়ভিত্তিক অলিখিত নাটকের কথা উল্লেখ করেছি আগে । মধ্যযুগেও আমরা লিখিতরূপে অভিনয়ভিত্তিক নাটক দেখি । মঙ্গলকাব্যগুলো তার প্রমাণ । মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'র ভূমিকায় কবি দেবীকে আহ্বান করে বলেন :

বিশ্রাম দিবস আট   শুন গীত দেখ নাট
আসরে করহ অধিষ্ঠান ।

শুধু পাঠ নয়, গান-নাচের যুগল সম্মিলন দেখতে বলেছেন কবি দেবীকে । অষ্টমঙ্গলা কি মনোটোনাস পাঠের বৃত্তে আবদ্ধ হতে পারে ? পরিবেশনের প্রয়োজনেই তার অন্তর্গত আঙ্গিকের নাট্যবৈশিষ্ট্যকে পারফরমেন্স-এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হতো । এক অধ্যায়েই দর্শকের মনের মধ্যে কালকেতু বেড়ে উঠতেন শিশু থেকে কিশোরে ।

কিত্তনখোলার বর্ণনাত্মক ভঙ্গি আমরা উৎস থেকে গ্রহণ করেছি ।

কবির লড়াই, বায়োস্কোপঅলা, মাঝিদের সমুদ্রযাত্রার কাব্য 'সয়ফলমুলুক' পাঠ কি বনশ্রীর মনসাকল্পনা ও মনসার সাজুয্যে সর্পাভরণের স্পৃহা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংগীতের সচেতন ব্যবহার করেছি আমরা ।

আদি রীতিতে র‍্যাপসোডিস্টের চমৎকার সুযোগ ছিল পরিস্থিতি বর্ণনার । আমরা কিত্তনখোলা নাটকে এজন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সবাসরি বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছি । আপনি যে পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে গেছেন তাতে দেখবেন সংলাপের অতিরিক্ত বর্ণনাও আমরা কিত্তনখোলায় যোগ করেছি । মুখোশের রঙ ও চাষীমনে তার প্রতিক্রিয়া, পূর্ণিমার নীচে মেলা, লাউয়া সম্প্রদায়, ডালিমন-বনশ্রীর প্রাকৃতিক রূপান্তর, সোনাই-র অনুভব এ-সব কিছু কোনোক্রমেই সংলাপযোগ্য করা সম্ভব হয়নি । যদি হতো, কৃষি ও শ্রমজীবী জীবনের ভাষান্তরের জন্য তা হয়ে উঠতো নিদারুণ ভাবী এবং কৃত্রিম ।

আমার এ চিঠিতে আপনি সহৃদয়চিত্তে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, শিল্পমাধ্যম হিসাবে নাটককে আমরা বিস্তৃততর তাৎপর্য দান করতে চাই । পদ্মা ও বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে ধ্বংস ও সৃষ্টির যে লীলা—নাটকের যথার্থ আঙ্গিক তো সেখানে । রৌদ্রে নুনে রক্তে ঘামে সে জীবন হয়ে ওঠে আমাদের নাট্যবস্তু । আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি । সেমিটিক মূল্যবোধের বদলে আমরা চাই আধুনিক ও সাবলীল জীবনের নবীন ভাষা । দক্ষিণে গর্জায়মান সমুদ্র । কাকে ভয় ? ঢাকা থিয়েটার নিশ্চিত পৌঁছে যাবে আদি নাট্যমাতৃকার উৎসমূলে । উৎসের মঙ্গল হোক ।

এখানে আমার একটি ব্যক্তিগত নিবেদন আছে । 'কিত্তনখোলা' এবং নতুন নাটক 'কেরামতমঙ্গল' লেখার সময় নাটককে আমার কাছে নাটকের চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে হয়েছে । আমাদের নাটক-লিখিয়েদের উচিত নাটকের সঙ্গে অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্কটি বুঝে নেওয়া । রবীন্দ্রনাথের পর্বত তো বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হতে চায় । নাটকের আঙ্গিকচেতনা সঙ্কীর্ণ হলে এ মাধ্যমে মানুষ ভাস্কর্যের আনন্দ আর সংগীতের দ্যোতনা পাবে না । রদাঁর ভাস্কর্য নির্মাণপদ্ধতির পরোক্ষ উপস্থিতি কি রিল্‌কের কবিতায় নেই ? ওভিদের 'রূপান্তর' কি ভাস্কর্যের দিকে মুখ ফেরানো নয় ? দান্তের নরক বর্ণনা কি চিত্রকলার অধিক নয় ? ওফেলিয়ার কবরখননের দৃশ্য কি নাটকের সীমা ছাড়িয়ে যায়নি ?

কিত্তনখোলা নাটকের ভাষা আঞ্চলিক । এ নাটকের পটভূমি সুনির্দিষ্টভাবে আঞ্চলিক । স্থানীয় ও বহিরাগত মিলিয়ে তিনটি ভিন্ন অঞ্চলের ভাষাভঙ্গি কিত্তনখোলায় ব্যবহৃত হয়েছে । স্থানীয় ভাষা হচ্ছে মানিকগঞ্জ ও নাগরপুরের (টাঙ্গাইল), যাত্রাদলের ভাষা ফরিদপুর-যশোর অঞ্চলের, আর খালেক মাঝির ভাষা আমার নিজের জেলা নোয়াখালির ।

চরিত্রের অন্তর্গত উপাদানগুলিকে আঞ্চলিক ভাষায় প্রাকৃতভঙ্গিতে তুলে আনা যে কি কঠিন কাজ, সে আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি । আমি ঐসব অঞ্চলের চাষীদের সঙ্গে থেকেছি খেয়েছি—তাদের কথার টান ও মাত্রা বোঝার জন্য অজস্র কথা ও গান ক্যাসেটবদ্ধ করেছি। (এমনকি কেরামতমঙ্গলের দু'টি বৃত্তের জন্য আমাকে গেল বছর হাজোং ও গারো ভাষাও শিখতে হয়েছে ।) পরে গৃহীত গান ও দৈনন্দিন কথা পাশাপাশি স্থাপনের পর আমি লক্ষ্য করলাম যে—ওদের নিজস্ব ভাষাভঙ্গিটাই আধ্যাত্মিক গানের ক্ষেত্রে বিমূর্ত চেতনার বিষয়গুলিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করছে । আমার নমস্য মরহুম আজাহার বয়াতীর গানগুলি ও ঢাকা থিয়েটারের গ্রাম সংগঠন কর্মী নায়েব আলি বয়াতীর পরিবেশনা আমার মনে এই ধারণা দেয় যে আঞ্চলিক ভাষার দৈনন্দিনতার শব্দগুলি যদি গানে পরিশ্রুত হয়ে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে তবে তা বিশেষ ক্ষেত্রে সুগভীর গদ্য সংলাপ তৈরির দিগন্তও উন্মোচিত করতে পারে ।

এভাবে হতাশা থেকে আমি আশায় উত্তরিত হলাম । বনশ্রীবালার আমলকি প্রসঙ্গ ও জীবন জীবন বলে ডাকা সেই রবিদাশের সংলাপকে আমি আপাতবিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ হিসেবে পাশাপাশি তৈরি করে রেখে দিলাম । বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম আমারই অগোচরে আমলকি রূপ বদলের প্রতীক হয়ে উঠছে আর বনশ্রীর রক্তে আমলকিরসের মিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে সে চলে এসেছে আমলকি ও আত্মহত্যার কাছাকাছি ।

এরপর কিত্তনখোলার ভাষার গীতলতা প্রসঙ্গে আমি আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা নিবেদন করব ।

বাংলা নাটকের গদ্য সংলাপ প্রায় সব ক্ষেত্রেই গীতল ও সুমিষ্ট । মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ সবার নাটকেই এই গীতল রূপটি এতই স্পষ্ট যে একে নাট্যভাষার ক্ষেত্রে দোষ বা গুণ বলার কোনো অর্থ হয় না । আমি একে বৈশিষ্ট্য বলব । এবং প্রিয় কবি মধুসূদন শতবর্ষ আগে বাংলাভাষার এই বৈশিষ্ট্যটি সবার আগে বুঝতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণকুমারীর উৎসর্গপত্রের শেষের দিকে তিনি লিখেছিলেন—'তথাচ ইহাও বক্তব্য, যে আমাদিগের সুমিষ্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব সুশ্রাব্য হয় । এমন কি বোধ করি অন্য কোন ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন ।'

আমাদের মনে রাখা উচিত অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করেই মধুসূদন বাংলা গদ্যকে সুমিষ্ট ও সুশ্রাব্য বলছেন । আর এ বিষয়ে তুলনা করবার অধিকার বাংলা সাহিত্যে একমাত্র তাঁরই ছিল ।

কাজেই কিত্তনখোলার গীতল গদ্য সংলাপ (যদি তা কারো মনে হয়) আমার সৃষ্টি নয় ।

বাংলা নাটকের অগোছালো অচিন্তিত নির্মাণ বিষয়ে ঢাকা থিয়েটার '৭২ সাল থেকে সচেতন । ফ্ল্যাট চরিত্র, সরাসরি সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা, আমাদের অধিকাংশ বাংলা নাটককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে । বাংলা কবিতা, কাহিনীকাব্য কি উপন্যাস, ছোটগল্পে শিল্প-সিদ্ধির যে পাবম্পর্য তা ভাবলে মনে মনে কষ্ট পাই আমরা । উনিশ শতকের শুরুতেই বাংলা নাটকের কাঁধে চাপানো হলো সমাজ-সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব । কাব্য উপন্যাসের পালা বদলে যে তুঙ্গ শিল্পচেতনা কাজ করেছে নাটকের ভাগ্যে তা ক্বচিৎ জুটেছে । কিত্তনখোলায় আমরা ব্যর্থ হতে পারি, কিন্তু আমাদের সততায় যেন আপনি সন্দেহ পোষণ না করেন ।

প্রযোজনা বিষয়ে কিছু বলার আগে কিত্তনখোলার মাত্র চারটি প্রধান চরিত্র বিষয়ে আমি আমার বক্তব্য আপনাকে নিবেদন করব ।

ক. পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় যে চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন তার নাম ইদু কনট্রাকটর। ইদু ভঙ্গিতে টাইপ হবার চেষ্টা করেছে, কিত্তনখোলার প্রাচ্যরীতির অভিনয় ভঙ্গির কারণে। চলতি অর্থে ইদুকে ভিলেন বললেও আসলে সে তা নয় । সে প্রাকৃত । এই সংস্কৃতির মধ্যেই সে শিকার ও শিকারীর যুক্তি খুঁজে পায় । আকাল, খরা, ঝড়, বৃষ্টি তাকে শোষণের অসীম ক্ষমতা যোগায় । বনশ্রী তার কারণেই কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেছে অথচ সে এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনাটাকে সাপে-কাটা অকালমৃতা এক কুমারীর মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করছে । আমি পীযূষ-অভিনীত চরিত্রটিকে একটি ধ্রুপদী ভঙ্গি দেবার চেষ্টা করেছি।

ওর খুন হয়ে যাবার ব্যাপারটা আমার কাছে প্রথমত অবাস্তব মনে হয় । কিন্তু আবার যখন সোনাই-র চোখে দেখি তখন মনে হয় সোনাই-র দিক থেকে ইদুকে খুন করাটা যথার্থ।

খ. ছায়ারঞ্জনের 'আমি মুসলমান হব' কথাটা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে । আমার তা ভালো লাগে না । ছায়া প্যাসিভ্ । ব্যক্তিগত ইচ্ছাতে সে নষ্ট হয়নি। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই উচ্চারণ সুগভীর সাম্প্রদায়িক বেদনা বহন করে। ফরিদির অভিনয় শুরুতে ছিল কৈশোরিক অনুভূতিসম্পন্ন । অসাধারণ লাগতো । তিন বছরে ও ভারী যুবক হয়ে গেছে । তবুও চমৎকার । আপনার নিশ্চয়ই ওর কথা মনে আছে ।

গ. বনশ্রীবালার মাধ্যমে আমি এই ভূখণ্ডের শিল্পচেতনাসম্পন্ন এক ডোম নারীর চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছি । কৈশোরে যখন 'মনসামঙ্গল' পড়ি তখন আমার বেউলার জন্য খারাপ লাগতো । কিন্তু যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে আমি দেখেছি রোরুদ্যমানা নারীকে, উন্মাদ হিংস্র করুণ ধর্ষিতা নারীদের । তাই বনশ্রীর দিক থেকে, যতই তার জীবন আঘাতে আঘাতে বিক্ষত হয়, সে হয়ে উঠে মনসাদেবীর সমান্তরাল । সর্পকুল বনজঙ্গল ও নদী পরিবেষ্টিত এককালের বরিশালে রচিত 'মনসামঙ্গল' আমাদের বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কাব্য । অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদের কাছে মনসা আজো প্রিয়তম পূজ্যদেবী । রয়ানীগণের মনসার জীবনে দেবীর উচ্চতা নেই । পূজালোভী সে নয়, সে পিতামাতা স্বামী ও পুত্র-বঞ্চিতা এক ক্রোধদীপ্তা নারী । উচ্চবর্ণে নিন্দিতা । মনসা আমার প্রিয়। আমাদের সুবর্ণা মোস্তফাকে এ চরিত্রে আপনি দেখেছেন কিনা আমি জানি না তবে এ চরিত্রে নূপুরের অভিনয়ও আমার ভালো লাগে ।

বনশ্রীবালার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রূপান্তরের সামাজিক পর্ব রচনার একটিমাত্র প্রবণতাকে আমি এড়াতে পেরেছি বলে আমার বিশ্বাস । অনির্ধারিত স্থানে সাজানো চিতার ওপরে যদি একদিন কোনো তালগাছ ওঠে আর ফল ধরে, সে গাছে তাড়ি ঝরে ? এই রূপান্তর প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কোষকলায় প্রবহমান । আর তা দৃশ্যমান নয়, অনুভবযোগ্য।

ঘ. আমার প্রিয়তম অভিনেত্রী শিমুল ইউসুফ লাউয়াদের মেয়ে ডালিমন সেজেছিল। ডালিমন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে বিশ্বাসী, তাই ব্যক্তিগত রূপান্তরের পথে সে যায় না । লাউয়াদের জন্মকাহিনীর পৌরাণিক যে ঘটনাটি রুস্তম তুলে ধরে পাপপুণ্যের বিচারে, ডালিমন তাকে তীব্রকণ্ঠে উড়িয়ে দেয় । লাউয়াদের জন্মের পেছনে এক ঋণাত্মক ঘটনা

আছে । পাপকর্মের মধ্য দিয়ে তারা অভিশপ্ত—এই বিশ্বাস তাদের আজও আছে। ডালিমন তার ক্ষণিক পরিচিত সোনাইকে ব্যবসায়িক দৃষ্টি থেকে প্রতারণা করেছিল। কিন্তু প্রেমিক অন্তর তাতে বাদ সাধলো । তাই মৃগীরোগী সোনাই-র জন্য সে নিয়ে আসে 'আদত ভল্লুকের নখ' ।

এবার কিত্তনখোলার প্রযোজনা সম্পর্কে আমার ও দলের দৃষ্টিভঙ্গি নিবেদন করব। এবং এরপরই এ চিঠির সমাপ্তি টানবো । ঢাকা থিয়েটারের তাত্ত্বিক, পরিচালক ও গ্রাম থিয়েটারের প্রধান নাসিরউদ্দিন ইউসুফকে কিত্তনখোলা নাটক মঞ্চায়নের সময় খুব কাছে থেকে দেখেছি। তদ্দিনে তিনি আমেরিকা, চীন, জাপান ইত্যাদি দেশ-ভ্রমণ করে নাট্য-বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন । ইউসুফ এদেশের লোকজ নাট্যরীতির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত । উপরন্তু আমাদের শকুন্তলা নাটকে তিনি ধ্রুপদী রীতির প্রয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন । ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্রে' ধ্রুপদী ও লোকজ রীতির মিশ্রণে যে নাট্যবিজ্ঞান তৈরি হয়েছিল তারই মধ্যে আছে প্রাচ্যদেশীয় অভিনয় ও নাট্যরীতির দর্শন । নাসিরউদ্দিন ইউসুফ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন । কিত্তনখোলার সর্গবিভাগ তাকে বেশ বিচলিত করেছিল । অজস্র ও অবিভাজ্য ঘটনার স্রোত তিনি কিভাবে নাটক মঞ্চায়নের অযোগ্য একটি মঞ্চে উপস্থাপিত করবেন ? প্রতিভাবান তরুণ জামিল আহমেদ (কলকাতায় সেট ডিজাইনেও খুব নাম করেছে বলে শুনেছি) এগিয়ে এল । স্টেজ থ্রাস্ট পদ্ধতির দু'টি ভিন্ন ধরনের নকশার মধ্যে একটি গৃহীত হলো । পাখির চোখে দেখলে সমস্ত মঞ্চটাকে মনে হবে কাঁকড়ার দাঁড় । কাঁকড়ার দাঁড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে চরিত্রগুলি—ইউসুফ এরকমই ভেবেছিলেন । তবে এ নাটকের আলোক পরিকল্পনা কেন যেন আমার চোখে লেগেছে । অবশ্য ঘটনা ও সময়ের অগ্রগতি বোঝানোর জন্য আলো নেভানোর সঙ্গে সর্গ অনুযায়ী ঘণ্টাধ্বনিরও তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে সর্গভাগের একটা ধ্বনিগত ব্যঞ্জনা থাকা উচিত । এবং এটা প্রাচ্যদেশীয় রীতি।

নাসিরউদ্দিন ইউসুফকে আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়, যখন দেখি সর্ব-অসুবিধা-যুক্ত একটি মঞ্চে তিনি ষাট-সত্তরটি চরিত্রের আগমন ঘটিয়েছেন প্রায় নিঃশব্দে । এই মঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের জন্যও তিনি যাত্রামঞ্চের রূপান্তর ঘটিয়েছেন । যাত্রামঞ্চের নির্দিষ্ট মাপ, উচ্চতা, প্রবেশ-প্রস্থানের ক্ষেত্রে ঢাকা থিয়েটার বেশ কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেছে । সারা দেশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষিজীবী নাট্যকর্মীরা এখন এ মঞ্চের ব্যবহার করছেন ।

শুধু মঞ্চের ক্ষেত্রেই নয়, ঢাকা থিয়েটার কিত্তনখোলা নাটক মঞ্চায়নের পর থেকে মেলা পত্তনের কাজে হাত দিয়েছে ।

নাসিরউদ্দিন ইউসুফ কিত্তনখোলা নাটকে মায়ারহোল্ডের কনস্ট্রাক্টিভিজম রীতিরও প্রয়োগ করেছেন । তবে তা কত স্বাভাবিক আপনি দেখেছেন ।

ইউসুফ কিত্তনখোলা নাটকের অভিনয় মূলত প্রাচ্যদেশীয় রীতির উপর দাঁড় করিয়েছেন—কিন্তু সুকৌশলে সোনাই-র চরিত্রে মিশ্রণ করেছেন গ্রোটোভস্কির ফিজিক্যাল থিয়েটারের অভিনয় রীতি । মূল চরিত্র সোনাই-র ছিল মৃগীরোগ । এ রোগে স্বেদ কম্পন পত্তনের সুযোগ তিনি নিয়েছেন । আমার চোখে কখনই তা অস্বাভাবিক মনে হয়নি।

আমার এই সুদীর্ঘ চিঠিটি এখনই শেষ করছি । কিন্তু তার আগে 'দেশ' পত্রিকায় আমাদের দল ও নাটক সম্পর্কে, বিশেষত বাংলাদেশের নাটক সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত অভিমতের জন্য আপনাকে ঢাকা থিয়েটারের সবার—এবং দেশব্যাপী আমাদের শ্রমজীবী নাট্যকর্মীদের পক্ষ থেকে জানাই সকৃতজ্ঞ ছালাম ।
গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক ।

আপনার স্নেহাস্পদ
সেলিম আলদীন

মাঘ-চৈত্র ১৩৯১ । পঞ্চম বর্ষ । চতুর্থ সংখ্যা

জয়া মিত্র

শিকড়ের কথামালা

চুয়াত্তর সালে স্ট্রেচারে শুয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসা, চুয়াত্তরেই আবার আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাওয়া আর পঁচাত্তরের শুরুর দিকে সেই বিশেষ অঞ্চলে সংগঠনের এলোমেলো হয়ে যাওয়া অবস্থার মধ্য থেকে ফিরে আসা — তারপর যেন আবার এক নতুন যুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করা । এই সামাজিক ধাঁচ, সাংসারিক কাঠামো কি করে চিনবে তারা, যারা ছাত্রজীবনের শেষ পর্যায় থেকে সামাজিক জীবনযাপনের প্রচলিত ধরন ছেড়ে চলে গিয়েছিল এক অন্যরকম জীবনের সন্ধানে, অন্যরকম জীবনে ? ফলে এবার প্রতি পদক্ষেপে লড়তে হয় এক নিঃশব্দ লড়াই, একা ।

লোকে যে মিছে কথা বলে, লোকে যে ঠকায়, সুযোগ নিতে পারে দুর্বল বা অসহায় অবস্থার, এসব কথা জানাই ছিল না তাদের, যাদের অভিধানে 'আমি' বলে শব্দের চল ছিল না, তার বদলে ছিল 'আমরা' । ফলে, সাতাত্তরে জনতা সরকার আসবার পর চাকরি পেলেও চতুষ্পার্শ্বে প্রবহমান সামাজিক ধরন-ধারণে অভ্যস্ত হতে অনেক সময় ও মনোকষ্ট প্রয়োজন হয় । আর, এই সমস্ত সময়টা ধরেই নিরন্তর কষ্ট — একদিকে ছেড়ে আসা ছড়িয়ে হারিয়ে যাওয়া যুদ্ধের সাথীদের জন্য, আর অন্যদিকে যাদের রেখে এসেছি প্রাচীরের ওপারে সেই ভেঙে যাওয়া ক্ষয়ে যাওয়া মানুষদের জন্য । বিছানায় শুতে ইচ্ছে করে না, খাবার পাতে আস্ত একটা ডিম যেন একজন দলত্যাগী ভুলে যাওয়া লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে । তখনও সহ্য করতে পারি না ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ, যা কিনা রক্তের গন্ধ ঢেকে ফেলবার জন্য ব্যবহৃত হয় ওখানে ।

এইসব সময়ে কিন্তু কারোর সঙ্গে কখনই করি না জেলের গল্প, কথাই বলি না সে বিষয়ে । তখনও কথা বলবার পক্ষে বড়ো বেশি বাস করি সেই স্মৃতির মধ্যেই । তখনও ঘা বড়ো কাঁচা, ছুঁলে রক্ত পড়ে । লেখার কথা চিন্তাও করি না । লিখি না । একমাত্র পুরোনো অভ্যাসবশত কিছু বই পড়ি । স্কুলে চাকরি শুরুর কাল । আনাড়িপনা বা পশ্চাৎপট সম্পর্কে জানা, যে কোনো কারণেই হোক, অবিমিশ্র স্নেহ ও প্রশ্রয় পাই সহকর্মীদের কাছ থেকে । এইসময়ে জেলের দীর্ঘদিনের সাথী কৃষ্ণা এল রূপনারায়ণপুরে আমাদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটাতে । তার সঙ্গেই যেন একমাত্র কথা বলতে পারি জেলের মেয়েদের নিয়ে । সে বলে এই বিষয় নিয়ে লিখবার কথা ভাবছে। স্কুলেও দু-একজন ততদিনে খুব সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করেন সেই প্রশ্ন, 'কেমন করে রাখত জেলে ?' 'খুব কষ্ট দিত ?'

বছরখানেকের মাথায় প্রথম বসা কাগজকলম নিয়ে । কোথা থেকে শুরু করব, কেমন করে লিখবো সেই সমস্যা । কারো সঙ্গে কথা বলবার সময়ে প্রশ্নের উত্তরে সাধারণত নিজেদের কথাই বলতে হয়, হাসিঠাট্টা করে বলি । কিন্তু যেকথা, যাদের কথা

লিখতে চাইছি সেকথা বলতে গেলে যে চোখ ফেটে রক্ত গড়িয়ে আসে । সেই শব্দ আমি কোথায় পাব ? সেই শুরুর পর্যায়ে এই লেখা ছিল ক্রোধে আর বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ, কান্না চাপবার জন্য ব্যঙ্গ করার মতো । তখনও ছড়িয়ে বলতে পারছি না—বহরমপুর পর্যায় শেষ হয়ে গেল পঁচিশ পৃষ্ঠার মধ্যে । দু-একজনকে পড়ে শোনাই উনআশি সালের সেই ঠাসা খসড়া। কেউ বলেন আবার পুলিশের ঝামেলায় পড়বে এই লেখা ছাপলে, কেউ উৎসাহ দেন। মাঝেমাঝেই বসি, লিখি হয়তো দুচার লাইন, বেশিটাই ভাবনা । সমস্যাটা অন্য জায়গায়। লেখাটায়, তখনও ওর নাম 'হন্যমান' হয়নি, মন দিলে আমি আবার চলে যাই সেইখানে, যেখানে প্রেসিডেন্সির দোতলা সেলের সিঁড়ির ঠিক মুখোমুখি একটা বাফল ওয়াল, তার ওপর কম্বল রোদ্দুরে দিয়েছি পোকা মারবার জন্য, সেইখানে তিনহাত তফাতে ভাঁটিঘরের পেছনদিকে ওয়ার্ডের বাউণ্ডারি ওয়ালের কোনায় পাঁচিলের ওপর বসানো একটা লোহার গোলক, তার সারা গা থেকে ফুটখানেক করে লম্বা লোহার কাঁটা বেরিয়ে আছে । দেখলে কেমন গা শিউরে ওঠে । উঠোনময় ছড়ানো ছোলা, পায়রা আর বাচ্চারা গড়িয়ে গড়িয়ে খুঁটছে । মুকুল আর ক্ষীরোদার সেলের সেই চাপা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ, যা আজ এখনও স্পষ্ট লেগে আছে নাকে । তখন অবান্তর হয়ে যায় আমার পরিপার্শ্বের বাস্তব, আমার প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, টিফিন গুছিয়ে, মুখে চুমু দিয়ে ছেলেকে স্কুলে পাঠানো । একসঙ্গে ওই দুই বাস্তবতায় বাস করার ভারসাম্য রাখতে পারি না । যেজন্য লেখাটা নিয়ে বসতে চাই, আবার চাইও না ।

এর মধ্যে, বিরাশি সালে, রূপনারায়ণপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় পরিবেশ ছেড়ে চলে এলাম আসানসোলে । স্কুলে যাওয়া-আসার দীর্ঘ বাসরাস্তা ভাবনার আবাস । ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ছি এই খনিশহরের চোরাগোপ্তা সাংস্কৃতিক স্রোতে । লেখাটা এগোচ্ছে না ঠিক, বরং বলা যায় যেন—ছড়াচ্ছে । একটু একটু করে খুব আড়ষ্টভাবেই সেই পঁচিশ পৃষ্ঠার আঁট বাঁধন ঢিলে হয়ে যাচ্ছে । একটি বাক্য ভেঙে কখনও গড়িয়ে পড়ছে দুটি-তিনটি প্যারাগ্রাফে । খুব যে কাটাকুটি করতে হচ্ছে বা ফিরিয়ে লিখতে হচ্ছে অনেক বেশি—তা নয় । প্রসঙ্গ পেয়ে যাবার পর আমি তো লিখছি আমার দৃষ্ট জিনিস । সে যেন নিজের সঙ্গেই টেনে নিয়ে আসছে তার ভাষা—আমার কারিগরির সুযোগ কম । প্রত্যক্ষত জ্বালা হয়তো একটু কমেছে, কিন্তু লেখা নিয়ে বসলে সেই দিনগুলি একই রকম দখল করে আমাকে । একটু একটু তাড়া দেন বন্ধুজনেরা, শেষ করার জন্য । আশপাশের কোনোকিছুই দাঁড়িয়ে নেই ।

ঘটে গেল ভূপাল । যার জন্য কোনো শব্দই যথেষ্ট নয় । চেরনোবিল । সাধারণ মানুষজনের মতো একটু একটু করে বুঝতে চাইছি পরিবেশবাদীদের কথা । অ্যান্টি-নিউক্লিয়ার আন্দোলনের কথা । ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে দেখলাম সমস্ত পৃথিবীর থেকে প্রায় দুশ জন বৈজ্ঞানিকের এক যৌথ সতর্কবাণী—গ্রীনহাউস এফেক্ট বিষয়ে । যে কোনো মানুষের মতোই মোচড় খেয়ে যাচ্ছে চেতনার তল পর্যন্ত । আর সেই একই অসহায়তার বোঝা—গঙ্গোত্রী যাবার পথে দেখি টেহ্‌রি ড্যাম, পাহাড়ের গা থেকে কেটে নেওয়া কাঁচা মাংসের মতো । প্রতিবাদ শোনবার কেউ নেই । আরওয়াল । মুকুল জল চাইছে আর মাথা ঠুকছে । উঠোনে দাঁড়িয়ে ঝরঝর করে জল ঢেলে হাত ধুচ্ছে ওয়ার্ডার ।

ভিতরে ভিতরে ঘনিয়ে উঠছে লেখা, চিন্তার মধ্যে চাপ দিচ্ছে লিখবার ইচ্ছা, লিখবার

তীব্র আবেগ। ততদিনে আমি জেনে গেছি অন্য আর কোনো কারণে নয়, যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছি তাকে লিখে ফেলা ছাড়া মুক্তি নেই আমার। আমি যে বেঁচে আছি, চিন্তা করতে পারছি, আমি যে কিছু বলতে চাই তার জন্য, শুধু তার জন্যই লিখতে হবে আমাকে। জেলে যারা বন্দী আছে তাদের করুণ গল্প লিখতে চাই না, আপাদমস্তক সমস্ত উদ্ভট, অবাস্তব, অর্থহীন সামাজিক সংস্থানের বিরুদ্ধে লেখক না হয়ে যদি ভূমিকম্প হতে পারতাম, কিংবা বজ্রপাতের ক্রোধ, হয়তো হতে চাইতাম তাই। কিন্তু হায়, এত সীমিত মানুষের ক্ষমতা—কটি শব্দই কেবল আছে তার হাতে—তাই তার ক্রোধের উড়াল, সেই তার মুক্তির স্বপ্ন। আর, এইসব ঘনিয়ে ওঠা সত্ত্বেও ঘটছে না সেই বিস্ফোরণ যা লেখার ক্রিয়াটিকে শুরু করিয়ে দেবে। কার কথা লিখব কাকে বাদ দিয়ে, কতখানি। প্রতিটি মানুষের জীবনের দুঃখ তো আলাদা, কিন্তু যে পড়বে তার কাছে কি পৌঁছবে সব আলাদা দুঃখ একটি যন্ত্রণার মহানদী হয়ে ?

এসবেরই মধ্যে একদিন, যেমন বলে লোকে, উটের কাঁধে শেষ খড়টি পড়ল। চোখে পড়ল কোনো জার্নালের একটা রিপোর্ট। এমন ঘটনা রোজ অজস্র বেরোয় কাগজে। অন্ধ্র অঞ্চলের গ্রামের মেয়েদের আকর্ষণীয় শর্তে সামুদ্রিক চিংড়িমাছ ছাড়িয়ে টিনে ভরবার কাজ দিয়ে নিয়ে যায় বিভিন্ন সংস্থা—রত্নগিরিতে, আরও কোথায় কোথায়। অন্ধ্রের মেয়েদের হাত নাকি খুব নরম, মাছ ভাঙে না। গ্রাম ছেড়ে দূরদেশে পৌঁছনোর দুদিনের মধ্যেই মেয়েরা বুঝতে পারে চিংড়ি নামমাত্র, আসলে তাদের ছাড়াতে হবে ছুরির মতো ধারওলা ক্যাট্‌ল ফিশের আঁশকাঁটা। কাজের সময় রাত্রি তিনটে থেকে বিকেল পাঁচটা। লবণাক্ত ভেজা বালিতে লম্বা টেবিলের পাশে ক্রমাগত দাঁড়িয়ে কাজ করা। দুপুরে খাবার ছুটি নেই। প্রথম কি দ্বিতীয় দিনেই কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় আঙুল। 'রাত্রে ঝোপড়িতে ফিরে ঘাটা সিদ্ধ খেয়ে আমরা ঘুমাতে পারি না, হলুদের জলে হাত ডুবিয়ে বসে আঙুলের যন্ত্রণায় সারারাত কাঁদি'—অথচ তখন চলে যাওয়া যায় না, একবছর থাকবার শর্তে টিপছাপ দিয়ে এসেছে। কবে যেন কুলিদের আসাম কি তরাই পৌঁছে দিয়ে রেল লাইন তুলে ফেলে দিত। এই উনিশ শ' সাতাশি সাল ! আর পরদিন সকালে দূরদর্শনের পর্দায় ফ্লানেল বোর্ড তৈরি করতে শেখাচ্ছে দুটি হাত। নরম, ফর্সা, বাহারি। নরম হাত, মাছের কানকো-কাঁটায় ছিঁড়ে যাওয়া হাত, হলুদ-জলে ডুবিয়ে রাখা হাতের পাশে টুপিয়ে পড়া চোখের জল—মাথার মধ্যে, অনেকদিন পর, আবার কিছু ছিঁড়ে ফেটে যায়। সারাদিন ছন্নের মতো গুম হয়ে থেকে সেদিন অনেক রাত্রে লিখতে বসি। মানুষকে মানুষের যন্ত্রণা দেওয়ার কথা, সহ্য করার কথা, চেতনাহীন বন্দীখানার অনির্দিষ্ট দেওয়ালের কথা, বেঁচে থাকবার বুক ফেটে যাওয়া উপকথা।

এই সময়ে কাছাকাছি পেয়েছি দুজন বড়ো মানুষকে—প্রদীপ ভট্টাচার্য আর কবি অমিতাভ গুপ্ত। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, অজস্র কথা বলেছি প্রদীপের সঙ্গে, চিন্তা গুছিয়ে নেবার জন্য। দিল্লি রায়টের দেরিতে প্রকাশ পাওয়া রিপোর্ট, পিলকিংটন গ্লাস-ফ্যাক্টরির ভিখারি হয়ে যাওয়া গৃহস্থজন—এইসব অসহ্য অভিজ্ঞতাকে সংহত করে নিজেকে লেখায় রাখবার জন্য পেয়েছি নিরন্তর আত্মিক সহায়তা। শেষ করার আগে কেবলই মনে হচ্ছে—হলো না। আরও কি যেন দেবার ছিল, বলবার ছিল আরও অনেক কথা। সেই শেষ করার মুখে শেষ করতে না পারার দ্বিধা, এই সমস্ত

সময়ে এই দুজন মানুষ সারাক্ষণ সাহস দিয়েছেন, তাড়া দিয়েছেন ।

তারপর অষ্টআশি সালের আগস্ট মাসের রাত্রি সোয়া দুটোয় টুরার শরীরে সাদা কাপড় ঢাকা দিলাম ।

চোদ্দই আগস্ট বিকেল-সন্ধ্যায় কিছু বন্ধুজনের কাছে 'হন্যমান' প্রেসিডেন্সি জেলের অংশ পড়ে শোনালাম । প্রথমার্ধ তাদের পড়া হয়ে গিয়েছিল ।

শেষ হয়নি লেখা, লিখতে পারিনি সেই তীব্র যন্ত্রণা যা মানুষকে অস্থির করে তুলবে নিজের ও অন্যদের চারপাশের পাঁচিল গরাদ আর শিকলের সচেতনতায় ।

তবু চেষ্টাটুকু করেছি, ফাঁকি দিইনি, এইমাত্র ।

এই নিজেকে দেওয়াই আমার দায় ছিল ।

তারপর বাকি সবকিছুই—অপ্রধান ।

কার্তিক-পৌষ, ১৩৯৮ । দ্বাদশ বর্ষ । তৃতীয় সংখ্যা

মলয় রায়চৌধুরী

হাংরি আন্দোলন : পিছন ফিরে দেখা

প্রিয় মলয়—হটাত আফগানি মাল কিছুটা পেয়ে গেলাম, বেশ খানিকটা । বিলি করা শুরু করেছি, তোমায় পাঠালাম, চাপ দিলেই গুঁড়ো । সিগারেট পাইপ ছিলিম যাতে খুশি খেতে পারো । মালেব প্রাপ্তিসংবাদ দিও ।

এখানে—সেই যে—বালিশের নিচে মুড়ি দিয়ে র‍্যাঁবো পড়ে, সেই ঘী-এর সঙ্গে দেখা —ওর ওখানেই উপস্থিত । দারুণ ব্যাপার । তাড়াতাড়ি এসো । লুপ্ত হয়ে থাকা যাক কিছুদিন। অফুরন্ত চবস আব মেয়েছেলে । — করুণানিধান

মলয়, তুমি আমি নাকি কলকাতায় অ্যারেস্ট হয়ে গেছি । চতুর্দিকে গুজব । কয়েকজন চেনা হাফ চেনার সঙ্গে দেখা হলে অবাক চোখে তাকাচ্ছে । ভাবখানা এই: কখন ছাড়া পেলে! আমাব তো এখন একতারা নিয়ে বাউল হয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে কলকাতায় । সবাই তালে আছে 'বাঘে ছুঁইয়ে দেবার' । — দেবী বায়

প্রিয় মলয, আমি কয়েকদিনের জন্যে সুবোর সঙ্গে বিষ্ণুপুরে গেছিলুম । কলকাতায় ফিরে আমার দিদির কাছে শুনলুম উনি নাকি আমার খবরাখবরের জন্যে আপনার কাছে গেছিলেন । এভাবে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত । এখানকার মানে কলকাতার আবহাওয়া আমার ঠিক ভালো লাগছে না—প্রত্যেকেই ছুরি শানাচ্ছে অথচ প্রত্যেকেব হাসিতে ঈশ্বরের সাদা দাঁত । — ফাল্গুনি বায়

মলয, এখন জীবন একেবারে অনিশ্চিত, অত্যন্ত দুঃখময় ও বন্ধুবান্ধবহীন একা । এই কটা দিন এর-ওর বাসায়, শিয়ালদা-হাওড়া স্টেশনে রাত কাটিয়ে শরীরের শেকড় দেখে নিয়েছি । পায়ের নিচে জমিতে চাপ দিয়ে দেখছি কতখানি স্যাঁতসেতে । প্রতিদিন সন্ধে হলেই ভাবা আরম্ভ করি কোন পরিচিতের বাড়ি হাজির হওয়া যায় নটাব পর । —সুবিমল বসাক

এইসব চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়েছে শ্রীমতী আলো মিত্র সম্পাদিত এবং ১৯৬৯ সনে প্রকাশিত 'হাংরি জেনারেশন পত্রসংকলন'-এ । ক্ষুধিত প্রজন্ম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রায় সমস্ত কবি-লেখকেব চিঠি ওই সংকলনে । আমি তুলে দিলুম যাতে ২০/২৫ বছরের কয়েকজন যুবকের সৃজনশীলতার তাপ টের পাওয়া যায়, যা এক বিশেষ সময়ের মেজাজ, কেউটের শীতল পেটে ঠোঁট চেপে ধরার মতন যা হয়তো সময় ডিঙিয়ে সময়, সন্দেহের অবকাশহীন মুহূর্ত সকল, মাছরাঙার অভিনিবেশ ।

২

হাংরি আন্দোলনেব পরিকল্পনা আমি-ই কবেছিলুম । এই আন্দোলন আপনা থেকে তৈরি হওয়া কোনো ব্যাপার নয় । আন্দোলন করার জন্যেই আন্দোলন । ১৯৬১ সনে,

যখন এই আন্দোলনের জিগির আমার ভাবনায় গড়ে উঠতে থাকে, তখন একদিন আচমকা ইংরেজি প্রাচীন কবি চসার-এর এই ভয়ানক কবিতা টুকরো আমায় ঘিরে ধরে : In the sowre hungry tyme. মনে হয়, সমকালের অবধারিত সংজ্ঞা। হাংরি শব্দের দ্যোতনা এবং অভিঘাত এমন নির্দিষ্ট করেন চসার যে, মনে হয়, চতুর্দিকের হুবহু। নিজের প্রজন্মকে হাংরি প্রজন্ম অভিহিত করি এবং এ-বিষয়ে আমার বাল্যবন্ধু ডঃ সুবর্ণ উপাধ্যায়-এর সঙ্গে আলোচনা করি।

এই সময়ে, 'মার্কসবাদের উত্তরাধিকার' গ্রন্থটির জন্যে নোটস সংগ্রহ করা কালে, আমি অসওয়ালড্ স্পেংলার বর্ণিত সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের হদিশ পাই। ওই বয়েসে, স্পেংলার-এ যে-আকর্ষণ আমি খুঁজে পাই, তা হলো এই উপাপাদ্য যে, একটি সংস্কৃতি তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যায় : আরোহণ, রেনেসঁস ও অবক্ষয়। প্রথম ধাপে তা সৃজনশীল এবং বাইরে থেকে কোনো প্রভাব গ্রহণ করে না, রেনেসঁসে অকল্পনীয় উদ্ভাবনক্ষমতা এবং অবক্ষয়ে তা বহিরাগত সংস্কৃতির মুখাপেক্ষী। সেই সময়ে, ১৯৬১ সনে, অবক্ষয়ের এই কনসেপ্ট বঙ্গসংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত লাগসই মনে হয়। সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ওরফে সর্বগ্রাস। এই দার্শনিক সর্বগ্রাসে আরোপ হলো চসার-কথিত হাংরি। অবক্ষয়ের নির্বিচার দ্বিধাহীন আত্মসাৎ-প্রক্রিয়া বর্ণনা করার জন্যে হাংরি কথাটা। হাংরি শব্দের কোনো যুতসই বাঙলা আমি তখন খুঁজে পাইনি। ক্ষুধিত ক্ষুৎকাতর ক্ষুধার্ত-র মধ্যে হাংরির সামগ্রিক নির্ণয় পাইনি। পরে, ১৯৬৪ নাগাদ, আলোচকদের বিদেশি বিদেশি এই চেঁচামেচিকে ঠেক্নো দেবার জন্যে কখনও ক্ষুধিত বা ক্ষুৎকাতর ব্যবহার করেছিলুম।

তখন আমি পাটনায় থাকতুম। একান্নবর্তী পরিবার থেকে বাবা সবে বেরিয়ে এসেছেন। বাল্যের বস্তি এলাকা থেকে স্থানান্তরিত হয়েছি স্বচ্ছল এলাকায়। পুরোনো বাড়িতে গানের চর্চা ছিল। জ্যাঠামশায় পাটনা মিউজিয়ামের সরকারি চিত্রশিল্পী। বাবা পেশাদার ফোটোগ্রাফার। জ্যাঠামশায়ের ছোট মেয়ে অর্থাৎ আমার ছোড়দি নিজে থেকে নানান জলরঙ আঁকতো। ঠাকুর্দার যেসব প্রাচীন গ্রন্থের সংগ্রহ ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর তাই দিয়ে কুয়ো বুজিয়ে সেখানে বৈঠকখানা তৈরি করেছিলেন ঠাকুমা। জ্যাঠামশায় ক্ল্যারিওনেট বাজাতেন এবং বড়দি সেতার ও অর্গান। গান মানে বাবার ঘাড় দুলিয়ে রামপ্রসাদ। এই আবহাওয়ায় কবিতার অনুপ্রবেশ আমার মামার বাড়ি পানিহাটি থেকে, কেননা আমার দাদা সমীর রায়চৌধুরী কলকাতায় লেখাপড়া করার দরুন, মামাদের গান কবিত্ব সুরা ও সৌখিনতার এক সুরম্য বিদেশ মাঝে-মাঝে পাটনায় নামিয়ে আনতেন। আমার লেখাপড়া পাটনার ব্রাহ্ম স্কুল রামমোহন রায় সেমিনারিতে।

১৯৬১ সনে আমার বয়স বাইশ : আমি কবিতা এবং মার্কস্‌বাদে আক্রান্ত। তিরিশের পর, চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকের লেখা কেমন জোলো মনে হচ্ছে। ইউরোপের সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে পড়ছি, উত্তেজিত হচ্ছি। বুঝতে পারছি যে, কেমন একটা সিউডো ব্রাহ্ম সংস্কৃতি ছেয়ে ফেলেছে শহুরে বাবুয়ান সমাজকে। সৃজনী লেখার নগণ্য প্রয়াস। এইসব তছনছ করে ফেলা দরকার। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব! সুবর্ণ উপাধ্যায় ততদিনে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় অধ্যাপনায় ব্যস্ত। একদিন এক লিটল ম্যাগাজিনে, একটা শুকনো ছালছাড়ানো নাম খুঁজে পেলুম এবং ঠিকানা : হারাধন ধাড়া। আমি তাঁকে

লিখলুম সুবর্ণর কলকাতার বাড়িতে, পাইকপাড়ায়, দেখা করতে। আন্দোলনের কথা বললুম। উনি নিমরাজি। ওই যুবককে সম্পূর্ণ কাঁচা মনে হলো। ঠিক হলো, আমি লেখা ছাপিয়ে তাঁকে পাঠাবো, প্রথমে কয়েকটা ম্যানিফেস্টো। উনি উচিত জায়গায় পৌঁছে দেবেন আর যারা শরিক হতে চায় তাদের রচনা যোগাড় করে আমায় পাঠাবেন।

৩

পাটনার প্রেস আমার তীব্র বাংলা ছাপতে রাজি হলো না। বিপদ। হারাধন জানালেন তিনি দেবী রায় নামে লিখতে চান। মনে হলো, পাটনা শহরে বসে কিচ্ছু করা সম্ভব নয়। ইউরোপের বিভিন্ন আন্দোলনের তথ্য সংগ্রহ আরম্ভ করলুম। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসু তাঁদের পত্রপত্রিকার মোডাস অপার‍্যানডাই কীভাবে ঠিক করতেন সেসব খবর জোগাড় করতে লাগলুম। আমার দাদা তখন চাইবাসায়। তাঁর সঙ্গেও আলোচনা হলো। তিনি তন্ময় দত্ত নামে একজন কবির কথা বললেন। তারপর, একদিন হঠাৎ, পাটনায় এলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে। শক্তিকে আমি অসওয়ালড স্পেংলারের সর্বগ্রাস কনসেপ্ট এবং আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বললুম। বললুম এই আন্দোলনের নাম দেওয়া হবে হাংরি আন্দোলন। শক্তিকে ট্রেনে তুলে দিয়ে, আমি প্রথম সমাজবিষয়ক একটা বক্তব্য একশো কপি, ইংরেজিতে, আর্ট পেপারে ছাপিয়ে দেবী রায়কে পাঠাই। তাতে, স্পেংলার-এর কোনো উল্লেখ না করে তাঁরই দর্শন তুলে ধরি এবং চসার-এর বাক্যটির পুরোনো ইংরেজি বানান বদলে দিই। চসার-এর নামও উল্লেখ করিনি। স্বাভাবিক। ঠিক কী লিখেছিলুম তা আর আজ মনে নেই। এটুকু মনে আছে, আর সেটা এখন বেশ রগড়ের ব্যাপার মনে হয়, সেই ছোট্ট ফালি কাগজে লিখেছিলুম লীডার শক্তি চ্যাটার্জি ক্রিয়েটার মলয় রায়চৌধুরী এডিটর দেবী রয় : হারাধন ধাড়া কর্তৃক ২৬৯ নেতাজী সুভাষ রোড হাওড়া হইতে প্রকাশিত। আন্দোলনের প্রথম দুটো ভুল এই প্রথম বুলেটিন থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়। এক, পাটনায় ছাপাবার দরুন ইংরেজিতে লেখার প্রয়াস এবং দুই, প্রকাশনার ব্যাপারে আইনকানুন না জানায় মুদ্রকের নাম না ছাপানো। প্রথম বুলেটিন থেকেই, তারিখ দেবার চল গড়ে ওঠেনি এবং শেষ অব্দি এভাবেই চলে। যতদূর মনে পড়ে শক্তি পাটনায় এসেছিলেন ১৯৬১ কালীপুজোর পর। তাই প্রথম হাংরি বুলেটিনের প্রকাশকাল নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৬১ ধরে নেওয়া যায়।

কলকাতা ফেরার সময় শক্তি আমার প্রথম গ্রন্থ 'মার্কসবাদের উত্তরাধিকার'-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে যান এবং নিজেই তা প্রকাশ করেন। সেটি একটি পৃথক দার্শনিক দুর্ঘটনা বলে এখানে কেবল উল্লেখ করলুম। প্রথম বুলেটিন কোনোরকম প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পেরেছিল কিনা তা স্মৃতি থেকে তুলে আনতে পারলুম না। হয়নি বলেই মনে হয়, কারণ হ্যাণ্ডবিলে সাহিত্য হতে পারে, এমন হাওয়া বুদ্ধদেব বসুও গড়ে যাননি। পরে, আমাকে জেরা করার সময়ে পুলিশ কমিশনার পি.কে.সেন মন্তব্য করেন 'ঈকি! বান্দর ব্র্যাণ্ড বিড়ির বিজ্ঞাপনের মতো কাগজে সাহিত্য হচ্ছে!' আমার ও দেবীর নাম তখন আনকোরা। চতুর্দিকব্যাপী মিথ্যা রচনার ব্যাপারটাই যেসময়ে বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেসময়ে নিজের সত্য নিজে উদঘাটিত করার কথাবার্তাকে শিল্প-অভিপ্রায় হিসেবে মেনে

নেওয়া এবং গদ্যপদ্যের অনুশীলিত নিরীক্ষা অনেকেরই অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়ে থাকতে পারে। ১৯৬২ সনের প্রথম দিকে হাংরি আন্দোলন বলতে আমরা কেবল চারজন: দেবী রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমীর রায়চৌধুরী এবং আমি।

'সম্প্রতি' পত্রিকার তৃতীয় সংকলনে শক্তি লিখলেন, 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব'। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি সেই রচনা থেকে : 'বিদেশে সাহিত্যকেন্দ্রে যে-সব আন্দোলন বর্তমানে হচ্ছে, কোনটি বীট জেনারেশন, কোনটি অ্যাংরি, বা সোবিয়েত রাশিয়াতেও সমপর্যায়ী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বাংলাদেশেও কোনো অনুক্ত বা অপরিষ্কার আন্দোলন ঘটে গিয়ে থাকে, তবে তা আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশে 'ক্ষুধা সংক্রান্ত' আন্দোলনই হওয়া সম্ভব। ওদিকে ওদেশে সামাজিক অবস্থা অ্যাফলুয়েন্ট, ওরা বীট বা অ্যাংরি হতে পারে। আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত। যে কোনো রূপের বা রসের ক্ষুধাই একে বলতে হবে। কোনো রূপ বা রসই এতে বাদ নেই, বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। একে যদি বীট বা অ্যাংরি দ্বারা প্রভাবিত বলার চেষ্টা হয় তবে ভুল বলা হবে। কারণ এ আন্দোলনের মূল কথা 'সর্বগ্রাস'। অর্থাৎ ভাত-ডাল চিংড়ি মাছের চচ্চড়ির সঙ্গে এই আন্দোলন বীট জেনারেশন সমেত মেখে লংকা ও নিমকের টাকনা দিয়ে গ্রাস করতে চায়। বদহজমসংক্রান্ত কথা উত্থাপিত হবে না আশা করি। কারণ বদহজমই হলো শিল্প। জীবন চিবিয়ে যতটুকু অখাদ্য তার বমনই হলো গদ্য পদ্য ছবি ইত্যাদি।'

শক্তি-র এই লেখাটির পর হাংরি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে আরম্ভ করল। অনেক আলোচক লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে এই আন্দোলনে সামিল করাটা আমার ঠিক হয়নি। বস্তুত পাটনায় থেকে, অতি বেগে ঝড় তোলার জন্যে, আমার মনে হয়েছিল, শক্তিই উপযুক্ত। কারণ অত দূর থেকে আন্দোলনকে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। আমি তখন রিজার্ভ ব্যাংকে একশো সত্তর টাকার চাকরি করতুম। দেবী রায় লেখা সংগ্রহ করতেন এবং ছাপানোর কাজ দেখতেন, আমি কেবল দরকার-মতন টাকা পাঠিয়ে দিতুম। ১৯৬২ সনে কলকাতায় বোধহয় বার দু-তিন গিয়েছিলুম, থাকতুম উত্তরপাড়ায় বা দেবী-র বাড়িতে বা আহিরিটোলায় পিসেমশায়ের বাসায়। পাটনা থেকে যে-বুলেটিনগুলো ছাপিয়েছিলুম তা সবই ইংরেজিতে। বাধ্য হয়ে এই ইংরেজিতে লেখা বুলেটিনগুলি আর শক্তির লেখায় বীট অ্যাংরি ইত্যাদি অভিধার দরুন পরে হাংরি আন্দোলনকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়।

১৯৬৩-কে হাংরি আন্দোলনের স্বীকৃতির বছর বলা যায়। এই সময়ে এসে আন্দোলনে যাঁদের নাম বুলেটিনগুলোয় পাচ্ছি : রবীন্দ্র গুহ, শংকর সেন, অরূপরতন বসু, বাসুদেব দাশগুপ্ত, অশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী, বিনয় মজুমদার, অমিত সেন, অমৃততনয় গুপ্ত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ভানু চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, ত্রিদিব মিত্র, ফাল্গুনি রায়, সতীন্দ্র ভৌমিক, সুবিমল বসাক, শম্ভু রক্ষিত, তপন দাস, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অনিল করনজাই, সুভাষ ঘোষ, করুণানিধান মুখোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুবো আচার্য, শৈলেশ্বর ঘোষ, সুব্রত চক্রবর্তী, দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, মিহির পাল, অরণি বসু, অজিতকুমার ভৌমিক। বেশির ভাগ বুলেটিন আমি সংগ্রহ করতে পারিনি, তাই নামের তালিকা সম্পূর্ণ নয়। এ-সময়ে হাংরি আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায় লেখকের চিন্তা করার এবং লেখার সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ব্যাপার

—সীমাহীন আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর নিরীক্ষার আশ্রয়স্থল ।

৪

ওই ১৯৬৩ সনে, আমার হাতে আসে সেসিলি ম্যাকওয়র্থ-কৃত 'গীয়ম অ্যাপলীনর অ্যাণ্ড দ্য কিউবিস্ট লাইফ' গ্রন্থটি এবং অ্যাপলীনর-এর চরিত্র ও কার্যকলাপে প্রভাবিত হই। সুবিমল বসাক এ-সময়ে কলকাতায় চাকরি পাবার দরুন কার্য-এলাকা বেড়ে যায়। তাঁর বাসায় যে-দু মাস আমি ছিলুম, আমি দেবী ও সুবিমল হাংরি ত্রিমূর্তি নামে অভিহিত হয়ে পড়ি। ১৯৭৪ সনে পেংগুইন প্রকাশিত, আদিল জুসসাওয়ালা সম্পাদিত 'নিউ রাইটিং ইন ইনডিয়া' গ্রন্থের ৩০৮ পৃষ্ঠায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে লেখা আছে। He was also responsible for starting the Hungrylist movement in Bengal, along with Shakti Chattopadhyay the poet and Utpal Basu, a writer now living in London অতএব, সেই সময়ের উত্তেজনা বোঝাবার জন্যে আমি 'এষণা' পত্রিকায় (অক্টোবর ১৯৬৩ প্রকাশিত) সন্দীপনের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিই: 'পাটনা থেকে মলয় রায়চৌধুরী নামক এক অজ্ঞাত যুবক এর নেতৃত্ব কিছুদিন করেন। কিন্তু হাংরি জেনারেশন এমন এক জিনিস যে কারো হাতেই নেতৃত্ব বেশিদিন থাকে না। প্রায় ২০টির মতো বুলেটিন বা ম্যানিফেস্টো মোটামুটি শক্তি বা মলয়ের নির্দেশে বেরোয়, বেশিরভাগ ইংরেজিতে লেখা, তারপর এখন খুবই মজার ব্যাপার হচ্ছে। কিছুদিন আগে একটা পোস্টার কলকাতার পাবলিক ল্যাভেটরিগুলিতে টাঙানো দেখা গেল :

THE HUNGRY GENERATION
OFFERS
a Rs. 100,00,00,000 poem
To the saint who would bring
Mao Tse Tung

স্পেশাল পুরস্কারের কথাও ছিল। কদিন আগে আমি পোস্টে একটা ভগবানের মুখোশ পেলুম, তার ওপর বড়ো বড়ো হরফে ছাপা :

দয়া করে মুখোশ খুলে ফেলুন
হাংরি জেনারেশন

শুনলুম শ্বাপদ শয়তান ঈশ্বর কাকাতুয়া পুলিশ ভাঁড় শুয়ার শেয়াল ইত্যাদি সব-রকমের মুখোশ নির্বিচারে পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সাহিত্যিক ইউনিভার্সিটির চেয়ার ফিল্মস্টার থেকে শুরু করে টাইম টেবল ঘেঁটে বের করা অজ্ঞাততম রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার অবধি। এরা হাংরি জেনারেশনের পোলিটিক্যাল ম্যানিফেস্টোও বের করেছে, যার শুরু existence is prepolitical এই বাক্য দিয়ে।'

একটি শুভবিবাহ কার্ড থেকে এই নোটিস তুলে দিচ্ছি, যা তখন প্রাপক বিয়ের হলুদমাখানো খাম থেকে বের করে থ :

ওঁ গঙ্গা

আলো মিত্র (হিন্দু ও রেজিস্টিরি মতে ত্রিদিব মিত্রের
অবিবাহিতা স্ত্রী) আয়োজিত

হাংরি জেনারেশনের শোকসভা
২৫ বৈশাখ দুপুর বারোটায়
।। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবরে ।।
মানুষের অকাল মৃত্যুতে

আমার একটি গ্রন্থের দাম রাখা হয় ১৪৪৩৫০০ টাকা অথবা ৫০টি টি. বি. সিল। একটি পত্রিকার দুরকম দাম রাখা হয় : বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্যে এক দাম আর অশ্লীল শ্রেণীর জন্যে আরেক।

আমাদের এইসব কার্যকলাপ ক্রমশ অনেক ক্ষমতাবানকে ক্রুদ্ধ করে তুলছিল। হাংরি বুলেটিন অনেক ঘন ঘন প্রকাশিত হওয়া আরম্ভ হলো। ১৯৬৩-র শীতে শক্তি সন্দীপন এবং বিনয় এই আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন। কেননা বিভিন্ন বড়মাপের পত্রিকা থেকে তাঁদের ওপর চাপ আসতে আরম্ভ হয়েছিল। এমনকি তাঁদের বন্ধুবান্ধব-ও তাঁদের বিরক্ত করতে লাগলেন। শ্রীমতী আলো মিত্র সম্পাদিত পত্রসংকলন থেকে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের চিঠির অংশ তুলে দিচ্ছি : 'জেব্রা বের করার একটা চেষ্টা এবার করো। শক্তিকে বাদ দিয়ে বের করার চেষ্টা করলে ঠিকই বেরিয়ে যাবে। প্রচুর লেখা জমেছে—একটাও লিট্‌ল কাগজ নেই। কৃত্তিবাস আমার ধোপা-নাপিত বন্ধ করতে চাইছে।' ডিক বাকেন ও লী অল্টম্যান সম্পাদিত ১৯৬৭ মার্চে প্রকাশিত 'হাংরি অ্যানথলজি'তে প্রশ্নোত্তরের জবাবে সুবিমল বসাক একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন নামের, যাঁদের দ্বারা তিনি কলেজ স্ট্রিটে হাংরি ফালি কাগজ বিলির দায়ে প্রহৃত হন। আমাদের বুলেটিন বিলি করতে দেয়া হবে না আর আমরা জবরদস্তি তা করবই। উত্তরসূরীর সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য লিখিত হুমকি দিলেন যে, তাঁদের যেন ভবিষ্যতে ওসব না পাঠানো হয়। চূড়ান্ত উত্তেজনা তখন। যে-বুলেটিনটা এই উত্তেজনাকে ধরে রাখে, তাতে ছিল কবিতাবিষয়ক আমার এই বক্তব্য : 'কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ। সে আর জীবনের সামঞ্জস্যকারক নয়, অতিপ্রজ অন্ধ বল্মীক নয়, নিরলস যুক্তিগ্রন্থন নয়। এখন, এই সময়ে, অনিবার্য গভীরতার সন্ত্রস্তদৃক ক্ষুধায় মানবিক প্রয়োজন এমনভাবে আবির্ভূত যে, জীবনের কোনো অর্থ বের করার প্রয়োজন শেষ। এখন প্রয়োজন অনর্থ বের করা, প্রয়োজন মেরুবিপর্যয়, প্রয়োজন নৈরাত্মসিদ্ধি। প্রাগুক্ত ক্ষুধা কেবল পৃথিবী-বিরোধীতার নয়, তা মানসিক, দৈহিক এবং শারীরিক। এ-ক্ষুধার একমাত্র লালনকর্তা কবিতা, কারণ কবিতা ব্যতীত কী আছে আর জীবনে। মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র এবং বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে গেছে। কবিতা এখন একমাত্র আশ্রয়।

'কবিতা থাকা সত্ত্বেও, অসহ্য মানবজীবনের সমস্ত প্রকার অসম্বদ্ধতা, অন্তরজগতের নিষ্কুণ্ঠ বিদ্রোহে, অন্তরাত্মার নিদারুণ বিরক্তিতে, রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে রচিত হয় কবিতা—উঃ তবু মানবজীবন কেন এমন নিষ্প্রভ। হয়তো, কবিতা, এবং জীবনকে ভিন্নভাবে দেখতে যাঁরা অভ্যস্ত-তাঁদের অপ্রয়োজনীয় অস্তিত্ব এই সংকটের নিয়ন্ত্রক।

'কবিতা বলে যাকে আমরা মনে করি, জীবনের থেকে মোহমুক্তির প্রতি ভয়ংকর আকর্ষণের ফলাফল তা কেবল নয়। ফর্মের খাঁচায় বিশ্বপ্রকৃতির ফাঁদ পেতে রাখাকে আর কবিতা বলা হয় না। এমনকি, প্রত্যাখ্যাত পৃথিবী থেকে পরিত্রাণের পথরূপেও কবিতার ব্যবহার এখন হাস্যকর। ইচ্ছে করে, সচেতনতায়, সম্পূর্ণরূপে আরণ্যকতার

বর্বরতার মধ্যে মুক্ত কাব্যিক প্রজ্ঞার নিষ্ঠুরতার দাবীর কাছে আত্মসমর্পণই কবিতা। সমস্ত প্রকার নিষিদ্ধতার মধ্যে তাই পাওয়া যাবে অন্তরজগতের গুপ্তধন। কেবল, কেবল কবিতা থাকবে আত্মায়।

'ছন্দে গদ্য লেখার খেলাকে কবিতা নাম দিয়ে চালাবার খেলা এবার শেষ হওয়া প্রয়োজন। টেবলল্যাম্প ও সিগারেট জ্বালিয়ে, সেরিব্রাল কর্টেক্সে কলম ডুবিয়ে, কবিতা বানাবার কাল শেষ হয়ে গেছে। এখন কবিতা রচিত হয় অরগ্যাজমের মতো স্বতঃস্ফূর্তিতে। সেহেতু বলাৎকারের পরমুহূর্তে কিংবা বিষ খেয়ে অথবা জলে ডুবে সচেতনভাবে বিহ্বল হলেই, এখন কবিতা সৃষ্টি সম্ভব। শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতা সৃষ্টির প্রথম শর্ত। শখ করে, ভেবে ভেবে, ছন্দে গদ্য লেখা হয়তো সম্ভব, কিন্তু কবিতা রচনা তেমন করে কোনো দিনই সম্ভব নয়। অর্থব্যঞ্জনাঘন হোক অথবা ধ্বনিপারম্পর্যে শ্রুতিমধুর, বিক্ষুব্ধ প্রবল চঞ্চল অন্তরাত্মার ও বহিরাত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির শক্তি না থাকলে, কবিতা সতীর মতো চরিত্রহীনা, প্রিয়তমার মতো যোনিহীনা, ঈশ্বরীর মতো অনুন্মেষিণী হয়ে যেতে পারে।' ১৯৬১ থেকে '৬৪-র মধ্যে টুকরো-টুকরো রচনাগুলি সাজিয়ে ১৯৬৫ সনে প্রকাশিত হয় 'মৃত্যুমেধী শাস্ত্র ওরফে আমার জেনারেশনের কাব্যদর্শন'।

প্রতিটি বুলেটিনের মতন এটিতেও বলা ছিল : স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরী নেতৃত্ব শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা দেবী রায়। পরে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫ শক্তি লালবাজারে যে বয়ান দিয়েছিলেন, তাতে বলেছেন যে তাঁর নাম তাঁর অনুমতি না নিয়েই ব্যবহার করা হয়েছে। 'এষণা', পত্রিকা-র অগ্রহায়ণ ১৩৭০ সংকলনে সন্দীপন লিখলেন, 'হাংরি' জেনারেশন আমার cause নয়, আমি মনে করি সিক জেনারেশন, যদিও ৫নং বুলেটিনে আমার একটি ছোট গদ্য রচনা বেরিয়েছিল।'. এঁদের দুজনকে নিয়ে বিনয় মজুমদার একটি হিলারিয়াস লিফলেট প্রকাশ করেন, এই লেখার সময়ে আমি তা সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি।

পঞ্চাশ দশকের কেবল উৎপলকুমার বসু হাংরি আন্দোলনে রইলেন এবং যে-অঘটন তাঁকে ছেঁকে ধরল তা 'প্রাংশু' পত্রিকার ১৯৮৩ পূজা সংখ্যায় মিহির রায়চৌধুরী এ-ভাবে বলেছেন : 'অশ্লীলতার অভিযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রথমেই তাঁকে ছ'মাসের জন্যে সাসপেণ্ড করেন। ফলে মাইনে হয়ে গেল অর্ধেক। এরপর একটি এনকোয়ারি কমিটি গঠন করে প্রতি পনেরো দিন অন্তর উৎপলদাকে উপস্থিত করিয়ে জেরা করা হতো। অবশেষে এই এনকোয়ারি কমিটি রায় দেয় যে, তাঁর লেখা নিশ্চিতরূপে অশ্লীল। তবে শেষবার সুযোগ দেওয়ার জন্যে একটি টাইপ করা কাগজে তাঁকে সই করে দিতে বলা হয়। কাগজে লেখা ছিল—ভবিষ্যতে এই ধরনের রুচি বহির্ভূত লেখা আর লিখবো না। উৎপলদা সেই কাগজে সই করতে রাজি হননি, এবং ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি কলেজ কর্তৃপক্ষ রেজিস্টার্ড ডাক যোগে তাঁর বরখাস্তের চিঠি পাঠিয়ে দেন।'

শ্রীমতী মিত্রের পত্র-সংকলন থেকে, এই পৃষ্ঠপটে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের চিঠির অংশটা এখানে প্রাসংগিক : 'একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আপনারা যে-বক্তব্য পৌঁছে দিতে চেয়েছেন আমি তার নিহিতার্থ অনুমান করতে পারছি। বুঝতে পারি অনির্বাচিত মানবস্বভাব আপনাদের উপপাদ্য। প্রসঙ্গত জানাই, আপনার সমীক্ষাধর্মী প্রবন্ধ বা কবিতা সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলির ভাবনার একটা তাৎপর্য আছে বলে আমার মনে হয়েছে। কিন্তু

এখন পর্যন্ত আপনাদের দলের সকল—আপনার দল অবশ্য ভাঙন-গড়নের দোটানায় এতই অনিশ্চিত যে ওভাবে নির্ধারণ করতে যাওয়ার অসুবিধে আছে— সদস্যদের কবিতায় আপনাদের প্রতিবাদমুখর নন্দনসংবিতের বলিষ্ঠতা এবং দার্শনিক ভঙ্গীটির ছাপ আমি খুঁজে পাইনি ।'

৫

১৯৬৪-র প্রথম থেকেই হাংরি আন্দোলনের শরিক অনেক কম হয়ে গেলেন । লেখার চেয়ে জীবনযাপনের ঢং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল । বয়স অনুযায়ী অভিজ্ঞতার ওজন বেশি হয়ে পড়ায়, আন্দোলনকারীদের ব্যক্তিগত জীবন এসময় ভয়াবহ, দুঃসহ, গ্লানিময়, দুঃখজনক, ছন্নছাড়া, রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ল । ফলে, আঙ্গিকের চেয়ে বিষয়বস্তু, শৈলীর চেয়ে বক্তব্য, রীতির চেয়ে স্বাতন্ত্র্য, বাচ্যার্থ-ব্যঞ্জনা-অলঙ্কারের চেয়ে মনস্তত্ত্ব অনিবার্যতায় পর্যবসিত হয় । ক্রমশ, সবায়েরই বিষয় হয়ে ওঠে অনুপুঙ্খ আত্মবিশ্লেষণ । পরবর্তীকালে, সমালোচকরা এই চেতনাকেই মনে করেছেন ক্ষুধার্ত আন্দোলনের সত্তাসন্ধান ।

এসময়ে, প্রদীপ চৌধুরী তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কলকাতায়, সুবো আচার্য এবং সুভাষ ঘোষ চাকুরিহীন অকপর্দক অবস্থায়, সুবিমল বসাক ও বাসুদেব দাশগুপ্ত নিকট আত্মীয়ার প্রণয়ে অন্ধগলিতে, ফাল্‌গুনি ক্রমে অসুস্থ হয়ে ফ্যাকাশে মৃত্যুর উদাসীন অপেক্ষায় । জীবনের এরকম ক্ষমাহীন সন্ধিক্ষণে হারিয়ে যান চসার ও স্পেংলার । ক্ষিপ্র অবজ্ঞায়, আন্দোলনের নাম হয়ে যায় HG—যা আমরা তখন ভেবে দেখার চেষ্টা করিনি । খালাসিটোলায় সারিবদ্ধ বেঞ্চে বসার চেয়ে গ্রামগঞ্জের আফিম-চরস-গাঁজার আড্ডা, দীঘা-জুনপুটের মাঝরাতের উলঙ্গ হুল্লোড়, বেনারস-কাঠমাণ্ডুর হিপি-হিপিনির সঙ্গে জটপাকানো চুলে স্নানশৌচবর্জিত উদ্দাম উল্লাস, হাড়কাটা গলির বিছানায় দাঁড়িয়ে কবিতাপাঠ, গ্রন্থ কেটে তার মধ্যে লুকিয়ে আমদানি-করা মারিহুয়ানা-এল এস ডি-কোকেন, ভাঙবনের বাগানে দড়ির খাটের রাত্রি, পূর্ণিমায় গঙ্গাবক্ষে দিগম্বর নৌকায়—পৃথিবী সম্পূর্ণ স্বাধীন নিজস্ব আর নিয়মহীন হয়ে যায় ।

হাংরি আন্দোলনকে এরপর থেকে বিদেশি বা বীট প্রভাবিত, তৃতীয় শ্রেণীর আমেরিকান সাহিত্য, বাংরিজি, বিটলে এইসব বলা হতে থাকে । কারণ বোধহয় এই যে বীট কবি অ্যালেন গীন্সবার্গ ও তাঁর সঙ্গী পিটার অরলভস্কি ১৯৬২-৬৩ সনে কলকাতার গুটিকয় যুবকের সঙ্গে মেলামেশা করেছিলেন । শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, ত্রিদিব মিত্র, ফাল্গুনি রায়, সুবো আচার্য, দেবী রায়, সুবিমল বসাক, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অনিল করনজাই, তপন দাস, করুণানিধান মুখোপাধ্যায়—যাঁরা হাংরি নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন, তাঁদের কারুর সঙ্গেই গীন্সবার্গের পরিচয় হয়নি, অনেকে এমনকি অ্যালেন ও পিটারকে দেখেননি ! অ্যালেন ও পিটার নিজেরাই চাইবাসায় আমার দাদার বাড়িতে, তারপর এপ্রিল ১৯৬৩-তে পাটনায় আমার বাসায় কিছুদিন ছিলেন । আমি কলকাতায় গিয়ে কখনও এঁদের কাছে যাইনি। পরবর্তীকালে ওকটাভিও পাজ যখন জ্যোতির্ময় দত্ত-র বাড়িতে আমাকে দেখা করার জন্যে ডেকেছিলেন, আমি যাইনি । তিনি নিজেই পাটনায় এসেছিলেন ।

ওসব আমি এইজন্যে বললুম যে, অনেকে মনে করেন আমার গর্ববোধ দম্ভ ও

আত্মাভিমান খুবই খেলো । বস্তুত বীটদের লেখালিখি না পড়ার জন্যেই বোধহয় এই অজ্ঞান তুলনা । যেখানে হাংরি আন্দোলনের শরিকদের নিজেদের মধ্যেই লেখায় আগাপাশতলা তফাত, সেখানে এই তুলনার একমাত্র কারণ হাংরি আন্দোলনের ঝড় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ভয়, স্থিতাবস্থা চুরমার হবার আশঙ্কা । হাংরি আন্দোলন, যে-কোনো সাহিত্য আন্দোলনের মতন, সাবভারসিভ ছিল । পরাভূত করার এই প্রয়াসকে নিহিলিজম মনে করাটা দার্শনিক মূর্খতা । যা বদলায় না, তার পার্থিব উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় । জীবনের একমাত্র অপরিবর্তনীয় পরিস্থিতি হলো প্রতিটি অপরিবর্তনীয়তাকে ঘাঁটানো । আর্নলড টয়েনবির কথায় বলা যেতে পারে, প্রতিটি চ্যালেঞ্জই মোকাবিলাযোগ্য, আর এটাই হচ্ছে সাড়া দেবার উপায় ।

আমি গীন্সবার্গের তিনটি কাব্যগ্রন্থ থেকে প্রথম কবিতার প্রথম পঙ্ক্তি তুলে দিচ্ছি :

I saw the best minds of my generation destroyed
by madness, starving hysterical naked (*Howl* থেকে)

Under the bluffs of Oroville, blue cloud September skies, entering
U. S. border, redred apples bend their tree boughs propt with sticks
(*The Fall of America* থেকে)

A bitter cold winter night
conspirators at cafe tables
discussing mystic jails (*Planet News* থেকে)

কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় আমার লেখায় গীন্সবার্গের প্রভাব দেখেছেন, তাই ১৯৬৫ সনে লিখিত ও প্রকাশিত 'জখম' গ্রন্থ থেকে আরম্ভটা উল্লেখ করি :

চাঁদোয়ায় আগুন লাগিয়ে
তার নীচে শুয়ে আকাশের উড়ন্ত নীল দেখছি এখন
দুঃখকষ্টের শুনানী মুলতুবি রেখে
আমি আমার সমস্ত সন্দেহকে জেরা করে নিচ্ছি
হাতের রেখার ওপর দিয়ে গ্রামোফোনের পিন চালিয়ে জেনে নিচ্ছি
আমার ভবিষ্যৎ
বুকের বাঁদিকের আর্মেচার পুড়ে গেছে বহুকাল --

আর শেষটা তুলে দিচ্ছি সেই কবিতাটা থেকে যেটি ব্যাংকশাল কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীঅমলকুমার মিত্র ও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক শ্রী তারাপদ মুখোপাধ্যায় পড়তে বাধ্য হন, পৃথিবীর ২৮টি ভাষায় অনূদিত :

ঝাঁকে-ঝাঁকে ছুঁচ ছুটে যাচ্ছে রক্ত থেকে কবিতায়
এখন আমার জেদি ঠ্যাঙের চোরাচালান সেঁদোতে চাইছে
হিপ্নটিক স্বপ্নরাজ্য থেকে ফাঁসানো মৃত্যুভেদী যৌনপরচুলায়
ঘরের প্রত্যেকটা দেয়ালে মারমুখি আয়না লাগিয়ে আমি দেখছি
কয়েকটা ন্যাংটো মলয়কে ছেড়ে দিয়ে তার অপ্রতিষ্ঠিত খেওখেয়ি ।

দেবী রায়-এর কবিতায় অ্যাড্রেনালিন এবং লিমফোসাইটস এর যে-ব্যবহার এবং প্রশ্বাসকে উদ্বিগ্ন করার ফলে যে-চেতনা তৈরি হয় তাতে কোনো বিদেশি প্রভাব নেই। শৈলেশ্বর ঘোষের ফ্যাটালিজমকে শঙ্খ ঘোষ তাঁর বেতার সমীক্ষায় প্রতিবাদের সাহিত্য বলেছেন। সুবিমল বসাকের উপন্যাসগুলি পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় এবং এই আঞ্চলিক মেজাজ কবিতায় পর্যন্ত আনবার প্রয়াস দেখা যায় এখন। 'দন্দশূক' পত্রিকায় সুভাষ ঘোষ এবং বাসুদেব দাশগুপ্ত-র লেখা সম্পর্কে দেবেশ রায় মন্তব্য করেছিলেন যে, রাজনীতির নকশালপন্থার সঙ্গে এঁদের দার্শনিক মিল আছে এবং হাংরি আন্দোলন হলো তত্ত্ববিশ্বের ক্ষেত্রে নকশালপন্থার প্রথম ইঙ্গিত। তাছাড়া, হাংরি আন্দোলনে যে বীট আন্দোলনের ছাপ নেই তা এক সমীক্ষায় পোর্টল্যাণ্ড স্টেট কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ডি. এস. ক্লিন এরকমভাবে বলেছিলেন :

Their originality is in no doubt. Compare imagery. And length of line (as translations, the music can't be heard, but line-length is some indication of its nature)। আসলে হাংরি আন্দোলনের সেরকম মূল্যায়নের চেষ্টা হয়নি। নিরপেক্ষ এবং অ্যাকাডেমিক মূল্যায়ন হওয়া দরকার যাতে ঝোল টানাটানি থাকবে না।

৬

এই রচনার আরম্ভে আমি দেবী রায় লিখিত ২২ জুন ১৯৬৪-এর চিঠির অংশ দিয়েছি। কিন্তু যে বুলেটিনের জন্যে পুলিশ-হস্তক্ষেপ হয় তা প্রদীপ চৌধুরী ছাপিয়েছিলেন জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে, বিতরণ করেছিলেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেবী, সুভাষ, সুবিমল, শৈলেশ্বর আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। তারপর, পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত লেখকরা, এই ধরনের সংবাদ ছাপতে লাগলেন : দেবদূতেরা কি ভয়ংকর ('চতুষ্পর্ণী'); ইহা কি বেহুদা পাগলামি ('দর্পণ'); সাহিত্যে বিটলেমি ('যুগান্তর', সাহিত্যে বিটলেমি কি এবং কেন ('অমৃত'); কাব্যচর্চার নামে বিকৃত যৌনলালসা ('জনতা'); অশ্লীল পুস্তক রচনার অভিযোগ ('আনন্দবাজার'); কাব্যচর্চায় অবাধ যৌনভেজাল ('জনতা'); Erotic lives and loves of the Hungry Generation [*Blitz*]; হা-ঘরে সম্প্রদায় ('জলসা')। ভবিষ্যতের গবেষকরা যদি খোঁজ নেন যে, এই সংবাদের রচনাকার কারা, তাহলে হাংরি আন্দোলন ঠিক কোথায় ঘা মারতে পেরেছিল তা টের পাওয়া যাবে। মানে, সত্যিই কেন তা আন্দোলন হয়ে ওঠে।

ওই হাংরি বুলেটিনের জন্যে লালবাজারের সাব-ইন্সপেক্টর কালীকিংকর দাস এফ. আই. আর দায়ের করেন ২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪। মলয়, দেবী, সুভাষ, প্রদীপ, সমীর, শৈলেশ্বর, সুবিমল, রামানন্দ, সুবো, উৎপল এবং বাসুদেবের নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বের হয় ভারতীয় দণ্ডসংহিতার ১২০বি এবং ২৯২ ধারা ভাঙবার দরুন। গ্রেফতার হন প্রথম ছয়জন। হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি বাঁধা হয় আমাদের। সকলের চাকরিতে টানাটানি আরম্ভ হয়। আমি সাসপেণ্ড হই। উকিল নিযুক্ত হন চণ্ডীচরণ দত্ত এবং সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩ মে ১৯৬৫ সবাইকে রেহাই দিয়ে পুলিশ আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আরম্ভ করে। এই দিনটিকেই হাংরি আন্দোলন ভেঙে যাবার দিন বলা যায়, কারণ যে-চার্জশীট আমায় দেয়া হয় তার সঙ্গে দেখা যায় শক্তি, সন্দীপন, উৎপল,

শৈলেশ্বর, সুভাষ, প্রদীপ এবং পবিত্রবল্লভ ও সমীর বসু নামে দুজন অচেনা যুবক আমার বিরুদ্ধে বয়ান দিয়েছেন। শক্তি, সন্দীপন, উৎপল, শৈলেশ্বর ও সুভাষ নিজেদের বয়ানে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক অস্বীকার করেন। লালবাজারে আমায় এবং আমার দাদাকে জেরা করেন একটি ইনভেসটিগেটিং বোর্ড, যাতে ছিলেন কলকাতা ও পঃ. বঃ. পুলিশ এবং বি. এস. এফ, ইস্টার্ণ কমাণ্ড, সি. বি. আই. তথা র-এর উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অফিসাররা। তা প্রত্যেকে টেপ করেন।

পুলিশের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেন সমীর বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পবিত্রবল্লভ, উৎপলকুমার বসু, সুভাষ ঘোষ, তারকনাথ সেন, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শৈলেশ্বর ঘোষ, সত্যেন্দ্রমোহন বারড়ি, বি. পি. শর্মা, রামনাথ প্রসাদ, পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কালীকিংকর দাস। আমার তরফের সাক্ষী ছিলেন সত্রাজিৎ দত্ত, অজয়কুমার হালদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় দত্ত এবং তরুণ সান্যাল। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৫ আমার সাজা হয় দুশো টাকা, জরিমানা অনাদায়ে একমাস কারাদণ্ড। হাংরি আন্দোলনের শরিকদের মধ্যে সুবিমল বসাক নিয়মিত আদালতে আসতেন। কলকাতার সাহিত্যসমাজের বাম বা ডান অথবা অন্যান্য হাংরি আন্দোলনকারীরা, কেউ আসেননি। অর্থসাহায্য করেছিলেন অবশ্য কেউ কেউ, গোপনে। ২৮ জানুয়ারি ১৯৬৬ আমি রিভিশন পিটিশন করি হাইকোর্টে। ব্যারিস্টার ছিলেন মৃগেন সেন, করুণাশঙ্কর রায়, এ.কে. বসু, অনঙ্গকুমার ধর। ২৬ জুলাই ১৯৬৭ হাইকোর্ট নাকচ করে দেন নিম্ন আদালতের রায়। তার পরদিন থেকে আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিই এবং ক্রমশ নিজেকে একাকীত্ব দিয়ে ঘিরে ফেলি। সবায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। পঁয়ত্রিশ মাস-ব্যাপী এই মোকদ্দমায় আমার প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল।

এরপরও হাংরি আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন সুবিমল বসাক এবং শৈলেশ্বর ঘোষ অথবা আরও পরে অরুণেশ ঘোষ। কিন্তু তা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে—সুবো আচার্য অনুকূল ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নেন, দেবী রায় বন্ধুবান্ধব পাল্টে ফেলেন, প্রদীপ চৌধুরী ত্রিপুরায় চলে যান, করুণানিধান মুখোপাধ্যায় নকশাল হয়ে যান, উৎপলকুমার বসু লণ্ডনে চলে যান, তপন দাস মারা যান এবং সবকিছুর মধ্যে খচখচ করতে থাকে ওই মুচলেকাগুলি। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫-কেই বলা যেতে পারে হাংরি আন্দোলনের সময়কাল।

নিজেদের উচ্ছন্নে নিয়ে গিয়ে, ২০-২৫ বছর বয়সের কয়েকজন যুবক, সাহিত্যে যে তোলপাড় আরম্ভ করেন, তা হালকাভাবে উড়িয়ে দেয়াটা ঠিক হবে না। সারাটা পঞ্চাশ দশক ধরে যাঁরা কিচ্ছু করতে পারেননি, আচমকা হাংরি আন্দোলন আরম্ভ হতেই তাঁদের লেখার ধারা রাতারাতি পাল্টে গেল কেন ? কেনই বা হাংরি আন্দোলনকে হেয় করার প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস ? তা তো অকারণ হতে পারে না ! হাংরি আন্দোলনের পরই গদ্য-পদ্যর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সীমাহীনভাবে আরম্ভ হয়। ক্রিয়েটিভ সাহিত্য এবং বাণিজ্য-সাহিত্যের তফাৎ এবং প্রতিষ্ঠান কীভাবে সৃজনশীল লেখককে নষ্ট করে, তা তো হাংরি আন্দোলনই চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়। সাহিত্যের সত্য এবং জীবনের সত্যের ফাঁকটুকু হাংরি আন্দোলনের পরই বন্ধ হতে আরম্ভ হয়। 'কৌরব' ৩২ সংখ্যায় হাংরি আন্দোলনকে গবেষক দিলীপ ঘোষ তুলনা করেছেন বাংলা সাহিত্যে একটা 'ক্যু'-এর সঙ্গে। মানে,

আন্দোলনের কু-ব্যাপারটার সঙ্গে ওই ক্যু যদি আলোচিত হয়, তবেই হাংরি আন্দোলনের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব। ২০-২৫ বছর বয়সে এর চেয়ে স্থায়ী কাজ আর কী হতে পারে!

হাংরি অভিধায় নিষিক্ত গ্রন্থগুলির তালিকা আমি দিচ্ছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সংগ্রহ করে মনস্থির করতে পারবেন : সুবিমল বসাক লিখিত 'ছাতামাথা', 'হাবিজাবি', 'অযথা খিটক্যাল'। শৈলেশ্বর ঘোষ-লিখিত 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' অপরাধীদের প্রতি, 'দরজা খোলা নদী'। ফাল্গুনি রায় লিখিত 'নষ্ট আত্মার টেলিভিশন'। ত্রিদিব মিত্র-র 'প্রলাপ দুঃখ'। প্রদীপ চৌধুরীর 'চর্মরোগ', 'চৌষট্টি ভূতের খেয়া', 'কালোগর্ত'। দেবী রায়-এর 'উপনরক', 'শবযাত্রার প্রথম চীৎকারকারী', 'ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে একা', 'উন্মাদ শহর'। বাসুদেব দাশগুপ্ত প্রণীত 'রন্ধনশালা', 'খেলাধূলা'। অরুণেশ ঘোষ-এর 'শব ও সন্ন্যাসী'। সুভাষ ঘোষ-এর 'আমার চাবি', 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট', 'অ্যামবুশ'। হাংরি আন্দোলনের পত্রিকাগুলি : 'জেব্রা'. 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'ক্ষুধার্ত', 'চিহ্ন', 'আর্তনাদ', 'জিরাফ'।

১১ শ্রাবণ ১৩৯১

কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৯১। পঞ্চম বর্ষ। তৃতীয় সংখ্যা

অম্লান দত্ত

উনিশশতকী বাংলা নবজাগরণের গৌরব ও অপূর্ণতা

মধ্যযুগীয় সমাজ ও চেতনার সঙ্গে তুলনায় আধুনিক যুগকে যুক্তিধর্মিতায় অগ্রসর বলা হয়েছে।

কিন্তু যুক্তিরও ক্ষেত্রভেদ ও প্রকারভেদ আছে। যুক্তিকে অখণ্ড ও অবিভাজ্য মনে করলে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

উদাহরণত আইনপ্রণয়নে অথবা আধুনিক আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে যুক্তির একটা বিশেষ বিকাশ লক্ষ করা যায়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জন্ম ও জাতিগত মর্যাদার একটা বড়ো স্থান ছিল। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের নৈর্ব্যক্তিক পদাধিকার সেই তুলনায় অধিকতর যুক্তিধর্মী—যেমন জেলার প্রশাসক ব্রাহ্মণই হন অথবা নীচুজাতই হন, তাঁর পদাধিকারের তাতে ইতরবিশেষ হয় না। নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধির বিচারে এটা প্রগতির একটা ধাপ। বাণিজ্যে অথবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে দেখি যুক্তির অপর এক প্রকাশ। আর্থিক লাভক্ষতির গণনায় একপ্রকার যুক্তি আছে একথা স্বীকার্য। আবার বিজ্ঞানে অথবা প্রকৃতিপাঠেও লক্ষণীয় যুক্তির উল্লেখযোগ্য জয়যাত্রা।

এই যে বিভিন্ন রকমের যুক্তিপ্রবণতা, এদের ভিতর ঐতিহাসিক সূত্রে কোনো দৃঢ় এবং অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অনুমান করে নেওয়া অনুচিত। বৃহৎ সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠান ও আইনপ্রণয়নে যে-জাতীয় যুক্তিধর্মিতা আছে তার একটা বড়ো রকমের বিকাশ ঘটেছিল প্রাচীন রোমক যুগে। অথচ বিজ্ঞানচর্চায় সে-যুগের কীর্তি তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বরং পূর্ববর্তী গ্রীক যুগ গণিতে ও বিজ্ঞানে ও দর্শনে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে অধিকতর ভাস্বর। এটাও দেখানো কঠিন নয় যে, প্রশাসনিক যুক্তি ও ব্যবসায়িক যুক্তির ভিতর কোনো অঙ্গাঙ্গী যোগ নেই। কোনো যুগে অথবা কোনো সম্প্রদায়ে নিয়মতন্ত্রী বুদ্ধির প্রাবল্য দেখা দিলেই যে মানুষের এক অবিভাজ্য যুক্তিপ্রবণতা সেই যুগমানসকে ব্যবসায়ী অথবা প্রযুক্তিসন্ধানী বুদ্ধির দিকে এগিয়ে দেবেই, এমন কথা বলা যায় না।

শাস্ত্রের ভয় ও বাঁধাধরার বন্ধন মানুষের চেতনায় যে অসাড়তার সৃষ্টি করে তাকে অতিক্রম ক'রে সুখের অথবা আনন্দের সন্ধানে যুক্তির একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। মানুষের ভিতর যে-শক্তি তাকে চেতনার স্তর থেকে স্তরান্তরে নিয়ে যায় সেই শক্তিকে পরিপূর্ণত যুক্তি নাম দেওয়া চলে কিনা সেটা অবশ্য ভিন্ন ও গভীরতর প্রশ্ন। কিন্তু যুক্তিকে অস্বীকার করলে প্রাচীনের বন্ধনমোচন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যুক্তির আলোর প্রয়োজন আছে আনন্দের সন্ধানেও। এই যুক্তি কখনও ধর্মসমালোচনার রূপ নেয়, কখনও নতুন অধ্যাত্মচিন্তার পথ খুলে দেয়।

এর পরও একই কথায় ফিরে আসতে হয়। ব্যবসায়ে অথবা নিয়মতন্ত্রে যে-যুক্তিকে আমরা পাই তার সঙ্গে আনন্দসন্ধানী বুদ্ধির কোনো অচ্ছেদ্য ঐক্য নেই। বরং এদের

ভিতর যুগবিশেষে বিরোধী সম্পর্কও লক্ষ করা যায়। আনন্দসন্ধানী বুদ্ধিকেই যিনি উত্তম বলে জানেন তিনি অবশ্য বলবেন যে, যুক্তির অপরাপর যে-সব রূপ ও পরিচয় আমরা পাই সে সবই মেকী। এ কথাটাকে হয়তো বিশেষ কোনো দর্শনের জোরে দাঁড় করানো যায়, কিন্তু ইতিহাসের বিশ্লেষণে এতে কাজ চলে না।

ইতিহাসে যুক্তি দেখা দেয় নানা খণ্ডিত ও বিচিত্র রূপে। যে-মানুষ সমাজের মাঝে দাঁড়িয়ে পথ খুঁজে নিতে চায়, অতীতের অর্থাৎ একটা গঠিত জীবনযাত্রার ভিতর থেকেই তার পরিপার্শ্বকে সে বিচার করে। অতএব সেই অতীতকে যখন সে অতিক্রম করতে চায় তখনও ভবিষ্যতের ওপর অতীতের ছায়া এসে পড়ে। ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কোনো গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায় যে-খণ্ডিত যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাতে একই সঙ্গে থাকে বর্তমানের প্রান্তস্পর্শী পশ্চাৎকালের অন্তরঙ্গ পরিচয়, আবার সম্মুখের কর্মকাণ্ড তথা নতুন সমস্যার আভাস।

এইভাবে প্রতিযুগই নিজের দ্বারা নিজে অন্তত কিছু পরিমাণে সীমাবদ্ধ। আবার প্রতিযুগকেই সেই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। ব্যবসায়িক যুক্তি ও নিয়মতন্ত্রী যুক্তি, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও আনন্দসন্ধানী বুদ্ধি, এসবের ভিতর একটা সামঞ্জস্য সমাজ ও জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়োজন। কাঙ্ক্ষিত সামঞ্জস্যের প্রকৃতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে চলে। বাস্তবে একে কখনও পুরোপুরি লাভ করা যায় না। যুক্তির প্রতিটি কাঠামোর একটা নিজস্ব জাড্যগুণ আছে ; তা থেকে ভেঙে বেরোবার জন্য একটা বিশেষ শক্তির প্রয়োজন হয়। কোনো একদিকে আতিশয্য, অন্য কোনো দিকে অপূর্ণতা, প্রতিযুগের নিজস্ব পরিচয় বহন করে। এরই ভিতর দিয়ে যুগের বিচার হয়, ভবিষ্যতের নতুন লক্ষ্য আকার ধারণ করে।

মুখবন্ধে এই ক'টি তাত্ত্বিক কথার উপস্থাপন করা গেল। এবার বাংলায় উনিশশতকী রেনেসাঁস অথবা নবজাগরণের আর্থিক ও সামাজিক পটভূমিকার দু'য়েকটি বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আসা যাক।

বাঙালি হিন্দুসমাজে উঁচুজাত বলতে আমরা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থকেই বুঝি। নবশাখ ও বণিক এই সমাজে উঁচুজাতের ভিতর গণ্য হয় না। ভারতে সর্বত্র জাতিবিচার একপ্রকার নয়। এই তারতম্যের সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা থাকাই স্বাভাবিক। সেসবের ভিতর যাওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন।

বাঙালি, বিশেষত কলকাতাবাসী, উচ্চজাতের হিন্দুসমাজ থেকে উনিশশতকী নবজাগরণের উদ্ভব। ঐ স্তরের কিছু লোক আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজের সঙ্গে অল্পবেশি যুক্ত হয়। অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে আমরা দেখি যে, সেই সময়ে ব্যবসায়িক জগতে, কিছুকালের জন্য হলেও, এরা অনেকটা প্রাগ্রসর স্থানলাভ করে। কিন্তু অবস্থার শীঘ্রই পরিবর্তন ঘটে। উনিশ শতকে দেখি বাঙালি উঁচুজাতের হিন্দুর ব্যবসায়ে সেই স্থান আর নেই।[১] স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, উঁচুজাতের বাঙালি হিন্দুরা ব্যবসায় ত্যাগ করলেন কেন আর ত্যাগ করে গেলেন কোথায়?

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসে, তারপর আঠারো শতকের

শেষ-ভাগে ভূমির রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার লাভ করে এবং উনিশ শতকে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আসে নতুন প্রশাসনযন্ত্র। এইসঙ্গে উঁচুজাতের হিন্দু বাঙ্গালির সামনে উন্নতির নতুন পথ ও সুযোগ দেখা দেয়। জমিদারি থেকে অর্থাগমের একটা পথ খুলে গিয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে। তার সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দু যোগ করতে চেয়েছে কলকাতায় ও অন্যত্র নাগরিক একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা। এই নাগরিক প্রতিষ্ঠা দুই ভিন্ন পথে হওয়া সম্ভব : এক, ব্যবসায়ের মাধ্যমে আর দ্বিতীয়ত, সরকারি আইন আদালত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনব্যবস্থায় চাকুরির পথে। এই দ্বিতীয় পথটাই উঁচুজাতের হিন্দুর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। এর নানা কারণ ছিল।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে যে-সব শিল্প উনিশ শতকে প্রধান হয়ে উঠেছিল, যেমন চা অথবা পাট, তার নির্ভর ছিল বৈদেশিক বাজারের ওপর। ফলে, এইসব শিল্পে কর্তৃত্বলাভ বিদেশি বণিকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। পশ্চিম দিকে, বোম্বাইকে কেন্দ্র করে, কাপড়ের কলে অবস্থাটা ছিল ভিন্ন। সেখানে বাজার অনেক পরিমাণে স্বদেশী। ফলে ভারতীয় পুঁজি নিয়োগের ওখানে সুবিধা ছিল বেশি। গুজরাতী পারসীরা সেখানে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে।

উঁচুজাতের হিন্দুরা মুসলমান আমলেও প্রশাসনে একটা বড়ো স্থান অধিকার করেছিল। এক সাম্রাজ্য ভাঙা এবং অন্য সাম্রাজ্য গড়ার মধ্যকালীন সময়ে যদিও কিছুদিনের জন্য ইংরেজ বণিকদের অংশীদার হয়ে তারা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবু তাদের জীবনযাত্রা ও মানসিক প্রবণতা বেশিদিন সেখানে তাদের থাকতে দেয়নি। জমিদারি মেজাজ আর শিল্পপতির প্রয়োজনের ভিতব কিছু কিছু বড়ো পার্থক্য থাকে। বিশেষত গোড়ার যুগের শিল্পপতিদের শুধু ভোগী এবং বিদ্যোৎসাহী হলেই চলে না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভিতর নতুন পথে এগোবার আর বড়ো কাজ হাতে নেবার মতো শক্তি ও কল্পনা ছিল প্রচুর। কিন্তু তিনি ছিলেন আদতে রাজসিক ও ভোগী। একদিকে যেমন তিনি বড়ো ব্যবসায় গড়ে তোলেন অন্যদিকে তেমনি মৃত্যুর সময় বিপুল দেনা রেখে যান, যার ভারবহন করতে হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথকে।

বাণিজ্যের উত্থানপতন, নিত্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অনিশ্চয়তাব চেয়ে প্রশাসনিক পদের স্থায়িত্ব অথবা আইনজীবী ও শিক্ষাবিদের নিরুপদ্রব মর্যাদা ও সংস্কৃত জীবনযাত্রা উচ্চবর্ণের হিন্দুব কাছে অনেক বেশি বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর একসময়ে ব্যবসায়ে বিপদের সম্মুখীন হন। যেহেতু ইংরেজি ভাষা ও আইনশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল কাজেই তাঁর সামনে একটি বিকল্প পথ খোলা ছিল। ব্যবসায় থেকে সরে গিয়ে তিনি অর্থ ও প্রতিষ্ঠালাভ করেন আইনের ক্ষেত্রে। পববর্তীকালে জমিদারির সঙ্গে আইনচর্চা অথবা প্রশাসনিক চাকুরির সংযোগটাই জীবিকার সুগম পথ হিসেবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙ্গালিরা নিজেদের ও পুত্রদের জন্য গোড়া থেকেই বেছে নিতেন সচরাচর। ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শুধু কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই নয়, বিহার থেকে সুদূর পঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বাঙালিরা নতুন শিক্ষাধারার অগ্রদূত হিসেবে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন।

জীবিকার এইসব পথ বহুদিন পর্যন্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে একরকম বন্ধ ছিল

বলা চলে। এর প্রধান কারণ সাংস্কৃতিক বা শিক্ষাগত। হিসেবে দেখা যায় যে, ১৮৮৩-৮৪ সালে, অর্থাৎ রামমোহনের মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পরেও, বাংলাদেশের কলেজসমূহে মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা পঁচানব্বই ভাগই ছিল হিন্দু আর এই হিন্দু ছাত্রদের ভিতর শতকরা পঁচাশি ভাগ ছিল উচ্চবর্ণের। এরপর তৎকালে সরকারি চাকুরিতে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুর সংখ্যাল্পতায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

উচ্চবর্ণের হিন্দুরা উনিশ শতকে, এমন কি বিশ শতকের গোড়াতেও, কেন শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অগ্রসর হয়নি, এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণে জমির মালিকানাই অপেক্ষাকৃত লাভজনক ছিল। কিন্তু এই উত্তরটা সম্ভবত যথেষ্ট নয়। প্রশ্নটা এই নয় যে, বাঙালি নব্য মধ্যবিত্ত জমিদারির প্রতি আকৃষ্ট হলো কেন। জমিদারির সঙ্গে শিল্প অথবা ব্যবসায় যোগ করা যায়, যেমন যোগ করা যায় ওকালতি অথবা সরকারি চাকুরি। প্রশ্নটা এই যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এই দ্বিতীয় সংযোগটাই বেছে নিল কেন? জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে জমির ভাগবণ্টনের ফলে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই মধ্যবিত্ত পরিবারের জমি থেকে আয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কমতে থাকে। কিন্তু চাকুরিকে আঁকড়ে ধরার প্রবৃত্তি অথবা অভ্যাস ততদিনে দুর্মর হয়ে উঠেছে। অথচ কিছু অবাঙালি তো বটেই, নিম্নবর্ণের বাঙালি হিন্দুদের ভিতরও কোনো কোনো সম্প্রদায় ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই নিজেদের জীবিকার উপায় করেছে। তাদের সামনে অন্যপথ বড়ো বেশি ছিল না। উনিশ শতকের গোড়ায়, পথ বেছে নেবার সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে, উচ্চবর্ণের হিন্দুর সামনে শহরে সরকারি চাকুরির অন্যপথ খুলে গিয়েছিল। যদি তা না হতো, যদি কোনো কারণে ঐ পথটি হিন্দুর কাছে বন্ধ এবং মুসলমানের কাছেই উন্মুক্ত হতো, তবে সেই কল্পিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে উচ্চবর্ণের হিন্দুকেও সম্ভবত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই আরও উদ্যোগী দেখা যেত। বাঙালি মুসলমান যে সেইদিকে অগ্রসর হয়নি তার অন্তত আংশিক কারণ তৎকালীন মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভাব। যাই হোক কল্পিত ইতিহাস নিয়ে অনুমানের চেষ্টা বেশিদূর না করাই ভালো। বাস্তব পরিস্থিতিতে উচ্চবর্ণের হিন্দু যে-পথ বেছে নিয়েছে, যে-যুক্তির অনুসরণ করেছে, সেটাই আলোচ্য। এই পথনির্বাচন বিশুদ্ধ আর্থিক গণনা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ হিন্দুর বংশানুক্রমিক যে ঐতিহ্য, বিভিন্ন বৃত্তি ও পদের সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে তাদের যা ধারণা, সেদিনের ইতিহাসে তাদের সাংস্কৃতিক যে-অভিলাষ বা দিগন্তবোধ, এইসব মিলেই চলবার পথও নির্দিষ্ট হয়েছিল।

যে-নাগরিক সম্প্রদায়ে উনিশশতকী নবজাগরণের উদ্ভব তার আর্থিক ও সামাজিক পটভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুয়েকটি কথা বলা গেল। এবার সেই নবজাগরণের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা আবশ্যক।

হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মের নবমূল্যায়ন উনিশশতকী নবজাগরণের প্রথম পর্বের একটা মূল বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে ভিতর থেকে প্রতিবাদ, অথবা ধর্মের সত্যকে নব উপলব্ধির দ্বারা নতুন রূপে আবিষ্কারের প্রচেষ্টা, অবশ্য পূর্বেও ঘটেছে। বর্ণভেদ ও আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বারবার দেখা দিয়েছে। বুদ্ধ এবং চৈতন্যের মতো

প্রচারকেরা সম্যক জ্ঞান এবং ভক্তি অথবা প্রীতিকে সারবস্তু বলে চিনেছেন ও চিনিয়েছেন।

তবু উনিশশতকী নবজাগরণে ধর্মের নবমূল্যায়নের যে-প্রচেষ্টা তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বিদেশি বণিক ও ধর্মযাজক যখন এদেশের মাটিতে দলে দলে উপস্থিত হলো তখন বিশ্বজগৎ এবং অপরাপর ধর্মমত ও ধর্মসমালোচনা আমাদের চৈতন্যের কাছে এমন একটা চমক কি আঘাত পৌঁছে দিল যাতে ঐতিহাসিক নতুনত্ব ছিল। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা পাই রামমোহনের মতো চিন্তার নেতাদের কাছ থেকে ধর্মের যুক্তিবাদী পর্যালোচনা। রামমোহন বিভিন্ন ধর্ম যত্নের সঙ্গে পাঠ করে দেখলেন যে, বিভিন্ন ধর্মের ভিতর কিছু বৈসাদৃশ্য আছে আবার সাদৃশ্যও আছে। তিনি বললেন যে, ধর্মের যেটা মূল সত্য, যেটা সর্বমানবের, সেখানেই বিভিন্ন ধর্মের ভিতর সাদৃশ্য ; আর ধর্মের যে অংশটা আচার ও অন্ধবিশ্বাসকে নিয়ে, সেখানেই দেখা যায় পরস্পর বিরোধ। এই যে নানা দেশের মানুষ ও তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে সজাগ চেতনা ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিচার আর সেই সঙ্গে যুক্তির ভিত্তিতে একটা সর্বমানবীয় সত্যের দিকে অগ্রসর হবার আকাঙ্ক্ষা, এতে আধুনিক যুগের একটা বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব সেনের ধর্মচিন্তার অবশ্য অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। আধুনিক বিজ্ঞান যতই মানুষকে জড় প্রকৃতির অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করে ততই মানুষের আধ্যাত্মিক প্রশ্ন একটা নতুন রূপে উপস্থিত হয়। প্রকৃতির নিয়মবদ্ধতা আর মানুষের আন্তরিক মুক্তির কামনা এ'দুয়ের ভিতর কি ক'রে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায়, এই অনুসন্ধান দেবেন্দ্রনাথের ভিতর একটা ব্যক্তিগত আকুলতা নিয়ে দেখা দেয়।

উনিশশতকী নবজাগরণে ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সমাজসংস্কারের যোগ হয়। দু'টি মূল প্রশ্ন অনেকখানি আলোড়ন সৃষ্টি করে : প্রথমটি নারীর স্বাধীনতা নিয়ে, দ্বিতীয়টি ব্রাহ্মণের অগ্রাধিকার ও জাতিভেদসংক্রান্ত। সতীদাহনিবারণ ও বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ভূমিকা সবাই জানেন। নারীর শিক্ষালাভের অধিকার সাধারণভাবে শুধু উদারপন্থীরাই নয়, রক্ষণশীলদের ভিতরও অনেকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঘরের বাইরে যে বৃহৎ ও বিচিত্র জগৎ সেখানে নারী স্বাধীনভাবে নিজের স্থান বেছে নিতে পারবে কি না, এটা ছিল বিতর্কিত বিষয়। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ভিতরও এ ব্যাপারে মতের গভীর ও তীব্র পার্থক্য ছিল, পিতাপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের ভিতর যার প্রতিফলন সুপরিচিত। একথা স্বীকার্য যে, নারীর এই স্বাধীনতার অধিকার বৃহত্তর সমাজ মেনে নিতে পারেনি। জাতিভেদের ক্ষেত্রেও রক্ষণশীলেরাই দলে ভারী ছিল। কিন্তু এইসব প্রশ্ন নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা ও বিতর্ক, উনিশশতকী নবজাগরণের কাছে এইজন্য আমরা ঋণী। এরপর কোনো বাঙালি বিদ্বজ্জনের পক্ষে আর জাতিভেদ অথবা সাম্প্রদায়িকতাকে সরাসরি সমর্থন করা সহজ রইল না।

এক শতকের ভিতর বাংলা সাহিত্যে যে বহুমুখী পরিবর্তন দেখা যায় সেটা চমকপ্রদ। ধর্ম ও সমাজসংস্কার নিয়ে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের যুগে যে বিতর্ক তারই ভিতর দিয়ে আধুনিক বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধসাহিত্যের সূত্রপাত। এ জাতীয় জিনিস পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছিল না। সেই সঙ্গে দেখা দেয় তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতিকে একটু দূরত্বে রেখে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখবার বিশেষ মানসিকতা এবং সাহিত্যে তার প্রতিফলন।

প্রবন্ধে, প্রহসনে, নাটকে পাওয়া যায় এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ।[৩] দেবদেবীর স্তুতি ও মাহাত্ম্য-কীর্তনের একটা আবরণ অন্তত রক্ষা করতে এতদিন অভ্যস্ত ছিল বাংলা সাহিত্য, তা নইলে কাব্যে মঙ্গল কোথায়, স্থায়িত্ব কোথায় ? এবার সেই আবরণ পরিত্যক্ত হলো, মানুষ ও সমাজকে আপন মর্যাদায় সাহিত্যের বিষয়বস্তুরূপে সরাসরি গ্রহণ করা হলো, বাংলা উপন্যাসের জন্ম হলো। পুরাণ ও মহাকাব্যের চরিত্রগুলি ফিরে এল নতুন যুগ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে আধুনিক অর্থ ও ব্যঞ্জনা বহন করে, মধুসূদনের কাব্যে যার উদাহরণ। এই সবের ভিতর দিয়ে আরও গূঢ় একটি পরিবর্তন সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। পুরনো ঐতিহ্যে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ও পরিস্থিতির বর্ণনার জন্য কিছু গৃহিত উপমা ও বাক্যাংশ ছিল, যার যথাযথ ব্যবহার লেখকের কারিগরিতে প্রধান হয়ে উঠত। যেহেতু নতুন যুগের সার্থক লেখকের উদ্দেশ্য শুধু ঐতিহ্যকে ভাষা দেওয়াই নয় বরং একটা ভিন্ন ও বহুপরিমাণে ব্যক্তিগত ভাবনাকে মূর্তিদান করা, অতএব নতুন শব্দ ও রচনাশৈলীর সচেতন সাধনা কাব্য ও সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হয়ে উঠল। ব্যক্তির মূল্য, অথবা রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিকের চিত্রাঙ্কনে ও অনুভূতিতে একটা বিশেষ মূল্যলাভ করল। মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, বিশেষত নারীর চরিত্রচিত্রণে, এটা পরিস্ফুট। সাহিত্যে নবজাগরণের আর একটি সার কথা এই যে, বাংলা সাহিত্য এবার বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হলো। বিশ্বসাহিত্যের দিকে মনের একটা জানালা খোলা রাখা, বাইরের সেই প্রভাবকে নিজের মনে গ্রহণ করে তাকে ক্রমাগত নতুন শিল্পবস্তুতে পরিণত করা, সাহিত্যিকের স্বধর্মের অঙ্গ বলে স্বীকৃত হলো।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগের সঙ্গে শেষভাগের সুরের একটা অমিল অবশ্য অনেকেই লক্ষ করেছেন। রামমোহন ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পুনরাবিষ্কৃত করেন উপনিষদের যুগের আলোতে। পরে গীতা প্রাধান্য লাভ করে, শিবাজী ও রাণা প্রতাপ কাব্যে ও রাজনীতিতে পুনঃপ্রবেশ করেন। স্বাদেশিকতার অভ্যুত্থান ও শক্তিবৃদ্ধির ফলে সমাজ-সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতিস্তুতিও লেখক ও বুদ্ধিজীবীর কর্তব্যের অংশ হয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ প্রেমেরও তাঁর সীমা ছিল না। সাহসে ও সহানুভূতিতে তাঁর স্বাদেশিকতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম অথবা শাস্ত্রের মাহাত্ম্যপ্রচার তিনি আবশ্যক মনে করেননি। বরং ইংরেজি সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ ক'রে দেশীয় পণ্ডিত ও চিন্তকেরা মুক্তমনে এদেশের প্রাচীন শাস্ত্রের সমালোচনা করবেন, দেশের উন্নতির জন্যে এইরকমই প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। যতদিনে আমরা বিবেকানন্দের যুগে এসে পৌঁছই ততদিনে দেশের রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবীর চিত্তপ্রবৃত্তি দু'য়েরই অনেকখানি পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিন্তু যে যুক্তিধর্মিতাকে নিয়ে উনিশশতকী নবজাগরণের শুরু তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য দেখিয়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গে পুরনো যুগের কৃষ্ণমাহাত্ম্যকীর্তনের কত তফাৎ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্য যুক্তিধর্মী রচনাশৈলীর উজ্জ্বল উদাহরণ। কঁৎ ও সেইযুগের বাস্তবাশ্রয়ী চিন্তাধারা বঙ্কিম-মানসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তৎকালীন প্রাগ্রসর দর্শনকে অস্বীকার করে নয়, বরং একপ্রকারে তাকে আত্মসাৎ করেই, বঙ্কিম তাঁর অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল চিন্তাভাবনাকে সাজাতে চেষ্টা করেছেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সংযোগ প্রশ্নাতীত। তবে মানুষের চেতনার বিবর্তনে

অবিশ্বাসেরও যে একটা বিশেষ স্থান আছে, একথা তিনি জানতেন। তিনিও আধুনিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত। স্বাজাত্যের সঙ্গে মিশিয়ে মানবতাবাদকে তিনি পরালেন অন্য এক বেশ, দরিদ্রনারায়ণের সেবা।

উনিশশতকী নবজাগরণ একদিন ধর্ম ও সমাজসংস্কার, শিল্প ও সাহিত্য, সবকিছুকে ব্যাপ্ত করে শুরু হয়েছিল। ধর্ম ও সমাজসংস্কারে তার প্রভাব তেমন গভীর হয়নি, তবে ভারতের অন্যান্য বহু অংশের তুলনায় জাতিভেদ ও ধর্মান্ধতা এখনও বাঙালিদের ভিতর তেমন কট্টর ও প্রবল নয়। অবশ্য এর অন্য কারণও আছে। নবজাগরণের স্থায়ী প্রভাব পড়েছিল বাঙালির সাহিত্যে। এবং মূল্যবোধে, বুদ্ধিমুক্তির মূল্য সম্বন্ধে একটা সচেতনতায়। এই মূল্যবোধও আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ পরাজিত হয়নি। বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন এই শতকের প্রথমভাগে পূর্ববাংলার মুসলমান চিন্তানায়কদের একাংশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই আন্দোলনের একটি ধারা নানা সংকটের ভিতর দিয়ে আজও, বিশেষত কবি-লেখকদের ভিতর দিয়ে, প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

অর্থাৎ, উনিশশতকী নবজাগরণ প্রধানত চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে উদ্ভূত হ'লেও, সেই সামাজিক সীমার দ্বারা বহু পরিমাণে খণ্ডিত ও বিকৃত হ'লেও, তার ভিতর একটা মূল্যাশ্রয়িতা ও অসামান্যতা ছিল। বাঙালির যদি আজ কোনো বিশেষ পরিচয় থাকে তো উনিশশতকী নবজাগরণকে অনুক্ত রেখে সেই পরিচয় উচ্চারণ করা যায় না।

তবু-যে বাঙালি মধ্যবিত্তের একাংশ সেই নবজাগরণকে অবজ্ঞা করতে চাইছে, তার অবমূল্যায়নের চেষ্টা করছে, তারও নিশ্চয়ই কারণ আছে। মোটাভাবে বলতে গেলে কারণটা সম্ভবত এইরকম। নবজাগরণ সত্ত্বেও বাংলার দুরবস্থা ঘোচেনি, আর্থিক সংকট থেকেই গেছে। বাংলার কৃষক দারিদ্র্য ও অত্যাচারে পীড়িত, শিক্ষিত যুবকদের ভিতর বেকারী ব্যাপক, বাংলার অর্থনীতি দ্রুত উন্নয়নের গতি লাভ করেনি। এসব কথা স্বীকার্য। কিন্তু প্রশ্ন তবু থেকে যায়।

আরও কয়েক শতাব্দী আগে, অর্থাৎ পনেরো শতকে, ইতালির বিখ্যাত রেনেসাঁসের কথা আমরা জানি। সেই রেনেসাঁসের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করা হয়ে থাকে। মনে রাখা ভালো, ইতালির আর্থিক সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান সেদিন হয়নি এবং বিশ শতকের গোড়াতেও ইতালি আর্থিক দৃষ্টিতে ইয়োরোপের পশ্চাৎপদ দেশের ভিতরই গণ্য ছিল। পনেরো শতকের নবজাগরণও শহরকেন্দ্রিক ছিল। ইতালির দরিদ্র চাষী তারপরও দরিদ্রই থেকে গেছে। তবু-যে সেই নবজাগরণের একটা মূল্য স্বীকার করা হয়েছে তারও তো একটা কারণ আছে।

আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে রেনেসাঁস একটা নতুন চেতনা যোগ করেছিল। মানুষ-যে সমাজে কোনো একটি পূর্বনির্দিষ্ট স্থান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, ব্যক্তি-মানুষ-যে বিচিত্র সম্ভাবনাকে বহন করে আনে এবং নানা অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়ে একটি নিজস্বতা ও অনন্যতা লাভ করে, এই অনন্যতার যে একটি বিশেষ মূল্য আছে, মানুষের সৃজনীশক্তি ও স্বাধীনতার অর্থ উদঘাটনে এই মূল্যবোধ যে একান্ত প্রয়োজনীয়, আবার প্রতিটি ব্যক্তি এই অর্থে বিশেষ হয়েও যে বিশ্বমানবের সঙ্গে মানুষের অধিকারে যুক্ত, এই রকম কয়েকটি কথা রেনেসাঁসের মূল বাণী হয়ে আছে। সমাজ ও চেতনার অভিব্যক্তির কোনো একটি স্তরে এই কথাগুলি

স্পষ্টভাবে উচ্চারিত না হলে একটা বড়ো অভাব থেকে যায়। সমাজের সমস্ত সমস্যার এতে সমাধান হয় না, বরং বহু সমস্যা এর পরও থেকে যায়। তবু নবজাগরণের আধারে বিধৃত এই বিশেষ মূল্যবোধের একটা সার্থকতা আছে, কারণ এছাড়া বিশ্বমানবের সংস্কৃতি অসম্পূর্ণ। এ ব্যাপারে আমাদের মনে একটা শ্রদ্ধা রাখাই ভালো। কোনো সমাজের আর্থিক অভাব পূর্ণ হলেই তার সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অনিবার্য হয়ে ওঠে না। সেজন্য একটা বিশেষ ঐতিহ্য চাই। রেনেসাঁস সেই ঐতিহ্যের নির্মাণে মহান সহায়ক, অতএব শ্রদ্ধেয়। তার কাছ থেকে কতটা আশা করা যায় আর কতটা যায় না, এ বিষয়ে সজাগ থেকেও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রক্ষা করা সম্ভব। ইতালিয় রেনেসাঁস ও বাংলার নবজাগরণের ভিতর, বলা বাহুল্য, দেশকালের ব্যবধানে নানা পার্থক্য আছে। কিন্তু আধুনিক বাংলার বিবর্তমান ঐতিহ্যে রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও মধুসূদন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র এবং আরও অনেকে মানবতাবোধ ও বুদ্ধিমুক্তির সমন্বিত যে-আদর্শ যোগ করে গেছেন তাকে মূল্য না দিলে অকারণে আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে দরিদ্র করা হবে।

ইয়োরোপে পনেরো শতকের নবজাগরণের পর এসেছিল পিউরিটান আন্দোলন। মেজাজে সেটাকে বলা যেতে পারে রেনেসাঁসের অনেকটা বিপরীত। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সেটা বিপদ ঘটায়। কিন্তু এরকম খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখলেও বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মধুর জিনিসটা ভালো, তবু লবণ ও কিছুটা তিক্তেরও প্রয়োজন আছে, যদিও মনে হতে পারে শেষের দু'টি প্রথমটির বিপরীত। মাত্রা রক্ষা করাটাই প্রধান কথা। ইয়োরোপের নাগরিক জীবন ঐ আপাত বিপরীতের প্রভাবেই গঠিত হয়েছিল। বাংলার উনিশশতকী নবজাগরণের ইতিহাসেও এর খানিকটা প্রতিতুলনা পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ যে-ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন তাতে 'পিউরিটান' ভাবধারার বিশেষ স্থান ছিল।[৪] আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এমনকি রবীন্দ্রনাথের জীবনেও কিছু পরিমাণে এর প্রভাব দেখা যায়, যদিও রবীন্দ্রনাথ মূলত অন্যভাবের ভাবুক। দ্বারকানাথের জীবনে ভোগের যে আতিশয্য ছিল অথবা দীনবন্ধু মিত্রের লেখায় উনিশশতকী কলকাতার যে সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে দেশ গড়ার কাজ সম্পূর্ণ হয় না। দেবেন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন নিরলস অধ্যবসায় ও আত্মসংযমের ওপর। তবে যে-বাস্তব অবস্থার সঙ্গে যোগাযোগে এই শিক্ষা বড়ো আকারে ফলপ্রসূ হতে পারতো সেই অবস্থা সেদিন দেশে ছিল না।

সামাজিক যে-আধারে উনিশশতকী বাংলা নবজাগরণের জন্ম ও বৃদ্ধি তার অপর একটি পরিণাম এই সঙ্গে উল্লেখ্য। ভারতের পশ্চিম উপকূলে নবজাগরণের যাঁরা নেতা তাঁদের ভিতর অনেকেই একটি কথার ওপর জোর দিয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক অথবা বৌদ্ধিক আন্দোলনের সঙ্গে সামাজিক আন্দোলন ও গঠনমূলক কাজের একটা সমন্বয় ও পরিপূরকতা থাকা প্রয়োজন। বঙ্গদেশে অন্যান্য সব কিছু ছাড়িয়ে রাজনীতিটাই ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠল। এই 'পলিটিক্স-প্রমত্ত'তার বিপদ রবীন্দ্রনাথকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল। তিনি দেখেছিলেন যে, বাংলার নবজাগরণ তার কল্যাণবুদ্ধি হারিয়ে ক্রমে দলাদলি ও উত্তেজনার শিকার হয়ে পড়ছে।

নবজাগরণের আরো একটি দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথ যেমনভাবে বুঝেছিলেন এদেশের স্মরণীয়দের ভিতর তার তুলনা পাওয়া কঠিন। তিনি বুঝেছিলেন যে, গ্রামবাংলায় যদি-

না নতুন জীবন সৃষ্টি করা যায় তবে বাংলার সার্থক নবজীবন সম্ভব নয় । অতএব কলকাতার নাগরিক নিবাস ত্যাগ ক'রে বীরভূমের পল্লী অঞ্চলে তিনি তাঁর কর্মকেন্দ্র বেছে নেন । নবজাগরণের উৎপত্তি অনিবার্যভাবে নগরে । কিন্তু নগর থেকে পল্লীতে যদি তার ব্যাপ্তি না ঘটে তবে তার ক্ষয় অনিবার্য ।

কথাটা উনিশ শতকের শেষ থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । রেনেসাঁসের যুক্তি ও প্রাণবস্তু মূলত আনন্দধর্মী । উনিশ শতকের বাংলায় এই আনন্দধর্মী জীবনদর্শনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তের বৃদ্ধি । এই যোগাযোগে সামাজিক সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান সম্ভব ছিল না । ইংরেজি শিক্ষা যতদিন স্বল্প লোকের ভিতরে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন বড়ো কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি । উনিশ শতকের শেষভাগে মুসলমানদের ভিতরও ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হলো । ক্রমে বাঙালি অবাঙালি, হিন্দু মুসলমান ইংরেজি শিক্ষিতদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়ে চলল । ফলে সরকারি চাকুরি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা বৃদ্ধি পেল । সীমাবদ্ধ শহরে চাকুরির জন্য এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমশ সামাজিক জীবনকে তিক্ত ও বিষাক্ত করে তুলল । এরই অন্যতম পরিণাম, নাগরিক মধ্যবিত্তদের ভিতর বিশ শতকের গোড়ায় চরমপন্থী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রাদুর্ভাব । প্রাগ্রসর ও অনগ্রসর গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ভিতর চাকুরি নিয়ে কাড়াকাড়ি, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব আমাদের সমাজে সেই থেকে একটি দুষ্টক্ষতের মতো আজও জেগে আছে ।

রবীন্দ্রনাথ রেনেসাঁসের সন্তান । তাঁর অন্তবতম প্রেরণাটি আনন্দধর্মী । কিন্তু তিনি এটা স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন যে, এই আনন্দধর্মী বুদ্ধিকে বক্ষা করা যাবে না একান্ত নাগরিক সীমানায়, সরকারি চাকুরিজীবীদের নিয়মতন্ত্রী কোলাহলে আর হতাশ তরুণদের পথভ্রষ্ট সন্ত্রাসবাদেব সন্দিগ্ধ পবিবেশে । পল্লীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সংস্কৃতি ও অর্থনীতির এক নতুন সমন্বয় এজন্য প্রয়োজন । রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে নবজাগরণের বাণী গ্রামবাংলায কিছু পরিমাণে সার্থক কবে তুলতে হলেও গ্রামীণ অর্থনীতিব মৌল পরিবর্তন ও পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন ।

উনিশশতকী নবজাগরণ যদিও শ্রদ্ধেয় তবু নিজেকে বক্ষা কববার শক্তি তার নিজেব ভিতর ছিল না । তাকে রক্ষা করবার জন্যই তার অপূর্ণতা স্বীকার কবে নিতে হয় । নবজাগরণের ধাবাকে ব্যাপ্ত করতে না পাবলে তাকে রক্ষা কবাও যাবে না । তাকে ব্যাপ্ত করা যাবে না গ্রাম ও শহবেব বিন্যাস ও পাবস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ছাডা। এটা বড়ো কাজ । এই কাজটা সামনে রেখে চিন্তা করলে অনেক প্রশ্নই অন্যভাবে দেখা দেয় । কর্মের পরিধির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নবজাগরণের চরিত্রেরও পরিবর্তন অনিবার্য। রেনেসাঁস চিন্তাকে নতুনভাবে ভাবিত হতে হবে । আনন্দিনী বুদ্ধি আর ব্যবহারিকী বুদ্ধির একটা নতুন সমন্বয়ের সময় এসেছে । যুগের এই প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের নতুন ক'রে চিনে নিতে হবে । প্রতিযুগই পূর্বপুরুষদের ও পূর্বঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার করে তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ।

~~আমাদের আগামী দিনের ইতিহাস উন্মুক্ত হবে না কোনো অতিক্রান্ত আন্দোলনের~~ অনুকরণে । একথা পুনরায় বলবার অপেক্ষা রাখে না যে, রেনেসাঁস ও নবজাগরণ এক বস্তু নয়। ইয়োরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁস এনে দিয়েছিল ব্যক্তিত্ব—অথবা, ব্যক্তির

অদ্বিতীয়তা—এবং মনুষ্যত্ব—কিংবা, মানুষের সাধারণ ধর্ম—এ দুয়ের ভিতর একটা সামঞ্জস্যের সমাধান । প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের অন্যতম ফল সেই অনলসতা ও নিয়মনিষ্ঠা, পশ্চিমী সমাজের জাগতিক উন্নতিতে যেটা সহায়ক হয়েছিল । আঠারো শতকের যুক্তির যুগের বাণী এই যে, যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ শতাব্দীর অন্ধতার বন্ধন কাটিয়ে প্রগতির অন্তহীন পথ খুলে দিতে পারে । এই তিন আন্দোলনের ফল যেন আমরা বাংলার উনিশশতকী নবজাগরণের কাছ থেকে একই সঙ্গে আশা করেছি। সেই আশা পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না, সম্ভব নয়। আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির নতুন পথ আজ রচিত হবে না পূর্বতন কোনো শিল্পোন্নয়নের অনুসরণে । এমনকি যুক্তি ও মুক্তির ধারণারও ক্রমাভিব্যক্তি আছে । মানুষ তার মনুষ্যত্বকে আবিষ্কার করবে নব নব রূপে। তবু অতীতের কিছু জিজ্ঞাসা, কোনো কোনো মূল্যবোধ, আশা করা যায়, সহায়ক হবে ভবিষ্যতের পথ খুঁজে নিতে । নবজাগরণের সদর্থ সেইখানে ।

উল্লেখপঞ্জী :

১. ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ লিখেছেন :
'During the years 1757-85 the principal businessmen in Calcutta were mostly higher caste Hindus ... This class of people disappeared from business by the beginning of the nineteenth century. Once again Indian business—whatever it was—fell into the hands of those who belonged to the trader caste.' *Studies in the Bengal Renaissance*, ed. Atulchandra Gupta, National Council of Education, Jadavpur, Calcutta 1958, p.7.

২. দ্রষ্টব্য: Anil Seal *The Emergence of Indian Nationalism*, Cambridge University Press, Paperback Edition, 1971, pp. 59, 61.

৩. এ যুগের ব্যঙ্গসাহিত্যে আক্রমণ চলেছে সমানভাবে প্রাচীনপন্থীদের কাপট্য ও নব্যসংস্কৃতির আতিশয্যের বিরুদ্ধে। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) নাটকে প্রকাশ পেয়েছে ইংরেজি শিক্ষিতদের সংস্কারমুক্তির বিষয়ে তীক্ষ্ম বিদ্রূপ । 'নিম (চাঁদ)। ...আমি জানি হিন্দুরা, যেমন প্রেজুডিসবশতঃ মদ খায় না, তেমনি অনেক হাকিম প্রেজুডিসবশতঃ ঘুস খায় না। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমার প্রেজুডিস গিয়েছে, কেবল অর্দ্ধচন্দ্রের ভয়েতে ঘুস খাও না ।' কলকাতার ভোগবাদী নাগরিকজীবনের বিরুদ্ধে নিদারুণ শ্লেষ নিয়ে রচিত হয়েছে 'বাঙ্গাল' রামমাণিক্যের করুণ একটি কাতরোক্তি। 'রাম। ... বাঙ্গাল কউশ ক্যান--এতো অকাদ্য কাইচি তবু ক্কলকত্তার মত হবার পারচি না ? ক্কলকত্তার মত না করচি কি ? মাগীবারী গেচি, মাগুবি চিকোন দুতি পরাইচি, গোরার বারীর বিস্‌কাট বক্কোন করচি, বাণ্ডিল খাইচি— এতো কর‍্যাও ক্কলকত্তার মত হবার পারলাম না ...(মাতাল হইয়া পপাত ধরণীতলে) ।' কারো কারো মতে নিমচাঁদের চরিত্রের ভিতর দিয়ে মধুসূদন দত্তকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে ; তবে এ বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্রের উক্তি, মধু কি নিম হতে পারে !
মধুসূদন মূলত মানবতাবাদী, নগরসংস্কৃতি ও বুদ্ধিমুক্তির সপক্ষে । 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) প্রহসনের প্রধান চরিত্র, ভক্তপ্রসাদ, বৃদ্ধ ও কামাতুর অথচ বাহ্যদৃষ্টিতে অতি ধার্মিক । ভক্তপ্রসাদ ও আনন্দের ভিতর মহানগরীতে পাঠরত যুবক অম্বিকা সম্বন্ধে একটি কথোপকথন এই রকম :
'ভক্ত । ...অম্বিকা তো কোনো অধর্মাচরণ শিখছে না ।
আন । আজ্ঞে, অধর্মাচরণ কি ?
ভক্ত । এই দেবব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এইসকল খ্রীষ্টিয়ানি মত—

আন । আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ করে বলতে পারি না ।
ভক্ত । ...আমি শুনেছি যে কলকেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে ? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, সোনার বেণে, কপালী, তাঁতী, জোলা, তেলী, কলু সকলই না কি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়াদাওয়াও করে? বাপু, এ সকল কি সত্য ?
আন । আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যা তাও নয় ।'

৪. এই প্রসঙ্গে আরও পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :
David Kopf, *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind*, Princeton University Press, 1979 ।

সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ

আধুনিকতাবিমুখ বাঙালি মুসলমান ও বাংলাদেশের বিকাশ সমস্যা

আজকের বিশ্বের সবচাইতে দরিদ্র এবং অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ একটি। এই অবস্থার জন্য যেসব কারণ সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয় সেসব হলো : ক. বাংলাদেশের সীমিত সম্পদ; খ. জনসংখ্যা-বিস্ফোরণ; এবং গ. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব। কিন্তু বাংলাদেশের অনগ্রসরতার জন্য যে কারণটি আমার কাছে মৌলিক বলে মনে হয় সেটি হলো আমাদের আধুনিক মন ও মানসিকতার অভাব। বিশ শতকের শেষ পাদে বাস করলেও আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মনকে মধ্যযুগীয় অন্ধ বিশ্বাস ও গোঁড়ামি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে মানুষের জীবনধারণের ক্ষেত্রে যে সকল সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি ভোগ করা সত্ত্বেও আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের চিন্তাধারায় অতীতমুখী মনোভাব প্রকটভাবে বিদ্যমান। এ অবস্থা কেবল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নয়। প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। ইউরোপের তুলনায় প্রাচ্যের চিন্তাধারায় অতীত বা পশ্চাৎমুখী মনোভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। এর দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমত, ইউরোপের তুলনায় এশিয়ার সভ্যতা প্রাচীনতর। দ্বিতীয়ত, গত দু'শ বছরের মধ্যে এশিয়ার অধিকাংশ দেশ কোনো-না-কোনো সময়ে কোনো ইউরোপিয় শক্তির অধীনে ছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই দেশগুলি ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর পরাধীন যুগকে ভুলে যাবার চেষ্টা এবং এ-যুগের অবদানকে অস্বীকার করার প্রবণতা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণেই বোধহয় আমরা অনেকে অতীতের কল্পিত স্বর্ণযুগকে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখি।

এই উপমহাদেশে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথম দিকে, বিশেষ করে ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে। এবং এর ধারক ছিল নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বস্তুত ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই উপমহাদেশে একটি দেশজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং উনিশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত এই শ্রেণী সর্বক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই উপমহাদেশের পুরাতন ঐতিহ্যিক সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনো স্থান ছিল না বলা যায়। ইংরেজ রাজত্বকালে ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে সহযোগিতার ফলে এক নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। উনিশ শতকের প্রথমভাগ নাগাদ এই শ্রেণী ছিল প্রধানত হিন্দুদের দ্বারা গঠিত। এর কারণ হিন্দুদের বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। সুদীর্ঘ মুসলিম রাজত্বকালে তারা অনেকেই সে আমলের রাজভাষা ফার্সি এবং এমনকি

আরবি শিখতে দ্বিধা করেনি এবং তার ফলে মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতা করে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। তেমনি ইংরেজ রাজত্ব এদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হিন্দুরা সাগ্রহে নতুন শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে লাভবান হয়েছে। তারা ইংরেজি ভাষা শিখতে সর্বাধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং এই ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন এবং বিশেষ করে আঠারো ও উনিশ শতকের যুক্তিবাদী ও উদারনৈতিক এবং মানবতাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেছে। এর ফলেই শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের 'বাংলার রেনেসাঁস' বা নবজাগরণ। মধ্যযুগীয় আবর্ত থেকে হিন্দু সমাজের আধুনিক উত্তরণ ঘটেছিল এই রেনেসাঁস আন্দোলনের মাধ্যমেই। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মসংস্কার আন্দোলন, ইয়ং বেঙ্গলের অনুসারীদের যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী চিন্তা এবং বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন হিন্দু সমাজকে নিয়ে গিয়েছিল আধুনিকতা ও প্রগতির দ্বারপ্রান্তে। এরপর থেকে শুরু হয়েছিল অগ্রগতির পথে হিন্দুসমাজের জয়যাত্রা।

তুলনামূলকভাবে বাংলার সমকালীন মুসলমান সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাই সম্পূর্ণ ভিন্নচিত্র। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল বরাবরই দুর্বল। এই দেশীয় মুসলমানদের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তেমন উৎসাহ কখন দেখা যায়নি। এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত হিন্দু বণিক ও মহাজনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ব্রিটিশ আমলের আগে থেকেই এই দেশের অধিকাংশ ভূসম্পত্তি হিন্দুদের হাতে ছিল। নবাব মুর্শিদকুলী খানের সময় বাংলার জমিদারদের তিন-চতুর্থাংশ এবং অধিকাংশ তালুকদার হিন্দু ছিলেন। মোগল শাসনব্যবস্থার অধীনে মুর্শিদকুলী খান বহুসংখ্যক হিন্দুদের রাজকর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করেন। বস্তুত মুসলমান আমলে এদেশের রাজস্ব বিভাগের চাকুরি প্রায় একচেটিয়াভাবে হিন্দুদের হাতে ছিল। কেবলমাত্র বিচার বিভাগে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু অধিকাংশ বিচারক, উকিল ও আইনজীবী ছিলেন বহিরাগত মুসলমানদের বংশধর—তাঁরা বাঙালি ছিলেন একথা বলা যায় না। মুসলিম আমলে বাংলার নবাব এবং অভিজাত শ্রেণীর একটা বিরাট অংশ ছিলেন অবাঙালি এবং বহিরাগত। মুসলিম আমলে মুসলমানদের আধিপত্য প্রধানত মুসলিম রাজশক্তির উপরে নির্ভরশীল ছিল। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন সেই রাজশক্তি ভেঙে পড়ল ঐ রাজশক্তির উপর নির্ভরশীল আর্থ-সামাজিক কাঠামোতেও ভাঙন দেখা দিল।

উনিশ শতকের বাংলার মুসলিম সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এই সমাজ ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন অধিকাংশ নগরবাসী বহিরাগত মুসলমানদের বংশধর এবং উর্দুভাষী। অন্যদিকে বাংলার অধিকাংশ জনসাধারণ ছিলেন দরিদ্র গ্রামবাসী এবং তাঁদের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। ফলে নগরবাসী অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্গে গ্রামীণ দরিদ্র মুসলমানদের একটা বিরাট ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে যখন প্রয়োজনের তাগিদে নগরবাসী মুসলমান অভিজাত শ্রেণী ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজের অবস্থার উন্নতি করতে কিছুটা সক্ষম হয়, তখন তার সুফল গ্রামীণ অঞ্চলের মুসলমান জনসাধারণ ভোগ করতে পারেনি। কিন্তু এই অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান নেতারা বাংলার সমগ্র মুসলমান সমাজের

নেতৃত্ব দাবি করতে দ্বিধা করতেন না। তাঁরা হয়তো মনে করতেন যে উত্তরাধিকারীসূত্রে বাংলার অবাঙালি মুসলমান নবাবদের স্থান অন্তত সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁদেরই প্রাপ্য। ইংরেজ সরকারও তাঁদের 'নবাব', 'খান বাহাদুর' প্রভৃতি গালভরা উপাধি দিয়ে ভূষিত করে তাদের সন্তুষ্ট রেখেছিল। এইভাবে ব্রিটিশ সরকারের অনুরক্ত এক নব্য মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। পরে এই শ্রেণীর লোকেরা যে রাজনীতি করতে শুরু করলেন সে রাজনীতি ছিল আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি। তাঁরা রাজনীতি করতেন নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থে। জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করা, তাদের অর্থনৈতিক কল্যাণসাধন কিংবা তাদের সামাজিক উন্নতির জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তাঁদের রাজনীতিতে ছিল না। এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রে নবাব আবদুল লতিফের মতো ব্যক্তি নেহাৎ জাগতিক প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল। সমকালীন মুসলমান সমাজের কুসংস্কার ও গোঁড়ামিকে প্রতিহত না করে তিনি এগুলির সঙ্গে আপস করতে চেয়েছিলেন।

অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের মানুষ—যারা অধিকাংশই ছিল মুসলমান এবং কৃষক-শ্রেণীভুক্ত—তাদের অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হচ্ছিল। জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারে বাংলার কৃষকশ্রেণী জর্জরিত হচ্ছিল। কিন্তু এই অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি কোন পথে আসবে সে সম্বন্ধে তাদের কোনো সচেতনতা বা পরিষ্কার ধারণা ছিল না। শহরের শিক্ষিত মুসলিম অভিজাত শ্রেণী গ্রামবাংলার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। দুর্দিনে ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই দেখতে পাই উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলার দরিদ্র কৃষকশ্রেণী—যারা ছিল অধিকাংশ মুসলমান—তারা তাদের আর্থ-সামাজিক দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য যে আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েছিল, সেটা ছিল মূলত ধর্মীয় আন্দোলন। আরবের ওয়াহাবী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিতুমীর ও হাজি শরিয়াতুল্লাহ্ পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার গ্রামীণ অঞ্চলে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেটা পুরোপুরি শ্রেণী সংগ্রাম ছিল না। আন্দোলনটা জমিদার ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু এর প্রধান উৎস ও প্রেরণা ছিল ধর্মীয়। তিতুমীর ও শরিয়াতুল্লাহ প্রমুখ গ্রামীণ নেতা খুব শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের মানুষ ছিলেন। শিক্ষাগত ও মানসিক সীমাবদ্ধতার জন্য তাঁরা সহজসরলভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ হলো তারা হজরত মুহম্মদের যুগের আদি ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং মুসলমানদের অতীতের হৃতগৌরবকে ফিরিয়ে আনতে হলে মুসলমানদের সেই অতীত যুগের জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে হবে। উত্তর ভারতের রায়বেরেলির সৈয়দ আহ্মদ এই মতবাদ প্রচার করার জন্য তারিকা-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলন গঠন করেন। তিনি ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্য পাঞ্জাবের শিখ রাজত্বের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' করতে গিয়ে ১৮৩১ সালে শহীদ হন। ঐ বছরই পশ্চিমবঙ্গের বারাসত থেকে অদূরে সৈয়দ আহ্মদের অনুসারী তিতুমীর কোম্পানির সরকারের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদত বরণ করেন। তিতুমীরের আন্দোলন ছিল জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। এই জমিদাররা নানা উপায় উদ্ভাবন করে নানা অছিলায় প্রজাদের নিকট থেকে কর আদায় করত। মুসলমান প্রজারা বিশেষ-

ভাবে ক্ষুব্ধ হলো যখন তাদের দাড়ি রাখার উপর কর ধার্য করা হলো । মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির উপর ছিল এটা চরম আঘাত । এর ফলে যে সংঘাত শুরু হলো সেটা সাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করেছিল । তেমনি পূর্ববঙ্গে শরিয়াতুল্লাহ্ ও তাঁর পুত্র দদুমিয়ার নেতৃত্বে ফরায়জী আন্দোলনটি মূলত ধর্মীয় আন্দোলন ছিল এই অর্থে যে ইসলামে যা 'ফরজ' অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় সেটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই আন্দোলনের সূচনা । কিন্তু এর একটা অর্থনৈতিক দিকও ছিল । এটা ছিল জমিদার ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের বিদ্রোহ । কৃষক সমাজের উন্নতি কিভাবে করা যায় সে সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা ধারণা ছিল অনুপস্থিত । ফলে এইসব আন্দোলন নেহাত বিদ্রোহের আকার ধারণ করে নিঃশেষিত হয়েছে; যথার্থ বিপ্লবে পরিণত হতে পারেনি । আর একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন । বাংলার সব জমিদার হিন্দু ছিলেন এবং সব কৃষক ছিলেন মুসলমান, এটা ঠিক নয়। বাংলার অধিকাংশ জমিদার হিন্দু ছিলেন সত্য; কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান জমিদারও ছিলেন । এবং হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের মধ্যে চরিত্রগত কোনো পার্থক্য ছিল না । উভয়ই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রজাদের শোষণ করতেন । উনিশ শতকে মুসলমান জমিদার-কর্তৃক মুসলমান কৃষকদের উপর উৎপীড়নের এক করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন সেকালের প্রখ্যাত মুসলিম সাহিত্যিক মীর মোশারাফ হোসেন তাঁর 'জমিদার দর্পণ' গ্রন্থে । তেমনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কৃষকদের উপব ইউরোপীয় নীলকর ও এদেশীয় হিন্দু কর্মচারীর অত্যাচারের চিত্র দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুবিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণে' তুলে ধরেছেন । বস্তুত ১৮৫৯-৬০ সালের নীল বিদ্রোহ এবং ১৮৭২ সালের পাবনায় কৃষক বিদ্রোহের সময় দেখা যায় বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা শ্রেণীচেতনা । এইসময় কৃষকরা ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একত্রিত হয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছে । কিন্তু এই সংগ্রাম সফল হয়নি । বাংলার হিন্দু-মুসলমান অভিজাত-শ্রেণী ও ভদ্রলোক সম্প্রদায় যাঁরা ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধাদি ভোগ করে আসছিলেন—তাঁরা নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিতে চাননি । স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—যিনি কৃষকদের দুর্দশার প্রতি সমবেদনা জানিয়ে 'বঙ্গদর্শন'-এ একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন—তিনিও শেষ পর্যন্ত কৃষক বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি । এমনকি মীর মোশারাফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' পুস্তকটির প্রচার ঐসময়ে বন্ধ করাব জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল এর প্রভাবে কৃষকশ্রেণীর দ্বারা জমিদারদের স্বার্থ বিঘ্নিত এবং তাদের ভাবমূর্তি কলুষিত হতে পারে ।

উনিশ শতকেব বাংলার হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে হিন্দুসমাজে রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ পর্যন্ত নেতারা হিন্দুসমাজের চিরন্তন কুসংস্কারাদি দূর করে হিন্দুসমাজকে সমকালীন যুগের প্রয়োজনে পুনর্গঠন করার প্রয়াস করেছেন এবং তাঁদের আন্দোলনের ঢেউ শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল । হিন্দুসমাজে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের সঙ্গে শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল ।

তুলনামূলকভাবে মুসলমান সমাজের অবস্থা ছিল অন্যরূপ । মুসলমান নেতারা

ছিলেন অধিকাংশই নগরবাসী; তাঁরা নিজেদের বহিরাগত মুসলমানদের বংশধর বলে গর্ব অনুভব করতেন এবং নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতে ঘৃণাবোধ করতেন। এমনকি নিজেদের পরিবারে উর্দু ভাষায় কথা বলতেন (যদিও সে উর্দু লখনউ বা দিল্লির উর্দুর মতো অতটা মার্জিত ছিল না), এবং বাংলাভাষাকে নিম্নশ্রেণীর ভাষা বলে অবজ্ঞা করতেন । তাঁদের সঙ্গে স্বভাবত গ্রামবাংলার জনসাধারণের কোনো আত্মিক যোগাযোগ ছিল না । এ হেন নেতৃবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর ভারত থেকে আগত, বিশেষ করে জৌনপুরের মৌলানা কেরামত আলির অনুসারীরা বাংলার গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন । তাঁরা এদেশের অমুসলমান বা হিন্দুদের ব্যাপকভাবে ইসলামে দীক্ষিত করতে সক্ষম হননি । কিন্তু তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তিতুমীর ও শরিয়াতুল্লাহ্ যে ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন তার সূত্র ধরে মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে আদি বা পৌরাণিক ইসলামের অর্থাৎ শরিয়তের বিধান অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করা । এই আন্দোলন উনিশ শতকের শেষের দিকে ব্যাপকতা লাভ করে কিছু সংখ্যক বাঙালি মৌলভি যেমন জমিরুদ্দীন ও মুন্সি মেহেরুল্লাহ্ প্রমুখ ধর্ম-প্রচারকের প্রভাবে । গ্রামবাংলার হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় বৈপরীত্য ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও যুগযুগান্তকাল ধরে পাশাপাশি বাস করার ফলে এক সমন্বয়ধর্মী দেশজ ও লোকজ সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটেছিল । এটির অত্যাশ্চর্য সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায় সতেরো শতকে মহাকবি আলাওলের কাব্যে এবং উনিশ শতকের মরমী সাধক ফকির লালন শাহ্-এর গানে । মোল্লা মৌলভিদের এই নতুন ইসমলামীকরণের আন্দোলনের ফলে সেই সমন্বয়ধর্মী বাঙালি সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরল । শুরু হলো এক নেতিবাচক আন্দোলন ; সংস্কৃতি বর্জনের পালা । মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হিন্দুদের যা কিছু সব বর্জন করতে হবে, এই ছিল এইসব মোল্লাদের নির্দেশ। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে উর্দুভাষার প্রচলনের চেষ্টা করা শুরু হলো । বাঙালি মোল্লা মৌলভিরা উর্দুভাষায় মিলাদ পাঠ করা প্রচলন করলেন। বাংলাভাষায় অধিক সংখ্যক উর্দু শব্দ আমদানি করে এক স্বতন্ত্র মুসলমানী বাংলা চালু করার চেষ্টা করা হলো এবং এই ভাষায় অসংখ্য পুথি রচিত হতে লাগল । এই প্রক্রিয়া নবাব আবদুল লতিফ প্রমুখ রক্ষণশীল অভিজাত শ্রেণীর নেতাদের স্বার্থের অনুকূলে ছিল, কারণ উর্দুভাষার মাধ্যম এই শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের বাংলার মুসলমানদের উপর তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করায় বিশেষ সহায়ক হয়েছিল । রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এইসব উর্দুভাষী ব্যক্তি বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে সরকার ও জনসাধারণের নিকট থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন । এঁদের মধ্যে পড়েন ঢাকার নবাব পরিবারের বেশ কয়েকজন, যেমন নবাব সলিমুল্লাহ্ থেকে শুরু করে খাজা নাজিমুদ্দিন । উল্লেখ্য, এই উর্দুভাষী নাজিমুদ্দিনই পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করার জন্য জিন্নাহ্‌র অযৌক্তিক দাবির জোর সমর্থক ছিলেন । মুসলমান-সমাজের এই মনোভাবের ফলে হিন্দুদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল । অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, মুসলমানদের প্রতি হিন্দু-সমাজের উন্নাসিক মনোভাব মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল । মানবতা-

বাদী দৃষ্টিসম্পন্ন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজের এই সংকীর্ণ মানসিকতার কথা সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন এই শতকের প্রথমদিকে রচিত তাঁর একাধিক প্রবন্ধে ।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, উনিশ শতকে হিন্দুরা যখন তাদের সমাজ-সচেতন, বাস্তবমুখী ও জ্ঞানদীপ্ত নেতৃবৃন্দের অনুপ্রেরণা ও প্রচেষ্টার ফলে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে সেসময় বাঙালি মুসলমানদের নেতৃত্বে দেখা দিয়েছিল চরম সংকট। মুসলমানদের দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত না হয়ে ছিল পশ্চাদমুখী । তারা ছিল গৌরবোজ্জ্বল অতীতের স্বপ্নে বিভোর। ১৮৮২ সালে হাণ্টারের নেতৃত্বে ভারত সরকার দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করার জন্য যে কমিশন গঠন করেন সেই কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে আপস করতে অস্বীকৃতি হলো এর মূল কারণ।

কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও উনিশ শতকে বাংলাদেশে কিছু সংখ্যক মুসলিম বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব হয়েছিল যাঁরা মুসলমান সমাজকে দিয়েছিলেন নতুন পথের সন্ধান। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন দেলওয়ার হোসেন আহ্মদ (১৮৪০-১৯১৩) । পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ১৮৬১ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে বি. এ. পাস করেন। খুব সম্ভব তিনিই এই উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম গ্র্যাজুয়েট । বি. এ. পাস করার পর দেলওয়ার হোসেন ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হন এবং চাকুরি জীবনের শেষের দিকে ইন্সপেক্টর জেনেরাল অব্ রেজিস্ট্রেশান-এর পদে উন্নীত হন । অবসরগ্রহণ করার পর তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন এবং ১৯১৩ সালে মারা যান ।

দেলওয়ার হোসেন ছিলেন একজন অত্যন্ত সাহসী, সমাজ-সচেতন বুদ্ধিজীবী, যিনি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে এবং এমনকি তাদের আইন ও বিধান পরিবর্তন করতে হবে ।

সরকারি চাকুরিতে থাকাকালীন দেলওয়ার হোসেন মুসলমানদের নানাবিধ সমস্যার উপরে ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন । এগুলি তিনি ছদ্মনামে প্রকাশ করতেন। ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৬ এই সময়কালে তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি ১৮৮৯ সালে *Essays on Muhammadan Social Reform* এই নামে পুস্তকাকারে কলকাতা থেকে Thacker, Spink and Company -কর্তৃক প্রকাশিত হয় ।[১] এই বইটিতে দেলওয়ার হোসেনের ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় ।

উনিশ শতকের অন্য দুই মুসলিম নেতা নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৪-১৮৯৩) ও সৈয়দ আমীর আলির (১৮৪৯-১৯২৮) সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে দেলওয়ার হোসেনের চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আমরা জানি আবদুল লতিফ নেহাত বাস্তব প্রয়োজনে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন । কিন্তু সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল । তাঁরই জোর তদ্বিরের ফলে এদেশে মাদ্রাসাশিক্ষা সম্প্রসারণ করা হয় । আবদুল লতিফ মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির সঙ্গে আপস করতে চেয়েছিলেন, সেগুলি দূর করার জন্য কোনো প্রচেষ্টা করেননি । অন্যদিকে সৈয়দ আমীর আলি ছিলেন চিন্তাক্ষেত্রে অনেকটা প্রগতিশীল ও

সংস্কারপন্থী। তিনি ইংরেজি শিক্ষার জোর সমর্থক ছিলেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা তুলে দিয়ে তার স্থলে মুসলমানদের জন্য ইংরেজি মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আধুনিক ও কারিগরীবিদ্যা শিক্ষা প্রচলনের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রেও আমীর আলি ছিলেন কিছুটা প্রগতিশীল ও সংস্কারপন্থী এই অর্থে যে তিনি হাজার বছরের আগে মুসলিম আলেমদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা ইসলামি আইন ও অনুশাসনকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে সমকালীন যুগের প্রয়োজনে এবং যুক্তির আলোকে ইসলামের চিরন্তন মর্মবাণী গ্রহণ করার পক্ষপাতি ছিলেন। বস্তুত আমীর আলি উনিশ শতকের ইউরোপীয় যুক্তিবাদের আলোকে ইসলাম ও তার অনুশাসনকে ব্যাখ্যা ও পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু ইসলামের কোন কোন অনুশাসন ও বিধি সমকালীন যুগের প্রয়োজনে পরিবর্তন করা উচিত সে সম্বন্ধে কোনো উক্তি তিনি পরিষ্কারভাবে করেননি কিংবা হয়তো করবার সাহস তাঁর ছিল না। এইখানে ছিল আমাব আলির সীমাবদ্ধতা।

তুলনামূলকভাবে দেলওয়ার হোসেনের চিন্তাধারা ছিল বলিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ এবং বেশ কিছুটা বৈপ্লবিক। তিনি নিজেকে নবম শতকের মুতাজিলাহ্‌পন্থী যুক্তিবাদী আরব দার্শনিকদের উত্তরসূরী বলে মনে করতেন। দেলওয়ার হোসেন খুব সম্ভব প্রথম মুসলিম চিন্তানায়ক যিনি ইসলামের কোনো কোনো অনুশাসন ও বিধি যেগুলি ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়—সেগুলি পরিবর্তন, এমনকি বর্জন করার কথা বলেছেন। মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্য তাঁদের বায়বহুল অভ্যাস, অলসতা এবং সর্বোপরি অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসকে তিনি প্রধানত দায়ী করেছেন। তাঁর মতে ঋণের উপরে সুদগ্রহণের উপরে নিষেধাজ্ঞা বিধান মুসলমানদের পুঁজির বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেমনি মুসলমানদের উত্তরাধিকারী আইনও তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক নয় বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর ভাষায়:

> When we see how the business of banking facilities commences and how it renders possible the creation of new trades and industries, it becomes apparent how amongst Mohammadans the connection of religion purely so-called with subjects altogether foreign to it—with criminal law, laws of inheritence, laws of property, laws of contracts, laws of bequests—has acted most injuriously on their material interests... We have suffered mentally and morally as well as in our worldly point of view from the connection of our Religion with Law.[2]

দেলওয়ার হোসেন মনে করতেন যে পরিবর্তনের প্রতি বিমুখ থাকার জন্য মুসলিম-অধ্যুষিত দেশে প্রায় সবসময় স্বৈরাচারী শাসন কায়েম থেকেছে এবং এইসব দেশে ব্যক্তি ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সবসময় সুরক্ষিত হয়নি।

দেলওয়ার হোসেনের মতে মুসলমানদের অবনতির একটি মূল কারণ হলো তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সহনশীলতার অভাব। মুসলিম দেশগুলিতে স্বৈরাচারী শাসনের প্রাধান্য উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতার অভাবের জন্যই এটা হয়েছে। ইউরোপিয় দেশগুলি, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেন্ট, স্বাধীন সংবাদপত্র এবং জনমত দ্বারা চালিত। কিন্তু মুসলমান দেশগুলি সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। দেলওয়ার হোসেনের ভাষায়:

> No Mohammadan nation has ever been able to provide any constitutional means of checking the immense authority and arbitrary power of kings. In the most advanced Christian countries the power of the sovereign—whether designated emperor, king or parliament—is more or less limited by law;... but in all Mohammadan countries the soverign is above the law and is responsible to none for what he may choose to do or not to do.[৭]

বস্তুত দেলওয়ার হোসেনের মতে মুসলিম সভ্যতার অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের একত্রীকরণ। তিনি মনে করতেন মুসলমানদের মধ্যে বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতার অভাবের জন্যই তারা আধুনিক যুগের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি। দেলওয়ার হোসেন মুসলমানসমাজের যেসব দোষ চিহ্নিত করেছেন সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য : ১. কুরাণ বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ভাষায় অনূদিত না হওয়ার ফলে অধিকাংশ মুসলমান-এর মর্মবাণী বুঝতে পারে না; ২. সুদগ্রহণের উপরে নিষেধাজ্ঞার ফলে ব্যবসাবাণিজ্য ও পুঁজির বিকাশ সম্ভব হয়নি; ৩. মুসলমানরা ইচ্ছামতো নিজেদের সম্পত্তি অন্যকে দান করতে পারে না; ৪. পর্দাপ্রথা এবং ৫. বহু-বিবাহ।

দেলওয়ার হোসেন মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর ভাষায় মাদ্রাসা শিক্ষা হলো '... utterly unsuited to the times, and it is a mere waste of means to supply people with what has no present value and will be of no future use.'[৮]

দেলওয়ার হোসেন বাংলার সকল শ্রেণীর মুসলমানদের দেশজ ভাষা শেখা ও চর্চা করার উপরে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষিত নগরবাসী মুসলমান বাংলাভাষাকে অবহেলা করার ফলে গোটা মুসলমান সমাজের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে কারণ তাঁদের সঙ্গে গ্রামবাংলার জনসাধারণের চিন্তাক্ষেত্রে মিলন বা আদান প্রদান হয়নি।

সমকালীন মুসলমান সমাজে দেলওয়ার হোসেনের চিন্তাধারা বিশেষ রেখাপাত করতে পারেনি। কিন্তু আজ থেকে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে তিনি মুসলমান সমাজের অবনতির কারণ বিশ্লেষণ করে এর উন্নতির জন্য যে পথনির্দেশ করেছিলেন আজকের দিনে বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য সেটা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়।

দেলওয়ার হোসেনের মৃত্যুর পর কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। এরমধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ মুক্ত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির ফলে সৃষ্ট হলো দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। আবার ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের জনগণ এক নতুন বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তানী স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অর্জন করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার সুফল কতখানি ভোগ করতে সক্ষম হয়েছে ?

বস্তুত, বর্তমান বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি খুব উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে হয় না। গোটা জাতি আজ এক অভূতপূর্ব সংকটের সম্মুখীন। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে ও

সমাজচিন্তায় বিরাজ করছে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা; সাংস্কৃতিক অঙ্গনে চরম বিকৃতি এবং অর্থনৈতিক জীবনে সীমাহীন দুর্নীতি ও অব্যবস্থা। সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনকে করে তুলেছে অসহনীয়। চিন্তাক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও রাজনৈতিক নেতাদের দেউলিয়াপনা প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো গণতন্ত্রের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সর্বোপরি মানসিক বা মনোজাগতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলা। স্বাধীনতার সংগ্রাম কখনও শেষ হয় না। যুগে যুগে সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতারও নতুন নতুন সংজ্ঞা আত্মপ্রকাশ করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি-না তার সঙ্গে আসে অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি এবং সকল রকম সামাজিক বৈষম্য ও অবিচারের অবসান। তাই এই স্বাধীনতার জন্য আজ নতুন করে সংগ্রাম করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই নতুন সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব এসে পড়েছে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের উপরে। তাঁরা কি এই মহান দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হবেন ?

উল্লেখপঞ্জী :

১. সম্প্রতি ড. সুলতান জাহান সালিক-এর সম্পাদনায় এই পুস্তকের একটি নতুন সংস্করণ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। Sultan Jahan Salik (ed.) *Muslim Modernism in Bengal : Selected Writings of Delwar Hassan Ahmed Meerza 1816 1913*, Dhaka, Centre for Social Studies 1980.
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
৩. ঐ, পৃ. ৩২।
৪. ঐ, পৃ. ১১০।

গোলাম মুরশিদ

বাঙালি মুসলমানের স্বরূপের সন্ধান : দুটি বিপ্রতীপ দৃষ্টান্ত

এ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাঙালি মুসলমানরা তাঁদের স্বরূপের প্রশ্নে কথঞ্চিৎ সচেতন হন, এমন কথা অনেকেই বলেছেন। তাঁদের পূর্বপুরুষরা আদৌ আরব-ইরান থেকে এসে থাকুন আর না-ই এসে থাকুন, এ শতাব্দীর প্রথম পাদে তাঁরা নিজেদের যথেষ্ট পরিমাণে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখেন। বাংলাদেশ বা ভারত সম্পর্কে তখন তাঁদের তেমন মাথাব্যথা ছিল না। ১৯৪০-এর দশকে তাঁদের মুসলমান পরিচয় সবচেয়ে প্রবল হয়ে ওঠে এবং একটি উগ্র জাতীয়তাবাদের তাড়নায় তাঁরা মুসলমানদের জন্যে একটি ইসলামী পাকিস্তানের 'সংগ্রামে' লিপ্ত হন। কিন্তু, অতঃপর, কী আশ্চর্য, দু'দশকের মধ্যে তারা একটি ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্যে জোরদার আন্দোলন শুরু করেন। বস্তুত, বাঙালি মুসলমানের ভাষাগত, আঞ্চলিক এবং সাংস্কৃতিক স্বরূপ তুলনামূলকভাবে দ্রুত পরিবর্তিত হয়। তবে, একথা অস্বীকার করার জো নেই যে, এ পরিবর্তন সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে এবং একই সময়ে হয়নি। তদুপরি, কতগুলো বিষয়ে পরিবর্তন হলেও, অন্যান্য সম্প্রদায়ের, বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁদের সাম্প্রদায়িক স্বরূপেব বিশেষ বিবর্তন হয়েছে, এমন মনে হয় না।

এই নিবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করব, স্বরূপের প্রশ্নে অনেক বিষয়ে সমাধান করতে সক্ষম হলেও, এবং ঐতিহ্য থেকে অনেকটা সরে এলেও মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের তেমন কোনো মৌল পবিবর্তন হয়নি। এটা দেখানোর জন্যে আমি প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি ব্যক্তিত্বকে বেছে নেব। একদিকে থাকবেন আবুল মনসুর আহমদ, অন্যদিকে আবদুল হক। এঁদের দুজনকে বেছে নেবার কারণ, শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তদের দুটি স্বতন্ত্র ধারার এঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন। তাছাড়া, স্বরূপের প্রশ্নে এঁরা যত লিখেছেন এবং যতোটা সোচ্চার, তেমন লেখক দুর্লভ।

এক

এই স্বরূপ অন্বেষার প্রয়াস বাঙালি হিন্দুদের মধ্যেও চলেছিল এক শতাব্দী আগে—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। কিন্তু তাঁদের কাজটি ছিল অনেক সহজ। তাঁরা 'গৌরবময়' অতীত ভারতকে আবিষ্কার করে, যা কিছু ভারতীয় তার সঙ্গেই নিজেদের একাত্ম এবং যুক্ত করে দেখার প্রয়াস পান। অপরপক্ষে, মুসলমানদের কাজ অত সহজ ছিল না। কারণ, দীর্ঘকাল তাঁরা মনঃস্থির করতে পারেননি তাঁরা কি ধর্মের এবং ফলত ধর্মের উৎপত্তিস্থল মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে দেখবেন, না শতাব্দীর পর শতাব্দী যে অঞ্চলে বাস করেছেন—সেই অঞ্চলের মানুষ হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করবেন।

ভাষার ব্যাপারেও ছিল তাঁদের একই ধরনের অস্বচ্ছ ধারণা। দীর্ঘকাল তাঁরা স্থির করতে পারেননি তাঁদের ভাষা কি আরবি, না ফারসি ! না কি, উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশের যে ভাষা—সেই হিন্দুস্থানী বা উর্দু। সংখ্যালঘু বলে, না হিন্দুদের তুলনায় বিদ্যা ও বিত্তে পিছিয়ে থাকার দরুন, যে কারণেই হোক মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক পরিচয়টা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল। এই সাম্প্রদায়িক চেতনা তাদের মধ্যে এমন গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে, স্বরূপের অন্বেষণে তাঁরা অন্যান্য যে বিষয়গুলি বিবেচনা করতে পারতেন, সেগুলো তাঁরা গ্রাহ্য করেননি। বিশেষ করে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কী, এ নিয়ে যে বিতর্কের সূচনা হয়, তা থেকে স্বরূপের অন্বেষণে ধর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তাঁদের ঔদাসীন্য প্রমাণিত হয়।

অনেকেই ধর্মের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়কে এমন অভিন্ন করে দেখেন যে, বাংলায় কথাবার্তা বললেও, তাঁরা আরবিকে তাঁদের 'জাতীয়' এবং 'মাতৃভাষা' বলে অভিহিত করেন। একজন সমাজতাত্ত্বিক এই মুসলমানদের 'স্বদেশে প্রবাসী' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১] নিজেদের সত্যিকার মাতৃভাষার প্রতি এ সময়কার মুসলমানদের মনোভাব এমন অদ্ভুত এবং অসঙ্গত ছিল যে, ১৯০৩ সালে, 'প্রগতিশীল' বলে চিহ্নিত 'নবনূর' পত্রিকার এক প্রবন্ধে একজন লেখক দাবি করেন যে, বাংলা হিন্দুদের ভাষা, সুতরাং মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরাই যে ভালো বাংলা জানবেন এটাই তো স্বাভাবিক।[২] এখন অদ্ভুত লাগতে পারে, এ জাতীয় এমন বহু রচনাই এ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে মুসলিম-পরিচালিত সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৩] শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই বাস্তবতা সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে ওঠেন। অন্য বাঙালিদের সঙ্গে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা অনুভব করেন যে বাংলাকে মুসলমানদের মাতৃভাষা হিসেবে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সেইসঙ্গে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতে হবে। মাওলানা আকরাম হোসেনের মতো অতি-মুসলমানও ১৯১৮ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি রচনায় বলেন, একমাত্র বাংলাই বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা। উপসংহারে তিনি বলেন :

> দুনিয়ায় অনেক অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। 'বাঙ্গালী মুছলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দু না বাঙ্গালা ?' এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত। বঙ্গে মোসলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষাই তাঁহাদের লেখ্য ও কথ্য ভাষা রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।[৪]

মনে হয়, ১৯৩০-এর দশক নাগাদ মুসলমানদের মধ্যে বিশেষত তরুণ সম্প্রদায় মাতৃভাষাবিষয়ক বিতর্কের সমাপ্তি ঘটান এবং বাংলাকেই তাঁদের মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন। কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ মুসলমান যুবক ১৯২৬ সালে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ গঠন করে যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ করেন—এই বিতর্কের অবসান সে কারণেই কিনা, তা অবশ্য বলা শক্ত। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে মুসলিম সাহিত্যসমাজ (যার অন্য নাম 'শিখা' গোষ্ঠী) ছিল উদার, মানবতাবাদী এবং প্রাগ্রসর। ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে পড়লেও, তাঁদের প্রভাব অনেকের ওপরই গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী ছাপ মুদ্রিত করে দিয়েছিল। ১৯৩০-এর দশকের শেষ-দিকে আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান এবং

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন প্রমুখ যুবকের রচনায় মাতৃভাষাসম্পর্কিত কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব একেবারেই অনুপস্থিত। তবে তাঁদের বাংলা প্রামাণ্য বাংলা, না 'মুসলমানি' বাংলা হবে সে বিষয়ে বিতর্ক যথেষ্ট ছিল। ১৯৪০-এর দশকে বাঙালি মুসলমানরা সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্বের অনুসরণে মুসলমানদের জন্যে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং মুসলমান বলে পরিচয় দিতে খুবই গর্ববোধ করেন। সুতরাং বলা যায়, ১৯৪০-এর দশকে বাঙালি মুসলমানদের একটি নতুন পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা পূর্ববর্তী প্রজন্মের নিকট ছিল আচ্ছন্ন এবং আবিল।

দুই

আবুল মনসুর আহমদ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৮ সালে, ময়মনসিংহের একটি গ্রামে। তাঁর পরিবারের কেউ কেউ ফারায়েজি আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ইসলামের প্রতি পারিবারিক এই আনুগত্যবশতই সম্ভবত আবুল মনুসর প্রথমে মাদ্রাসায় আরবি শিক্ষা পান। পরে অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে তিনি প্রথমে ময়মনসিংহে, তারপর ঢাকায় এবং সবশেষে কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকালে তিনি বিলক্ষণ আত্মসচেতন ছিলেন। হিন্দুসমাজের জাতিভেদ ব্যবস্থা, ছোঁয়াছুঁয়ি এবং বর্ণহিন্দুদের সম্পর্কে প্রথম থেকেই যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা তিক্ততর হয়ে ওঠে। কারণ এক হিন্দু প্রকাশক তাঁকে বহুস্থানে হিন্দু পাঠকদের কথা মনে রেখে তাঁর লেখা পরিবর্তন করতে বাধ্য করেন।[৫] ঐতিহ্যিক পরিবেশে লালিত হওয়ার কারণেই হোক অথবা মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের হীনতাসূচক আচরণের জন্যেই হোক, আবুল মনসুর গোড়া থেকেই মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বিশেষ সচেতন হয়ে ওঠেন। তবে তাঁর মাতৃভাষা যে বাংলা এ বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না, আগেই উল্লিখিত হয়েছে। ১৯৪৪ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটিতে প্রদত্ত তাঁর এক বক্তৃতা থেকেই তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এ বক্তৃতায় তিনি বলেন :

> পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলা ও আসামের সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি, তা বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য। এটা খুবই উন্নত সাহিত্য। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ এ সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান দিয়ে গিয়েছেন। তবু এ সাহিত্য পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। কারণ এটা বাংলার মুসলমানের সাহিত্য নয়। এ সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নাই, শুধু তা নয়, মুসলমানদের প্রতিও এ সাহিত্যের কোনো দান নেই। ...এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়। ...বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের প্রাণ হবে মুসলমানদের প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ভাষাও হবে মুসলমানেরই মুখের ভাষা। ...নজরুল ইসলামই পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় কবি। ...পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য রচিত হবে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর মুখের ভাষায়। সে ভাষা সংস্কৃত বা তথাকথিত বাংলা ব্যাকরণের কোনো তোয়াক্কা রাখবে না। পূর্ব-পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় সে ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ রচনা করবে। ...বাংলার বর্তমান বর্ণমালার আবর্জনা আমরা রাখব না।[৬]

আবুল মনসুরের এ বক্তৃতায় যদি বা গভীর বিশ্লেষণের অভাব এবং উগ্র স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাচুর্য ধরা পড়ে, তাঁর পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে এতে তিনি কোনো সংশয় রাখেননি। বাংলা তাঁর মাতৃভাষা এ সম্পর্কে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না ; কিন্তু তাঁর প্রামাণ্য বাংলার সংজ্ঞা হয়তো ভিন্ন ছিল। বোধহয় তিনি নিজে যে ধরনের বাংলায় কথা বলতেন অথবা মনে করতেন পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানরা কথা বলবেন, তাঁকেই তিনি তাঁর প্রামাণ্য বাংলা বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অবশ্য এটা ব্যাখ্যা করেননি যে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা যাঁবা প্রামাণ্য কথ্য বাংলায় কথা বলতেন, পূর্ব-পাকিস্তানে তাঁদেব দশা কী হবে।[৭] নজরুল ইসলাম পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় তাঁর সাহিত্য রচনা না-করা সত্ত্বেও তিনি কেন নজরুলকেই 'জাতীয় কবি' হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন, তার ব্যাখ্যাও তিনি দেননি। মনে হয়, তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন যে বাংলা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে জন্ম নিয়েছিল।[৮] সুতরাং তিনি এমন এক ধরনের বাংলা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে যথেষ্ট আববি-ফারসি এবং অনার্য দেশীয় শব্দ থাকবে। তিনি বোধহয় প্রত্যাশা কবেছিলেন, এই নতুন ধরনের বাংলা পূর্ব-পাকিস্তানে পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করতে সহায়তা কববে এবং এভাবে পূর্ব-পাকিস্তানি মুসলমানরা এক স্বতন্ত্র পরিচয়ের অধিকারী হবেন। সম্ভবত এই লক্ষ্যের কথা স্মরণ রেখেই তিনি পূর্ব-পাকিস্তানি বাংলার জন্যে একটি ভিন্ন ধরনের বর্ণমালা গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন।

পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে আবুল মনসুবের লক্ষযোগ্য পার্থক্য এই যে তিনি তাঁর ভৌগোলিক পরিচয় সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। তিনি কেবল একথা বলেই ক্ষান্ত হননি যে বিভিন্ন দেশীয় মুসলমানরা বিভিন্ন জাতীয়তার অধিকারী। তিনি আরও বলেন যে পূর্ব-পাকিস্তানি মুসলমানরা পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলমানদের থেকেও আলাদা জাতি, একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অধিকারী।

দু-দশক পরে আবুল মনসুর রচনা করেন তাঁর 'পাক-বাংলার কালচার' (১৯৬৬) গ্রন্থটি। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হয়ে গেছে এবং স্বশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন দানা বাঁধছিল, তার ফলে জাতীয় চেতনার ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তনের সূচনা হয়। আবুল মনসুর এ সময়ে একজন সক্রিয় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভার সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুতরাং তিনি যে ভাষা ও স্বশাসনের আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হবেন, এটাই ছিল স্বাভাবিক। হয়েও ছিলেন। নিম্নের অনুচ্ছেদ থেকে তাঁর এই পরিবর্তিত মানসিকতা এবং তীক্ষ্ণতর আঞ্চলিক পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> আমাদের মাতৃভূমির নাম পাক বাংলা। এটা প্রাচীন সমতট দেশ। হঠাৎ জলধি হইতে ভাসিয়া-উঠা চরভূমি নয়। অন্তত দু হাজার বছরের প্রাচীন কাহিনী ইহার ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ...কি নৃতত্ত্বের দিক হইতে, কি ভাষাকৃষ্টির দিক দিয়া পাক বাংলা আর্য-ভারত হইতে বরাবরই ছিল পৃথক। আর্যরা কোনো দিন পারে নাই বাংলা জয় করিতে।[৯]

তাঁর ভাষাগত পরিচয়ও স্বতন্ত্রতর হয়ে উঠেছিল। পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে তিনি

স্বীকার করেন, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের মতো সাহিত্যিকরা পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববাংলা উভয় অঞ্চলের সাহিত্যকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করেন। বর্ণমালা পরিবর্তনের দাবি তিনি ত্যাগ করেন । তিনি এই বলে তাঁর অবস্থান ব্যাখ্যা করেন যে বর্ণমালার যদি কোনো পরিবর্তন আদৌ করতে হয়, তবে তা করা হবে নিতান্ত ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণে ।[১০]

পাকিস্তানে যেহেতু হিন্দু অধিপত্যের ভীতি ছিল না, সুতরাং মনসুর এখন পূর্বের তুলনায় কম স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন । এর ফলে তাঁর যুক্তিতে একাধিক স্ববিরোধ দেখা দেয় । প্রথমত, তিনি বাংলাদেশের দু হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্যে গর্ববোধ করেন; এমনকি মুসলমান-পূর্ব অনার্য এবং বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেও তিনি তাঁর নিজের বলে গণ্য করেন । অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, হিন্দুযুগকে তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করেন । দ্বিতীয়ত, তিনি পূর্ব-পাকিস্তানি মুসলমানদের পশ্চিম-পাকিস্তানি মুসলমানদের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জাতি বলে অভিহিত করলেও, পূর্ববাংলার নাম তিনি রাখলেন 'পাক' বাংলা । এখানে যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হলো, তাঁর আঞ্চলিক এবং একই সঙ্গে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী পরিচয় । মনে হয়, তিনি তাঁর দেশের নাম বাংলাদেশ বলতে কুণ্ঠা-বোধ করছিলেন, কারণ তাঁর মনে 'বাংলাদেশ' কথাটির সঙ্গে হয়তো একটু হিন্দু অনুষঙ্গ ছিল । তাঁর ধ্যানের পাক-বাংলা কেবল মুসলমানদের দেশ ।

অবশ্য একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন । বরং উল্টো, কোনো কোনো বিষয়ে তিনি বেশ 'আধুনিক' ছিলেন। তিনি চিত্রাঙ্কন, কাব্য, সংগীত, নৃত্য এবং চলচ্চিত্রের বিশেষ সমর্থক ছিলেন। যদিও এগুলো প্রায় সবই মোটামুটি ইসলাম ধর্মের অনুশাসন অনুসারে নিষিদ্ধ। তিনি রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের পক্ষে, এমনকি মোবাইল স্টেজের পক্ষে জোরদার ওকালতি করেন ।[১১] কোনো কোনো পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতিও তাঁর গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল । কিন্তু একটি জায়গাতেই তিনি মীমাংসা করতে একেবারে নারাজ ছিলেন, সে হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মুসলমানি পরিচয়কে ।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারার আরো পরিবর্তন হয় । বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সমন্বয়ে গঠিত একটি বাঙালি জাতির বাস্তব অস্তিত্ব তিনি আর অস্বীকার করতে পারছিলেন না । তিনি বলেন, বাংলাদেশ নামক ভৌগোলিক এলাকায় বাস করে যারা, তারা নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অভিন্ন । এই প্রথমবাবের মতো স্বীকার করেন, বাংলাদেশবাসীদের সংস্কৃতি এক । তাছাড়া, এই প্রথমবারের মতো তিনি এ জাতিকে 'বাঙালি' বলে আখ্যায়িত করেন ।[১২] অবশ্য তিনি এসব সত্ত্বেও বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র অস্বীকার করেন । তিনি বলেন, বাংলাদেশ প্রধানত এবং মূলত একটি মুসলিম দেশ । তিনি আরো দাবি করেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মানে হলো লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন-- যে প্রস্তাবে একাধিক মুসলিম সংখ্যা-গরিষ্ঠ দেশ গঠনের দাবি জানানো হয়েছিল ।[১৩] তিনি অবশ্য এই অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব দেননি যে পাকিস্তানি কাঠামোর মধ্যেই লাহোর প্রস্তাব কেন বাস্তবায়িত করা গেল না। অথবা সে প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার জন্যে কেন বাঙালিদের কঠোর সংগ্রাম করতে হলো পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ।

পূর্বের উগ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদী অবস্থান থেকে তিনি যদি-বা সরে এসে থাকেন

এবং কথঞ্চিৎ উদার হয়ে থাকেন, তবু তিনি তাঁর সাম্প্রদায়িক পরিচয় বিস্মৃত হতে পারেননি । তবে রাষ্ট্রে সেই সম্প্রদায়ের অবস্থান খানিকটা পাল্টে গিয়েছিল— সন্দেহ নেই। পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে তিনি মনে করেন যে, ১৯৬০-এর দশকের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ বাঙালি মুসলমানদের জাতীয় পরিচয়কে অনেকটা অস্পষ্ট ও বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল । তিনি ব্যাখ্যা করে বলেননি, তাঁর বক্তব্য ঠিক কী; কিন্তু তিনি সম্ভবত ১৯৬০-এর দশকের ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধিকার ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন ।

তিন

আবুল মনসুর আহমদের তুলনায় আবদুল হক ২২ বছরের ছোটো । তার চেয়েও জরুরি কথা, নিঃসন্দেহে তিনি একটি স্বতন্ত্র প্রজন্মের প্রতিনিধি । [১৪] আবুল মনসুরের পরিবারের মতো তাঁর পরিবারের কোনো সদস্য ওয়াহাবি অথবা ফারায়েজি আন্দোলনে যোগদান করেননি এবং সম্ভবত ধর্মীয় গোঁড়ামিও তাঁদের কম ছিল । আবদুল হকের জন্ম হয় ঢাকায় 'শিখা' গোষ্ঠী স্থাপিত হওয়ার ছ-বছর আগে । তাঁদের পরিবারের কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'শিখা' গোষ্ঠীর বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা, জানা নেই । আবদুল হকের পিতা স্কুলে সামান্যই লেখাপড়া শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রভূত অধ্যয়ন করতেন । আবদুল হক বাল্যকালেই পিতার এই অধ্যয়নের অভ্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং অনেক গ্রন্থ পিতার জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে পড়ে ফেলেন ।

আবদুল হক গোড়া থেকেই ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন । তদুপরি তিনি যখন ১৯৪৩-৪৪ সালে রাজশাহি কলেজে ইংরেজি সম্মান শ্রেণীর ছাত্র, তখন কাজী আবদুল ওদুদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসেন । কাজী আবদুল ওদুদের উদারনৈতিক এবং যুক্তিবাদী চিন্তার দ্বারা এসময়ে তিনি যথেষ্টমাত্রায় প্রভাবিত হন । ১৯৪৬ সালের শেষভাগে তিনি কলকাতা থেকে ইংরেজিতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । কলকাতায় থাকাকালে তিনি পরিচিত হন আবদুল ওদুদের বিপরীত এক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে । ইনি কবি ফররুখ আহমদ । ফররুখ আহমদ আগাগোড়া উগ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদে ও স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন । ফররুখ আহমদের একটা তাৎক্ষণিক প্রভাব আবদুল হকের ওপর পড়েছিল । আবদুল হক ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হন । কিন্তু ১৯৪৭ সাল থেকে ফররুখ আহমদ এবং আবদুল হকের বিচ্ছেদ ঘটে এবং সাহিত্যিক মার্গ ভিন্ন হয়ে যায় । ফররুখ আহমদ ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করতে থাকেন। আবদুল হক উদারনীতি এবং অংশত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেন । [১৫]

সম্ভবত তাঁর ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে এবং সেইসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদের প্রভাববশত তিনি সেকালের অধিকাংশ তরুণ মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করতে সমর্থ হন ।'কালের প্রেক্ষণা'-র মতো (১৯৪৭) তাঁর গোড়ার-দিকের রচনা থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । [১৬] মনে হয়, প্রথম থেকেই তিনি ইংরেজি-শিক্ষিত উদারনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন । আদর্শের জন্যে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে না-তাকিয়ে তিনি দৃষ্টি ফেরালেন আপন দেশের প্রতি । ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত একটি রচনায় তিনি একথা আবার জোর দিয়ে বলেন । তিনি বলেন, 'নিজের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা দেশপ্রেমেরই একটা স্নিগ্ধ ও সংস্কৃতিময় প্রকাশ ।' [১৭]

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের মূল্যায়ন করার যে আদর্শ পূর্ববর্তী প্রজন্মের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল সেটি তিনি বাতিল করে দেন। তিনি বরং মোহম্মদ ওয়াজেদ আলীর মতো মুসলমান সাহিত্যিকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন; কারণ ওয়াজেদ আলী সাহিত্যকে কখনো সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ কোণ থেকে দেখেননি। তিনি সেসব মুসলমান সাহিত্য-সমালোচকদের নিন্দা করেন যাঁরা সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কেবল দেখতেন যে সে সাহিত্যের প্রকৃতি যথেষ্ট ইসলামি কিনা, অথবা লেখক যথেষ্ট ইসলামি মনোভাবপূর্ণ কিনা। এ ধরনের সাহিত্য-সমালোচনাকে তিনি 'সাহিত্যে ওয়াহাবিবাদ' বলে আখ্যায়িত করেন।[১৮] তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে সকল মুসলমান সাহিত্য-সমালোচকই যদি মুসলমান-রচিত প্রতিটি সাহিত্যকর্মকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম বলে গণ্য করেন, তাহলে পূর্ববর্তী সেই হিন্দু সমালোচকগণের ভুলই তাঁরা করবেন যাঁরা মুসলমানের লেখা হলেই তাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর মতে সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড হওয়া উচিত উঁচু ও কঠোর এবং সকল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে।[১৯] অর্থাৎ তার আদর্শ আবুল মনসুরের উল্টো কোটিতে অবস্থিত।

আবদুল হকের কাছে মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় সে মানুষ। একটি অসাধারণ অনুচ্ছেদে তিনি তাঁর বক্তব্য এভাবে তুলে ধরেন:

> জন্মের পর মানুষের প্রথম পরিচয় ক্ষুদ্র মানব হিসাবে এবং প্রায় একই সঙ্গে ক্ষুদ্র বাঙালী, পাঞ্জাবী, আরব, ইংরেজ, ইত্যাদি হিসাবে—মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি অনুযায়ী; তারপর মুসলমান খৃষ্টান ইত্যাদি হিসাবে—বিশ্বাস ও আচরণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী।[২০]

আবদুল হক যা লেখেন, তার সঙ্গে তাঁর কার্যকলাপ সঙ্গতিপূর্ণ। ১৯৬০-এর দশকে তিনি যেসব রচনা প্রকাশ করেন, তা থেকে তাঁকে প্রথমে বাঙালি, তারপর পাকিস্তানি এবং সব শেষে মুসলমান বলে সনাক্ত করা যায়। মনে হয়, তাঁর নিজের পরিচয় সম্পর্কে তাঁর নিজের কাছে কোনো দ্বিধা ছিল না। আবুল মনসুর আহমদের মতো তিনিও লাহোর প্রস্তাবের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই প্রস্তাবানুসারেই পাকিস্তানের জন্ম হয়। কিন্তু আবুল মনসুর মনে করতেন, পাকিস্তান কেবল মুসলমানদেরই বাসস্থান; অপরপক্ষে, আবদুল হকের মতে পাকিস্তান একটি মুসলমান-প্রধান দেশ হলেও আদৌ ইসলামিক রাষ্ট্র ছিল না।[২১] যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন, দ্বিজাতিতত্ত্বের জনক মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ দেশবিভাগের তিনদিন আগে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, পাকিস্তানে রাজনৈতিকভাবে মুসলমানরা মুসলমান থাকবেন না, হিন্দুরাও হিন্দু থাকবেন না—সবাই হবেন পাকিস্তানি। সুতরাং হকের মতে, জাতির জনকের ঘোষণা অনুযায়ী, পাকিস্তানের হওয়ার কথা ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ।[২২]

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীত ও ভারতীয় চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ হয়। 'পাক-বাংলার কালচার' গ্রন্থ থেকে মনে হয়, আবুল মনসুর এতে খুশিই হয়েছিলেন।[২৩] তাঁর সাধের পাকিস্তানে হিন্দুদের কোনো স্থান ছিল না; সুতরাং এ-যুদ্ধে তিনি হিন্দুদের তথা ভারতকে প্রতিপক্ষ হিসেবে গণ্য করেন। অপর পক্ষে, ভারতকে প্রতিপক্ষ গণ্য করলেও আবদুল হক পাকিস্তানি হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের স্বপক্ষীয় বলে বিবেচনা করেন। সাধারণভাবে হিন্দুদের অবিশ্বাস ও ঘৃণার

চোখে দেখা হলেও, হক বলেন হিন্দুরা ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের হয়ে লড়াই করেন। এবং অনেক হিন্দু যুদ্ধ তহবিলে মোটা অঙ্কের অর্থদান করেন ।[২৪] তাছাড়া, তিনি আরো দাবি করেন যে তথাকথিত পাকিস্তানি সংস্কৃতির একটা বড়ো অংশই সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অবদান থেকে প্রাপ্ত । প্রসঙ্গত তিনি মণিপুরি নৃত্যসহ অনেকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করেন ।[২৫]

তাঁদের পরদেশী মনোভাবের জন্যে আবদুল হক বাঙালি মুসলমানদের কঠোর সমালোচনা করেন । তিনি বলেন :

> বাঙালি মুসলমানরা পশ্চিমাগত কোনো ভাবধারা নিয়ে কখনো প্রশ্ন করেনি, করলেও পশ্চিমেরই দেখাদেখি করেছে ...বাঙালি মুসলমান যদি নিজেকে বাঙালি মনে করতো, সগৌরবে এবং সকলে নিজেদের বাঙালি বলে ঘোষণা করতো তবে তার গোষ্ঠীচেতনা প্রবল হতে পারতো, চিন্তা সংহত হতে পারতো এবং অনুকরণবৃত্তি এতো প্রবল হতে পারতো না । কিন্তু ঠিক এই বাঙালি হওয়াটাকেই সে একটা অনুচিত কাজ মনে করে এসেছে । ...বাঙালি মুসলমান যদি নিজেকে বাঙালি মনে করে গর্ব বোধ করে তবে তা অনুচিত হবে কেন, এ প্রশ্নের সদুত্তর নেই। আরব, ইরানী, তুর্কী এবং আরো অনেক মানবগোষ্ঠী যদি নিজেদেরকে একটা বিশেষ মানবগোষ্ঠী মনে করতে পারে, একই দেশের অধিবাসী হয়েও ইংরেজ যদি নিজেকে ইংরেজ এবং স্কচ (তাই আছে) নিজেকে স্কচ মনে করতে পারে, যদি পাঞ্জাবী নিজেকে পাঞ্জাবী এবং পাঠান নিজেকে পাঠান মনে করে গর্ববোধ করতে পারে, তবে বাঙালি মুসলমান নিজেকে বাঙালি বলে গর্ববোধ করতে সংকুচিত হবে কেন তার কোনো মানে নেই ।[২৬]

তিনি অবশ্য লক্ষ করেন যে, বাঙালি মুসলমানদের স্বরূপের প্রশ্নে বিবর্তন হচ্ছে। 'স্বাধীনতা-পূর্ব কালের তুলনায় এ চেতনার প্রকৃতি পৃথক : তখন হিন্দুর সঙ্গে সহ-অবস্থান করতে গিযে তাকে ভাবতে হতো সে মুসলমান, স্বাধীনতার যুগে অবাঙালি পাকিস্তানীদের সঙ্গে সহ-অবস্থান করতে গিয়ে স্বার্থ-সংঘাতের তাড়নায় তাকে ভাবতে হচ্ছে সে বাঙালি।' তিনি আরো লক্ষ করেন যে এই বাঙালি চেতনা যতটা রাজনৈতিক ততটা সাংস্কৃতিক নয় । তিনি ঘোষণা করেন, যেহেতু তাদের মাতৃভাষা বাংলা সুতরাং তারা জগতের আর তাবৎ মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্র এক জাতিসত্তার অধিকারী, ধর্মীয় সাদৃশ্য সত্ত্বেও । নিজেদের বৈশিষ্ট্য ভুলে গিয়ে আরব-ইরানিয়ানির চর্চা করাকে তিনি ইসলামের প্রতি আনুগত্যের প্রধান লক্ষণ বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন ।[২৭]

বাঙালি মুসলমানরা কেন নিজেদের 'বাঙালি' বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন, আবদুল হক তার একটা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন । তিনি বলেন, যেহেতু ঊনবিংশ শতাব্দীতে, এমনকি বর্তমান শতাব্দীতে, বাঙালি ও মুসলমান প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, সেজন্যেই বাঙালি মুসলমান নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা, এমনকি সম্ভবত, লজ্জাবোধ করে । এটা যে সাম্প্রদায়িকতারই প্রতিফলন, এ বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল না ।[২৮]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক বছর আগেই, আবদুল হক 'পূর্ব পাকিস্তান : বাংলাদেশ' (১৯৬৪) নামক একটি প্রবন্ধ 'সমকালে' প্রকাশ করেন । এতে তিনি দাবি

করেন যে পূর্ব-পাকিস্তানকে বাংলাদেশ বলা উচিত। যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন, যে ভৌগোলিক এলাকা প্রাচীনকাল থেকে বঙ্গ বা বাংলা বলে পরিচিত তার বেশিরভাগ নিয়েই পূর্ব-পাকিস্তান গঠিত হয়েছে। যদি বিভক্ত ভারত এখনো ভারত হিসেবেই চিহ্নিত হয় তাহলে বিভক্ত বঙ্গদেশ কেন বাংলাদেশ বলে আখ্যায়িত হবে না, তিনি এমন সঙ্গত প্রশ্ন তোলেন। তিনি আবো যুক্তি দেখান :

> বাংলা আমাদের মুখের ভাষা, আমাদের প্রাণের ভাষা,—এ বিষয়ে আমরা সচেতন ছিলাম বলে আমাদের ভাষা কেউ অপহরণ করে নিতে পারেনি; কিন্তু আমাদের ইতিহাসচেতনা ক্ষীণ বলে আমাদের স্বদেশের নাম আজ আমাদের জন্য বিলুপ্তপ্রায়। যদি আমরা বাঙালি হই, আমাদের মাতৃভূমির নাম যদি বহু শতাব্দী ধরে বাংলাদেশ হয়ে থাকে এবং সে বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশই যদি আজও আমাদের মাতৃভূমি হয়, তবে আমাদের মাতৃভূমিকে আমবা "বাংলাদেশ" বলবো না কেন ? [২৯]

এ প্রবন্ধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়াব সাত বছর আগে এবং ছ' দফা আন্দোলন শুরু হওয়ার দু-বছর আগে। তখনো পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নামে অভিহিত করার লিখিত প্রস্তাব অন্য কোনো রচনায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। সুতরাং তাঁর দূরদৃষ্টি, প্রাগ্রসর ধারণা এবং সাহসের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

শাসনতন্ত্র অনুসারে বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে ঘোষণা করা হয় এবং এর নাগরিকদের বলা হয় 'বাঙালি'। এর ফলে শিক্ষিত বাংলাদেশবাসীদের অনেকে দুঃখিত ও আতঙ্কিত হন; তাঁদের মনে হয়, এ তাঁদের ধর্মীয় পরিচয় ঘুচিয়ে দেবাব একটা ষড়যন্ত্র। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক শেখ মুজিবর রহমান আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার অব্যবহিত পরেই এজন্যে একটি প্রবল গোষ্ঠীর চাপে শাসনতন্ত্র সংশোধিত হয় এবং বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের দুটি মৌলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বিসর্জন দেওয়া হয়। এ দেশকে কেবল যে একটা ইসলামি লেবাস পরানো হয়, তাই নয়; নাগরিকদের নতুন নামকরণ করা হয়—'বাংলাদেশী'। চিরদিন সৎসাহসী এবং স্পষ্টবাদী আবদুল হক এই পরিবর্তনের নিন্দা ও প্রতিবাদ করেন। 'দোদুল্যমান জাতীয়তা' (১৯৭৬) নামক প্রবন্ধে তিনি এই পিছে-ফিবে যাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করেন। দেশ ও বিদেশের ইসলামি মনোভাবকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কাজে ব্যবহার করার জন্যেই শাসনতন্ত্রের এ ধরনের সংশোধন করা হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে আবদুল হক কিছু বলেননি। বাঙালি মুসলমানদের চিরকালীন সাম্প্রদায়িক চেতনাকেই তিনি এ পরিবর্তনের কারণ বলে চিহ্নিত করেন। তিনি অবশ্য সতর্ক করে একথা মনে করিয়ে দেন যে দেশের নাম যা-ই হোক না-কেন, আমাদের ভাষার নাম কেউ বদলে বাংলাদেশী বলতে পারবে না, অথবা এ দেশের নাগরিকদের ভাষা বাংলা বলে, তাঁদেরও বাংলাদেশী বলা সঙ্গত নয়। [৩০] বস্তুত, আবুল মনসুর আহমদের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক; আবদুল হকের দেশ ও ভাষা। তাঁদের অবস্থান অতএব বিপরীত মেরুতে।

দুজনের অবশ্য একটি মিলনক্ষেত্র আছে—দুজনই মনে করেন 'বাঙালি' জাতির উন্মেষ হয়েছে লাহোর প্রস্তাবহেতু। [৩১] আবুল মনসুর আহমদের মতে বাংলাদেশের জন্ম আসলে লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন ছাড়া আব-কিছু নয়। আবদুল হক বাংলাদেশকে

ইসলামি দেশও মনে করেন না, এমনকি, মুসলমানদের দেশও নয়; তবু তিনিও বিশ্বাস করেন বর্তমান 'বাঙালি' জাতির উন্মেষ ঘটে লাহোর প্রস্তাবের ফলস্বরূপ । সুতরাং তাঁর বাঙালিজাতি আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ হলেও, অন্তস্তলে তার মুসলিম পরিচয় অপ্রকট নয় । যতক্ষণ মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমানাধিকার স্বীকৃত হচ্ছে, ততক্ষণ তিনি এই ধর্মনিরপেক্ষতা মেনে নিতে রাজি আছেন। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নে যথার্থই একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা দেখা দিলে, তিনি 'বাঙালি' জাতির ধর্মনিরপেক্ষতা কতটা মেনে নিতে রাজি থাকবেন, তা বলা শক্ত । ১৯৪৭ সাল থেকে মুসলমানরা যে সুযোগসুবিধা ভোগ করে এসেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়তো তাঁর মানসিকতা গড়ে উঠেছে ।

বস্তুত শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং দ্রুত একটি নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষ ঘটেছিল দেশ বিভাগেরই ফলে, এবং পূর্ববঙ্গ থেকে ব্যাপকহারে হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে, সন্দেহ নেই । তিনি যে-সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তার জন্যে আবুল মনসুর আহমদকে যোগ্যতর হিন্দুদের সঙ্গে রীতিমতো প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে । অপর পক্ষে, আবদুল হক হচ্ছেন লক্ষ লক্ষ সেই বাঙালি মুসলমানদের একজন, যাঁরা বিনা অথবা সামান্য প্রতিযোগিতার ফলেই তাঁদের সাফল্য ও প্রতিষ্ঠালাভ করেন । অধিকাংশ 'প্রগতিশীল' বাঙালি মুসলমানদের মতোই, হকও 'ধর্মনিরপেক্ষ' । কিন্তু সত্যিকার সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক—শুরু হলে তিনি সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর নির্লিপ্ততা কতটা বজায় রাখতে পারবেন, বলা কঠিন ।

আমার মনে হয়, বাঙালি মুসলমানদের স্বরূপ অন্বেষণ এখনো এগিয়ে চলেছে। স্বাধীনতাসংগ্রামের অব্যবহিত পরে তাৎক্ষণিকভাবে মনে হয়েছিল, বাঙালি মুসলমানদের পরিচয়সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে । কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই, বিশেষত শেখ মুজিবের পতনের পরে, এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রশ্নটি আবার উত্থাপিত হয় । শাসকচক্র সন্দেহজনক উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় যাতে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি লুপ্ত হয় । কোনো কোনো ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী দলও ধর্মীয় এবং/ অথবা আর্থিক উদ্দেশ্য নিয়ে শাসকচক্রের চেষ্টায় মদত জোগায় । তারা দেশব্যাপী এ-বিষয়ে রীতিমতো সংগঠন ও সমর্থন গড়ে তোলার চেষ্টা চালায় । বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি বাঙালিদের 'বাংলাদেশী' করে ছাড়েন এবং প্রধানমন্ত্রী বাংলাভাষাকে পর্যন্ত সংসদের বক্তৃতায় 'বাংলাদেশী ভাষা' বলে অভিহিত করেন । বলা বাহুল্য, দুজনের পেছনেই সংগঠিত এবং ব্যাপক রাজনৈতিক সমর্থন ছিল । এবং শাসকচক্র তাঁদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে বেতার, টিভি ও সংবাদপত্রসমূহের চূড়ান্ত ব্যবহার করেন । ফলে অবস্থা দাঁড়ালো অনেকটা আবুল মনসুর আহমদ যেমন স্বপ্ন দেখেছিলেন, তেমন । মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক পরিচয়কে এমন জোরদার করে তোলা হয় এবং এমন উস্কে দেওয়া হয় যে, নিম্নের অনুচ্ছেদটি—যা অর্ধশতকেরও আগে লেখা—আবুল মনসুর আহমদের মতো অনেক শিক্ষিত মুসলমানের কাছে এখন অসঙ্গত ও অবাঞ্ছিত বলে মনে হয় । আলোচ্য অনুচ্ছেদে নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদ বলেছিলেন :

> সর্বক্ষণ এই ভাবটা আমাদের অন্তরে পোষণ করতে হবে যে 'বাঙালি' শব্দের ওপর আমাদের প্রতিবাসী হিন্দুর যে পরিমাণ অধিকার, তার চেয়ে আমাদের দাবি

অনেকাংশে বেশি। অর্থাৎ কিনা, প্রকৃত বাঙালি বলে পরিচয় দিতে হলে, হিন্দুর চেয়ে আমরাই বরং দু-পা এগিয়ে যাব। এই বাঙালা ভাষাতেই সর্বক্ষণ মনের ভাব ব্যক্ত করেও যদি বাঙালি না হয়ে আমরা অপর কোনো একটা জাতি সেজে বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে আমাদের কখনও উত্থান নাই-ই, অধিকন্তু চির-মেঘাচ্ছন্ন গহ্বর মধ্যে পতন অবশ্যম্ভাবী। [৩২]

রাজনৈতিকভাবে ইসলামকে খুব ব্যবহার করা হয়েছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এখনও একটা অংশ নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদের মতো নিজেদের বাঙালি বলে চিহ্নিত করেন ; এমনকি তাঁরা অনেকে হয়তো যথার্থই ধর্মনিরপেক্ষ। আবদুল হকের "দোদুল্যমান জাতীয়তা" প্রবন্ধও আমাদের এ বক্তব্য প্রমাণ করে। সুতরাং বড়োজোর যা বলা যেতে পারে, তা হলো, বাঙালি মুসলমানদের স্বরূপের অন্বেষণ-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়নি, বরং তা একটা সংক্রান্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে।

উল্লেখপঞ্জী :

১. বদরুদ্দীন উমর, 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা', ঢাকা : গ্রন্থনা, ১৯৬৯, পৃ. ৮-১১।
২. 'নবনূর', প্রথম বর্ষ, পঞ্চম খণ্ড (ভাদ্র, ১৩১০), আনিসুজ্জামান সম্পাদিত 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র', ঢাকা : বাংলা অ্যাকাডেমি, ১৯৬৯, পৃ. ৭৩।
৩. এ জাতীয় অনেকগুলো রচনা/রচনার অংশ আনিসুজ্জামান সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থে এবং মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম-সম্পাদিত 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত', ঢাকা : বাংলা অ্যাকাডেমি, ১৯৭৭, গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।
৪. 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্রে' উদ্ধৃত ; পৃ. ৪৭।
৫. আবুল মনসুর আহমদ, 'আত্মকথা', ঢাকা : আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৮; বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত।
৬. "মূল সভাপতির অভিভাষণ ", সরদার ফজলুল করিম সম্পাদিত 'পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য', ঢাকা : বাংলা অ্যাকাডেমী, ১৯৬৮ গ্রন্থে সংকলিত; পৃ. ১৪৬, ১৪৯, ১৫১-৫২। রচনাটি আবুল মনসুর আহমদের 'বাংলাদেশের কালচার', ঢাকা : আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৬, গ্রন্থেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
৭. 'বাংলাদেশের কালচার' গ্রন্থে এ বিষয়ে তিনি অবশ্য একটা স্ববিরোধী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, পৃ. ২২৩-২৫। স্ববিরোধী এজন্যে যে, এতে তিনি বলেন, তাঁর পূর্ববঙ্গীয় আদর্শ ভাষায় পশ্চিমবঙ্গীয় প্রামাণ্য কথ্যভাষাও মেশাতে হবে।
৮. 'বাংলাদেশের কালচার' গ্রন্থে তিনি দাবি করেন, বাংলাভাষার ওপর সংস্কৃতের চেয়ে দ্রাবিড়ভাষার প্রভাবই সম্ভবত বেশি (পৃ. ২৪১) এ বিষয়ে তিনি নাজিরুল ইস্লাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের বাংলা সাহিত্যের বরাত দেন। নাজিরুল ইসলামের মত উদ্ভট ও অগ্রহণযোগ্য!
৯. আবুল মনসুর আহমদ, 'পাক-বাংলার কালচার', ঢাকা : আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৬, পৃ. ২৪,২৬। এই গ্রন্থই স্বাধীনতার পরে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে 'বাংলাদেশের কালচার' নামে প্রকাশিত হয়।
১০. ঐ, পৃ. ৭৫, ৭৯।

১১. ঐ, পৃ. ৩৪-৫৪।
১২. আবুল মনসুর আহমদ, 'বেশী দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা', ঢাকা : আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২, যত্রতত্র ।
১৩. 'বাংলাদেশের কালচার', পৃ. ২৬৫ ।
প্রসঙ্গত তাঁর অন্য একটি গ্রন্থের নামও এখানে উল্লেখ করা যায় । গ্রন্থটি হলো: *End of a Betrayal and the Restoration of the Lahore Resolution*, 1976 ।
১৪. এ সম্পর্কে প্রথমে বিস্তারিত এবং মূল্যবান আলোচনা করেন আনিসুজ্জামান। তাঁর "স্বরূপের সন্ধানে" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 'স্বরূপের সন্ধানে', ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৭৬, পৃ. ৯১।
১৫. আবদুল হকের নিকট প্রাপ্ত তথ্য ।
১৬. "কালের প্রেক্ষণা", 'ক্রান্তিকাল', ঢাকা : সমকাল প্রকাশনা, ১৯৬২, পৃ. ৫৫-৬০।
১৭. "সাহিত্য ও দেশপ্রেম", 'ক্রান্তিকাল', পৃ. ২৯ ।
১৮. "মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী", 'ক্রান্তিকাল', পৃ. ৯২ ।
১৯. "সাহিত্যিক মূল্যবোধ", 'ক্রান্তিকাল', পৃ. ২২ ।
২০. আবদুল হক, "ভাষা স্বদেশ সত্তা", 'সাহিত্য ও স্বাধীনতা', ঢাকা : বাংলা অ্যাকাডেমি, ১৯৭৪, পৃ. ১৫৮ ।
২১. "মুসলিম জাতীয়তাবাদ : পুনর্নিরীক্ষা", 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', চট্টগ্রাম : বইঘর ১৯৭৩; পৃ. ২২-৫১ । প্রবন্ধটি প্রথম 'সমকালে' ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়।
২২. ঐ, পৃ. ৩০ । অধিকন্তু দ্রষ্টব্য তাঁর "ইসলামী রাষ্ট্র", 'সমকাল' , অষ্টাদশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৭৬; পৃ. ৯-৩৭ ।
২৩. 'পাক-বাংলার কালচার', পৃ. ৫৬ ।
২৪. "যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িকতা" (১৯৬৬), 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', পৃ. ৫৪-৬৩।
২৫. "মুসলিম জাতীয়তাবাদ : পুনর্নিরীক্ষা", পৃ. ৪৫, ৪৭ ।
২৬. "বাঙালী মুসলমান : ভূমিকা ও নিয়তি", 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ' ইত্যাদি, পৃ. ৭-৮।
২৭. ঐ, পৃ. ৮, ১০ ।
২৮. ঐ, পৃ. ২।
২৯. "পূর্ব পাকিস্তান : বাংলাদেশ", 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ' ইত্যাদি, পৃ. ১৮, ২০ ।
৩০. "দোদুল্যমান জাতীয়তা", 'সমকাল', উনবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল ১৯৭৭), পৃ. ১১।
৩১. 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ : পুনর্নিরীক্ষা', পৃ. ৫০ ।
৩২. "আমাদের কাজ",'সওগাত', সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (১৯২৯), 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৬১-৬২।

অসীম রায়

দেশ-বিভাগ ও সংশোধিত ইতিহাসের রায়

ইতিহাসের অন্তরাত্মা বিবর্তন বা পরিবর্তন—একথা আমরা মোটামুটি সবাই জানি, কিছুটা প্রত্যক্ষও করি। সে পরিবর্তনের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রশ্নটি জটিল হলেও সাধারণভাবে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর একটা কাঠামো আমরা গড়ে তুলি যার কোনো মৌল পরিবর্তনের সম্ভাবনা বিরল। ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা অবশ্যই অবহিত। তবে নিছক তথ্যের সত্যতা নিয়ে সাধারণত আমাদের মনে কোনো গভীর সন্দেহ থাকে না—বিশেষত যদি সে তথ্য প্রায় সর্বজনস্বীকৃত মৌল তথ্যের পর্যায়ভুক্ত হয়। কিন্তু ঠিক এ ধরনের একটি মৌল ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে সর্বজনস্বীকৃত ধারণা ও প্রত্যয়ের বিরোধী নতুন সংশোধনী ঐতিহাসিক চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়েছে গত কয়েক বছরে।

এই ঐতিহাসিক চিন্তা-চেতনার সঙ্গে সবার সমান পরিচয় না থাকলেও বিগত ১৯৮৮ সনের ফেব্রুয়ারি থেকে সংবাদপত্রে পরিবেশিত কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত-বিভাগসংক্রান্ত রাজনীতি নিয়ে সাধারণের মনে কিছু সংশয়, বিভ্রম ও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। দেশ-বিভাগের রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রণীত ও ১৯৫৭ সনে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম' গ্রন্থের[১] পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত তিরিশটি অপ্রকাশিত পৃষ্ঠার জনসমক্ষে প্রকাশের নির্ধারিত সময় ছিল পূর্বোক্ত ফেব্রুয়ারি মাস। আইন-সংক্রান্ত সমস্যার ফলে সে বছরের নভেম্বর মাসে তা প্রকাশিত হয়। মৌলানা আজাদ তাঁর রচনার এই অংশে জওহরলাল নেহরুকে তাঁর (আজাদের) পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে মনোনয়নের দাবি করেছেন এবং নিজের এই সিদ্ধান্তকে 'হিমালয় পর্যায়ের ভ্রান্তি' হিসেবে বর্ণিত করেছেন, কেননা ভারত-বিভাগের বিশেষ দায়িত্ব তিনি এই প্রসঙ্গেই নেহরুর স্কন্ধে অর্পণ করেছেন।[২] দেশ-বিভাগের রাজনীতির প্রচলিত ব্যাখ্যা ও ভাষ্যে লালিত ভারত উপমহাদেশের জনসমাজের মনে আজাদের উক্তি গভীর বিস্ময় ও বিভ্রান্তির কারণ-না হয়ে পারে না। অথচ আজাদের বক্তব্যের মধ্যে সত্যের যে উপাদান রয়েছে, অধুনা সংশোধনী ঐতিহাসিক গবেষণা ও চিন্তায় তার সমর্থন মেলে। কিছু নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপকরণ ও তথ্যের ভিত্তিতে নতুন গবেষণার ফলে দেশ-বিভাগের প্রশ্নটিকে সুপ্রচলিত ধারণা ও প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে নতুন দৃষ্টিতে পূর্ণসমীক্ষার প্রয়োজন ও দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে।[৩]

এক

দেশ-বিভাগের রাজনীতির ভিত্তি, পুরাতন বা প্রচলিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দুটি

'অবিসংবাদী ও সর্বজনীন সত্যের' উপরে প্রতিষ্ঠিত । তার প্রথমটি হলো : মুসলিম জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক 'মুসলিম লীগ' দেশ-বিভাগের প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ কারণ; আর দ্বিতীয়টি হলো : ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধ্বজাবাহী ও অখণ্ড ভারতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' বিচ্ছিন্নতাবাদী লীগের দাবির সামনে পরাহত ও দেশ-মাতৃকার নির্মম অঙ্গচ্ছেদের অসহায় ও করুণ সাক্ষী । হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ —সর্বসাধারণের মধ্যে এ ধারণা দীর্ঘকাল ধরে প্রতিপালিত হয়েছে । এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে এ বিশ্বাস শুধু সাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; ইতিহাস ও রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ মহলেও এটি প্রচলিত মত । পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে সাধারণ পরিচয়সম্পন্ন সকলের কাছেই, ১৯৪০ সালের ২৪ মার্চ তারিখে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবটি প্রকৃতপক্ষে 'পাকিস্তান' বা 'দেশবিভাগ'-এর প্রস্তাব, এবং ১৯৪৭ এর ১৪-১৫ অগাস্টের ঘটনা এই পাকিস্তান দাবির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ।

নতুন তথ্যের আলোকে ঐতিহাসিক ঘটনার নতুন বিশ্লেষণ, সমীক্ষা ও মূল্যায়ন এই প্রচলিত ধারণাগুলি সম্পর্কে গভীর সংশয়ের সৃষ্টি করেছে এবং ভারত-বিভাগের রাজনীতির ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক সংশোধিত ঐতিহাসিক ধারার সূত্রপাত করেছে। একদিকে লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কিত জিন্নাহ্‌র গূঢ় রাজনীতি ও অপরদিকে জিন্নাহ্‌র সংশয়জনক ও আপাতবিরোধী জটিল রাজনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার ফলে কংগ্রেস রাজনীতির চাতুর্য ও পরিবর্তিত কৌশল—এই দুয়ের সমন্বয়ে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭-এর ইতিহাসে এক জটিল নাটকীয় রাজনীতির পালা শুরু হয় যা জনৈক লীগ-নেতার চোখে 'এক বিরাট চাতুর্যের যুদ্ধ' বলে মনে হয় ।[৪] অস্বীকার করে লাভ নেই, সমসাময়িক কালে, খুব সামান্য লোকের কাছেই এই রাজনীতির গূঢ় অর্থ ধরা পড়ে। তাই প্রচলিত ইতিহাসের ভাষ্যেও তার পরিচয় নেই । এই অক্ষমতার কারণ অবশ্যই রয়েছে । এর মূল কারণের বিষয় আগেই উল্লেখিত হয়েছে । মুসলিম জাতীয়তাবাদ, লীগ, লাহোর প্রস্তাব, পাকিস্তান ও দেশবিভাগ—সর্বসাধারণের মনে একসূত্রে গ্রথিত হয়ে থাকার ফলে কারো মনে কোনো বিরুদ্ধ চিন্তার স্থান পাওয়া সহজ হয়নি । তাছাড়া, জিন্নাহ্ ও কংগ্রেস উভয়পক্ষের পরস্পরের উদ্দেশ্য ও কার্যের মধ্যে যে সূক্ষ্ম তারতম্য লক্ষ করা যায় তা উভয়পক্ষের 'নিরুক্তির ষড়যন্ত্রের' ফলে সম্যক উপলব্ধি করা সহজ ছিল না । এই রাজনীতির যে ছবি আমাদের চোখে এখন ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তা হলো : জিন্নাহ্ দেশ-খণ্ডনের ব্যাপারে ততখানি নয়, যতটা আগ্রহী ছিলেন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় হিন্দু সংখ্যাগুরুত্বের ভিত্তিতে কংগ্রেস-একাধিপত্য কায়েমি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা প্রতিহত করার উপায় সন্ধানে । এর একমাত্র পথ তাঁর কাছে মনে হয় 'দ্বি-জাতিতত্ত্বের' ভিত্তিতে মুসলিমের 'সংখ্যালঘু' অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন এবং ভারত অধিবাসী একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে এই দেশের ভবিষ্যৎ কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কংগ্রেসের সমতুল ('প্যারিটি') ক্ষমতা ও অধিকার অর্জন । দেশবিভাগের প্রচ্ছন্ন বিভীষিকা কংগ্রেসের সামনে সর্বক্ষণ তুলে ধরে জিন্নাহ্ দেশ-খণ্ডন ব্যতিরিক্ত পাকিস্তান দাবির অন্তর্নিহিত অন্যান্য আর সমস্ত সুযোগ ও অধিকার কংগ্রেসের কাছ থেকে কৌশলে আদায় করতে চেয়েছিলেন । অপরপক্ষে, ১৯২০-৩০-এর ঐক্য-প্রচেষ্টার পৌনঃপুনিক অসাফল্যে হিন্দু-মুসলিম একতার আদর্শে কংগ্রেসের বিশ্বাস ক্রমশ শিথিল হয়ে যায়।

১৯৩০ সনে কংগ্রেস-কর্তৃক গৃহীত 'পূর্ণ স্বরাজের' সিদ্ধান্ত এদিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 'একতার দাবি অগ্রগণ্য' ও 'একতাবিহীন স্বাধীনতা অলীক'—সুদীর্ঘকাল যাবৎ সযত্নে লালিত কংগ্রেসের এই মৌল আদর্শের ভিত্তিতে এই সময় থেকেই ক্রমশ ভাঙন শুরু হয় । শুধুমাত্র স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই দেশের সাম্প্রদায়িক ঐক্যলাভ সম্ভব হবে—কংগ্রেস তরফ থেকে এই যুক্তি ক্রমশ প্রচারিত হতে আরম্ভ করে এবং এই যুক্তির আড়ালেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরসনে কংগ্রেসের অক্ষমতা গোপনের প্রচেষ্টা ধরা পড়ে। ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের ফলে কংগ্রেসের এই ধারণা আত্ম-সমর্থন লাভ করে ও কংগ্রেস-মনোভাব দৃঢ়তর হয় । এই প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত দ্বি-জাতিতত্ত্বের মাধ্যমে কংগ্রেসের কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারে সমানাধিকার আদায় করার লীগ-প্রচেষ্টা কংগ্রেস নেতাদের মনে গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি করে । কেননা, এই ক্ষমতা ও অধিকারের সমবণ্টন শুধুমাত্র সম্ভব ছিল যদি কংগ্রেস শাসনকেন্দ্রে সীমিত ক্ষমতার দাবি মেনে নিয়ে প্রাদেশিক শাসনক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাবে আগ্রহী হতো । গোটা ভারতের হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে অবাধ ক্ষমতার অভিলাষী ও অধিকারী কংগ্রেসের পক্ষে এই বিশেষ মূল্যের বিনিময়ে একতার প্রয়োজন বৃহত্তর মনে হয়নি । তাই জিন্নাহ্‌র পাকিস্তান-দাবির রাজনীতির আক্ষরিক বা মৌখিক সত্যকে মেনে নেওয়ার 'মহত্ত্ব' বা বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দেখাবার কূটনীতির চালে, অনিচ্ছুক জিন্নাহ্‌র ঘাড়ে বিভক্ত পাকিস্তান চাপিয়ে দিয়ে, কংগ্রেস ভারতের মুসলিম-সমস্যা নির্বাসিত করার চতুর পথ বেছে নেয়। দেশের ঐক্য বজায় রাখার শেষ প্রচেষ্টা ও সুযোগ—১৯৪৬-এর ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা—বানচাল হয়ে যায় বিভেদ-সৃষ্টিকারী ব্রিটিশ কূটনীতি বা দেশ-খণ্ডনে অতি-উৎসাহী জিন্নাহ্ বা লীগের ছুরি চালানোয় নয় । দেশবিভাগ প্রতিহত করার শেষ চাবিকাঠি কংগ্রেসের হাতে ধরা ছিল । মুসলিম সমস্যা সমাধানে বিপর্যস্ত ও অক্ষম কংগ্রেস সে চাবি ফেলে দিয়ে ছুরি তুলে নেয় হাতে এবং মুসলিম 'ক্ষতস্থান' কেটে বাদ দেবার প্রচেষ্টায় 'দেশমাতার' অঙ্গ ব্যবচ্ছেদেও কসুর করেনি ।

দুই

ইতিহাস-পুনর্বিচারের এই কাজটি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে সম্প্রতি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পাকিস্তানি গবেষিকা আয়েশা জালালের 'দ্য সোল্ স্পোকসম্যান : জিন্নাহ্, দ্য মুসলিম লীগ অ্যাণ্ড দ্য ডিম্যাণ্ড ফর পাকিস্তান'-এই মূল্যবান গ্রন্থটির মাধ্যমে ।[৫] দেশবিভাগ সম্পর্কিত ইতিহাসের প্রচলিত ভাষ্যের একদিকে জিন্নাহ্ ও লীগ ও অপরদিকে কংগ্রেসের ভূমিকা সম্বন্ধে যে দুটি জনপ্রিয় ধারণার কথা এর আগে উল্লেখিত হয়েছে, জালাল, গবেষণা-লব্ধ প্রামাণিক যুক্তির সাহায্যে, তার একটির সত্যতা নিয়ে চূড়ান্ত সন্দেহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন । জালালের বক্তব্য, দেশ-বিভাগের আগে জিন্নাহ্ ও লীগের কয়েক বছরের রাজনীতি নিয়ে গভীর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে দেশ-ভাঙা তাঁদের রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল না । প্রচলিত মতের সঙ্গে এই নতুন সংশোধিত মতের পার্থক্য বিশেষভাবে দুটি বিষয়ে লক্ষণীয় : একটি লাহোর প্রস্তাব সংক্রান্ত ও অপরটি জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক জীবন ও আদর্শের মৌলিক পরিবর্তনের প্রশ্নসম্বন্ধীয় ।

লাহোর প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ, স্বাভাবিক কারণেই, এই মতবিরোধের প্রধান উপলক্ষ। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবের আগে মুসলিম রাজনীতির চরিত্র বিশ্লেষণে প্রাচীন ও নতুন মতে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। ১৯২০ সালে সর্বভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীর অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে,আইনানুগ ও শাসনতান্ত্রিক পথে রাজনীতিতে বিশ্বাসী--নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী জিন্নাহ্‌র কংগ্রেস-সদস্যপদ ত্যাগের সময় থেকে মুসলিম লীগের পক্ষে নিদারুণ নৈরাশ্যজনক ১৯৩৭-এর নির্বাচন পর্যন্ত—এই সুদীর্ঘকালব্যাপী লীগ ও জিন্নাহ্‌র রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রাচীন ও নবীনের মোটামুটি মতৈক্য রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের ক্রমপরিবর্তনশীল রাজনৈতিক মঞ্চে মুসলিম সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার আদায়ের কাজে সর্বভারতীয় মুসলিম ঐক্যের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা ও সেই উদ্দেশ্যে উত্তরোত্তর লীগের কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ ও সংবর্ধনের মূল লক্ষ্যের কথাই মোটামুটি এই সময়ের লীগ রাজনীতি সম্পর্কে সকলে বলে থাকেন। লীগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পরিপূরণের পথে দুটি বড়ো বাধা লক্ষ্য করা যায় : তার একটি মুসলিম সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ সমস্যা; অপরটি বাইরের বৃহত্তর সংখ্যাগুরু অ-মুসলিম সমাজের ভূমিকার প্রশ্ন। ১৯১৯-এর সংস্কার আইনের মাধ্যমে প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রে ভারতীয় ক্ষমতার বৃদ্ধির ফলে, দুই বিশ্ব-যুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে, মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে—বিশেষত পাঞ্জাব ও বাংলায়—স্থানীয় মুসলিম রাজনৈতিক নেতা ও দলের অধীনে মুসলিম রাজনৈতিক ক্ষমতার কিছু নতুন ঘাঁটি তৈরি হয়। এই অঞ্চলগুলিতে মুসলিম লীগের প্রাধান্য বিশেষ ছিল না, কেননা, লীগের রাজনৈতিক শক্তি প্রধানত সেইসব অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল যেখানে জনসংখ্যার অপ্রধান অংশ ছিল মুসলিম। লীগের রাজনৈতিক সমস্যার একটি বড়ো অংশ জুড়ে ছিল—মুসলিম-প্রধান ও অপ্রধান অঞ্চলের মুসলিমের বিপরীত স্বার্থের সামঞ্জস্য সাধন। লীগের পক্ষে বোঝা দুষ্কর হয়নি যে মুসলিম রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাবের মূল আধার ছিল মুসলিম-প্রধান অঞ্চল বা প্রদেশসমূহ। অংশ৮ স্থানীয় অবস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই অঞ্চলের অ-সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত লীগ-রাজনীতির আকর্ষণ ও লীগ নেতাদের প্রভাব খুব ক্ষীণ ছিল। তাছাড়া লীগের সর্ব-ভারতীয় কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বিস্তারের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থানীয় প্রভাবশালী প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের মনঃপূত না হওয়াব যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ ছিল। একদিকে বাস্তব-রাজনীতির চাপে ও স্বার্থে মুসলিম প্রাদেশিকতার সমর্থন অপরদিকে লীগের কেন্দ্রীয় ভূমিকা সম্প্রসারণের স্বার্থে গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যের অগ্রগণ্য দাবির ভিত্তিতে মুসলিম প্রাদেশিকতার শক্তি-বিনাশ—এই দুই বিপরীতধর্মী রাজনৈতিক স্বার্থের টানাপোড়েনে লীগ ও মুসলিম রাজনীতি এইসময়ে বেশ জটিল আকার ধারণ করে। অন্যদিকে, প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের যে বিশেষ অবনতি ঘটে ৬, তার প্রভাব কংগ্রেসের পক্ষেও অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। এই সময়েই, হিন্দু-জাতীয়তাবাদীদের চাপে মুসলিম সমস্যার প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব কঠিনতর হতে থাকে। নেহরু কমিটির অনুদার সুপারিশ, তার পরিপ্রেক্ষিতে জিন্নাহ্‌র 'চৌদ্দ-দফা দাবি', কংগ্রেস-কর্তৃক সে দাবির প্রত্যাখ্যান ও সর্বশেষে কংগ্রেসের এক-তরফা 'পূর্ণ স্বরাজের' সিদ্ধান্ত গ্রহণ—এই সমস্তই কংগ্রেসের পরিবর্তিত মনোভাবের পরিচায়ক। এই অচল

রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৯ সালে জিন্নাহ্‌র দেশত্যাগ ও লণ্ডন-যাত্রার অনেকখানি ব্যাখ্যাই মেলে। তিরিশ দশকের মাঝামাঝি মুসলিম অ-প্রধান অঞ্চলের কিছু নেতার অনুরোধে জিন্নাহ্‌র দেশ ও রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের পরেও তাঁর ও লীগের নীতি বা কার্যে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক নির্বাচনের আগে পর্যন্ত সেই নীতির উদ্দেশ্য, পরিষ্কারভাবেই মনে হয় যে ভারতীয় মুসলিমের সংখ্যালঘুপদের ভিত্তিতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রে এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম প্রতিনিধিত্বের দাবি, কংগ্রেস ও ব্রিটিশের কাছ থেকে আদায় করা। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের ফলাফল জিন্নাহ্ ও লীগের এই নীতি ও কৌশল পুরোপুরি ব্যর্থ করে দেয়, এবং তার ফলে লীগের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে।

এখানে উল্লেখনীয়, এই নির্বাচন যে বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন সে বিষয়ে প্রচলিত ও সংশোধিত মতবাদে বিরোধ নেই; বিরোধেব শুরু স্পষ্টতই এই গুরুত্বের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের বিষয়ে। অ-মুসলিম বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে কংগ্রেসের চূড়ান্ত সাফল্য ও মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে লীগ ও কংগ্রেসের যুগপৎ ব্যর্থতা[৭]—এই নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফলাফল। লীগেব দুর্বলতা লীগ সম্পর্কে কংগ্রেসের ধারণা ও মনোভাব পরিবর্তনের পক্ষে অনুকূল হয়নি। নিবাচনের পরবর্তীকালে কংগ্রেস-লীগ আদান-প্রদানে কংগ্রেসের এই মনোভাব পরিস্ফুট। ১৯৩৭-এর অভিজ্ঞতা জিন্নাহ্‌র পক্ষে বিপর্যয়ের বার্তাবাহী বলে যুক্তিসংগত কাবণেই মনে হয়েছিল: একদিকে দেশের বিরাট অংশে কংগ্রেসের একাধিপত্যের বাস্তব পরিচয়, অপরদিকে, বাংলা ও পাঞ্জাব এই দুটি বৃহত্তম মুসলিম প্রদেশের ক্ষেত্রেও সরকার গঠনে লীগের অক্ষমতা। কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা—যা ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুযায়ী তখন পর্যন্ত পুরোপুরি ব্রিটিশ এক্তিয়ারে ছিল—হস্তান্তরের অর্থ কংগ্রেস আধিপত্যের বিস্তার। ১৯৩৭-এব ঘটনার ফলাফল লীগের অস্তিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত ছিল: লীগের ইতিহাসে এর চেয়ে বড়ো সংকটের সন্ধান পাওয়া যায় না। জিন্নাহ্‌র চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল বাজনৈতিক সত্যের নগ্ন রূপ। তিনি তখন মন্তব্য করেন: 'একমাত্র সমতাব ভিত্তিতেই সম্মানজনক মতৈক্য গড়ে ওঠা সম্ভব', কেননা 'বাজনীতির অর্থ ক্ষমতা'।[৮] এই সত্যের উপলব্ধি জিন্নাহ্‌র রাজনীতিতে কিভাবে পরিবর্তন এনেছিল সে প্রশ্নের মধ্য দিয়েই প্রচলিত ও সংশোধিত চিন্তার পার্থক্য প্রকট হয়ে ওঠে।

পুরাতন দৃষ্টিতে, এই ঘটনা জিন্নাহ্ ও লীগের উদ্দেশ্য, নীতি ও কার্যক্রমে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনে যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী জিন্নাহ্, এর ফলে, পুরোপুরি ধর্ম-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠেন এবং ভারতের অ-মুসলিম সমাজ থেকে মুসলিমকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার অভিপ্রায়ে 'দ্বি-জাতিতত্ত্বের' ধ্বজা তুলে ধরেন। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব লীগ-কর্তৃক এই স্বতন্ত্র মুসলমান জাতীয়তার প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও ১৯৪৭-এর অগাস্ট মাসে তার পূর্ণতা-লাভ। নতুন দৃষ্টিতে লাহোর প্রস্তাব ও জিন্নাহ্‌র আমূল পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রচলিত এই দুটি অভিমতই ত্রুটিপূর্ণ ও পরিত্যাজ্য। নিঃসন্দেহে, ১৯৩৭-এর পরে জিন্নাহ্‌র রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজনা হয়; কিন্তু সংশোধনী অভিমতানুযায়ী, এই পরিবর্তন জিন্নাহর রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত নয়, সে পরিবর্তন

ঘটেছিল তার অপরিবর্তিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণে নতুন কৌশল ও কূটনীতি অবলম্বনে। সেই রাজনীতির লক্ষ্য তখনও, প্রকৃতপক্ষে দেশ-বিভাগ নয়; দেশ-বিভাগের প্রচ্ছন্ন হুমকির সাহায্যে, ভারত শাসনে কংগ্রেসের সঙ্গে ক্ষমতার সমবিভাজনই ছিল এর মূল লক্ষ্য। আর সে উদ্দেশ্য-চরিতার্থে পরিবর্তিত কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল স্বতন্ত্র হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তার স্বীকৃতি আদায়। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের দাবি গৃহীত হলেই প্রয়োজনানুগ যুক্তরাষ্ট্রীয় বা অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম-প্রধান অঞ্চলগুলির সঙ্গে সঙ্গে অ-প্রধান অঞ্চলের মুসলিম অধিবাসীদেব স্বার্থরক্ষা করা সম্ভবপর ও সহজতর মনে হয় জিন্নাহ্ ও লীগের কাছে। নতুন দৃষ্টিতে, উদ্দেশ্য ও কৌশলের এই পার্থক্য নির্ণীত হওয়ার ফলে, লাহোর-প্রস্তাব সংক্রান্ত বিতর্কের রূপ স্পষ্টতর হয়েছে। উপরোক্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির কারণে, মুসলিম জাতীয়তার স্বীকৃতি-অর্জন ছিল প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং, সেজন্যেই, এই দৃষ্টিতে লাহোর-প্রস্তাব একটি 'কূটনৈতিক চাল' (tactical move) ও 'দরাদরির চাকতি' (bargaining counter) বলে অভিহিত হয়েছে।[৯]

তিন

যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে এই দুটি মত পর্যালোচনা করে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে প্রচলিত মত যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ, ও এতে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর মেলে না। লাহোর প্রস্তাবকে পাকিস্তান দাবির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখাব সাধারণ প্রবণতা অনেক দিক থেকে যুক্তিগ্রাহ্য নয়। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, তথাকথিত 'পাকিস্তান প্রস্তাবের' কোনো অংশে 'পাকিস্তান' শব্দের উল্লেখ নেই কেন? এই অনুল্লেখ আরো বিশেষ গুরুত্বলাভ করে যদি জানা থাকে যে 'পাকিস্তান' শব্দটির প্রতি জিন্নাহ্‌র গোড়ায় যথেষ্ট অনীহা ছিল। এমনকি, তিনি ১৯৪৩ সালে লীগের লখনৌ অধিবেশনে মন্তব্য করেন:

> আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে 'পাকিস্তান' শব্দটি লাহোর প্রস্তাব পাশ করার সময়ে আমরা ব্যবহার করিনি। তাহলে এই শব্দটি কোথা থেকে এল? ...আমার কাছ থেকে শুনুন, এর জন্যে দায়ী তারা (হিন্দুরা)...তারাই এই শব্দটি আমাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে।[১০]

একথা বুঝতে অসুবিধে নেই যে দেশ-ভাঙার অর্থে 'পাকিস্তান' জিন্নাহ্‌র মনঃপূত নয়। পরে তিনি লাহোর-প্রস্তাবের 'সহজ' পাকিস্তান নামকরণের জন্যে হিন্দুদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম জাতীয়তার প্রতীক স্বরূপ 'পাকিস্তান' শব্দটির আবেদন অবশ্য তাঁর কাছেও ছিল।

১৯৪০ সালে দেশবিভাগের দাবির যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হয় আরেকটি কারণে যার উল্লেখ ওপরে আমরা করেছি। মুসলিম-প্রধান অঞ্চল নিয়ে একাধিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের যে দাবি লাহোর প্রস্তাবের মূল ভিত্তিস্বরূপ ছিল, সে দাবি পূরণের মধ্যে এই অঞ্চল বহির্ভূত প্রায় সাড়ে তিন কোটি মুসলিমের সমস্যা সমাধানের কোনো উত্তর এই প্রস্তাবে ছিল না। গোটা উপমহাদেশের মুসলিম অধিবাসীর সমর্থন ও আনুগত্যের ভিত্তিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের তরফে কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রে অধিকার ও ক্ষমতাভিলাষী জিন্নাহ্‌র পক্ষে মুসলিম সমাজের এই বিপুল এক-তৃতীয়াংশকে উপেক্ষা করার কোনো

কারণ বা যুক্তি ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে তিরিশের দশকে লণ্ডনে আত্ম-নির্বাসন থেকে জিন্নাহ্‌র স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় অ-প্রধান অঞ্চলের কিছু মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায়।

তৃতীয়ত, মুসলিম-প্রধান অঞ্চলের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতেও, নিছক দেশবিভাগের প্রস্তাব এই অঞ্চলের প্রাদেশিক নেতৃবর্গের সমর্থন পায়নি। এই অঞ্চলের স্থানীয় মুসলিম নেতৃবর্গের রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে সংশয়ের অবকাশ ছিল না। তাঁরা নিজ এলাকার অ-মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগে রাজনীতি পরিচালনায় আগ্রহী ও কুশলী ছিলেন। নিঃসন্দেহে, মুসলিম জাতীয়তা ও দেশ-বিভাগের দাবি এই অঞ্চলের অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তিমূল দুর্বল করে এবং পরিশেষে পাঞ্জাব ও বাংলা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত হয়।

চতুর্থত, এক পাকিস্তান রাষ্ট্র বা একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের কোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা নিয়ে গভীর সন্দেহ শুধু অ-মুসলিম ভারতীয় বা ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, জিন্নাহ্‌সহ বহু বাস্তববাদী মুসলিম নেতাদের মনেও এই বিষয়ে সন্দেহ ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য পাকিস্তান সৃষ্টির শেষ পর্যায়ে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুশ্চিন্তাজনক ভৌগোলিক বিচ্ছেদের সমস্যার কথা ভেবেই জিন্নাহ্ এই দুই অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি অপরিসর ভূমিখণ্ডের জন্যে প্রাণান্ত চেষ্টা করেছিলেন।

লাহোর-প্রস্তাব ও পাকিস্তান দাবির অভিন্নতা সম্পর্কিত প্রচলিত মতের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতার উৎস হলো, প্রস্তাব পাশের পরবর্তীকালে জিন্নাহ্‌র কথা ও আসল কাজের মধ্যে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কে অনবহিতি বা অজ্ঞানতা। ১৯৪২-এর ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাব ও ১৯৪৬-এর ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা—এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগের বক্তব্য ও আচরণ নিঃসন্দেহে দেশবিভাগের মতবাদের পরিপন্থী। অথচ, এই অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলিকে প্রচলিত মতবাদীরা প্রায় পাশ কাটিয়েই চলে গেছেন। প্রাচ্যের যুদ্ধমঞ্চে ক্রমবর্ধমান জাপানি শক্তি ও প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪২ সনের ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাব স্পষ্টতই, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আক্ষরিক অর্থে লাহোর-প্রস্তাবের মূল দাবি মেনে নেয়, কেননা এই প্রস্তাব অনুযায়ী, স্বশাসিত ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় গঠিত ভারতের যে কোনো প্রদেশ, আকাঙ্ক্ষী হলে, এই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারী হয়। সুতরাং মুসলিম-প্রধান অঞ্চলসমূহ বিচ্ছিন্ন করার যে মূল দাবি লাহোর-প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাবের মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে কোনো বাধা ছিল না। সেহেতু, জিন্নাহ্ ও লীগের পক্ষে ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান তাদের প্রকৃত অভিলাষ সম্পর্কে গভীর সন্দেহ সৃষ্টি করে। ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটির অনুল্লেখ—প্রত্যাখ্যানের এই অদ্ভুত কারণটি সন্দেহের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। লাহোর-প্রস্তাবেও পাকিস্তানের উল্লেখ নেই এবং পাকিস্তান শব্দটির প্রতি জিন্নাহ্‌র যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল তার বিরুদ্ধেও প্রমাণ আমরা উপরে দাখিল করেছি। পাকিস্তানের উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক, মুসলিম প্রদেশগুলিকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন করার অধিকার ক্রিপ্‌সের প্রস্তাব নিঃসন্দেহে মুসলিমদের হাতে তুলে ধরেছিল। অপরপক্ষে ১৯৪৬ সনের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত

প্রদেশগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করে । প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয় : তার একটি, মুসলিম প্রদেশগুলির সমষ্টি; দ্বিতীয় বিভাগটি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-প্রধান প্রদেশসমূহের সমষ্টি; তৃতীয় বিভাগটি বাংলা ও আসাম প্রদেশ-দুটি নিয়ে গঠিত, যাকে অধিকার দেয়া হয় দশবছর পরে অন্য দুটি বিভাগের যে কোনো একটির সঙ্গে মিলিত হওয়ার । নির্দ্বিধায় বলা চলে যে দেশবিভাগের ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান দাবির মূলসূত্রকে এই পরিকল্পনায় অস্বীকার করা হয়েছে । তথাপি, আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়করভাবে জিন্নাহ্ ও লীগ কংগ্রেসের অনেক আগে এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায় । পরে এই পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে কংগ্রেসের প্রকৃত ইচ্ছার অভাব ও বিভ্রান্তি-সৃষ্টিকারী কার্যকলাপের ফলে জিন্নাহ্ এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যানে ও অবশেষে দেশবিভাগের ভিত্তিতে সমাধান মেনে নিতে বাধ্য হন । ক্রিপ্‌স্ ও ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব সম্পর্কে জিন্নাহ্‌র মনোভাব ও কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে দেশবিভাগের যুক্তির পরিপন্থী।

পরিশেষে জিন্নাহ্‌র রাজনীতি সম্পর্কে প্রচলিত মতে আরেকটি বড়ো ত্রুটি ধরা পড়ে। এই মতানুযায়ী জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক আদর্শ, বিশ্বাস ও কার্যধারার বিবর্তনে একটি আমূল পরিবর্তনের আনুমানিক সিদ্ধান্ত রয়েছে । ভারতীয় জাতীয়তা ও ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতির আদর্শে আজীবন-বিশ্বাসী জিন্নাহ্, এই মতবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে, ১৯৩৭-এর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পরে, ক্রমশ ধর্মের আদর্শে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠেন, ও ১৯৪০-এর দেশবিভাগের প্রস্তাবের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তার আদর্শে কুঠারাঘাত করেন। জিন্নাহ্‌র চতুর রাজনীতি সম্পর্কে এই মত শুধুমাত্র ভ্রান্তিমূলক নয়, জিন্নাহ্‌র প্রতি অবিচারমূলকও বটে । ওপরে আমরা আলোচনা করে যে তথ্য প্রতিপাদনের প্রয়াস পেয়েছি তা হলো: জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিবর্তন এটা ততটা নয় যতটা ছিল তাঁর রাজনৈতিক কৌশল ও চালের উল্লেখনীয় পবিবর্তন ।

চার

প্রচলিত মতের বিবিধ দিকের এই অপূর্ণতা ও ত্রুটি নতুন জিজ্ঞাসা, গবেষণা ও সংশোধিত চিন্তা ও বিশ্লেষণের গভীর প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে । আয়েশা জালালের উপরোক্ত গবেষণামূলক গ্রন্থের মাধ্যমে লাহোর-প্রস্তাব ও তার পরবর্তীকালে জিন্নাহ্ ও লীগের রাজনীতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে বিভ্রান্তি-সৃষ্টিকারী প্রচলিত মতের দুর্বলতাগুলি আমাদের চোখে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । জালালের গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য; তাঁর কাজের সঠিক মূল্যায়নের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । ফ্রান্সিস্ রবিনসন দাবি করেছেন যে জালালের বক্তব্যটি একটি 'সম্পূর্ণ নতুন তত্ত্ব' (a novel thesis) ।[১১] এই দাবি অতিশয়োক্তি বলে মনে হয় । ইতিহাস সংশোধনের সাধারণ নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জালালের সংশোধনী মতামতের সৌধও নির্মিত হয়েছে কিছু পূর্ব-বিদিত তথ্য ও ধারণার ভিত্তির উপরে । লাহোর-প্রস্তাবের শব্দ ও অর্থের অস্পষ্টতা যে জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক কৌশলের একটি মুখ্য উপাদান জালালের এই বক্তব্যের সমর্থক একটি মতধারা সমসাময়িককাল থেকে পরবর্তীকালের মতামতের মধ্যেও তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে । ১৯৪০ সালেই প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও রাজনীতিক বি. আর. আম্বেদকর (যাঁর মতামতের উপর জিন্নাহ্ আস্থাশীল ছিলেন) এই প্রস্তাবের

অস্পষ্টতা ও স্ব-বিরোধিতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতপ্রকাশ করেন।[১২] ব্রিটিশ রাজনীতি-বিশারদ রেজিনাল্ড কুপল্যাণ্ড, যিনি ১৯৪০ সনে প্রস্তাব গ্রহণের সমসাময়িককালে জিন্নাহ্‌র সাক্ষাৎপরিচয় লাভ করেন, তিনিও প্রস্তাবটির 'সঠিক অর্থ' সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।[১৩] প্রস্তাবটিকে পাকিস্তানের পূর্ণ-দাবির অর্থে গ্রহণ না করে রাজনীতির দরদামের প্রয়াস হিসেবে দেখার সার্থকতার কথা লিখেছেন আরো অনেকে। ১৯৬৭ সালে হিউ টিংকার লেখেন যে অনেক সমসাময়িক ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও রাজনীতিক প্রস্তাবটিকে 'স্বেচ্ছাকৃত চড়া মূল্যের ডাক' (deliberate over-bid) বলে মনে করেছেন।[১৪] জনৈক ব্রিটিশ রাজকর্মচারী, পেণ্ডেরেল মুন পরবর্তীকালে লিখেছেন :

> ব্যক্তিগতভাবে জিন্নাহ্ লাহোরে দু'একজনের কাছে বলেছেন যে এই প্রস্তাবটি একটি 'চাল' [tactical move] : তাছাড়া, তিনি যে ১৯৪০ সনে, অপরিহার্যভাবে পাকিস্তানের অনুরক্ত ছিলেন না তা সুপ্রমাণিত হয় এই সত্যের সাহায্যে যে তিনি ছয় বছর পরে সোজা দেশভাগের চেয়ে নিম্নতরমার্গের কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন।[১৫]

১৯৪১ সনে, 'রিফর্ম কমিশনার' হিসেবে, হড্‌সন লক্ষ করেন যে মুসলিম লীগ পন্থীরা 'কনফেডারেশনের ধারণার সঙ্গে পাকিস্তান অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করেনি'। হড্‌সনের কাছে এটি বিন্দুমাত্র বিস্ময়কর মনে হয়নি, কেননা অ-প্রধান অঞ্চলের মুসলিম জনসমূহের জন্যে পাকিস্তান-পরিকল্পনা একেবারেই অর্থহীন।[১৬] পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ও প্রস্তাব-পাশের কালে লীগের এক বিশিষ্ট সদস্য আই. আই. চুন্দ্রিগড়ের ধারণায় আয়ারল্যাণ্ডের মতো আরেকটি 'আলস্টার' সৃষ্টি করা লাহোর-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল না; তার উদ্দেশ্য ছিল 'সমতার ভিত্তিতে দুই জাতিকে এক রাষ্ট্রের অধীনে আনা'। তাঁর মতে 'ভারতের ঐক্য বিনষ্ট না করে, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একাধিপত্যের বিকল্প শাসনব্যবস্থা' সন্ধান করাই এই প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল।[১৭] সর্বোপরি, আমরা এর আগেই বলেছি, জিন্নাহ্ স্বয়ং, ১৯৪৩ সালে, লাহোর-প্রস্তাবটিকে 'পাকিস্তান' আখ্যায় ভূষিত করার ব্যাপারে হিন্দুদেরই দায়ী করেছেন।[১৮]

উপরোক্ত কারণে, লাহোর-প্রস্তাব সম্পর্কিত জালালের মূল বক্তব্য সম্পূর্ণ 'নূতনত্বের' দাবি করতে পারে না। জালালের গবেষণামূলক কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন তাই এই নূতনত্বের দাবির ভিত্তিতে করা অনুচিত; তাঁর অবদান মূলত বিচার করতে হলে মনে রাখা প্রয়োজন, গবেষণার সাহায্যে যে বক্তব্যকে তিনি যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে সংহত ও পূর্ণরূপে উপস্থাপিত করেছেন, তা এতদিন নিতান্ত সীমিত গণ্ডীতে সংশয়, অনুমান ও অন্তর্দৃষ্টির উপরে দাঁড়িয়ে ছিল। সংশোধিত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসের বহু দুর্জ্ঞেয় ও দুর্বোধ্য প্রশ্ন ও ঘটনার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা মেলে। লাহোর-প্রস্তাবের সময় থেকে ক্যাবিনেট মিশনের সময় পর্যন্ত জিন্নাহ্ ও লীগের বাক্য ও আচরণে যে আপাত-বিরোধী অবস্থা গভীর সংশয়ের সৃষ্টি করে, সংশোধিত ভাষ্যে তার অনেকখানি উত্তরই খুঁজে পাওয়া যায়। পুরাতন দৃষ্টিতে জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক জীবনের বিচ্ছিন্ন মূলসূত্রটিকে আবার অবিচ্ছিন্নভাবেই ফিরে পাওয়া যায় এই নতুন ব্যাখ্যায়। নতুন দৃষ্টিতে জিন্নাহ্‌র রাজনীতি অধিকতর জটিল ও সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে। ১৯৩৭-এর অভিজ্ঞতার ফলে ধর্মের জিগির তুলে, দেশভঙ্গের আপসহীন দাবির ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে

১৯৪৭-এর পাকিস্তান-সৃষ্টির সাফল্য অর্জনের যে সুপরিচিত জিন্নাহ্‌র ছবি ঐতিহাসিকরা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তা নিতান্ত মামুলি অতিসরলীকৃত চিত্রায়ন। প্রকৃতপক্ষে, জিন্নাহ্ বহুগুণে জটিলতর ও কঠিনতর পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলন শক্তিশালী ও উদ্দেশ্য সফল করার খাতিরে মুসলিম জাতীয়তার প্রয়োজন তাঁর চোখে নিশ্চিতভাবেই পড়েছিল, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন যে এই ধর্মের ধুয়ো নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি হ'লে দেশবিভাগের প্রশ্নটিই বড়ো হয়ে উঠবে। এবং সেক্ষেত্রে পাকিস্তান বহির্ভূত ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণের স্বার্থ খণ্ডিত ও ব্যাহত হবে। তাই মুসলিম-জাতীয়তার স্বীকৃতির অত্যাবশ্যকতার সঙ্গে দেশ-বিভাগের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করার গুরুতর সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। অপরদিকে, প্রাদেশিক স্তরে ক্ষমতাভিলাষী মুসলিম প্রদেশের নেতৃবৃন্দের উপরে লীগের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বিস্তার ও অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে জিন্নাহ্ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হলে সাধারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সেই কেন্দ্রীয় শক্তির অব্যর্থ পরিণতি কংগ্রেসী একাধিপত্য। জিন্নাহ্‌র কাছে উপমহাদেশীয় মুসলিম সমস্যার আদর্শ সমাধান ছিল দু'টি যুক্তরাষ্ট্র—একটি কংগ্রেস শাসিত মূলত হিন্দু-অধ্যুষিত, অপরটি লীগ-শাসিত মূলত মুসলিম অধ্যুষিত— যে দু'টিকে কনফেডারেশন বা অন্য কোনো চুক্তি বা অঙ্গীকারপত্রের মাধ্যমে একটি অবিচ্ছিন্ন শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। এই ব্যবস্থায় লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বাধীনে মুসলিম-প্রধান অঞ্চলের স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি পূরণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে মুসলিম সংখ্যালঘুর স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল না।

জিন্নাহ্‌র রাজনীতিকে এই মূল প্রেক্ষিত থেকে বিচার করলে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭-এর ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত অর্থ ক্রমশ বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। দেশ-বিভাগের পরিবর্তে মুসলিম জাতীয়তা-ভিত্তিক 'অধিকারের' স্বীকৃতি লাহোর-প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় জিন্নাহ্‌র পক্ষে প্রথমদিকে পাকিস্তান-দাবির সঙ্গে একে একাত্ম করে দেখার বাধা ছিল। অপরদিকে, মুসলিম জাতীয়তার প্রতীক হিসেবে পাকিস্তান শব্দটির ক্রম-সংযোগ জিন্নাহ্‌কে এই জনপ্রিয় সমীকরণ গ্রহণে প্ররোচিত বা বাধ্য করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত ব্রিটিশরাজ মুসলিম সমর্থনলাভের আশায় ১৯৪০-এর 'অগাস্ট ঘোষণায়' মুসলিম অধিকার স্বীকৃতি দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। ক্রমবর্ধমান জাপানি প্রভাবের চাপে ১৯৪২-এর ক্রিপস্-প্রস্তাব লাহোর-প্রস্তাবের আক্ষরিক অর্থানুসারে প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতার অধিকার মেনে নিয়ে মুসলিম দাবির সমর্থনে আরো এক ধাপ এগিয়ে আসে। কিন্তু জিন্নাহ্‌র 'প্রকৃত' উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এই ক্রিপস্-প্রস্তাব তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। লীগের পক্ষে ক্রিপস্-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সরকারি কারণটির মধ্যে জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের আংশিক পরিচয় রয়েছে। প্রস্তাবে পাকিস্তানের অনুল্লেখের বিষয়টিকে যে কারণ হিসেবে দেখানো হয় তার সঙ্গে মুসলিম জাতীয়তা স্বীকৃতির প্রশ্ন কিছুটা জড়িত ছিল বলা চলে। কিন্তু জিন্নাহ্‌র পক্ষে ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ক্রিপস্-প্রস্তাব। লাহোর-প্রস্তাবে যে অস্বস্তিকর প্রশ্নটিকে জিন্নাহ্ পাশ কাটিয়ে গেছেন, সেই প্রশ্নটিই ক্রিপস্-প্রস্তাব সর্বসমক্ষে তুলে ধরে জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক কৌশল প্রায় বানচাল করে দেয়ার উপক্রম করে। আমরা

আগেই উল্লেখ করেছি, ১৯৪০-এর পরবর্তীকালে লীগের প্রভাব মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে ক্রমশ কার্যকরী হয়েছে। সে প্রভাব ও ক্ষমতা অর্জনের আগে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে মুসলিম লীগকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, কেননা এখানে অনেকখানি স্বার্থের সংঘাত ছিল। মুসলিম প্রাদেশিক নেতাগণ স্বাভাবিক কারণেই কেন্দ্রীয় শক্তি নয়, প্রাদেশিক ক্ষমতার বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন ; অপরপক্ষে জিন্নাহ্ মুসলিম প্রদেশের রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকলেও, সর্ব-ভারতব্যাপী মুসলিম জাতীয়তা ও লীগের রাজনৈতিক স্বার্থে মুসলিম প্রাদেশিকতার সঙ্গে মুসলিম জাতীয় সংহতির মিলনের প্রয়াসী ছিলেন। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে মুসলিম প্রদেশে লীগের শোচনীয় ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৪০-এর লাহোর-প্রস্তাবে জিন্নাহ্ শুধু প্রাদেশিক ক্ষমতার প্রশ্নটি তোলাই সমীচীন মনে করেন। লাহোর-প্রস্তাব, তাই, কোনো ঐক্যবদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রের প্রশ্নে নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করে। ক্রিপ্‌স্-প্রস্তাব শুধুমাত্র প্রাদেশিক স্বাধীনতার ক্ষমতা মুসলিম প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে, কেন্দ্রীয় শাসন ও মুসলিম রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রশ্নে জিন্নাহ্‌র পক্ষে আর নিশ্চুপ থাকা প্রায় অসম্ভব করে তোলে। সৌভাগ্যক্রমে, কংগ্রেস প্রস্তাবটিকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন না হয়েও জিন্নাহ্ প্রস্তাবের বিপক্ষে অনায়াসে মত প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। ক্রিপ্‌স্-প্রস্তাব যেখানে সমস্যা সৃষ্টি করে, ১৯৪৬-এর ক্যাবিনেট মিশন-প্রস্তাব ঠিক সেখানেই জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সাফল্যে মদত যুগিয়েছিল। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, মিশন-প্রস্তাবে জিন্নাহ্‌র আগ্রহ প্রকাশ প্রায় সবচেয়ে বেশি। দেশের কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন করার অধিকার মিশন-প্রস্তাবে স্বীকার করা হয়নি; সেদিক থেকে এই প্রস্তাব লাহোর-প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু জিন্নাহ্‌র রাজনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা ছিল না, তাই দেশবিভাগের অধিকার অস্বীকৃত হলেও, জিন্নাহ্‌র পক্ষে মিশন-প্রস্তাবের আর্কষণ ছিল বহুবিধ। এই প্রস্তাবের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ প্রদেশসমূহের বাধ্যতামূলক আঞ্চলিক সংঘবদ্ধতা (Compulsory grouping), যার ফলে পূর্ব, ও বিশেষত, উত্তর-পশ্চিম এলাকার মুসলিম প্রদেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করে প্রায় লীগ ও জিন্নাহ্‌র হাতে তুলে দেয়া হয়। তাছাড়া, ভারতের মুসলিম-প্রধান ও অ-মুসলিম-প্রধান অঞ্চলগুলি স্বতন্ত্রভাবে পুনর্গঠিত করে এক-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার মূল লক্ষ্যের দিক থেকেও এই প্রস্তাব জিন্নাহ্‌র কাছে বরণীয় মনে হয়। স্বাভাবিক কারণেই এই শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হয় ; তা লীগের দৃষ্টিতে কংগ্রেস-আধিপত্য সীমিত রাখার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। মিশন-প্রস্তাবের আগেই মুসলিম প্রদেশে লীগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে কারণেই সীমাবদ্ধ কেন্দ্রীয় ক্ষমতার ফলে মুসলিম রাজনীতিতে লীগের প্রাধান্য খর্বিত হওয়ার প্রশ্ন ছিল না। নিঃসন্দেহে, ক্যাবিনেট মিশন-পরিকল্পনা জিন্নাহ্‌র জটিল রাজনীতির অভীপ্সিত লক্ষ্যের খুবই কাছাকাছি এসেছিল। ১৬ মে ১৯৪৬ মিশন-প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় ; ৬ জুন লীগ তা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়; ২৫ জুন কংগ্রেস কার্যপরিষদ আংশিকভাবে তা গ্রহণ করে এবং ৬ জুলাই মৌলানা আজাদের সভাপতিত্বে অখিল-ভারত কংগ্রেস পরিষদ আবার সর্তাধীন স্বীকৃতি জানায়; ২৯ জুন সাফল্যের সম্ভাবনায় আহ্লাদিত মিশন ভারত থেকে বিদায় নেয় এবং জিন্নাহ্ তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সন্ধ্যায় অভীপ্সিত লক্ষ্যে উত্তরণের স্বপ্নে বিভোর হন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আপসের সমস্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। নতুন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু ১০ জুলাইয়ের মধ্যে মিশন-প্রস্তাবের মূল সূত্রগুলি সম্পর্কে গভীর সংশয় সৃষ্টি করে প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনার অবসান সূচনা করেন। আশাহত ও বিক্ষুব্ধ জিন্নাহ্ ২৯ জুলাই লীগের পক্ষ থেকে মিশন-প্রস্তাবের পূর্বতন স্বীকৃতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। মুক্তদৃষ্টিতে বিচার করে আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে ক্যাবিনেট মিশনের ব্যর্থতার দায়িত্ব ইতিহাসের পক্ষপাতহীন কঠোরদৃষ্টিতে বহন করতে হবে মুসলিম লীগকে নয়, কংগ্রেসকে। ইতিহাসের কাঠগড়ায় দেশবিভাগের সম্পূর্ণ বিরোধী মিশন-পরিকল্পনা হত্যার আসামী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেসের এই আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত আচরণের প্রমাণ ও ব্যাখ্যা কি ?

পাঁচ

এর উত্তরটির সঙ্গে প্রচলিত ইতিহাসের দ্বিতীয় কাল্পনিক বা আনুমানিক সত্যের যে প্রশ্নটির অবতারণা আমরা শুরুতে করেছিলাম তা যুক্ত। দেশ-বিভাগের প্রশ্নে জিন্নাহ্ ও লীগের দায়িত্ব নির্ধারণের কাজটি জালালের গবেষণার ফলে চূড়ান্ত সাহায্য লাভ করেছে। অপরদিকে, একই প্রশ্নে কংগ্রেসের দায়িত্ব নির্ণয়কল্পে কংগ্রেসের প্রধান নেতৃবৃন্দের চিন্তা ও আচরণের যে বিক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রমাণ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, তার ভিত্তিতে এই সম্পর্কে প্রচলিত ইতিহাসের ধারণা ও বিশ্বাস সংশোধনের বিশেষ আবশ্যকতা অনুভূত হয়।

এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, বিশের দশকে অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবৃদ্ধির ফলে ও এই দশকের শেষের দিকে সর্বদলীয় রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার অসাফল্যে 'ঐক্যের ভিত্তিতে স্বাধীনতা'— কংগ্রেসের এই মূল প্রত্যয় ও নীতি অনেকখানি শিথিল হয়ে যায়। ১৯৩০ সনে কংগ্রেস 'পূর্ণ স্বরাজের' যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এদিক থেকে তার গুরুত্ব বোঝা দরকার। এইসময় থেকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেস বক্তব্যের একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। কংগ্রেসেব বক্তব্য ক্রমশ হয়ে দাঁড়ায় যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান স্বাধীনতার আগে লভ্য নয়, পরে লভ্য। পরবর্তীকালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যখন স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে একতার দাবি শেষ পর্যন্ত উৎসর্গিত হয়, এর গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী অভিজ্ঞতার পরে মুসলিম লীগের রাজনীতি দেশীয় ঐক্যের পক্ষে মহা গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি প্রশ্ন সোজাসুজি কংগ্রেসের কাছে তুলে ধরে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে কেন্দ্রের সীমিত ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতের ঊর্ধ্বে এক-তৃতীয়াংশ কেন্দ্রীয় আসনের মাধ্যমে মুসলিমস্বার্থ সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব—এই বিশ্বাস মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। ১৯৩৭-এর পরবর্তীকালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে কেন্দ্রে ক্ষমতার সমবণ্টনের যে নতুন দাবির ধুয়া লীগের পক্ষ থেকে ওঠে, তা কংগ্রেসের পক্ষে গ্রহণীয় ছিল না। একথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে কংগ্রেস লীগের বোঝাপড়ার গোটা ইতিহাসে অনেক বিষয়ে—এমনকি মুসলিমদের স্বতন্ত্র নির্বাচনব্যবস্থা সম্পর্কেও — মতৈক্য ঘটেছে [১১], শুধু কংগ্রেস কোনো অবস্থাতেই কেন্দ্রীয় শক্তির সংকোচনের প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি। তাই কেন্দ্রীয় প্রাধান্যের

বিনিময়ে একতা বজায়ের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে একতার বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার পথই কংগ্রেস বেছে নেয় ।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন নয় । কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ 'জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন' প্রত্যাশী যে ভারতের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তা বর্ণ, ধর্ম, ভাষা ও অঞ্চলে বিভক্ত ভারতে ক্ষমতাহীন কেন্দ্রের নেতৃত্বে বাস্তবায়িত করা সম্ভব মনে হয়নি । তা ছাড়া নেহেরুর মতো সমাজবাদে বিশ্বাসী কংগ্রেস-নেতাগণ পরিকল্পনা-ভিত্তিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যাবশ্যকতা সম্পর্কে প্রায় নিঃসন্দেহ ছিলেন । মুসলিম লীগের সঙ্গে ক্ষমতা-বণ্টনের ভিত্তিতে কার্য-কুশলী শাসন-যন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্পর্কে কংগ্রেস নেতারা সবাই চূড়ান্ত অবিশ্বাসী ছিলেন । ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক শাসনের ও ১৯৪৬-এ অন্তর্বর্তী সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা তাঁদের বিশ্বাসের মূল সুদৃঢ় করে । সর্বোপরি, স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস-আধিপত্য সুদীর্ঘকাল বজায় রাখার স্বার্থেও কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অভিলাষী ছিল । স্বাধীনতা-উত্তর কালে কংগ্রেস নেতৃত্বে দেশ-শাসনের ইতিহাসের দিকে নজর দিলেই এর সত্যতা সহজে ধরা পড়ে ।

কংগ্রেসের মুখ্য নেতাদের চিন্তায় ও প্রত্যয়ে শুধুমাত্র দেশ-খণ্ডনের সম্ভাবনাকে মেনে নেওয়া নয়, সে উপায়কে প্রকৃষ্টতর বলে গ্রহণ করার অভীপ্সা কখন ও কিভাবে গড়ে ওঠে তার স্পষ্ট নিশানা আমাদের হাতে নেই । ভি. পি. মেননের মতে মে ১৯৪৭-এর মধ্যে দেশ-বিভাগের প্রশ্নে নেহেরুর আপত্তি সম্পূর্ণ অপসৃত হয় । মৌলানা আজাদ ও লিওনার্ড মোজ্‌লি এই মতের পরোক্ষ সমর্থন করেছেন নেহেরুর এই ধারণার পশ্চাতে নব-নিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটন ও তাঁর পত্নীর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে ।[২০] স্পষ্টতই এই মতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে প্রচলিত এক গভীর বিশ্বাস যে কংগ্রেস নেতাগণ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশ-ব্যবচ্ছেদ নিবারণের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন । প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৭-এর মার্চ মাসে মাউন্টব্যাটন দম্পতির ভারত আগমনের বহু আগে, কংগ্রেসের মুখ্য নেতাগণ ক্রমে ক্রমে দেশবিভাগের পন্থাটিকে সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্টতম উপায় বলে চিন্তা করতে শুরু করেন । নেহেরুর মত নির্ধারণে মাউন্টব্যাটনের প্রভাবের প্রশ্ন উত্থাপন করার সময়ে উপরোক্ত মতের প্রবক্তাগণ যে সম্ভাবনার কথা আদৌ চিন্তা করেননি তা হলো ভারতীয় নেতাদের এই মত পরিবর্তনে ইংরেজের অবদান নয়, বরং তার উল্টো সম্ভাবনাটিই প্রকৃত সত্যের নিশানা দিতে পারে । কেন্দ্রীয় প্রাধান্যের প্রশ্নটিকে না জড়িয়ে মুসলিম সমস্যা সমাধানের যে পথ কংগ্রেসের কাছে গ্রহণীয় মনে হয়, তার পরিচয় ক্রমশ তাঁদের চোখে স্পষ্টতর হয় লাহোর-প্রস্তাবটিকে কেন্দ্র করে । কংগ্রেসের সমস্যাও কিছুটা জিন্নাহ্‌র সমস্যার সমজাতীয় : বাক্য ও আচরণের অসাদৃশ্য । গোটা অ-মুসলিম জনসমাজ ও কংগ্রেস-পন্থী জাতীয়তাবাদী মুসলিম গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনার্থে কংগ্রেস একদিকে একতার ধ্বজা তুলে রেখে, অপরদিকে রাজনীতির কূটচালে দেশ-বিভাগের উপায় ছাড়া আর বাকি সব সম্ভাবনার পথ জিন্নাহ্‌ ও লীগের পক্ষে রুদ্ধ করে । আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না যখন দেখা যায় দেশবিভাগের সম্ভাবনা-বর্জিত ক্যাবিনেট মিশনের শেষ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা-প্রসূত সমাধান জিন্নাহ্‌ সাগ্রহে গ্রহণ করেও কংগ্রেসের কারসাজিতে অবশেষে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন । ১৯৪২ সালের এপ্রিলেই প্রবীণ

ও ধুরন্ধর কংগ্রেস নেতা রাজগোপালাচারীর নেতৃত্বে মাদ্রাজ আইনসভা লাহোর-প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয় ও সেই সুপারিশ পাঠায় কংগ্রেসের কাছে। কংগ্রেস সে সুপারিশ তখন গ্রহণ না করলেও ওয়ার্কিং কমিটির প্রাসঙ্গিক মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> It cannnot think in terms of compelling the people of any territorial unit to remain in the Indian Union against their declared and established will. [২১]

লাহোর-প্রস্তাব পাশের সমসাময়িক কালেই নেহেরু, এমনকি গান্ধীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে দেশবিভাগের প্রশ্নের প্রতি কোনো উগ্র বিরোধিতার ছাপ নেই। গান্ধী বলেন :

> Unless the rest of India wishes to engage in internal fratricide, the others will have to submit to the Muslim dictation, if the Muslims will resort to it. I know no non-violent method of compelling the obedience of eight crores of Muslims to the will of the rest of India, however powerful a majority the rest may represent. The Muslims must have the same right of self-determination that the rest of India has. We are at present a joint family. Any member may claim a division. [২২]

তিনি আরো বলেন :

> As a man of non-violence, I cannot forcibly resist the proposed partition if the Muslims of India really insist upon it. But I never can be a willing party to the vivisection... For it means the undoing of centuries of work done by numberless Hindus and Muslims to live together as one nation. Partition means a patent untruth. My whole soul rebels against the idea that Hinduism and Islam represent two antagonistic cultures and doctrines... But that is my belief. I cannot thrust it down the throats of the Muslims who think that they are a different nation. [২৩]

১৫ এপ্রিল, ১৯৪০ লাহোর-প্রস্তাব সম্পর্কে নেহেরুর প্রতিক্রিয়া নিম্নোক্তভাবে সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয় :

> He was pleased, not because he liked it [the Lahore Resolution]—on the contrary he considered it to be the most insane suggestion—but it very much simplified the problem. They were now able to get rid of the demands about proportionate representation in legislatures, services, cabinets, etc... [He] asserted that if people wanted such things as suggested by the Muslim League at Lahore, then one thing was clear, they and people like him could not live together in India. He would be prepared to face all consequences of it but he would not be prepared to live with such people. [২৪]

এর পরের দিনই নেহেরু একই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য আরো দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেন :

> Many knots of the Hindu-Muslim problem had been merged into one

knot, which could not be unravelled by ordinary methods, but would need an operation...... he would say one thing very frankly that he had begun to consider them [Muslim Leaguers] and people like himself, as separate nations. [২৫]

চল্লিশের দশকের প্রথম ভাগে আহ্‌মেদাবাদ জেলে অন্তরীণ অবস্থায়, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নে তাঁর মনোভাব একইভাবে প্রকাশ পায়। তিনি মনে করেন :

Unity is always better than disunity, but an enforced unity is a sham and a dangerous affair full of explosive possibilities. [২৬]

মাউন্টব্যাটন দম্পতির ভারতে পদার্পণের বহু আগে, এমনকি ক্যাবিনেট মিশনের আগমনের আগে, নেহেরুর পক্ষে পাকিস্তান দাবির স্বীকৃতির সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ১৯৪৬-এর জানুয়ারিতে, ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ওয়াটের সঙ্গে আলোচনায় নেহেরু স্বীকার করেন :

the British Government might have to declare for Pakistan... granted however (a) a plebiscite, and (b) territorial readjustments so that solid blocks of Hindu territory were not included, he accepted Pakistan. [২৭]

একই মাসে ক্রিপ্‌স্‌-এর কাছে লেখা একটি চিঠিতে আরো পরিষ্কার হয়ে যায় যে নেহেরু ততদিনে পাকিস্তান সম্পর্কে জিন্নাহ্‌র রাজনীতির গুপ্ত উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছেন। তিনি তাঁকে লেখেন :

It seems clear that he [Jinnah] is not after Pakistan but something entirely different. [২৮]

ক্যাবিনেট মিশনের আলাপ-আলোচনার কালেই, ১৯৪৬-এর এপ্রিল মাসে আরেকটি ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারী, ডাকওয়ার্থ, নেহেরুর সঙ্গে কথাবার্তার পরে মন্তব্য করেন :

He [Nehru] was scornful of Jinnah and doubted very much whether he had the intention or the power to start a revolt in India if he did not receive Pakistan. [২৯]

প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সর্দার প্যাটেল সম্পর্কেও জানা যায়, ১৯৪৬-এর গোড়ায় তিনি লীগ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্যে 'ব্যাধিগ্রস্ত প্রত্যঙ্গের ব্যবচ্ছেদ' করার সময় এসেছে বলে মনে করেন। [৩০] ৯ মে, ১৯৪৭, সর্দার লর্ড মাউন্টব্যাটনের কাছে দৃঢ়ভাবে নিজের মত প্রকাশ করেন যে ভারতের পক্ষে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাবশ্যক এবং 'পাকিস্তান চাইলে মুসলিম লীগ তা সহজেই পেতে পারে'। [৩১] গান্ধী-ভক্ত ও কংগ্রেসের অর্থনৈতিক বলবর্ধনকারী, জি. ডি. বিড়লা, পাকিস্তান দাবি স্বীকৃতির মাধ্যমে দেশবিভাগের সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন বলে জানা যায়। [৩২]

পাকিস্তান বা দেশবিভাগের বিভীষিকা সৃষ্টি করে জিন্নাহ্‌ কংগ্রেসের কাছ থেকে তাঁর আসল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার যে কূটনীতির পথ বেছে নিয়েছিলেন, কংগ্রেসের সম্মুখে সে চাল ক্রমশ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জিন্নাহ্‌র রাজনীতির মূল ভিত্তি

ভেঙে পড়ে । একদিকে কংগ্রেসের আগে মিশন-পরিকল্পনা গ্রহণ করে, অপরদিকে দেশের ঐক্যের খাতিরে দেশ-বিভাগের 'স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত মুসলিম অধিকার' দাবি না করে আত্মক্ষতি স্বীকারের মহত্ত্ব প্রচাবের মাধ্যমে জিন্নাহ্ প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের কাছে তাঁর 'রাজনৈতিক ধোঁকা' সুপ্রমাণিত করার পথ সুগম করে তোলেন । কংগ্রেসের পক্ষে জিন্নাহ্কে তাঁর 'পাকিস্তান' ঘাড়ে চাপিয়ে চিরদিনের মতো ভারতের বাইরে নির্বাসিত করার পক্ষে আর কোনো বাধা রইল না ।

জিন্নাহ্র পক্ষে তৎসত্ত্বেও, আবো অন্তত কিছুদিন এই রাজনৈতিক খেলা চালিয়ে যাওয়া হয়তো অসম্ভব হতো না যদি, তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পরিশ্রান্ত ও নিঃস্ব ব্রিটেন, লেবার সরকারের নেতৃত্বে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পথ থেকে দ্রুত সরে আসার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করত । ভারতের ওপরে ব্রিটিশ-কর্তৃক কোনো রাজনৈতিক সমাধান জোর করে চাপিয়ে না দেওয়া ও সর্বসম্মতিক্রমে সমাধান না মেলা পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত রাখা —এই দুটি সর্ত বজায় রাখার উপরে জিন্নাহ্র রাজনীতির অস্তিত্ব অপরিহার্যভাবে নির্ভরশীল ছিল । একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্রিটেনের ভারত ত্যাগের ঘোষণা নিঃসন্দেহে জিন্নাহ্র রাজনীতির একটি প্রধান পাটাতন সরিয়ে নেয় । তাছাড়া, ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক, সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের গুরুতর প্রয়োজনে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ পবিত্যক্ত ভারতে একটি কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক শক্তিব বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেন । সে ভূমিকা পালনের শক্তি, সামর্থ্য, অভিলাষ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সবই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে পূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল । ফলে জাতীয় সংগ্রামের কালে যে স্বার্থের অভিন্নতা ব্রিটেন মুসলিম লীগের সঙ্গে খুঁজে পেয়েছিল নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত অবস্থায় সে স্বার্থের অভিন্নতা এখন ব্রিটেন খুঁজে পায় কংগ্রেসের সঙ্গে । এই নবাবিষ্কৃত স্বার্থের দ্রুত সাধনের পক্ষে মুসলিম লীগের বাধা দূর করার উপায় ছিল একটিই এবং সে সম্পানে কংগ্রেস ও ব্রিটিশরাজ এখন অভিন্ন মত : জিন্নাহ্ ও লীগকে আসলে তাঁদের যা কাম্য তা উপেক্ষা করে, তাঁদের দাবির মৌখিক অর্থের সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানের জপের মালা গলায় পরিয়ে তাঁদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা ।

সর্বশেষে অবশ্য এটাও মনে রাখা প্রয়োজন, পাকিস্তান-দাবির একটি অন্তর্নিহিত আবেগধর্মী শক্তি শেষ পর্যন্ত জিন্নাহ্র রাজনৈতিক লক্ষ্যসাধনের পথে ক্রমশ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় । জিন্নাহ্র কাছে লাহোর-প্রস্তাব বা পাকিস্তানের যে অর্থই থাকুক না কেন, মুসলিম সর্বসাধারণের মনে পাকিস্তান ও স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণায় বিশেষ পার্থক্য থাকার কথা নয় । তাই জিন্নাহ্র আপাতবিরোধী রাজনীতির বাস্তব প্রকাশ মুসলিম সমাজে অনিশ্চয়তা, সংশয়, বিভ্রান্তি ও কিছুটা বিক্ষোভের সৃষ্টি না করে পারেনি । জিন্নাহ্র পক্ষে মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্নজড়িত এই আবেগ ও উদ্বেলতা অনির্দিষ্টভাবে উপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে । মিশন পরিকল্পনা বানচালের পরে দেশবিভাগের দাবির ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রচেষ্টার দ্রুত অগ্রগতির পেছনে এই কারণটিও সক্রিয় ছিল ।

ছয়

সংশোধিত বিচার-বিশ্লেষণের আলোকে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রচলিত ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে

অতিমাত্রায় সরল, সীমিত ও ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হবে। পুরাতন ভাষ্যের বহু অসম্পূর্ণতা ও ভ্রান্তি নতুন ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আশা করা অসমীচীন হবে না এই সংশোধিত ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাই অদূর ভবিষ্যতে সর্বজনস্বীকৃত প্রচলিত মত হয়ে দাঁড়াবে।

একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে প্রচলিত ধারণার সবটুকুই অসার প্রমাণিত হয়েছে বা সংশোধিত চিন্তা ও গবেষণা এই সমস্যা সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্নের সমাধান আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। বরং বলা অনেক সঙ্গত হবে যে এই নতুন দৃষ্টিতে গবেষণাভিত্তিক বিচারের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। আরো নতুন গবেষণা ও চিন্তার মাধ্যমে এই ইতিহাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার দায়িত্ব আমাদের সকলের সামনে। কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশোধিত বক্তব্যের সব সিদ্ধান্ত নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে, লাহোর-প্রস্তাব ও জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পর্কে আয়েশা জালালের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে মতবিরোধের সম্ভাবনা আছে। লাহোর-প্রস্তাবের 'অস্পষ্টতা' এমনকি কিছুটা 'ইচ্ছাকৃত অস্বচ্ছতা' প্রায় সাধারণভাবেই স্বীকার্য। জালাল এই সর্বস্বীকৃত ধারণাকে আরেকটি নতুন স্তরে উত্তীর্ণ করেছেন। তাঁর মতে, প্রস্তাবের এই অস্পষ্টতা জিন্নাহ্‌র রাজনীতি পরিচালনায় 'শক্তি' যুগিয়েছিল এবং তাঁব 'রাজনৈতিক বিচক্ষণতার' পরিচায়ক। প্রস্তাবের অস্পষ্টতা ও জিন্নাহ্‌র দূরদৃষ্টি—এই দুটি বিষয়েই সংশয় ও মতবিরোধের অবকাশ আছে। আক্ষরিক অর্থে প্রস্তাবে অস্পষ্টতা একমাত্র আইনজ্ঞ বা রাজনীতিকদের বিচার্য বিষয় হওয়া সম্ভব ছিল। সাধারণ স্তরে প্রস্তাব পাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র ও জনমতের মাধ্যমে দেশবিভাগভিত্তিক পাকিস্তান দাবির সঙ্গে একে একাত্ম করা হয়। একথাও মনে রাখা প্রয়োজন, মুসলিম-প্রধান অঞ্চলগুলিকে একাধিক 'স্বাধীন' (independent), 'সার্বভৌম' (sovereign) ও 'স্বতন্ত্র' (separate) রাষ্ট্রে পুনর্গঠিত করা দাবি প্রস্তাবের মধ্যে সুস্পষ্ট। আরো মনে রাখা প্রয়োজন, জিন্নাহ্ সর্বসাধারণের চোখে লাহোর-প্রস্তাব ও পাকিস্তানের এই একাত্মকরণকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং এই দুটির অভিন্নতার বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন প্রকাশ্যে তোলেননি।[৩৩] সর্বোপরি, এই সর্ববিদিত অভিন্নতার ধারণার অস্তিত্ব না থাকলে কংগ্রেস ও ব্রিটিশের পক্ষে শেষ পর্যায়ে জিন্নাহ্ বা মুসলিম লীগকে পাকিস্তান গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভব হতো না। ঠিক এ কারণেই জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক দূরদর্শিতাসংক্রান্ত প্রশ্নে সংশয়িত না হয়ে পারা যায় না। দেশবিভাগের সম্ভাবনাকে পরাহত করে মুসলিম সমস্যা সমাধানের প্রয়াস যদি জিন্নাহ্‌র রাজনীতির মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে জিন্নাহ্‌র এই রাজনৈতিক কৌশলে গভীর খাদের পরিচয় রয়েছে। অস্বীকার করে লাভ নেই, দেশবিভাগের দাবির মধ্যে দিয়ে দ্বি-জাতিতত্ত্বের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করাই লাহোর-প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য। প্রস্তাবের জটিল শব্দচয়নের আবরণে দেশবিভাগের বা পাকিস্তানের সরল অর্থ কারুর চোখেই ঢাকা পড়েনি। যে প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তরের ভিত্তিতে জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক কৌশলের কাঠামো গড়ে ওঠা আবশ্যক ছিল তা হলো : তিনি দেশবিভাগের সম্পূর্ণ বিরোধী কি না ? এর চূড়ান্ত উত্তর আমাদের এখনো জানা নেই। যদি দেশবিভাগ অবাঞ্ছনীয় মনে করেও সে সম্ভাবনার ভিত্তিতে তাঁর রাজনীতি পরিচালিত হয়, তাহলে তাঁর রাজনৈতিক কৌশলে ত্রুটি নেই। অপরপক্ষে, তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্যে দেশবিভাগের কোনো স্থান না থেকে থাকলে তার কৌশলে বিরাট ত্রুটি ধরা পড়ে। সেক্ষেত্রে মনে হয় লাহোর

-প্রস্তাব থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের রাজনীতিতে দেশবিভাগের খড়্গটা দেশের মাথায় ঝুলিয়ে রেখে জিন্নাহ্ নিঃসন্দেহে বেশ কিছু রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পেরেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশভঙ্গের প্রবল ঝুঁকি বয়ে বেড়িয়েছেন। শেষ পর্যন্ত সেই খড়্গ কংগ্রেস ও ব্রিটিশ কূটনীতির সহযোগে শুধু পাকিস্তানকে কেটেই আলাদা করেনি, দ্বি-জাতিতত্ত্বের যুক্তি প্রয়োগে মুসলিম প্রার্থিত পাকিস্তানেরও অঙ্গচ্ছেদ করা হয়। শিখ ও হিন্দু 'জাতির' স্বার্থে পাঞ্জাব ও বাংলা দ্বিখণ্ডিত করা হলো। দেশবিভাজনের বিরাট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সম্পর্কে, সেক্ষেত্রে, জিন্নাহ্র রাজনৈতিক কৌশলে দূরদৃষ্টির পরিচয় কোথায়? লাহোর-প্রস্তাবে, মুসলিম জাতির স্বতন্ত্রভিত্তিক দেশবিভাগের অধিকারের প্রশ্নের পাশাপাশি গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থেই দেশবিভাগভিত্তিক সমাধান অবাঞ্ছনীয় ও অগ্রহণীয়—এজাতীয় আদর্শ বা লক্ষ্যের অনুল্লেখ বা অপ্রকাশ দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে না। অন্ততপক্ষে, ১৯৪০ সনের লাহোর-প্রস্তাবের ত্রুটি তার পরবর্তীকালে সংশোধিত না হওয়ার যুক্তি কি? দেশবিভাগে তাঁর অনীহার কথা জিন্নাহ্ কখনো প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেননি—করেছেন মাঝে মাঝে তাঁর কাজে। কংগ্রেস দেশবিভাগের প্রশ্নে একেবারেই রাজী হবে না—এই অনুমানের ভিত্তিতে রাজনৈতিক জুয়াখেলা চলে, চাতুর্য ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতির পরিচালনা সম্ভব নয়। জিন্নাহ্র এই রাজনৈতিক 'পোকার' (poker)খেলায় জিন্নাহ্র 'ধোঁকা' যে কংগ্রেসের অজ্ঞেয় ছিল না —এটা জিন্নাহ্র নিশ্চয়ই জানা ছিল না; জানা থাকলে তাঁর পক্ষে এ খেলার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। অপরপক্ষে এ কঠিন সত্যটি তাঁর অজানা থাকায় জিন্নাহ্র এই রাজনৈতিক খেলা শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় এবং জিন্নাহর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। শক্তি ও দুর্বলতা গোপন না রেখে জিন্নাহ্ ও লীগ যদি তাঁদের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করে কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পাল্টা কৌশল অবলম্বন কবতেন, তাহলে কংগ্রেস ও ব্রিটিশের পক্ষে কি ভারতের ষাট কোটি মুসলমানকে দেশ থেকে কেটে বাদ দেওয়া সম্ভব বা সহজ হতো? জুয়া খেলার অনিশ্চিত পথ বেছে না নিয়ে জিন্নাহ্ যদি কংগ্রেসকে দাবা খেলায় শক্তি পরীক্ষার আহ্বান জানাতেন—তাহলে আমাদের উপমহাদেশের ইতিহাসের চাকা কি অন্য পথে এগুতো?

সংশোধনী ইতিহাসের ভাষ্য প্রচলিত মতের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পথে এই ধরনের বহু প্রশ্ন ও বিচার সম্পর্কে আমাদের নিঃসংশয় হতে হবে। ততদিন পাকিস্তান সৃষ্টিতে জিন্নাহ্র অবদান সম্পর্কে সংশোধনী বক্তব্য বিশেষ ধর্মীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিতে কিছুটা আবেগ ও উত্তেজনার কারণ হতে পারে। কেননা, পাকিস্তানের জন্মদানে সর্বজনস্বীকৃত ও মান্য 'পাকিস্তানের জনকের' ভূমিকা সম্পর্কে সংশোধিত ইতিহাসের রায়ের তাৎপর্য বিশেষ অপ্রিয় ও অস্বস্তিকর।

উল্লেখপঞ্জী :

1. M. A. K. Azad, *India Wins Freedom,* Calcutta, 1957.
2. *The Statesman Weekly,* Calcutta, "The Maulana's Lament", Editorial. 5 November, 1988.
3. ভারত উপমহাদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার-কর্তৃক ১৯৭০ থেকে প্রচুর মূল্যবান সরকারি নথিপত্র ও ঐতিহাসিক উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য:

N. Mansergh (ed- in-chief); *Constitutional Relations Between Britain and India : The Transfer of Power 1942-1947,* 12 Vols, London 1970-83. তাছাড়া, পাকিস্তান ন্যাশনাল আর্কাইভসে Quaid-i-Azam Jinnah Papers, All-India Muslim League Papers এবং Partition Papers জাতীয় বহু নতুন ঐতিহাসিক উপকরণ গবেষকের আয়ত্তাধীন। তেমনি দিল্লিস্থিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্কাইভস্ ও নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ও লাইব্রেরিতে প্রচুর নতুন তথ্য ও উপকরণ সংরক্ষিত হয়েছে।

4. S. S. Pirzada (ed.), *Foundation of Pakistan, All India Muslim League Documents : 1906-1947,* Vol 2, Karachi, 1970, p. 321.
5. A Jalal, *The Sole Spokesman : Jinnah, The Muslim League, and the Pakistan Demand,* Cambridge, 1984.
6. এই সময়েই আর্য-সমাজ ও হিন্দু-মহাসভা জাতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী দলের প্রভাব বিস্তার ঘটে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও হিন্দু জাতীয়তাবাদী উপদলের উদ্ভব হয়। পক্ষান্তরে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও তবলীগ ও তনজিম জাতীয় উগ্রধর্মী মুসলিম আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।
7. ১১টি প্রদেশের মধ্যে কংগ্রেস ৬টি প্রদেশে সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং ৩টি প্রদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক আসন অধিকারে সমর্থ হয়। মুসলিম লীগের নির্বাচনী ব্যর্থতা শোচনীয়ভাবে প্রকাশ পায়, বিশেষত মুসলিম-প্রধান আঞ্চলগুলিতে। গোটা মুসলিম ভোটের মাত্র ৪.৬% মুসলিম লীগের ভাগ্যে জোটে।
8. Pirzada, op. cit.,p. 269.
9. Jalal, op. cit., pp. 57, 243.
10. Pirzada, op. cit., p. 425.
11. Francis Robinson, "Review", *Modern Asian Studies,* Vol. 20, No. 3., July 1986, p. 617.
12. B. R. Ambedkar, *Pakistan or the Partition of India,* Bombay, 3rd edition, 1986, pp. 4-5.
13. R Coupland, *Indian Politics 1936 1942, Report on the Constitutional Problem of India,* Oxford, 1944, p. 206.
14. H. Tinker, *Experiment with Freedom : India and Pakistan,* 1947,Oxford, 1967 ; P. Hardy, *The Muslims of British India,* Cambridge, 1972, p. 232.
15. P. Moon, *Divide and Quit,* London, 1961, p. 29.
16. H. V. Hodson, *The Great Divide : Britain, India, Pakistan,* London, 1969, p. 69.
17. Jalal, op. cit , p. 70.
18. Pirzada, op. cit., p. 32.
19. ১৯১৬ সনে 'লখনৌ চুক্তি" অনুসারে কংগ্রেস মুসলমানদের স্বতন্ত্র-নির্বাচনব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল। বিশের দশকের শেষে কংগ্রেস সে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করার প্রচেষ্টা চালায়।
20. V. P. Menon, *The Transfer of Power in India,* Princeton, 1957, p. 360; M. A. K. Azad, op. cit., p. [illegible]; L. Mosley, *Last Days of the British Raj,* London. 1961, p.97.
21. Menon, op. cit. p. 132.
22. D. G. Tendulkar, *Mahatma,* Bombay, 1952, Vol. 5, pp. 333 34.
23. Tendulkar, ibid., pp. 336-37.

24. S. R. Mehrotra. "The Congress and the Partition of India", in C. H. Philips & M. D. Wainwright (eds.), *The Partition of India : Policies and Perspectives, 1935-1947,* London, 1970, p. 210.
25. Mehrotra, ibid.
26. J. Nehru, *The Discovery of India*, Bombay reprint, 1969, p. 526.
27. Mansergh, op. cit., Vol. 6, Doc. No. 357, p. 796.
28. Mansergh, ibid., Doc. No. 384, pp. 855-56.
29. Mansergh, op. cit., Vol. 7. Doc. No. 54, p. 136.
30. D. V. Tahmankar, *Sardar Patel,* London, 1970, p. 191.
31. Mansergh, op. cit. Vol. 10, Doc. No. 375, p. 717.
32. Tahmankar, op. cit., p. 272.
33. Pirzada, op. cit., p. 426. Jinnah said : 'We wanted a word and it was foisted on us, and we found it convenient to use it as a synonym for the Lahore Resolution.'

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

বাঙালি ও বাংলাদেশী

বেশিদিনের কথা নয় যখন আমরা বাঙালি পদবাচ্য ছিলাম না। অর্থাৎ, আরও ভেঙে বলতে গেলে, বাংলাদেশের মুসলমান বাঙালি হিন্দুর চোখে ছিলেন না। তাহলে আমরা কি ছিলাম ? আমরা 'মুসলমান' ছিলাম। এই চিন্তার মধ্যে অনেক কিছু অস্পষ্ট ছিল ও প্রচ্ছন্ন ছিল। পরবর্তীকালে তার কিছুটা গেছে। এখন আমাদের বাঙালি পরিচয় নিয়ে আর কেউ তর্ক তুলবে না।

কথাটার নিষ্পত্তি এখানে হলেই ভালো ছিল। কিন্তু আবার গোল বেধেছে। এবার আমরাই গোল পাকিয়েছি—ওঁরা নন, তাঁরা নন। আমরা এখন 'বাঙালি' নামে পুরোপুরি তৃপ্ত নই। আমরা কেউ কেউ। আমরা 'বাংলাদেশী' হতে চাচ্ছি। বাংলাদেশের বাসিন্দা, অতএব অবশ্যই 'বাংলাদেশী', যেমন আমার পাসপোর্টে আমি বাংলাদেশী। কিন্তু প্রশ্নটা এখানেও একটু ঘোলাটে। এই 'বাংলাদেশী' কথাটার মধ্যেও কিছু অব্যক্ত থেকে যাচ্ছে। কোথায় যেন একটা আপত্তি, বা সন্দেহ, বা নিরাপত্তার অভাব, বা সব মিলিয়ে একটা অস্পষ্ট ও মিশ্র অনুভূতি।

জিজ্ঞাসা করলে সবাই যে আমরা স্পষ্ট জবাব দিতে পারব, তা নয়। এদেশে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নটি এত পুরনো, এত বাঁক ঘুরে এসেছে কয়েক শতাব্দী ধরে, যে এই অতি পুরাতন প্রশ্নটি একাত্তরের পর একেবারেই মিথ্যা হয়ে যায়নি। যদি সমগ্র বাংলাভাষী জগৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে এক ও অভিন্ন হতো, তাহলে একরকম হতো। কিন্তু জগৎটা দ্বিখণ্ডিত। তাই, যদিও প্রশ্নটা আজ তেমন কণ্টকিত নয়, মারাত্মকভাবে অগ্নিগ্রাহী নয়, তবু 'বাঙালি' শব্দটার মধ্যে আমরা অনেকেই যে জুজু দেখছি এতেই প্রমাণ হয় অনেক গ্রন্থি খোলার পরও এখনও কিছু জট অবশিষ্ট আছে। বাংলাদেশ বলে একটা রাষ্ট্রীয় সত্তা দেখা দিয়েছে পৃথিবীর মানচিত্রে। বাংলাভাষী জগতের এটাই বৃহত্তর অংশ। এই জগতের শতকরা সত্তরভাগ মানুষ অক্ষরজ্ঞানশূন্য। দারিদ্র্য-সীমার নীচে বাস করে এরা প্রায় সকলেই। এরা দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোগাতে, লজ্জা নিবারণের দু' গজ কাপড় জোটাতে ব্যতিব্যস্ত। আজকের প্রশ্নগুলো—এটা প্রথমেই স্পষ্ট হওয়া উচিত—এই বিরাট জনগোষ্ঠীর প্রশ্ন নয়, সমাজের উঁচু ও মধ্যস্তরের মানুষের প্রশ্ন। জাতীয়তা ও সংস্কৃতির পরিচয় ও পার্থক্য-বিচার যাঁরা করে থাকেন, এ বিষয়ে ভাবেন, ভাবতে বাধ্য হন, তাঁরা এই উপরতলার মানুষ। শুধু বাঙালি ও/ বা বাংলাদেশী প্রশ্নে নয়, ব্যাপকতর সাংস্কৃতিক প্রশ্নে আমরা কি ভাবছি, বা পরিস্থিতিটা কী, এ প্রশ্নের কোনো সহজ জবাব আমরা কেউ দিতে পারব, আমি মনে করি না। সমকালীনতা তার গণ্ডী টেনে দিয়েছে। কোনোকালে হয়তো যা স্পষ্টতর হবে, এখন তার অনেকটাই ধোঁয়াটে।

এই ধোঁয়ার ভিতর দৃষ্টিপাত করে যে-ছবিটা আমি দেখতে চাচ্ছি, যেটুকু দেখতে

পাচ্ছি, তার মধ্যে বস্তুগত সত্য কি আছে জানি না, তবে এটা আমার দেখা, আমার উপলব্ধি। অতঃপর আমি যা বলতে যাচ্ছি, তাকে কেউ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত ও প্রামাণিক বৃত্তান্ত মনে করলে ভুল করবেন। সম্পূর্ণতা ও প্রামাণিকতা আমার সাধ্যের বাইরে, অভিষ্ট তো নয়ই। বাঙালি ও বাংলাদেশী কথাটার মধ্যে যে প্রশ্ন, যে ভীতি, যে সংস্কার ও উদ্বর্তনের ইশারা, সেই প্রেক্ষাপটে আমি, একজন বাঙালি ও বাংলাদেশী--আমার এই উপলব্ধির পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

সাতচল্লিশে, স্বাধীনতাব পর, যখন প্রথম ঢাকায় যাই, তখন ওই শহরের যে পরিস্থিতি দেখেছি তার সঙ্গে আজকের পরিস্থিতির তফাৎ অনেক। তখন যেন; একটা সদ্য-জেগে ওঠা চরের মতো ছিল সবকিছু। সবই অসম্বদ্ধ, অগঠিত, কোথাও কোনো পথরেখা নেই, আছে কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। এত শূন্যতার মধ্যে এত আশাবাদ কিভাবে এসেছিল বলা মুশকিল। রাজধানী শহরে কোনো জাতীয় দৈনিকপত্র ছাপা হতো না, ছিল না উল্লেখ করার মতো কোনো সাহিত্যপত্র। টিমটিম করে জ্বলছে এমনি একটি বেতারকেন্দ্র ছিল, পুরনো শহরের ভাড়া করা বাড়িতে। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেখানে একদিকে হু হু করে ছাত্র বাড়ছে, অন্যদিকে এক এক করে বেরিয়ে যাচ্ছেন অধ্যাপকমণ্ডলী, —"অন্য কোথা, অন্য কোনখানে"। উন্নতমানের ছাপাখানা ছিল না একটিও। একটা বইপাড়া ছিল, বাংলাবাজারে। আমি কলকাতার কলেজ স্ট্রিট-ফেরতা যুবক, সেই অনুজ্জ্বল, অগোছালো, অপ্রসর দোকানগুলো দেখে বড়োই হতাশ হয়েছিলাম। সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের যে প্রাসাদতুল্য দো-মহলা ছাত্রাবাসে উঠলাম, তার সমান ছাত্রাবাস কলকাতায় দেখিনি। তবে সেই খিলান-গম্বুজ, সেই মোগল-উদ্যানের আড়ালে দারিদ্র্যও ছিল : ছাত্রদের পড়ার টেবিলে বইয়েব তাকে বই ছিল না বেশি। এখনও ঢাকা থেকে প্রতি বৎসর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা এমন কিছু নয়, তবু এক বৎসরে কুল্লে যত বই প্রকাশিত হয়, পাকিস্তানের প্রথম দশ কি পনেরো বছরেও তা হয়নি। প্রকাশনার সঙ্কট এখনও আছে, সাতচল্লিশে প্রকাশনা ব্যাপারটাই অজানা ছিল।

যদি রাজধানীকে মানদণ্ড ধরি তাহলে অস্বীকার করা যাবে না যে বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। প্রদীপের নীচে অন্ধকার আছে, তবে প্রদীপশিখাও একটা আছে। পত্র-পত্রিকা আছে, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, অনিয়মিত ও আকস্মিক। বেতারের কলেবর ও কলরব বহুগুণ বেড়েছে। ইতিমধ্যে টেলিভিশন এসেছে, প্রথমে সাদা-কালো, অতঃপর রঙিন। চলচ্চিত্রের মান যাই হোক, এফ. ডি. সি-র স্টুডিও, যেখানে এগুলি তৈরি হয়, সেখানে শোনা যায় আধুনিক সরঞ্জামের কমতি নেই। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে, সকল স্তরে, উল্লেখযোগ্যভাবে উপরের স্তরে। স্কুল-কলেজ-ইনস্টিটিউট-বিশ্ববিদ্যালয়, সকল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। একটা ধারা প্রবর্তিত হয়েছে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ-গবেষণা, সব ধরনের মননচর্চার, যা গুণগতভাবে বা পরিমাণগতভাবে তুচ্ছ নয়।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও জাতীয়-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আমি দৃষ্টিপাত করছি না, তা আমার আলোচ্য নয়। অগ্রগতির পাশাপাশি পশ্চাদ্‌গতি বা স্থবিরতা যা আছে, বা যেখানে আছে তাও আমার প্রসঙ্গ-বহির্ভূত। কেবল শিক্ষা ও সংস্কৃতির এলাকায় চোখ রেখে আমি মোটা আঁচড়ে একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। আমার মনে হয় তাকিয়ে দেখলে একটা ছবি দেখতে পাওয়া যাবে।

ঢাকা শহরকে এখন শুধু শহর বললে চলে না, মেট্রোপলিস বললে আমাদের অভিমান তৃপ্ত হয়। উন্নাসিকেরা বলেন—একসময় আমিও বলেছি—একটা অতিকায় গ্রাম। এবং একদিক দিয়ে কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। তবু তো কথাটার মধ্যে বাড়াবাড়ি আছে। অনেক সময় একটু বেশি দাবি করা হয়, শহর নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে। যে শহরে ট্যাক্সি দেখা যায় না, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অতিশয় অপ্রতুল, যেখানে পার্কের অভাব, 'নৈশজীবন' প্রায় অনুপস্থিত, সেই শহরকেও কেউ কেউ একটু গর্বের চোখে যে দেখছে, সেটা তো মিথ্যে নয়। যুক্তিতে না হয় না টিঁকল, আদৌ যে এরূপ একটি মনোভাব জেগে উঠছে, তার কিছুটা ভিত্তি নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু সংস্কৃতির মূল্যায়ন তো শহরের মাপের উপর নির্ভরশীল নয়, বুলেভারের প্রশস্ততায় নয়, দোকানের পণ্যে নয়। যেখানে তার জন্ম-বৃদ্ধি-বিকাশ, সেই মনের খবর কী? নাগরিক বাংলাদেশ, মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত বাংলাদেশ কি ভাবছে, কি সৃষ্টি করছে, কোন্ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে, কোন্ আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত হচ্ছে? সে কি তৃপ্ত না অন্য কিছু? কি ধরনের সংস্কৃতি গড়ে উঠছে, কারা গড়ছেন, কোন্ আদর্শে গড়ছেন, কোথায় বাধা, কোনদিকে অগ্রগতি—এই সুযোগে নিজেকেই এই প্রশ্নগুলি করছি, সব প্রশ্নের উত্তর পাব বলে নয়, ধারণাগুলি যদি কিছুটা স্পষ্ট হয়, সেই আশায়।

আমাদের সংস্কৃতির একটা বড়ো অংশ আছে যা ঐতিহ্য-সূত্রে পাওয়া। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক মনে করতেন, বাংলাদেশে যে ইসলাম ধর্ম আমরা পেয়েছি সেটা একটা লৌকিক ধর্ম। তার মধ্যে আচাব-অনুষ্ঠানটাই প্রধান। ধর্ম-জিজ্ঞাসা, ধর্মের মূল প্রস্তাবগুলি নিয়ে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নের অভিঘাতে সমাজে আলোড়ন, মুসলিম-বাংলায় এসব বলতে গেলে ঘটেনি। ফারায়েজি আন্দোলন, আহ্‌লে হাদিস (ওয়াহাবি) সম্প্রদায়ের উদ্ভব, এমনকি অত্যন্ত প্রান্তিকভাবে হলেও, পাঞ্জাব থেকে আহমদিয়া মতবাদের অনুপ্রবেশ, — এ জাতীয় ঘটনা ঘটেছে, তবে সমাজে খুব একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। বাইরের আন্দোলনের ঢেউ হিসেবে এসেছে। আমরা কোনো রামমোহনের জন্ম দিইনি। আমরা মাঝে মাঝে ভাবের ও ভক্তির বন্যায় ভেসেছি। প্রতিবছব শীতের শেষদিকে ঢাকার অদূরে টঙ্গিতে যে বিরাট ইজতামা (ধর্ম-সম্মেলন) হয়, মক্কার হজের বাইরে এত বড়ো ইসলামী সমাবেশ কোথায়ও হয় না এবং এটাও আন্তর্জাতিক। এছাড়া, প্রতিবছর দেশের সর্বত্র ছোট বড়ো উরস-এও মানুষের ঢল নামে। এসব ভিড়ের বিভিন্ন উরসের জনপ্রিয়তার ওঠা-নামা আছে। আজকাল, ফরিদপুর জেলায়, আটারশির উরসে জনসমাগম বোধহয় সবচেয়ে বেশি। গদীনশিন পীরসাহেবের ব্যক্তিত্বই এই জনপ্রিয়তার নিয়ামক। অন্তত দূব থেকে তাই মনে হয়। তীর্থযাত্রা আমাব স্বভাবে নেই, পুণ্যের প্রতি লোভ নেই। সুতরাং এর বেশি বলা আমার উচিত হবে না।

আটারশিতে শুধু সাধারণ মানুষের ভিড় নয়। দেশের উচ্চ-রাজকর্মচারী, মন্ত্রী, মায় রাষ্ট্রপতি সকলেরই যাতায়াত সেখানে। শোনা যায়, দেশের রাজনীতি-সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, অনেক জটিল গ্রন্থিমোচন, সেখানে হয়ে থাকে। হয়তো প্রত্যক্ষভাবে পীরসাহেব নিজে এই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন, তবে যাঁরা যান, তাঁরা একত্র হওয়ার এই সুযোগে রথ দেখা ও কলাবেচা দুটোই সেরে আসেন। অন্তত জনশ্রুতি তাই।

ধর্মের তাত্ত্বিক আলোচনা শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রচুর সংখ্যায় আরবি-ফার্সি-উর্দু ও ইংরেজি থেকে ধর্ম-বিষয়ক, ও ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বইয়ের অনুবাদ, ও সেই সঙ্গে বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থও, প্রকাশ করেছে। বিক্রয় ও বিতরণের মাধ্যমে এসব বই পৌঁছে যাচ্ছে সব জায়গাতেই। মওলানা মওদুদী-র বইয়ের পাঠক-সংখ্যা কম নয়। এর মধ্যে সরলমতি, আদর্শবাদী, অনুসন্ধিৎসু ছাত্রছাত্রীও আছে। প্রচুর সংখ্যায় আছে। যেমন মার্কস্‌বাদী সাহিত্যের পাঠক আছে। এ-মুহূর্তে কারা দলে ভারী, বলা যায় না। এটাও বলা যাবে না, যারা মওদুদীর বই পড়ছে তারা মার্কস্ পড়ছে না, ও যারা মার্কস্ পড়ছে, তারা মওদুদী পড়ছে না। বাংলাদেশের আত্মার অধিকার নিয়ে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে। মধ্যপন্থা ও উদারনীতির দল এই টানাটানির মধ্যে তৃতীয় শক্তি হিসেবে খুব সক্রিয় নয়।

মধ্যপন্থীরা সম্ভবত সব জায়গাতেই এরকম। অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে সংগঠনমূলক উদ্যোগের অভাব। তাঁদের বিশ্বাস ও স্বভাব তাঁদের দিয়ে কিছু কাজ করায়, ও তাঁদেরকে কিছু অকাজ থেকে বিরত রাখে। বাংলাদেশে এঁদের উদ্যোগী ভূমিকা অতটা চোখে পড়ে না বলেই এঁদের সংখ্যা বা গুরুত্বকে খাটো করা যায় না। এঁদের একটা অংশকে দলে টানতে না পারলে দক্ষিণের চলে না, বামেরও চলে না। ধর্মের সঙ্গে এঁদের আড়াআড়ি নেই, যতক্ষণ না ধর্ম রাজনীতির মধ্যে বাড়াবাড়ি করছে। ধর্মনিরপেক্ষতায় এঁদের রাজনৈতিক আস্থা টলেনি। অতীতে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আবারও পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের পঞ্জিকায় ঈদ, বকর ঈদ, দুর্গাপূজা, বড়দিন ও বুদ্ধপূর্ণিমার উপস্থিতি যেমন স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিজয় দিবস (ষোল ডিসেম্বর), একুশে ফেব্রুয়ারি, পহেলা বৈশাখ। বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসার দিনও সম্ভবত এর সঙ্গে যুক্ত হবে। এই উৎসবগুলি এসেছে সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে, এবং তিনটিই সর্বজনীন ও সেক্যুলার। সংস্কৃতির বিবর্তনে আমার মনে হয় এই তিনটি জাতীয় অনুষ্ঠানই প্রমাণ করে ধর্মবহির্ভূত উপাদান কত সজীব আমাদের সাংস্কৃতিক ভাবনায় ও আচরণে। রক্ষণশীল মহলের আপত্তি ও বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে এই অনুষ্ঠানগুলির ভিতর দিয়ে আজকের বাঙালি শুধু তার বাঙালিত্বই ঘোষণা করছে না, তার সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষার ব্যাপকতাও জানিয়ে দিচ্ছে।

এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে শিক্ষার জায়গা সবার উপরে। শিক্ষার সাধ আছে সকলেরই, সাধ্য নেই অনেকের। কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়তে আসে, তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসে। বনেদী প্রতিষ্ঠানে হয় এরা ভিড়তে পারে না, অথবা থাকে কোণঠাসা হয়ে, যার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সময়ে সময়ে বিভিন্ন দাবি আদায়ের আন্দোলনে। উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা এখন আর দেশের শিক্ষায় সন্তুষ্ট নয়। তাদের চোখ বিদেশের দিকে, বিশেষত আমেরিকার দিকে। যতদিন বিদেশযাত্রা না ঘটছে ততদিন তারা প্রথমত ইংরেজি-মিডিয়াম স্কুলে, অতঃপর কিছু ব্যয়সাধ্য আবাসিক স্কুলে পড়াশুনা করে। কোনো কোনো বাড়িতে ছেলেমেয়েদের পিছনে একাধিক প্রাইভেট টিউটর না থাকলে অভিভাবকের স্বস্তি নেই। এসব ক্ষেত্রে একজন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্র বা ছাত্রীর পিছনে যে মাসিক ব্যয়, তা বাংলাদেশের অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক বাজেট ছাড়িয়ে যায়। সামাজিক ক্ষেত্রে

নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তারই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ণভেদ। সেদিন প্রায় এসে গেছে যখন বিলেতি সমাজের মতো আমরাও কোনো ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান জানতে চাইলে আলগোছে তার স্কুলের পরিচয়টি নেবো। সমাজে শ্রেণী-বিন্যাস আগেও ছিল, কিন্তু গত দুই দশকে নতুন বিত্তের যে উৎকট ভূমিকা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এটা অভাবিতপূর্ব। এর সরাসরি আঘাত পড়েছে শিক্ষাব্যবস্থার উপর। বাংলাদেশের প্রথম সরকার উপলব্ধি করেছিলেন, জাতীয় সংহতির পক্ষে এই পরিস্থিতি কতটা ক্ষতিকর, এবং এটাকে নির্মূল করার চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই সময়কার আরোপিত বিধিনিষেধ কিছুই টেঁকেনি। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা, যারা এইসব স্কুলে পড়াশুনা করছে, এক বিশিষ্ট মেজাজ, রুচি ও অভিপ্রায় নিয়ে বড়ো হচ্ছে। এরা সামাজিকভাবে খাপছাড়া এবং একবার দেশ ছাড়তে পারলে দেশকে ভুলতে এদের বেশিদিন লাগবে না। কারণ দেশে থেকেও এরা দেশের সঙ্গে মনের দিক দিয়ে যুক্ত নয়।

বাংলাদেশের তরুণেরা যখন বয়স্কদের আলোচনার বিষয় হয়, তখন প্রায়ই একটা জায়গায় আমরা ভুল করি। এরা যখন দলবদ্ধভাবে উচ্ছৃংখলতা দেখায়, এদের একটা অংশ যখন ছিনতাই রাহাজানীর পথ ধরে, একটা অংশ যখন আমেরিকার স্বপ্নে বিভোর থাকে, একটা অংশ যখন পড়াশুনার চেয়ে দল পাকানোতেই ব্যস্ত থাকে বেশি, তখন সব মিলিয়ে যেটা ফুটে ওঠে, তা হলো সামাজিক অব্যবস্থা। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুফল হাতে আসার আগেই, দুর্ভাগ্যবশত, জাতীয় জীবনে এসেছে এই অব্যবস্থা ও উল্টোযাত্রা। সমাজের একটা অংশ এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন, এর অবসান ঘটানোর জন্য সচেষ্ট। এর মধ্যে তরুণের একটা জোরালো ভূমিকা আছে। আবার এই সমাজেরই অপর এক অংশ সামাজিক অন্যায়ের শিকার হয়ে পড়েছে। এর প্রকাশ ঘটছে নানাভাবে, কখনো স্থূলতায়, কখনো নিষ্ঠুরতায়। শিক্ষাঙ্গনে তরুণ সমাজের এই নৈরাশ্য, উচ্ছৃংখলতা ও উৎকেন্দ্রিকতা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন সারা দেশে শুরু হয়ে যায় নীতিবাক্য বর্ষণ, কেউ তলিয়ে দেখেন না, কেন এটা ঘটছে।

নৈরাশ্যের শিকার শুধু ছাত্ররাই নয়, শুধু তরুণেরাই নয়। এদের বেলা তবু তো কারণগুলো বোধগম্য। সমাজের এলিট, বা উত্তমশ্রেণীর মধ্যেও নৈরাশ্য ছায়া ফেলেছে। বিদেশে পাড়ি জমাবার ইচ্ছার মধ্যেই এর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। পাকিস্তানি-পর্বে লোভনীয়তম যে আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল, ব্রিটিশ ভারতের আই. সি. এস.-এর আদলে, ক্ষমতায় ও সুযোগ-সুবিধা আদায়ে তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সামরিক বাহিনীর অফিসারদের। পরে একটা অলিখিত বোঝাপড়ার ভিত্তিতে উভয় গোষ্ঠী সমাজের ক্ষীরটা-সরটা ভাগ করে চলেছিল। রাজনীতিওয়ালারা ছিল এদের সাধারণ শত্রু। এদের দুর্নীতির দোহাই দিয়ে ওরা সুযোগ পেলেই গদি দখল করেছে। কিন্তু দুর্নীতির সূক্ষ্ম ও বিধিবদ্ধ পথ ধরে বাড়ি গাড়ি এঁরা যা করেছিলেন, রাজনীতিওয়ালারা তার সিকি পরিমাণও করতে পারেননি। অন্যান্য পেশার কম ভাগ্যবানেরা তারস্বরে গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেছেন ও সাধ্যমতো আখের গুছিয়েছেন। আদর্শবাদী বুদ্ধিজীবী বলে যাঁদের পরিচয়, যাঁরা তরুণের হৃদস্পন্দন শুনেছিলেন, ভবিষ্যতের আশা রেখেছিলেন, তাঁরা মূলত এইসব অপরাপর পেশারই একটা খণ্ডাংশ। তবে এঁদের পরিচয়ে এঁদের পেশার গৌরব বেড়েছে,

যা আসলে তার প্রাপ্য কিনা, বিবেচনার বিষয় হতে পারে ।

এলিটিজম বাংলাদেশে মনে হয় এখনও দানা বাঁধেনি । বেশ কিছুদিন ধরে বিদ্যা বিত্ত ও প্রতিপত্তির সন্নিপাত সমাজের একটি অংশে বা পেশায় দেখা গেলেই তো সেই অংশকে, বা সেই পেশার মানুষগুলোকে এলিট বলে চিনতে পারা যায় । এক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে কিছুই ঘটেনি । ইতিমধ্যে 'বুদ্ধিজীবী' বলে যাঁদের পরিচয় তাঁরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত সমাজের লোক । এঁদের অর্থনৈতিক অবস্থান খুব মজবুত নয় । পেশায় কেউ সাংবাদিক, কেউ অধ্যাপক, অধিকাংশই চাকুরিজীবী । এঁদের পরিচয় এঁদেব উদ্বৃত্ত সময়ের ব্যবহারে; বই লেখায়, বই পড়ায়, সংস্কৃতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আয়োজনে ও অংশগ্রহণে, সংগীত, চিত্রকলা, নাট্যমঞ্চের পৃষ্ঠপোষকতায় । এঁদের বৃহদংশ বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদে আস্থাশীল । এই আস্থার প্রকাশ ঘটেছিল পাকিস্তানের প্রথম বৎসরগুলিতেই । পরবর্তী সময়ে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পথ ধরে এটা দৃঢ় হয়েছে ।

বাংলাদেশে বাংলাভাষার প্রতি সাধারণভাবে শিক্ষিত ও তরুণ সমাজের টানের মধ্যে কতটা খাঁটি আর কতটা মেকী– এই প্রশ্ন মাঝে মাঝে উঠে থাকে । একুশের মরশুমে যে ভাবালুতা, বাস্তব জীবনে তার সমর্থন কতটা ? প্রশ্নটা আমাদেরও । বাংলাভাষী ভারতীয় আগন্তুকের দৃষ্টিতে এই টান প্রায়শই প্রশ্নাতীত । এ-সম্বন্ধে তাঁরা অনেকেই ইতিবাচক রায় দিয়েছেন । অনেকে আবার প্রশ্নও তুলেছেন । এমন প্রশ্নও করা হয়েছে যে এতই যদি বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগ, তাহলে ওদের নাম কেন অবোধ্য আরবি ভাষায় ? অধিকাংশ নাম আরবিতে, অল্প কিছু ফারসিতে । বোম্বাইবাসী পারশিদের নামও প্রাচীন পারশি ভাষায় । খ্রিস্টান ইউরোপেও নামের আসল বা প্রধান শব্দটি দেশীয় নয়, বহু বহু দূরাগত । এটা চলে আসছে ঐতিহ্য হিসেবে, অনেক ধর্মীয়-সামাজিক প্রথার মতো । যেমন হিন্দু সধবার সিঁথির সিন্দুর । অধুনা বাংলাদেশে ছেলেমেয়েদের নামকরণেও বাংলার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে । রাজধানী ঢাকায়, বিশেষত নতুন শহরে, রাস্তার দু' পাশে সারি সারি দোকানের কবিত্বময় নাম অনেকে লক্ষ করেছেন। কল্পনার এই বল্গাছেঁড়া দৌড়ের একটা কৌতুকজনক দিকও আছে। কিন্তু বাংলা নামের এমন অজস্র উদ্দাম ব্যবহার আর কোথায় কে দেখেছে ? যে দেশের শতকরা নিরানব্বুইজনের ভাষা বাংলা সেখানে বাংলার ব্যবহার অনেক বেশি হবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । এই সেদিন পর্যন্ত সাবেক বাংলাদেশের অনেক মুসলমান পরিবারে শরাফতির অংশ হিসেবে উর্দুভাষা চালু ছিল । এখন এসব পরিবারে বাংলা তার জায়গা করে নিয়েছে, ও নিচ্ছে । উর্দুকে নিয়ে সমস্যা নেই, বরং ইংরেজির প্রতি যে হঠাৎ অতিরিক্ত আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, যে কথা আগেই বলেছি, ভয়টা এখানেই ।

চেতনার উদ্বর্তন সমাজের সর্বত্র একসঙ্গে হয় না । ইউরোপে রেনেসাঁসও এক প্রজন্মের ব্যাপার ছিল না । তবে সৃজনধর্মীতা, যা এতকাল পাথর-চাপা অবস্থায় ছিল এখন মুক্তি পেয়েছে । বিদেশের শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে জানার আগ্রহ যত আছে, সুযোগ ততটা নেই । বিশেষত ইংরেজির বাইরে অন্যান্য বিদেশি ভাষাশিক্ষার সুযোগ এখনও সীমিত । তবু যেটুকু সুযোগ আছে, তরুণ বাংলাদেশ তা সাগ্রহে লুফে নেয়। নাট্যমঞ্চে, সাহিত্যে, চিত্রশিল্পে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে । রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তি

এই সৃজনশীলতাকে ব্যাহত করেছে, বন্ধ করতে পারেনি । গ্রাম্যতা ও প্রাদেশিকতার অবশেষ এখনও কিছু কিছু আছে, তবে কেটে যাচ্ছে । এজন্য সময়ের প্রয়োজন । রাজধানী শহরের লোকের মুখে এখন আর শুধুই আঞ্চলিক ভাষার বিচিত্র উচ্চারণ শোনা যায় না—পাশাপাশি একটা মার্জিত কথ্যভঙ্গীও দাঁড়িয়ে গেছে । এই পরিবর্তনটি ঘটেছে সাতচল্লিশের পর থেকে, প্রায় অলক্ষগোচরভাবে । একসময় মার্জিত উচ্চারণকে সন্দেহ করা হতো, বিজাতীয় ভাবা হতো, এখন হয় না ।

বাংলাদেশের ঝোঁক গণতন্ত্রের দিকে, প্রগতির দিকে, আধুনিকতার দিকে । বিপরীত ঝোঁকের সঙ্গে এই ঝোঁকের চলছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা । প্রগতি ও আধুনিকতার দুর্গ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভূমিকা স্পষ্ট । এই ভূমিকা, বাংলাদেশের পটভূমিতে, আঠারো শতকে জার্মানির জাগরণে ওদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভূমিকার সঙ্গে মেলে। সৃজনশীলতারও প্রথম উন্মেষ এখানেই ও অপরাপর শিক্ষায়তনে । প্রতিক্রিয়া ও পশ্চাৎমুখীনতা এখানেও হানা দেয় । তবে অতীতেও এখানে যারা হাত দিয়েছে তাদের হাত পুড়েছে । যারা পাসপোর্টের পরিচয়ে বাংলাদেশী, ও আগে-পিছে সর্বক্ষণই বাঙালি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদেরই দুর্জয় ঘাটি । এখানে—যেমন প্রগতিশীলতার অন্যান্য অঞ্চলেও — সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রমনস্ক দলাদলি, পেশাগত রক্ষণশীলতা, স্বার্থপরতা—সবই পাওয়া যাবে । তবে পাশাপাশি অন্যদিকও আছে । শিক্ষকেরাই সব নয়, ছাত্রসমাজও আছে, প্রবলভাবে আছে। বাংলাদেশের তারুণ্যের সকল ক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করছে তার শিক্ষাঙ্গন। দেশের ভবিষ্যতের রূপরেখা খুঁজতে হলে এখানেই আসতে হবে ।

বাংলাদেশের জাগরণকে পুনর্জাগরণ বা রেনেসাঁস বলা, আমার মতে, ঠিক নয়। রেনেসাঁস একটা ইউরোপিয় ঘটনা, একবারই ঘটেছিল । অতীতের শিল্প-সাহিত্য ও ভাবনা উদ্ধার করে, তবে নতুন সৃষ্টির জোয়ার এসেছিল । এক্ষেত্রে অতীতের সেই ভূমিকা কোথায় ? এই জাগরণের মুখ পুরোপুরি ভবিষ্যতের দিকে । এর শক্তির উৎস অতীতের শিল্প ও সাহিত্য নয় । এর অনুপ্রেরণা বর্তমানের পৃথিবী, যেখানে বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে একসারিতে দাড়িয়ে আছে । এর শক্তির উৎস বাঙালি মন ও মানসের উর্বরতা, তার সৃজনশীলতা । নতুন জিজ্ঞাসার আলোয় এই উর্বরতা ও সৃজনশীলতা তার পরিণতির পথে চলেছে । আমরা যেন তারই সূচনাপর্ব দেখতে পাচ্ছি ।

মাঘ-চৈত্র ১৩৯১ । পঞ্চম বর্ষ । চতুর্থ সংখ্যা

বীণা আলাসে

লোকহিতবাদীর চিন্তাজগতের পরিচয়

ভারতবর্ষে 'রেনেসাঁস' বলে যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে, মহারাষ্ট্রে তার শুরু উনিশ শতকের মাঝামাঝি। তখন যেসব সমাজ-সংস্কারক যুক্তিবাদী মন নিয়ে সমাজের অচলতাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন তার মধ্যে গোপাল হরি দেশমুখ ওরফে লোকহিতবাদী একজন প্রধান ব্যক্তি। এই ব্যক্তির জীবন ও কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু লিখবার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই একটি কথা স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত। আজ আমরা উনিশ শতকের অনেক মানুষদের জীবন ও কাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছি এবং তাঁদের একধরনের মূল্যায়ন বা পুনর্মূল্যায়ন করতে শুরু করেছি। অনেকের জন্মশতাব্দী বা জন্মের দেড়শো-দুশো বছর পূর্তি সমারোহ হচ্ছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা তাঁদেব স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানাতে চাই, কিন্তু শুধু শ্রদ্ধা জানালেই ব্যাপারটা চুকে যায় না। এইসব কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিদের জীবনের আদর্শ ও তাঁদেব চিন্তাধারার মূল কেন্দ্র খুঁজে বের করে বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখাটাও আমাদের কর্তব্য। তাঁরা নিজেদের অতীত এবং বর্তমানকে নিয়ে সমাজে একধরনের ভাঙাগড়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেটাই আজ আমাদের অতীত হয়ে উঠেছে। আমাদের আজকের জীবনেও ভাঙাগড়া চলছে। দেখতে হবে যে তাঁদের কাজকর্মের যে উদ্দিষ্ট তার থেকে কতদূর আমবা এগিয়েছি। যদি দেখতে পাই যে বিশেষ দূর এগোনো যায়নি তাহলে তাঁদের চিন্তাধারার কেন্দ্র আমাদের আজকের জীবনেও উপস্থিত থাকা উচিত।

বিপ্লবী চিন্তাধারার মানুষ যখন সমাজে একরকমের ভিন্নমুখী স্রোত তৈরি করতে চান তখন রক্ষণশীল সমাজ সেটা সহজে গ্রহণ করতে পারে না। বাধা দেয়। নানান বদনামও দেয়। প্রত্যেক যুগপ্রবর্তকেব জীবনে এমন একটা সময় দেখা যায় যখন তাঁর কাজকর্মের দিশাকে ভুল বুঝে সমাজ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে ব্যক্তিত্বভঞ্জন শুরু করে। এই সময়টা একজন ব্যক্তির জীবনে ভীষণ কষ্টকর। এটাই পরীক্ষার সময়। এই সময়ের মধ্যে দিয়ে যদি সেই ব্যক্তি আপন চিন্তাধারার বিশিষ্টতা প্রমাণ করে স্থিরভাবে দাঁড়াতে পারে, তবেই মনে হয় সেটা ছিল তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্ব।

পুনা শহরে ১৮২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন লোকহিতবাদী। তাঁর জন্মের পাঁচ বছর আগেই পেশোয়াদের রাজত্ব চলে গিয়েছিল ইংরেজের হাতে। তাঁর বাবা হরিপন্ত পেশোয়াদের সরসেনাপতি বাপু গোখলের ফড়নিস ছিলেন। ফড়নিস মানে সেক্রেটারি। সেক্রেটারিদেরকে মহারাষ্ট্রে ফড়নিস, চিটনিস, দেশমুখ, কুলকর্ণি ইত্যাদি পদবী দেওয়া হতো। যাঁরা এই পদবী পেতেন তাঁরা কয়েকটি গ্রাম, বাড়ি, জমি ইত্যাদি ইনাম হিসেবে পেতেন। এটাকে বলা হতো তাঁদের সরঞ্জাম। গোপাল রাও-এর যখন তেরো বছর

বয়স তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে । তারপর ব্রিটিশ সরকার তাঁদের সরঞ্জাম বন্ধ করে দেন।

গোপাল রাও ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান । বাড়িতে তাঁকে 'জ্ঞানেশ্বরী', একনাথের 'ভাগবৎ', রামদাসের 'দাসবোধ' ইত্যাদি মহারাষ্ট্রীয় সন্ত কবিদের গ্রন্থ পড়ানো হয় । ১৮৪১ সালে তিনি ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন, তার সঙ্গে সংস্কৃত, গুজরাটি, ফারসি ইত্যাদি ভাষাও আয়ত্ত করে নেন । ১৮৪৩ সালে তিনি ডেক্কন সর্দারের এজেন্টের কাছারিতে অনুবাদকের কাজ পান । ১৮৪৬ সালে মুন্সেফের পরীক্ষা পাস করে ১৮৫২ সালে ওয়ায়ি-তে ফার্স্টক্লাস মুন্সেফ হিসেবে নিযুক্ত হন ।

তারপর ১৮৫৬ সালে যখন তিনি 'সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনাম কমিশনার' হিসেবে কাজে যোগ দেন তখন তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্বের শুরু । এইসময় তাঁকে নানারকম লোকনিন্দা সহ্য করতে হয়েছে । কারণ, পেশোয়া আমলে যাঁরা নানারকম ইনাম পেয়েছিলেন তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের আমলেও সেসব সরঞ্জাম পাওয়ার নানারকম ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন । গোপাল রাও খেটেখুটে এক একজনের সমস্ত খাতা খুঁজে, কে বেঁচে আছে, কে মৃত সেসব খবর নিয়ে অনেকের ইনাম বাজেয়াপ্ত করে টাকাটা সরকারের অ্যাকাউন্টে জমা করতেন । এইসব টাকা থেকে মারাঠিভাষায় নানান বিষয়ে পাঠ্যবই তৈরি করা হোক—এমন দাবি রাখতেন । যাঁদের ইনাম এমনভাবে বাজেয়াপ্ত হয়েছে তাঁরা ক্ষেপে গোপাল রাও-এর নামে নানান রকম বদনাম রটিয়েছিলেন । অনেকে এমন কথাও রটিয়েছিলেন যে গোপাল রাও স্বজনদের সঙ্গে শত্রুতা করে চাকরিতে উঁচু পদ পাবার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে খুশি করে যাচ্ছেন । তারপর ১৮৬২ সালে তিনি আমেদাবাদে অ্যাসিস্ট্যান্ট জজ হিসেবে এবং সেখানেই ১৮৬৬ সালে 'অ্যাকটিং স্মল কজেস জজ' হয়ে দশবছর কাজ করেন । তারপর 'জয়েন্ট সেসন্স্ জজ' হিসেবে নাসিকে এসে ১৮৭৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন । ১৮৮১ সালে গোপাল রাও ফার্স্ট ক্লাস সর্দারের সম্মান পান । ১৮৯২ সালে ৬৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে ।

লোকহিতবাদী মারাঠিভাষার একজন জোরালো লেখক । ১৮৪৮ সালে তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা । 'শতপত্রে' তাঁর প্রথম এবং প্রধান রচনা যার দ্বারা তিনি সমাজ পরিবর্তনের কাজ শুরু করেন । তিনি ভাবতেন জ্ঞানই হচ্ছে সম্মানের, শক্তির এবং ঐশ্বর্যের মূল । আমাদের সমাজকে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে তিনি ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, সংস্কৃতবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ে লিখেছেন ।

ভাউ মহাজন সম্পাদিত 'প্রভাকর' পত্রিকায় 'শতপত্রে'র প্রথম চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯মার্চ ১৮৪৮-এ । লোকহিতবাদীর শেষ বই 'উদয়পুরের ইতিহাস' ১৮৯২ সালে প্রকাশিত হয় । এই দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর তিনি নানা বিষয়ে লিখেছেন । কিন্তু 'শতপত্রে' ছাড়া আর কিছু না লিখলেও মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে একজন অগ্রণী সমাজ-সংস্কারকরূপে তিনি স্থান পেতেন । ইংরেজ আমল আসার পরে প্রথম প্রজন্মের তিনি এক সাহসী ও চিন্তাশীল পুরুষ যিনি 'বুদ্ধিরেব বলীয়সী' এই মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নেমেছিলেন । আচার্য জাওড়েকর লিখছেন, 'দ্বিতীয় প্রজন্মে ন্যায়মূর্তি রাণাডে যেসব কাজ করেছেন তার তত্ত্বমূলক চিন্তাবীজ লোকহিতবাদীর লেখায় পাওয়া যায়।' কয়েকটি ব্যাপারে লোকহিতবাদীর লেখায় আরো বেশি মূলগ্রাহী দৃষ্টিভঙ্গি আর সাহস

দেখতে পাই ।

১৮৫০ সালে 'শতপত্রে' লেখা শেষ হওয়ার পরে লোকহিতবাদী 'ইন্দুপ্রকাশ', 'বৃত্তবৈভব' ইত্যাদি পত্রিকায় লিখতেন, পরে 'লোকহিতবাদী' নামে একটি পত্রিকা তিনি নিজেই প্রকাশ করতেন । বলাবাহুল্য যে নতুন সমাজ রচনার চিন্তায় 'শতপত্রে'র মূল্য কত বেশি তা বুঝে ডঃ আম্বেডকর তাঁর 'বহিষ্কৃত ভারত' পত্রিকায় এই চিঠিগুলি আবার প্রকাশ করেছিলেন প্রায় সত্তর বছর পরে ।

'শতপত্রে'তে সমাজ-বিষয়ক যে চিন্তা সেটা তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। লোকহিতবাদীর প্রায় সমস্ত লেখাই এই তিনভাগে ভাগ করা যায় । প্রথমত, যুক্তিবাদী মন তৈরি করা ; দ্বিতীয়ত, বিষমতামূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ; এবং তৃতীয়ত, জনশিক্ষা ও জনজাগৃতি । তিনি লিখেছেন, 'বচন মনুর হোক, যাজ্ঞবল্ক্যের হোক বা যারই হোক, স্বয়ং ব্রহ্মদেবের হলেও "বুদ্ধিরেব বলীয়সী" এটাই আসল কথা । শাস্ত্র সরিয়ে রেখে নিজের বুদ্ধি একটু খাটান । একটু ভেবে দেখুন, সমাজঘাতক বচন মুছে ফেলুন, ধর্মশাস্ত্র মানে আইনমাত্র । প্রয়োজনে তাতে পরিবর্তন করা যায় । কয়েকটি বচন একেবারে বাদ দিলেও চলে ।' (চিঠি, ক্রমাঙ্ক ৭০)

সমাজ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লোকহিতবাদী গভীরভাবে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছিলেন । বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা দেখে নির্ভয়ে লিখেছেন, 'জাতিভেদের এত কথা শুনে শাস্ত্রে তার প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যে কোনো প্রমাণ নেই । শুধুই স্বেচ্ছাচারিতা । মূলে যে ধর্ম ও শাস্ত্র লেখা হয়েছে তাতে চার বর্ণের কথা পাওয়া যায় । কিন্তু আজ দেখি তার থেকে হাজার হাজার জাত তৈরি হয়েছে আর অর্থহীন স্বৈরাচার চলছে । এটা হিন্দুদের চূড়ান্ত বিবেকশূন্যতা ।' শুধু বিভিন্ন জাতের মধ্যে নয়, নারী-পুরুষের মধ্যেও লোকহিতবাদী সমানতা চেয়েছিলেন । তাঁর লেখায় তীব্র বুদ্ধিবাদী প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গেই করুণাপ্লুত মনেরও পরিচয় পাওয়া যায় । কয়েকটা উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাপারটি স্পষ্ট করা যাক :

> 'মেয়েদের দুঃখ এতই বেশি যে সে ব্যাপারে ভাবতে গেলে বা কয়েকটা অত্যাচারের কথা মনে পড়লে আমার গা শিউরে ওঠে । ... তোমরা জেনেশুনে নিজেদের বোনদের, কন্যাদের ঘর বিধবস্ত করো, এটা কি ভালো কথা ? নিজ কন্যার প্রতি কোনো দয়ামায়া নেই ? কি করে যে বুক পাথর করতে পারো । আমার কথা শোনো, মেনে নাও যে নারীরও পুরুষের মতো সমস্ত অধিকার আছে । এরকম নতুন ধর্ম শুরু করে দাও যাতে মেয়েরা পড়াশুনো করবে, নিজের কথা নিজে ভেবে, নিজের মত অনুযায়ী নারী-পুরুষের বিবাহ হবে ।'

পুনর্বিবাহের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি 'পরাশরস্মৃতির' একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন :

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে ।

এই শাস্ত্রমত দিয়ে তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে উপরিউক্ত পাঁচরকম বিপদ দেখা দিলে নারীর অন্য পতি বরণ করা উচিত । [বিধবাবিবাহ আইন সংক্রান্ত প্রস্তাবের সমর্থক তালিকায় লোকহিতবাদীর স্বাক্ষর আছে । পরাশরের এই শ্লোকটি তিনি কি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বেই উদ্ধৃত করেছিলেন ? লোকহিতবাদীর এই বিশেষ রচনাটি কোন্ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বীণা তা উল্লেখ করেননি । —শি. না. রা.] যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা এ তিনটি আদর্শে লোকহিতবাদীর প্রচণ্ড নিষ্ঠা ছিল। আমাদের সমাজের দুর্বলতা ঠিক কোথায়, সে ব্যাপারে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না । তাই শেষ চিঠিতে তিনি নির্ভয়ে লিখে গেছেন, 'আমি জনগণের কাছে এইটুকু অনুরোধ করছি যে আপনারা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করুন । নতুন বই এবং খবরের কাগজ পড়ুন । চারদিকে কি হচ্ছে তা নিয়ে ভাবুন । বিবেকবুদ্ধি জাগিয়ে তুলুন । পরম্পরা অন্ধ বলে নিজেও চোখ বেঁধে নেবেন না । বিশ্বের সম্পর্কে নানা তথ্য যোগাড় করুন। সেই জ্ঞান আশেপাশের লোকজনকে দিন । আলস্য ছাড়ুন । যে বুদ্ধিমান তাঁকেই নেতা করে তাঁর কথা মেনে চলুন । মানুষের মধ্যে যেন সংহতি থাকে । পড়াশুনা করে, চিন্তা করে এগিয়ে যান । দেশের চিন্তা করা প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব । রাজ কেমন চলছে এবং কে রাজা, তাঁর কার্যকলাপ কিরকম—এ ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষ যেন সজাগ থাকে ।'

'গীতাতত্ত্ব', 'আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র', 'স্বাধ্যায়' এবং 'আগমপ্রকাশ' এই গ্রন্থগুলিতে লোকহিতবাদী ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন । কর্মকাণ্ডের এবং আচারবিধির অবাস্তব আড়ম্বর ভেঙে ফেলার জন্য তাঁর কলম 'শতপত্রে'তে একেবারে তলোয়ারের মতো শাণিত হয়ে উঠেছে । তিনি লিখেছেন এইসব কর্মকাণ্ডের ফলে ধর্মের মূলকথা —মনুষ্যত্বের মঙ্গলবোধ—নষ্ট হয়ে যায় । ধর্মের বিষয়ে তথ্য পরিবেশন, ধর্মের সমালোচনা এবং ধর্মের ব্যাখ্যা, এই ব্যাপারে অন্তত কুড়িটি চিঠি 'শতপত্রে'র অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মের ব্যাখ্যার বিষয়ে তাঁর মুল কথা হচ্ছে ধর্ম ও শাস্ত্র এ দুটি আলাদা জিনিস। শাস্ত্র মানে আইন । দেশকাল পরিস্থিতি অনুযায়ী সেটা পাল্টাতে হয় । ধর্মকে দুভাগে ভাগ করে তিনি বলেন, 'এক অংশ গরীব মানুষের সুখ ও সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য এবং অন্যটা জ্ঞানবৃদ্ধি করে মনকে বোধসম্পন্ন করার জন্য' । এইদিক দিয়ে তাঁর 'স্বাধ্যায়' গ্রন্থটি 'শতপত্রে'র পরিপূরক গ্রন্থ বলা যেতে পারে । সেখানে তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে ধর্ম মানেই হিতচিন্তন । হিতচিন্তন দুই রকমের—প্রাপঞ্চিক এবং পারমার্থিক। তাইতো কণাদমুনি বলেছেন :

অথা তো ধর্মজিজ্ঞাসা
যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সধর্মঃ ।।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লোকহিতবাদী লিখেছেন, 'এই শ্লোকে গ্রন্থকার হাতজোড় করে সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছেন যে অধ্যয়ন করো, বিশ্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হও, সত্য ইতিহাস দ্যাখো, যার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না তা মিথ্যা বলে ত্যাগ করো।'

১৮৮০ সালে 'আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ' গ্রন্থটির মারাঠি অনুবাদ প্রকাশিত হয় । অনুবাদ করেছিলেন শ্রীক্ষেত্র জনস্থানস্থ যাদবাত্মজ নানাশাস্ত্রী টাকলে । এই গ্রন্থে ছাপান্ন পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা লিখেছেন লোকহিতবাদী । এই ভূমিকা তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের, বিবেকী দৃষ্টির এবং প্রচণ্ড পরিশ্রমের প্রমাণ । এটিতে তাঁর মূল বক্তব্য হলো এই যে ভারতবর্ষে পুরাকাল থেকে ধর্মের দুটি ধারা চলে এসেছে—একটি বৈদিক ধর্ম, অন্যটি দয়াধর্ম । একটির উৎস মন্ত্রে, অন্যটির উপনিষদে । একটির বিষয় কর্ম, অন্যটির বোধ।

লোকহিতবাদীর চেষ্টা ছিল ধর্মচিন্তার সঙ্গে যুক্তিবাদ যোগ করা, ইহবাদী চিন্তার প্রসার করা এবং ধর্মকে ঐহিক অভ্যুদয়ের বাহন করে তোলা। এই কাজ তিনি অনেক পরিশ্রমে, প্রচণ্ড সাহস দেখিয়ে করে গেছেন।

ইতিহাস ছিল লোকহিতবাদীর অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মারাঠি ভাষায় ভাবতবর্ষেব মতো একটা দেশের কোনো ইতিহাস লেখা নেই। এই দেশ এককালে একটি প্রগতিশীল দেশ ছিল। এদেশে বিভিন্ন শাস্ত্র, শিল্পবিদ্যার অধ্যয়ন হতো। কিন্তু ইতিহাস নেই। তাঁর কথায়, 'বেদ থেকে শুরু করে প্রাকৃত কাব্য পর্যন্ত হাজার হাজার গ্রন্থ আছে, কিন্তু ইতিহাসের গ্রন্থ নেই। বস্তুনিষ্ঠ কালগণনা, বস্তুনিষ্ঠ ভূগোল, বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস এসব হিন্দুদের একেবারেই অজানা।' নানা চিঠিতে নানা বিষয়ে লিখতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন যে পুরাণের গল্প মানে ইতিহাস নয়। তাতে স্থানকালের ঠিক ঠিক নির্দেশ পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে অনেক পুরাণ লেখা হলো। ন্যায়, বেদান্ত, শাস্ত্র তৈবি হলো। কাবা, নাটক, প্রবন্ধ, সূত্র ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থ রচিত হলো। কিন্তু সবই কল্পনাভিত্তিক রচনা। ইতিহাস চেতনা-ই নেই। এ ব্যাপারে নানারকম গবেষণা কবে শেষ পর্যন্ত লোকহিতবাদী ইতিহাস না থাকার নয়টি কারণ নির্ণয় করেছেন :

১. ইতিহাসেব প্রয়োজন হিন্দুরা বুঝতেই পারেনি। মুসলমান ইতিহাসকারেরা হিন্দুদেব অশিক্ষিত ভেবেছেন।

২. ভারতে অনেক ভাষা। ভাষা-ভিন্নতার ফলে হাজার হাজার বছর ধরে সমাজ বিভক্ত, তাদের মধ্যে একত্বের বোধ তৈরি হয়নি।

৩. হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি নিবৃত্তিবাদী। ইহলোকের চাইতে পরলোকনিষ্ঠা বেশি। তাই প্রধানত ধার্মিক কর্মকাণ্ড নিয়েই তাঁরা গ্রন্থরচনা কবেন।

৪. মুসলমান-বাজ সাত শতক ধরে চলেছে। তাদের আমলে অনেক গ্রন্থ নষ্ট হয়ে যায়। গ্রন্থ লেখার উৎসাহও কমে যায়। হিন্দুদের মতিভ্রম হয়েছিল।

৫. লেখন, অধ্যয়ন, কাব্যরচনা ইত্যাদি কাজ শুধু ব্রাহ্মণদের হাতেই ছিল। ব্রাহ্মণদেব জীবিকা বাজাশ্রয়ী। তাই বাস্তবনিষ্ঠ সত্য ইতিহাস লেখা সম্ভবপর ছিল না।

৬. এদেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল না। সমানেই ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে বিতণ্ডবাদ ছিল। তাতে গ্রন্থরচনা পিছিয়ে পড়ে।

৭. মুসলমান আমল শুরু হওয়ার আগে বিশেষ কিছু ঘটেনি।

৮. ইতিহাস লেখার ও পড়ার আগ্রহ কারো মনে ছিল না। সকলেই অদ্ভুত কাহিনী এবং পুরাণেব গল্প পছন্দ করতেন।

৯. সংস্কৃতভাষা মৃতপ্রায় হয়ে যাওয়ার পরে নতুন গ্রন্থরচনা করার আগ্রহ ও সামর্থ্য দেখা যায় না।

লোকহিতবাদীর ইতিহাস সম্পর্কিত লেখা প্রধানত তথ্যমূলক। তিনি তথ্য পরিবেশন করাটাকেই জনজাগৃতির একটি প্রধান অস্ত্র বলে মনে করতেন। ইসলাম, খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মের ইতিহাস তিনি মারাঠি মানুষের সামনে রেখেছেন। নিজের ইতিহাস সম্পর্কিত লেখায় তিনি স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইতিহাসের অধ্যয়ন সমাজ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ইতিহাস চেতনার অভাবে কোনো সমাজ বর্তমান পরিস্থিতির যথাযোগ্য বিশ্লেষণ করতে পারে না, নিজের সামাজিক অবস্থার মূল্যায়ন করতে পারে না, এটাই

তাঁর মূল বক্তব্য । আমার এই লেখার শেষে লোকহিতবাদীর সমস্ত রচনার একটি সূচি দেওয়া হয়েছে । তার দিকে তাকালে পাঠক দেখতে পাবেন যে শুধু 'শতপত্রে'তে নয়, ইতিহাসমূলক লেখা তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

লোকহিতবাদীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চিন্তাধাবা বিশেষভাবে তত্ত্ববহুল। তিনি ইংরেজ-রাজকে সমর্থন জানাতেন ঠিকই, তবে তাঁর বক্তব্য ছিল যে 'এদেশে জনগণকে শিক্ষিত এবং সেয়ানা করে তোলা ইংরেজ সরকারের কর্তব্য । তারপর যখন আমাদের জনগণ নিজেদের রাজত্ব নিজেরা সামলানোর যোগ্য হবে, পৃথিবীর নানা তথ্য জানবে, নিজেদের দুর্গুণ ত্যাগ করবে, তখন তাদের প্রদেশ তাদের হাতে সঁপে দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু আজকেই যদি আমরা আমাদের রাজ পাই তাহলে অনর্থ হবে ।' ইংরেজদের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ব্যক্তি-স্বাধীনতা, উদার মতবাদ এবং পরিশ্রম কবার ক্ষমতা। এই তিনটি গুণ না থাকলে কোনো প্রদেশ স্বাধীনতাব যোগ্য হতে পারে না, এই ছিল তাঁর ধাবণা । অথচ ইংরেজদেব গুণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুর্ব্যবহারেব কঠোর সমালোচনাও তিনি কবেছেন । কষ্টকর খাজনা বৃদ্ধি, নেটিভদের সম্পর্কে সংকীর্ণ মনোভাব, আমদানি-বপ্তানিতে এদেশের শোষণ ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ সমালোচনা তাঁব লেখায় পাওয়া যায় ।

'সরকারের কর্তব্য কি' এই শীর্ষক একটি লেখায় সাতটি কর্তব্যের একটি তালিকা দেওয়া আছে :

১. প্রজাগণের সুরক্ষা, দেশে শান্তির পবিবেশ বজায় রাখা । ২. জাত-ধর্ম নির্বিশেষে ন্যায়দান । ৩. খাজনা যোগ্য পবিমাণে বাখা । প্রজাগণ কষ্ট পাবে এমন খাজনা যেন না চাপানো হয় । ৪. শিক্ষা-প্রসার । ৫. বাণিজ্য-ব্যবসায় এবং শিল্পোদ্যোগ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা । ৬. জনগণকে নীতিগতভাবে চালাবার জন্য সরকার যেন দুর্নীতিগ্রস্ত না হয় । ৭. চিন্তা ও কথাব স্বাধীনতা দেওয়া ।

আমাদেব দেশের দারিদ্র্যের যে আলোচনা তিনি করেছেন তাতে তাঁর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় । ১৮৪৯ সালে তিনি ক্লিফটের 'পলিটিক্যাল ইকনমি' গ্রন্থের আধারে 'লক্ষ্মীজ্ঞান' বইটি লিখে প্রকাশ কবেন । তাতে তাঁর মূল বক্তব্য হলো —১. বিশ্বের উন্নত দেশেব মধ্যে হিন্দুস্থানেব গণনা হতে পারে না, কারণ নানা অজ্ঞতাজনিত কুসংস্কারের ফলে আমাদের সমাজ কুণ্ঠিত হয়ে আছে । ২. যখন হাতে মূলধন ছিল তখন নানা শিল্পোদ্যোগেব দিকে নজর দেওয়া হয়নি । এখন শুধু কৃষি উদ্যোগটুকু বাকি আছে । ৩. প্রাচীনকালে হিন্দুরা জ্ঞানোপাসক ছিলেন । কিন্তু তারপর অনেক শতক ধবে জ্ঞান আহরণের কোনো চেষ্টা দেখা যায় না । এটা একটা অক্ষম্য ভুল । বিকাশের জন্য জ্ঞানোপাসনা কবতে হবে । ৪. হিন্দুদের চিন্তা কর্মকাণ্ডমূলক । বাস্তবাধিষ্ঠিত প্রগতিশীল চিন্তা করা হয়নি । তা করতে হবে ।

ইংরেজবা আর্থিক শোষণ করছে—এ ব্যাপারে লোকহিতবাদীর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না । তাঁর কথায়, 'এঁরা (ইংরেজরা) সম্প্রতিকালে হিন্দুস্তানেব দেবতা হয়ে আছেন। আমাদেব প্রাচীনকালে দেবতারা ঘি, চাল, বা আরো বেশি হলে দু চাব পাঁঠা-বলি দিলে তৃপ্ত হতেন । কিন্তু এই দেবতাদেব কুড়ি কোটি টাকার হবির্ভাগ দিলেও এঁরা তৃপ্ত হন না । আজ এমন ধনমেধ চলছে ।'

লোকহিতবাদী তাঁর সাতান্ন-সংখ্যক পত্রে স্পষ্টত লিখেছেন, 'আমাদের এমন ঠিক করা উচিত যে আমাদের দেশে যা তৈরি হয় তা-ই খাব, তা-ই ব্যবহার করব । তা যেমন-ই হোক । আমরা তথ্য সংগ্রহ করে উৎকৃষ্ট জিনিস করতে শিখবো । যা পাই তাতে সন্তুষ্ট থাকব । এমন যদি হয় তাহলে হাজার হাজার মণ তুলো এখান থেকে বিলেতে যাবে কেন ? যারা তুলো বিক্রেতা তারা এমন সিদ্ধান্ত নিক যে ইংরেজদের আমরা তৈরি কাপড় দেব কিন্তু তুলো দেব না । তাতে সবারই সুখ । সম্প্রতিকালে আমাদের লোক নিজেদের লোককেই মেরে ফেলছে ।'

'গ্রাম রচনা' নামে একটি স্বতন্ত্র বই লিখে লোকহিতবাদী তাতে গ্রামের কৃষির অবস্থা, ন্যায়দানের ব্যবস্থা এবং মহাজনদের অত্যাচারের বিরোধিতা করার জন্য প্রশাসনের ব্যবস্থার দীর্ঘ আলোচনা করেছেন । গ্রামে ন্যায়দানের ব্যাপারে তিনি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন । কারণ তাতে গ্রামবাসীরা কম খরচায় অবিলম্বে ন্যায় পেতে পারেন। তিনি বলেন, 'কোর্টের ফী, সাক্ষীদের খোরাক, স্ট্যাম্পের দাম, কেরানিদের চা-পানি ইত্যাদির ফলে অনেক টাকা খরচ হয়ে যায় । আমাদের কাছে কোর্ট মানে কালিকাদেবীর বলিদানের মহাবেদী হয়ে যাচ্ছে ।' তিনি ধরে ফেলেছিলেন যে গ্রামের স্বয়ংশাসিত প্রশাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশদের আমলে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে । এ ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতা তালুক বা জেলাস্তরে কেন্দ্রিত হয়ে যাওয়ার ফলে গ্রামীণ প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ছে। টাকার এবং সময়ের অভাবে গ্রামের মানুষ ন্যায় চাইতে যায় না । অন্যায়ই মেনে নিচ্ছে। গ্রামীণ সমাজের দুরবস্থা শোধরাতে হলে—১. এই দেশের মানুষদের বেশি টাকা রোজগারের সুযোগ দিতে হবে । ২. দেশে নানারকম শিল্পোদ্যোগ চালু করতে উৎসাহ দিতে হবে । ৩. চাষীদের জন্য আলাদা 'নিধি' (আমানত) রেখে তাদের টাকা ধার দিতে হবে । ৪. ন্যায়দানের জন্য যে খাজনা চাপান হয় তা কম করতে হবে ।

মারাঠি ভাষায় গ্রাম-রচনার উপর এই প্রথম বই ।

লোকহিতবাদী গুজরাটি ও ফারসি ভাষা ভালোভাবে জানতেন । বিশ্বের অভিজাত সাহিত্য তিনি পড়েছিলেন । উল্লেখযোগ্য তাঁর 'পুষ্পবন' বইটি । এটি বিখ্যাত পারসীক কবি সাদীর 'গুলিস্তান' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের ভাষান্তর । এই ভাষান্তর সম্পর্কে লোকহিতবাদী লিখছেন, 'হিন্দুস্থানে মুসলমানরা তাদের বাচ্চাদেরকে প্রথমে 'পন্দনামা' ও 'গুলিস্তান' পড়ায় । কারণ এতে নীতিবোধ আছে । 'গুলিস্তান' গ্রন্থটি বিশাল । তার আটটি অধ্যায় । শেষ অধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাছাড়া ম্লেচ্ছদের উপদেশ হিন্দুদের উপদেশ থেকে কোথায় ভিন্ন তা-ও জানা চাই । মূল গ্রন্থের ভাষা উৎকৃষ্ট, সেই রস ভাষান্তরে পাওয়া যাবে না । কিন্তু অর্থ ও মূল বক্তব্য জানা যাবে ।'

লোকহিতবাদীর মৃত্যুর একশো বছর হতে এখন মাত্র তিন বছর বাকি । তবুও মনে হয় যে তাঁর যুগপ্রবর্তক চিন্তাধারার স্রোত আজও প্রাসঙ্গিক । কয়েকটি বিষয় আমরা সময়সাপেক্ষ বলে বাদ দিতে পারি । কিন্তু এই বিজ্ঞানমণ্ডিত যুগে আজকেও আমরা বিজ্ঞাননিষ্ঠ যুক্তিবাদী মন তৈরি করতে সফল হইনি—এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এটাই আমাদের শোকান্তিকা বা ট্র্যাজেডি । বিপ্লবী চিন্তকদের এটাই বৈশিষ্ট্য যে তাঁরা তাঁদের সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেন আবার ভবিষ্যতের দিশাও দেখিয়ে দেন । এই অর্থে মহান সমাজ-সংস্কারক অনন্তকালের যাত্রী । তাঁকে বিভূতি করে তোলার কোনো প্রয়োজন

নেই, কিন্তু অবহেলা করলে আমাদেরই ক্ষতি। 'বুদ্ধিরেব বলীয়সী' এই মন্ত্র উচ্চারণ করে লোকহিতবাদী সমাজে কুসংস্কার মুছে ফেলার জন্য, মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য, বোধসম্পন্ন করার জন্য কলম হাতে ধরেছিলেন। 'শতপত্রে'র প্রত্যেকটি চিঠি গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি সমস্যাকে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে দেখে লোকহিতবাদী নানা জায়গায় নানারকম বক্তব্য রেখেছেন। তার থেকে এটাই শেষ কথা, এমন কিছু বের করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। সেরকম কিছু করতে গেলে তাঁর বহুস্তরীয় চিন্তাজগতের একটু সরলীকরণ হয়ে যেতে পারে। তার থেকে বরং তাঁর চিন্তার জটিলতাকে মেনে নেওয়া ভালো।

লোকহিতবাদীর প্রকাশিত সাহিত্য

ধর্মীয় ও নীতিবিষয়ক

১. খোটী সাক্ষ ওয় খোটী শপথ য়াং চা নিষেধ (মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা শপথ-এর নিষেধ); পুনে, ১৮৫১
২. গীতাতত্ত্ব ; নাশিক, ১৮৭৮
৩. সুভাষিত অথবা সুবোধবচনে (সংস্কৃত গ্রন্থের কয়েকটি সুভাষিতের ভাষান্তর) ; ঠানে, ১৮৭৮
৪. স্বাধ্যায় : প্রাচীন আর্যবিদ্যাংচাক্রম, বিচার আণি পরীক্ষণ; (স্বাধ্যায় : প্রাচীন আর্যবিদ্যার ক্রম, চিন্তা ও বিচার) ; নাশিক, ১৮৮০
৫. আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (অনুবাদ-ভূমিকা অংশ) ; মুম্বই, ১৮৮০
৬. আগমপ্রকাশ (গুজরাটিতে লেখা বই) ; মুম্বই, ১৮৮৪

জীবনীগ্রন্থ

১. পৃথ্বীরাজ চওহাণ য়া চা ইতিহাস (চন্দ বরদাই-এর 'পৃথ্বীরাজ রাসৌ' কাব্যের আধারে লেখা গ্রন্থ) ; পুনে, ১৮৮৩
২. পণ্ডিত স্বামী শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী, ১৮৮৩

ইতিহাস

১. ভারতখণ্ড পর্ব ; পুনে, ১৮৫১
২. পানিপথচী লড়াই ; ঠানে, ১৮৭৭
৩. ঐতিহাসিক গোষ্টী, (ইতিহাসের গল্প) প্রথম ভাগ ; ঠানে ১৮৭৭
৪. ঐতিহাসিক গোষ্টী, দ্বিতীয় ভাগ ; নাশিক ১৮৭৮
৫. হিন্দুস্তানচা ইতিহাস, পূর্বার্ধ (গ্রিগের *The History of the British Empire in India* গ্রন্থের অনুবাদ) ; ঠানে, ১৮৭৮
৬. ঐতিহাসিক গোষ্টী, তৃতীয় ভাগ ; নাশিক ১৮৮০
৭. গুজরাত দেশ চা ইতিহাস ; পুনে, ১৮৮৫
৮. লঙ্কে চা ইতিহাস ; পুনে, ১৮৮৮
৯. সুরাষ্ট্র দেশা চা সসাক্ষ ইতিহাস (গুজরাটি থেকে অনুবাদিত) ; পুনে, ১৮৯১
১০. উদয়পুর চা ইতিহাস (কর্নেল টডের 'অ্যানালস অব রাজস্থান' থেকে ভাবান্তর) ; পুনে, ১৮৯৩

রাজ্যশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র

১. লক্ষ্মীজ্ঞান (ক্লিফ্টের 'ট্রিটিজ অন পলিটিক্যাল ইকনমি' গ্রন্থের আধারে) ; পুনে, ১৮৪৯
২. হিন্দুস্থানাস দরিদ্রতা য়েণ্যা চী কারণে আণি ত্যাচা পরিহার ওয় ব্যাপার বিষয়ী বিচার (হিন্দুস্থানে দারিদ্র্য আসার কারণ এবং তার সমাধান ও ব্যবসা সম্পর্কিত চিন্তা—দাদাভাই নৌরজির "Poverty In India"এই প্রবন্ধের আধারে লেখা) ; মুম্বই, ১৮৭৬
৩. স্থানিক স্বরাজ্য ব্যবস্থা ; পুনে ১৮৮৩
৪. গ্রামরচনা ; পুনে ১৮৮৩
৫. স্বদেশী রাজ্যে ওয় সংস্থানে ; ১৮৮৩

সমাজ চিন্তন

১. জাতিভেদ ; ঠানে ১৮৭৭
২. ভিক্ষুক (পুরোহিতবৃন্দ) ; ঠানে, ১৮৭৭
৩. প্রাচীন আর্যবিদ্যা ওয় রীতি ; আলিবাগ, ১৮৭৭
৪. কলিযুগ (বোম্বাইর আর্যসমাজে প্রদত্ত ভাষণ) ; মুম্বই, ১৮৭৭
৫. নিবন্ধ সংগ্রহ ('শতপত্রে' ও অন্যান্য প্রবন্ধ) ; আহমদনগর, ১৮৬৬

বিবিধ

১. হোলি বিষয়ী উপদেশ ; মুম্বই, ১৮৪৭
২. মহারাষ্ট্র দেশাতীল কামগার লোকাংশী সম্ভাষণ (মহারাষ্ট্র দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে সংলাপ) ; পুনে, ১৮৪৮
৩. সরকারচে চাকর আণি সুখবস্তু হিন্দুস্থানাতীল সাহেব লোকাংশী সম্ভাষণ (সরকারি চাকর এবং হিন্দুস্থানের সুপ্রতিষ্ঠিত সাহেবদের সঙ্গে সংলাপ) ; পুনে, ১৮৫০
৪. যন্ত্রজ্ঞান *(Introduction to Physical Sciece)* গ্রন্থের অনুবাদ) ; পুনে, ১৮৫০
৫. পন্দনামা (ফার্সী পুস্তকের অনুবাদ) ; পুনে, ১৮৫০
৬. পুষ্পবন ('গুলিস্তানে'র ৮ম অধ্যায়ের অনুবাদ) ; পুনে, ১৮৫০
৭. শব্দালঙ্কার ; পুনে, ১৮৫১
৮. বোধপত্র ; ঠানে, ১৮৭৮

নিরঞ্জন ধর

এক যুক্তিবাদীর চোখে মহাযোগী অরবিন্দ

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার না পেয়ে অরবিন্দ ঘোষ গায়কোয়াড়ের চাকরি নিয়ে বরোদায় আসেন। প্রবল ইংরেজ-বিদ্বেষ, সম্ভবত প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়েই তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দেন। যোগ দেবার পরে যে দুটি কাজে তিনি প্রথম আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা হলো—১. নরমপন্থীদের কবলিত জাতীয় কংগ্রেসকে ভারতীয় জনগণের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অহিংস হাতিয়াররূপে গড়ে তোলা এবং ২. প্রকাশ্য কংগ্রেসি আন্দোলনের আড়ালে এক সশস্ত্র সংগ্রামের আয়োজন করা। অরবিন্দের আগমনের কিছু আগে থেকেই এই দুটি চরমপন্থী ধারা ভারতীয় রাজনীতিতে দেখা দিয়েছিল। এখন অরবিন্দের যোগদানে ধারা দুটি অধিকতর জোরদার হলো।

কিন্তু অচিরে অরবিন্দ তৃতীয় একটি অভিনব ধারা তাঁর স্বাধীনতা অর্জন প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত করলেন। এই নব-প্রবর্তিত ধারাটি হলো তাঁর যৌগিক ধারা। আগের ধারা দুটিকে যদি লৌকিক ধারা বলি তাহলে তাঁর যৌগিক ধারাটিকে আমরা অলৌকিক ধারা বলে অভিহিত করতে পারি। কারণ যোগসাধনার দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করে তার সাহায্যে এক বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তিই দেশের স্বাধীনতা আনতে পারবে —এই বিশ্বাসের উপর উক্ত ধারাটি প্রতিষ্ঠিত।

প্রাথমিক স্তরে যৌগিক ধারাটি গৌণ থাকলেও ক্রমশ অরবিন্দের কাছে তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে লাগল। শেষ অবধি তিনি অপর দুটি ধারার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবলমাত্র যোগসাধনাতেই নিজেকে নিয়োজিত করলেন। এর প্রধান কারণ মনে হয় যে অতিরিক্ত ঈশ্বর-নির্ভরতার দরুন মানুষের ক্ষমতায় তাঁর আস্থার অভাব ছিল। তাছাড়া চরমপন্থী স্বাধীনতা আন্দোলনের সেদিন অনেক ঝুঁকি ছিল। কারাবরণ থেকে মৃত্যুবরণ অবধি যে কোনো মূল্য দেবার জন্য চরমপন্থী স্বাধীনতা-সংগ্রামীকে তৈরি থাকতে হতো। অরবিন্দের মতন একজন স্বভাব-ভীরু ও সাবধানী লোকের পক্ষে এই বিপদ আর অনিশ্চয়তার বোঝা বেশিদিন বহন করা সম্ভব ছিল না। বস্তুত তাঁর স্বভাব-ভীরুতা-সঞ্জাত অপরাধবোধই তাঁকে বাক্য ও লেখায় অগ্নিবর্ষী করে তুলেছিল বলে অনুমান করা যায়।[১]

এই নতুন পথে কিন্তু অরবিন্দ একক যাত্রী ছিলেন না। তাঁর উদাহরণে উৎসাহিত হয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সহযোগীদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করে দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে যোগসাধনার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন যতীন ব্যানার্জি ও দেবব্রত বসু যাঁরা যৌগিক জীবনে যথাক্রমে নিরালম্ব স্বামী ও প্রজ্ঞানন্দ নামে খ্যাতিমান হন। অরবিন্দের অপর দুই প্রধান সহকর্মী বিপিন পাল ও সতীশ মুখার্জি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যত্ব নেন। রামকৃষ্ণ আশ্রমেও কোনো

কোনো বিপ্লবী আশ্রয় নিয়েছিলেন। নলিনীকিশোর গুহ অন্যূন ষোলজন প্রখ্যাত বিপ্লবীর নামের এক তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন যাঁরা যোগীর জীবন বরণ করেছিলেন। অরবিন্দের 'কারাকাহিনী' গ্রন্থ থেকেও এমনকিছু রাজনীতিক-যোগীর বৃত্তান্ত জানা যায়।

তবে এঁদের কাউকেই তো ব্রিটিশ পুলিসের আওতার বাইরে থাকার জন্য বিদেশের মাটিতে আশ্রয় নিতে হয়নি। সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে দেবার পর এর আর কোনো প্রয়োজন ছিল বলে তাঁরা মনে করেননি। তবে অরবিন্দের বেলায় তার প্রয়োজন পড়ল কেন? তিনি কি আশঙ্কা করেছিলেন যে, প্রাচীন ভারতে ইন্দ্র যেমন স্বর্গরাজ্য হারাবার ভয়ে তপস্বীদের তপস্যায় নানাভাবে বিঘ্ন ঘটাতেন তেমনই ব্রিটি' সরকারও ভারত সাম্রাজ্য হস্তচ্যুত হবার ভয়ে তাঁর যোগসাধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন? 'আদেশ' কি সেইজন্যই পেয়েছিলেন?

দুই

এইবার আমরা পণ্ডিচেরি আশ্রমের একান্তে অরবিন্দ যে যোগসাধনায় নিজেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ব্যাপৃত রেখেছিলেন তার দিকে দৃষ্টিপাত করব। তার আগে যোগ-সম্পর্কে দু'-এক কথা বলা দরকার।

যোগ হলো একটা টেকনিক বা কৌশল যার দ্বারা মনুষ্যদেহের 'আধ্যাত্মিক' শক্তিকে এক নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দেওয়া যায় বলে ধারণা করা হয়েছে। দর্শন, অধিবিদ্যা ও ধর্মের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অবদান আছে। কিন্তু যোগ হলো ভারতবর্ষের একেবারে নিজস্ব সম্পদ; যোগকে মনুষ্যসংস্কৃতিতে এক উজ্জ্বল সংযোজন বলে দাবি উত্থাপিত হয়েছে। বহু শতাব্দী ধরে ধর্মাচরণেব উক্ত শাখাটির কোনো বিকাশ ছিল না। অরবিন্দ তাকে আধুনিক করেন এবং অরবিন্দ-প্রবর্তিত এই আধুনিক যোগ 'পূর্ণযোগ' নামে খ্যাত হয়।

অববিন্দ কিন্তু প্রচলিত যোগ দিয়েই তাঁর সাধনা শুরু করেছিলেন। প্রকাশ, নিবেদিতা যখন বরোদায় গিয়ে মহাবাজার আতিথ্য নেন তখন তিনি অরবিন্দকে বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' পুস্তকখানি উপহার দেন। পুস্তকে বর্ণিত নির্দেশানুসারে তিনি যোগ-অভ্যাস সুরু করেন। মহারাষ্ট্রীয় যোগী লেলের কাছেও তিনি হাতে-কলমে এই যোগ শেখেন। বিবেকানন্দ-কর্তৃক বর্ণিত ও লেলে-কর্তৃক প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় যোগসাধনা করে অরবিন্দেরও সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন ও সমাধিলাভ ঘটেছিল।

এখানে উল্লেখ্য, কী করে ইন্দ্রিয়গুলি বহির্জগত থেকে প্রত্যাহার করে একমাত্র ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তার পদ্ধতি হলো যোগ। অর্থাৎ উপনিষদে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ব্রহ্ম ও জীবের যে অভিন্নতার কথা বলা হয়েছে ব্যবহারিক দিক দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করাই হলো প্রাচীন যোগের চূড়ান্ত লক্ষ্য। যোগসাধনার বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা ও ঔপনিষদিক সাধনার অঙ্গ হিসেবে যোগের বহুল ব্যবহার সমগ্র ঔপনিষদিক সাহিত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বস্তুত 'মৈত্রী উপনিষদ'-এ যোগপদ্ধতি যেভাবে বিবৃত হয়েছে তারই প্রায় হুবহু নকল আমরা পাই পতঞ্জলির 'যোগসূত্রে'।

প্রাচীন যোগপদ্ধতি বলে বর্তমানে যা প্রচলিত আছে তা অবশ্য কেবল পতঞ্জলি-বর্ণিত পদ্ধতি নয়। তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত এক পদ্ধতি যা

এক বিশেষ শরীরতত্ত্ব অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। কুলকুণ্ডলিনী, সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা, ষট্‌চক্র, সহস্রার ইত্যাদির ধারণার উপর উক্ত শরীরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ-যোগ আর তান্ত্রিকদের কুণ্ডলিনী যোগের সমবায়ে সৃষ্টি হয়েছে রাজযোগ। রাজযোগই হলো প্রকৃত যোগ যা অরবিন্দ সাধনা করেছিলেন। এই আধ্যাত্মিক যোগের বিপরীতধর্মী যোগ হলো হঠযোগ . কতকগুলি শারীরিক কসরতের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ।

হঠযোগ যোগীর শরীরের কিছুটা উৎকর্ষ সাধন করে ও শরীরের উপর তার একটা নিয়ন্ত্রণ এনে দেয়। এর যে একটা শারীরবৃত্তিক ভিত্তি আছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু পশ্চিমী প্রাচ্যবিদ্‌রা হিন্দুদের শরীরতত্ত্বকে 'সবচেয়ে অপ্রতিরোধ্য প্রাচ্য কল্পনা' (that most irrepressible oriental phantasy) বলে অভিহিত করেছেন তা মুখ্যত রাজযোগের তন্ত্রপ্রদত্ত শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে প্রযোজ্য।

মনুষ্যদেহ সম্পর্কে বাস্তবসম্মত জ্ঞান অর্জন করতে হলে শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেখতে হয়। সাধারণত ডাক্তার-বৈদ্যরাই তা করে থাকেন। দৈহিক ব্যাধি ইত্যাদির নিরসনের জন্য মনুষ্যদেহ সম্পর্কে আসল জ্ঞান তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য। তাই আমরা দেখি, পশ্চিমী দেশগুলিতে শারীরবিজ্ঞান প্রধানত সেখানকার চিকিৎসকদেরই সৃষ্টি। মানুষ যে এক ধরনের জীব ছাড়া আর কিছু নয় এই আধুনিক ধারণাটি তাঁদের অনুসন্ধিৎসার ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ঐসব দেশের ধর্মীয় নেতারা মানুষকে ঈশ্বরের এক বিশেষ সৃষ্টি ও প্রতিনিধিরূপে দেখাতে অভ্যস্ত ছিলেন। স্বভাবতই তাঁরা ডাক্তার ও শল্যচিকিৎসকদের সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে পোপ অষ্টম বেনিফিস তাই এক হুকুমনামা জারি করে মনুষ্য-শবব্যবচ্ছেদ বন্ধ করে দিলেন। কারণ দেখালেন যে, শবব্যবচ্ছেদের দরুন চরম বিচারের দিনে মনুষ্যদেহের পুনরুত্থান সম্ভব হবে না। ধর্মধ্বজীরা এইভাবে মানুষ ও তার জগতকে নিজেদের সংরক্ষিত এলাকা করে রাখতে তৎপর হয়েছিলেন।

পোপের হুকুমনামা অবশ্য কেবল সাময়িকভাবে কার্যকরী হয়েছিল। রেনেসাঁস আন্দোলনের সূচনায় অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানার্জনের উপরে পুনরায় জোর পড়ায় শবব্যবচ্ছেদ প্রথাও চালু হয়ে গেল। তদনুযায়ী ১৫০৫ সালে সান্তা ক্রোচের হাসপাতালে প্রকাশ্যে জনসাধারণের সামনে এক শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা হলো। এরপর একে একে প্রকাশ্যে আরও অনেকগুলি শবব্যবচ্ছেদ সম্পাদিত হলো। ফলে মনুষ্যদেহ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পেল।

ভারতবর্ষেও আরম্ভটা অনেকাংশে ইউরোপের আদলে হয়েছিল। কিন্তু এখানে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের উপরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের বজ্রকঠিন নিয়ন্ত্রণ থাকার দরুন পরিণতিটা ভিন্নরূপ নিয়েছিল। প্রাচীন হিন্দুদের আয়ুর্বেদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বভাববাদসম্মত ও বৈজ্ঞানিক। অথর্ববেদের বর্ণিত 'দৈব-ব্যাপাশ্রয় ভেষজের' পরিবর্তে 'যুক্তি-ব্যাপাশ্রয় ভেষজের' প্রতি তার স্থির আনুগত্য ছিল। বিভিন্ন সময়কার বিভিন্ন হিন্দু চিকিৎসকের ওষুধপত্র-সম্পর্কিত জ্ঞান সংগৃহীত হয়েছে 'চরক-সংহিতা'-র মধ্যে। এর পাশাপাশি আমরা পাই 'শুশ্রুত-সংহিতা'-কে। এর কারবার হলো শল্যচিকিৎসা নিয়ে। মনুষ্য-সভ্যতার সেই ঊষাকালেও হিন্দু শল্যচিকিৎসকরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনুষ্য-শবব্যবচ্ছেদ করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের সাহায্যে মনুষ্যদেহের মোটামুটি একটা নির্ভরযোগ্য ছবি তাঁরা এঁকেছিলেন।[২]

আয়ুর্বেদীয় ঐতিহ্যের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বৌদ্ধনৃপতিরা। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির ধ্বজাবাহীরা বুদ্ধবাদের পতনের পর পুনরায় 'দৈব-ব্যাপাশ্রয় ভেষজে'র প্রতি তাঁদের সমর্থন ও শল্যচিকিৎসার প্রতি ধিক্কার জানালেন। প্রত্যক্ষ দর্শনের চেয়ে সহজাত জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় ঘোষণাকে সত্যলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলে তুলে ধরা হলো। এইসময় মনুষ্যশবও অপবিত্র বলে গণ্য হলো এবং তা স্পর্শ করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। পরিবর্তে মনুষ্যদেহের অভ্যন্তরীণ অংশের সম্পূর্ণ কল্পিত একটা ছবি তাঁরা আঁকলেন। চন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠলোক ইত্যাদির সাহায্যে যেমন তাঁরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা মনগড়া ধারণা করলেন মনুষ্যদেহের বেলায়ও তা হলো।

আমরা জানি, মনুষ্যদেহের স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ হলো তার মস্তিষ্কের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগসাধন। আয়ুর্বেদে এইসব স্নায়ু ও তাদের কর্মপদ্ধতির যথাসাধ্য একটা বাস্তবসম্মত বিবরণ দেবার প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু 'বৃহদারণ্যক', 'ছন্দোগ্য', 'কঠ' 'তৈত্তিরীয়' প্রমুখ উপনিষদগুলিতে স্নায়ুমণ্ডলীর কিয়দংশের এক আধ্যাত্মিক ভূমিকার কথা বলা হয়েছিল যার উপর ভিত্তি করে তান্ত্রিক সাধনা ও রাজযোগ অংশত গড়ে উঠেছে। এইসব সাধনার প্রবক্তাদের হাতে মেরুদণ্ড হয়েছে ব্রহ্মাণ্ড, সুষুম্না ব্রহ্মনাড়ী আর গুরুমস্তিষ্ক ব্রহ্মরন্ধ্র। বস্তুবিশেষের উপরে অত্যধিক মনোযোগসঞ্জাত সম্মোহন নিদ্রা হয়েছে সমাধি। এই অবস্থায় স্বাভিভাবের অত্যন্ত প্রভাব থাকায় যোগীরা নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী 'সত্য' দর্শন ও উপলব্ধি করতে থাকেন।

রাজযোগের এই কল্পিত চরিত্র আধুনিককালের এক তত্ত্বজিজ্ঞাসু যোগীর চোখেও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল। ইনি আর কেউ নন, আর্যসমাজ-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ। প্রথম যুগে অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি মরুভূমিতে বহুকাল যোগসাধনায় রত ছিলেন। কিন্তু ক্রমে তিনি এর কার্যকারিতা ও শারীরবৃত্তিক ভিত্তি সম্পর্কে সন্ধিহান হয়ে উঠলেন। যোগশাস্ত্র সম্পর্কে অনেক পড়াশুনো করলেন। শেষে একদিন নদীতে ভাসমান এক শবদেহ তিনি টেনে তীরে তুললেন এবং 'বৃহৎ এক ছুরির সাহায্যে' তা ব্যবচ্ছেদ করতে শুরু করলেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলে তিনি যোগশাস্ত্রে প্রদত্ত মানুষের অভ্যন্তরীণ দৈহিক প্রণালীর বর্ণনার অলীকত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হলেন আর শবদেহের সঙ্গে যোগ সম্পর্কিত পুঁথিগুলিও টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন।[৩] দয়ানন্দের অস্বস্তিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে বেদান্তবাদীরা তখন বলতে শুরু করলেন—যোগশাস্ত্রে বর্ণিত স্নায়ুতন্ত্র মানুষের চর্মচক্ষুগ্রাহ্য নয়, ভাবচক্ষুতে তা দেখা যাবে।

যে বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' পড়ে অরবিন্দ প্রথম যোগসাধনার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর জীবন থেকেই বা আমরা কী দেখি? ১৮৮৬ সালের ৪ জানুয়ারি অর্থাৎ রামকৃষ্ণের মৃত্যুর কয়েক মাস আগে নরেনকে আক্ষেপ করতে দেখা যাচ্ছে—'সব্বাই-এর হলো, আমায় কিছু দিন। সব্বাই-এর হলো আমার হবে না?' তার উত্তরে রামকৃষ্ণ জানালেন—'তুই বাড়ীর একটা ঠিক করে আয় না, সব হবে।'[৪] বলা বাহুল্য, এটা রামকৃষ্ণের স্তোকবাক্যমাত্র। তিনি মৃত্যুপথযাত্রী। কাজেই এতকাল যা হয়নি তা হবার আর কোনো অবকাশ ছিল না।

বস্তুত তা যে আর হয়নি তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো, ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে যখন বিবেকানন্দ গাজীপুরে এসে উপস্থিত হলেন তখন তিনি পাওহারী বাবার সঙ্গে দেখা

করে তাঁর কাছে রাজযোগের পাঠ নিতে চাইলেন । এই ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের সন্নিধানে যোগ সম্পর্কে যথেষ্ট শিক্ষা পাননি । রামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্যের এই বিকল্প গুরুর সন্ধান গুরুর যোগদক্ষতার উপরও এক পরোক্ষ কটাক্ষপাত। গুরুভাইরা সংবাদ পেয়ে বিবেকানন্দকে প্রতিনিবৃত্ত করতে প্রয়াসী হলেন। তিনি তাঁদের কথায় কর্ণপাত করতে চাইলেন না। তবে শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দের মনোবাসনা আর পূর্ণ হলো না। কারণ বাবা নিজেই স্বামীজীর কাছ থেকে রাজযোগ শেখায় আগ্রহ দেখাতে লাগলেন । এ যেন এক অন্ধজন অপর এক অন্ধের কাছে পথের নির্দেশ চাইছেন। [৫] শেষ অবধি রাজযোগ সম্পর্কে বিবেকানন্দের যে ধারণা তা যে তাঁর পুরোপুরি বইপড়া বিদ্যে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । তাঁর 'রাজযোগ' গ্রন্থখানিতেও তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা কার্যত অনুপস্থিত । শুধু কোন্ কোন্ কসরতের কী ফল দর্শে বলে শাস্ত্রকারেরা যা উল্লেখ করেছেন গ্রন্থখানিতে প্রধানত সেই কথাই বলা হয়েছে। এখানে আরও লক্ষণীয় যে, বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে লঘুচিত্ত সাহেব-মেমদের রাজযোগের উপর ক্লাস নিলেও তাঁর প্রধান শিষ্যা নিবেদিতাকে তিনি যোগসাধনায় লিপ্ত করেননি। তবে বিবেকানন্দ মৌলিকতা দেখিয়েছেন যেখানে তিনি তাঁর রাজযোগ সংক্রান্ত বক্তৃতাগুলির মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তিকে প্রজননশক্তি বীজ বলে উল্লেখ করেছেন। এই যৌনশক্তি মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়ে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয় বলেছেন । ভারতীয় যোগবিদ্যার এই ফ্রয়েডপন্থী ব্যাখ্যা সত্যিই এক বিপ্রতীক পরিণতি বা anti-climax ।

তবে রাজযোগের শারীরবৃত্তিক ভিত্তি অনুপস্থিত থাকলেও এবং যোগীদের তথাকথিত ব্রহ্মদর্শন ইত্যাদি স্বাভিভাবের ফল হলেও তুরীয় অবস্থায় তাঁরা মনের যে আনন্দঘন অবস্থার কথা বলেছেন তা হয়তো একেবারে স্বাভিভাবজাত নাও হতে পারে। আমরা জানি, সুপ্রাচীনকাল থেকেই যোগীরা গাঁজা, আফিম, চরস, সিদ্ধি, সুরা ইত্যাদি মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত। এর ফলে যোগীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লুপ্ত হয় ও তাঁদের মনে এক আনন্দ-উল্লাসেব সৃষ্টি হয় । যোগীদের তথাকথিত ব্রহ্মানন্দ তাঁদের মাদকদ্রব্য সেবন-সঞ্জাত বলা যেতে পারে । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য দেশে তরুণ-তরুণীরা যে L. S. D.- প্রমুখ মাদকদ্রব্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে তার মধ্যেও রয়েছে অনুরূপ এক সুখানুভূতি লাভের আগ্রহ । এইভাবে আদিম মনুষ্যগোষ্ঠীও সুখানুভূতি লাভের অভ্যাস রপ্ত করেছিল । [৬]

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, অরবিন্দের যোগসাধনার উদ্দেশ্য কেবল ব্রহ্ম-উপলব্ধি ও ব্রহ্মদর্শন নয় । দেশকে বিদেশি শাসনমুক্ত কবাও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল । যোগসাধনার এই দিকটির মধ্যেও অন্ধবিশ্বাস ও কারচুপি সক্রিয় থাকতে দেখা যায় ।

রাজযোগ সাধনার ফলে অলৌকিক ক্ষমতালাভ করা যায় তা পতঞ্জলির 'যোগসূত্র'-এর "বিভূতিপাদ" অংশে বিবৃত হয়েছে । সেখানে এমন ৩৭টি ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে ; তবে সেগুলি মাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে । তালিকাটি মোটেই চূড়ান্ত নয় । যোগসাধনার দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায তা তন্ত্রসাহিত্যেও উল্লিখিত হয়েছে । লৌকিক স্তরে বাংলার নাথসাহিত্যেও তার বিবরণ পাওয়া যায় ।

"বিভূতিপাদ" অধ্যায় ও তন্ত্রশাস্ত্রের এই ধারণার পেছনে এক যাদুবিশ্বাস কাজ করছে। যাদু লৌকিক কার্যকাবণ সম্পর্কে বিশ্বাস করে কিন্তু কোনো ক্রিয়ার প্রকৃত কারণ

সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। 'পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত বস্তুর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান' — প্রধানত এই নীতির উপর নির্ভর করে যাদু কোনো বস্তু বা ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে অগ্রসর হয়। যোগসাধকদের বিশ্বাস ছিল যে, মনুষ্যদেহ ('দেহভাণ্ড') ব্রহ্মাণ্ডেরই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং ব্রহ্মাণ্ডে যেসব গুণ বিদ্যমান মনুষ্য কলেবরেও সেগুলি বিদ্যমান। মনুষ্যদেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াগুলিকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিগুলির উপরও অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হবে।

মানুষের অভ্যন্তরীণ দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের এক অদ্ভুত তত্ত্বও উদ্ভাবন করা হয়েছে, যার নাম হলো 'প্রাণায়াম'। আজ আমরা জানি, মানুষের দেহে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ হলো বাইরের বাতাসের সঙ্গে দেহে অক্সিজেন গ্রহণ করা ও দূষিত বায়ু শরীরের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া। প্রাচীন ভারতে মনুষ্যদেহের পক্ষে অক্সিজেনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কোনো সুষ্ঠু ধারণা অবশ্য গড়ে ওঠেনি। আয়ুর্বেদ মতে, পৃথিবীদেহ ও মনুষ্যদেহ যে পঞ্চভূতে গঠিত, বায়ু হলো তার মধ্যে একটি এবং বায়ু কুপিত হলে মানুষ উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়। ভারতীয় ভাববাদীদের চোখে কিন্তু বায়ু এক রহস্যময় সত্তারূপে প্রতিভাত হয়েছে। প্রথম নিশ্বাসবায়ুর সঙ্গে জীবদেহে প্রাণসঞ্চার ঘটে আর শেষ নিশ্বাসত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ দেহ ত্যাগ করে। কাজেই ভাববাদীদের সিদ্ধান্ত হলো বায়ুই হলো প্রাণ, বায়ুই হলো আত্মা। দেহের অভ্যন্তরে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ঊর্ধ্বগতি, অধঃগতি ইত্যাদি বিচার করে পাঁচপ্রকার বায়ুর কথা বলা হয়েছে — প্রাণ, আপান, ব্যান, উদান ও সমান (in-breathing, out-breathing, interspiration occupying the interval between respirations, up-breathing ও all-breathing)। বায়ুর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হলেও অন্য কোনো প্রাচীন মানবগোষ্ঠী কিন্তু তার বিভিন্ন দিক নিয়ে হিন্দুদের মতন এত মাথা ঘামায়নি।

ভারতীয় ভাববাদের আদি প্রবক্তা ছিলেন কুরু-পাঞ্চাল অঞ্চলের সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলির ক্ষত্রিয়-রাজন্যবর্গ। বায়ুর ভাববাদী ব্যাখ্যাও আমরা প্রথম পাই কার্যবিদ নামে এক ক্ষত্রিয় নৃপতির কাছ থেকে। 'চরক-সংহিতা' থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রাচীন ভারতে বায়ুসম্পর্কিত এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে অংশ নিয়েছিলেন কয়েকজন ভারতীয় চিকিৎসক ও ক্ষত্রিয়-নৃপতি। চিকিৎসকগণ যখন তাঁদের আয়ুর্বেদীয় বায়ুতত্ত্ব উপস্থাপিত করলেন কার্যবিদ তখন তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে তার বিরুদ্ধ ভাববাদী বায়ুতত্ত্ব বর্ণনা করে বায়ুকে মনুষ্যদেহের ভেতরে ও বাইরে সর্ব-নিয়ন্তা বলে চিত্রিত করলেন। বলা বাহুল্য, হিন্দু ভাববাদীদের প্রচারিত বায়ুতত্ত্ব বা প্রাণায়াম তাঁদের উদ্দাম ও উদ্ভট কল্পনার অপর এক নিদর্শন।[৭]

প্রাণায়ামের দ্বারা মনুষ্যদেহযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে ও তার মাধ্যমে বহির্বিশ্বের উপরও নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় এই ধারণার মূলে রয়েছে কতকগুলি অলীক যাদুবিশ্বাস যা বহুল প্রচারের ফলে আজ হিন্দুদের প্রায় জাতীয় সংস্কারে পরিণত হয়েছে। আধুনিক-কালে ইউরোপিয় থিওসফিস্টদের প্রচার এই সংস্কারকে দৃঢ়মূল হতে সাহায্য করেছে। থিওসফিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী মাদাম ব্লাভাৎস্কি হিমালয়বাসী যোগীদের নানা অলৌকিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে নিজেকে জাহির করতে থাকেন এবং 'যোগবলে' শহরের বুকেও কিছু 'অলৌকিক' কাণ্ড ঘটাতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত

"অলৌকিক" ক্রিয়াকলাপই যে নিছক জুয়াচুরি তা সত্বর ধরা পড়ে । ইংল্যাণ্ডের Society for Psychological Research তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে, তিনি হলেন 'one of the most accomplished, ingenious and interesting impostors in history'। [৮]

যোগলব্ধ এই তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাকে চলতি কথায় 'সিদ্ধাই' বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে । সিদ্ধাই লাভ সমাধিলাভেরই পূর্ববর্তী স্তর বলে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুটি স্তরের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে অনেক লুকোচুরি ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলকে।

তিন

পণ্ডিচেরিবাসের দশকখানেক পর থেকেই আমরা অরবিন্দকে এক নতুন যোগের প্রবক্তারূপে দেখতে পাই । এর অর্থ এই নয় যে, স্বামী দয়ানন্দের মতন প্রচলিত রাজযোগ তাঁর কাছেও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে । আমরা এর আগে দেখেছি, যোগ হলো বেদান্ত প্রচারিত তত্ত্বের বাস্তব উপলব্ধি লাভ কবার প্রণালী । যোগবিদ্যা যে এতকাল রুদ্ধগতি হয়েছিল তার এক মস্ত কারণ হলো যে, বেদান্ত-দর্শনের মধ্যেও তখন কোনো বিকাশ ছিল না । বিশ শতাব্দীর বিশ দশকের গোড়া থেকে অরবিন্দ বেদান্ত-দর্শনে কিছু মৌলিকতা আনেন যার ফলে যোগশাস্ত্রের পরিবর্তনের প্রয়োজনও তাঁর কাছে অনুভূত হয়েছিল। এই পরিবর্তনের তাৎপর্য বুঝতে হলে বেদান্ত দর্শনে তাঁর অবদানের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ ধর্মীয় বিশ্বাসের উপরে মোক্ষম আঘাত হেনেছিল । নিউটন প্রদত্ত আঘাতের চেয়ে তা ছিল গুরুতর। নিউটনের জগত থেকে ঈশ্বরকে একেবারে বাদ দেওয়া যায়নি । বরঞ্চ এক পরিকল্পনামাফিক জগতের স্রষ্টারূপে তাঁর স্থান সেখানে সুনির্দিষ্ট ছিল বলা যেতে পারে । ডারউইনের বিবর্তনবাদ এক বস্তু থেকে অপর বস্তুর উদ্ভবকে স্বীকার করাব ফলে এক সর্বশক্তিমান পরিকল্পক ঈশ্বরের ধারণার তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিয়েছিল। কাজেই ধর্মকে বিবর্তনবাদের নিক্ষিপ্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছে । ভারতীয় ধর্মীয় দর্শন অর্থাৎ বেদান্তবাদে কিন্তু সেই প্রচেষ্টা এযাবৎ-কাল অনুপস্থিত ছিল। অরবিন্দই প্রথম ভারতীয় চিন্তক যিনি বিবর্তনবাদকে তার সঙ্গে সমন্বিত করে তাকে এক আধুনিক রূপ দিতে প্রয়াসী হলেন ।

অরবিন্দ বললেন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এক বিবর্তনের স্রোত বয়ে চলেছে সেকথা ঠিক। তবে এ বিবর্তন বস্তুর নয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের । বস্তুও ব্রহ্ম । অভিব্যক্তির এক বিশেষ স্তরের ব্রহ্মই হলেন বস্তু । বস্তুত ব্রহ্ম বস্তু হয়েছেন মধ্যবর্তী কয়েকটি স্তর পার হয়ে । অরবিন্দের মতে বিবর্তনের ধারাটি হলো এইরকম : সচ্চিদানন্দ-অতিমানস-মানস-জীবন-বস্তু । অতিমানস ও মানসের মধ্যে এত নক্ষত্রসুদূর ব্যবধান যে এই দুটি সত্তার মধ্যবর্তী কয়েকটি স্তরও তিনি কল্পনা করেছেন, যেমন অধিমানস, সম্বুদ্ধমানস, প্রদীপ্তমানস ও উত্তরমানস । বিশ্ব-অভিব্যক্তির স্রোত কেবল ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নমুখী নয়, নিম্নতম স্তর অর্থাৎ বস্তুতে উপনীত হবার পর তা আবার ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে । যেমন বস্তু-জীবন-মানস-উত্তরমানস-প্রদীপ্তমানস-সম্বুদ্ধমানস-অধিমানস-অতিমানস।

এ যেন সিঁড়ির একই ধাপ বেয়ে ছাদে ওঠা ও নীচে নামা। উত্তরণ থেকে ধাপে ধাপে অবতরণ, আবার অবতরণ থেকে ধাপে ধাপে উত্তরণ—অনবরত এই প্রক্রিয়া চলেছে।

অরবিন্দের মতে, বর্তমান সমস্যা-পীড়িত পৃথিবীর মুক্তির একমাত্র পথ হলো এখানে অতিমানসের অবতরণ। বিবর্তনের অনিবার্য ধারায় এই অবতরণ একদিন অবশ্যম্ভাবী। অরবিন্দের নব পর্যায়ের যোগ সাধনার উদ্দেশ্য হলো তাকে ত্বরান্বিত করা। যোগকে তাই তিনি বলেছেন, 'সচেতন বিবর্তন'। অতিমানসের শক্তিকে ধারণ করে ঐশীক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে মানুষও সেদিন অতি-মানুষে পরিণত হবে এবং সে এতখানি আধ্যাত্মিক বলের অধিকারী হবে যে তার পক্ষে কোনো সমস্যার সমাধানই আর ক্ষমতাবহির্ভূত থাকবে না। আজকের মানুষ তার বর্তমান মানস ও নৈতিক শক্তি দিয়ে এতকাল যা পারেনি অতি-মানুষ তার অতি-মানবিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে জগত ও জীবনের দিব্য পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে।

অরবিন্দের আগেকার যোগসাধনার উদ্দেশ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা লাভ। আর তাঁর নব-পর্যায়ের যোগসাধনার কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হলো অন্তরীক্ষ থেকে অতিমানসকে নামিয়ে এনে তার রূপান্তর সাধন করা। তাঁর পরিকল্পিত এই নতুন উদ্দেশ্য পূর্বতন যোগসাধনার উদ্দেশ্য থেকে বেশি ব্যাপক ও মহৎ। এই উদ্দেশ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধনপদ্ধতিও পরিবর্তিত হলো। আমরা আগে দেখেছি, কয়েকটি উপনিষদ ও পতঞ্জলির 'যোগসূত্র'-এ বর্ণিত অষ্টাঙ্গযোগই হলো যোগসাধনার আদি রূপ। তন্ত্রের কুলকুণ্ডলিনী যোগ পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। শেষোক্ত যোগটির শারীরবৃত্তিক ভিত্তিই শুধু অবাস্তব ছিল তা-ই নয়, তা যোগসাধনাকে এক অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া করে তুলেছিল। অরবিন্দ কুলকুণ্ডলিনী যোগের অবাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলেও এর জটিলতা তাঁকে বিক্ষুব্ধ করেছিল এবং তাঁর দিব্যজীবনের সাধনায় এর অনুপযুক্ততা তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। এই যোগে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির ঊর্ধ্বারোহনের কথা আছে কিন্তু অবতরণের কথা নেই। এমনকি, সচ্চিদানন্দের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে ব্রহ্মদণ্ড দিয়ে নেমে মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীরূপে অবস্থানের কথা সেখানে অনুপস্থিত। কাজেই জাগতিক রূপান্তরের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনের ধারণার সঙ্গে এই যোগ বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অরবিন্দ যোগসাধনার আদি সরল রূপে ফিরে যেতে চাইলেন, ধারণা ও ধ্যান হলো যার মূলকথা। তিনি অবশ্য এরসঙ্গে আর একটি অবস্থা সংযোজিত করেছেন তা হলো নিস্তব্ধতা। কিন্তু যেহেতু নিস্তব্ধতা ছাড়া ধ্যান সম্ভব হয় না সেহেতু প্রাচীন যোগে ধ্যান বলতে নিস্তব্ধতার ভাবও বুঝিয়েছে ধরা যেতে পারে। অরবিন্দ শুধু সেই ভাবটিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন তাকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য ও তার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য।

বেদান্তদর্শনে অরবিন্দের মৌল অবদান বলে যা এতকাল প্রচারিত হয়েছে এবং তাঁর নব-পর্যায়ের যোগসাধনাকে যার ফলিত দিক বলা যেতে পারে তার বিশ্বাসযোগ্যতা আমরা এখন কিছুটা পরীক্ষা করে দেখব। স্থানে ও কালে সচ্চিদানন্দের আদি প্রকাশিত রূপই হলো অতিমানস। অতিমানসের অবতরণের যে স্তরগুলি অরবিন্দ নির্দেশ করেছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে চিন্তাক্ষমতাহীন বস্তুর আগমনের পূর্বে চিন্তাশীল মানুষের আবির্ভাব আর জীবনের আবির্ভাবের পূর্বে মনের আবির্ভাব ঘটেছে বলে ধরতে হবে। স্পষ্টতই

এ ধারণা বিজ্ঞানসম্মত নয় । এই অসুবিধার হাত এড়ানো যেতে পারে একমাত্র যদি অতিমানস অবতরণের সময় মধ্যবর্তী স্তরসমূহ বাদ দিয়ে সরাসরি বস্তুতে নামেন, কিন্তু ঊর্ধ্বারোহনের সময় সমস্ত স্তর একে একে অতিক্রম করেন । তবে এই পরিবর্তনের ফলে অরবিন্দের গোটা দার্শনিক কাঠামোটাই নড়বড়ে হয়ে পড়বে । আর অতিমানস যদি সোজাসুজি বস্তুতে অবতরণ করেন তাহলে ১৯২৬ সালে অরবিন্দের দেহে অধি-মানসের অবতরণ ঘটে কী করে ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, অতি-মানসিক ক্ষমতার অধিকারী অতি-মানুষরা অতি-দেহীও হবে কি ? অরবিন্দ স্বয়ং অবশ্য কোনো অতি-দেহী অতি-মানুষের কথা স্পষ্ট করে বলেননি । তিনি শুধু এই কথা বলেই শেষ করেছেন যে, চেতনাই নিজস্ব প্রয়োজনে মনুষ্যদেহে প্রাসঙ্গিক মৌল পরিবর্তন ঘটিয়ে নেবে । তবে 'শ্রীমা' নাকি যোগবলে স্বর্গরাজ্যে গিয়ে দেখে এসেছেন যে, সেখানে এই অতি-দেহী অতি-মানুষ ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে আর এক মৃদু বেগুনী আলো তার সারা দেহকে ঘিরে রেখেছে । পৃথিবীতে জন্মাবার অপেক্ষায় এখন সে প্রহর গুণছে ।

এই সম্পর্কে বলা যেতে পারে পৃথিবী একান্ত করেই মানুষের জায়গা, অতি-মানুষের কোনো স্থান এখানে নেই । মানুষের দৈর্ঘ্য ও দৈহিক গঠন যে গ্রহে সে বাস করে তার পরিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । মানুষ যদি পৃথিবীবাসী না হয়ে জুপিটারে বাস করত তাহলে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তার মেরুদণ্ডকে এখনকার চেয়ে অনেক বেশি শক্ত করতে হতো ; কারণ জুপিটারের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে বেশি । আবার পৃথিবী যদি চন্দ্রসদৃশ হতো তাহলে অনেক কম হাড় ও স্নায়ু দিয়ে মানুষের কাজ চলে যেত। অতি ক্ষুদ্র আকারের মানুষের পক্ষে দৈহিক তাপাঙ্ক একই অবস্থায় বজায় রাখা সম্ভব নয় । তেমনই বিরাট আকারের কোনো জীবের পক্ষেও তার অস্তিত্ব রক্ষা করা কষ্টকর হতো। মানুষের বর্তমান পরিধি ও ওজন তার দৈহিক ক্ষমতা ও গতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী হয়েছে । একইরকমভাবে, মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিও তার দেহের বাইরের জগতে সাধিত পরিবর্তনসমূহের প্রয়োজনীয় খবরাখবর দেবার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছে । মানুষের শারীরিক গঠনের পক্ষে যা বলা হলো তার মানসিক গঠনের পক্ষেও তা প্রযোজ্য । মানুষ শুধু পৃথিবীর সঙ্গে নয়, তার দেহের বিভিন্ন অংশও পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ: খাদ্য গ্রহণ ও হজম, অক্সিজেন নেওয়া ও সারা দেহে ছড়িয়ে দেওয়া, দূষিত পদার্থসকল শরীরের অভ্যন্তরের থেকে বার করে দেওয়া, বাইরের আঘাত থেকে দেহকে রক্ষা করা, সন্তানের জন্ম দেওয়া, চিন্তা করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য শরীরের বিভিন্ন অংশ কাজ করে চলেছে । মানুষ পৃথিবীর এক সুসঙ্গত জীব । বিশ্বপ্রকৃতির বিবর্তনের ধারায় অতি-দেহী ও অতি-মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন অতি-মানুষের অবধারিত জন্মের ধারণা উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র ।

তৃতীয়ত বিশ্বে রূপ থেকে রূপান্তর এক নিরুদ্দেশ্য প্রবাহে বয়ে চলেছে । তার নিজস্ব কোনো লক্ষ্য নেই । মানুষই সচেতন জীব হিসেবে তার প্রয়োজনানুযায়ী রূপান্তরকে বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হয়েছে । বস্তু যদি ব্রহ্ম হয় আর চেতনা যদি প্রতি বস্তুর মধ্যে গোড়া থেকেই অপরিস্ফুট অবস্থায় নিহিত থাকে, বিবর্তনের ধারায় যা পরিস্ফুট হতে বাধ্য, তাহলে অন্য কোনো গ্রহে জীবনের প্রকাশ পেতে আমরা

দেখি না কেন ? বস্তুত জীবন হলো বস্তুপুঞ্জের এক বিশেষ সমাবেশেরই এক আকস্মিক ফসল। কোনো সচ্চিদানন্দের বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রসূত নয় ।

চতুর্থত, গাছ ফলের দ্বারা পরিচিত হয় । অতি-মানসের 'দিব্য-জীবন' সৃষ্টি করার যে ক্ষমতার কথা বারবার বলা হয়েছে কার্যক্ষেত্রে তার কোনো সমর্থন আমরা পাইনি। আজকের মানুষ ও তার মনন ক্ষমতার উপর অরবিন্দ বিশেষ কোনো আস্থা রাখতে পারেননি । একমাত্র অতিমানসের অবতরণের মধ্য দিয়ে মনুষ্য সভ্যতার সমস্ত সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধান হবার আশা তিনি দেখেছেন ।

অরবিন্দ ১৯২৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর 'শ্রীমায়ের' মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর দেহে ঐদিন অধিমানসের অবতরণ ঘটেছে । অবশ্য তার ফলে পৃথিবী 'দিব্য-জীবন' লাভের দিকে এক পাও এগিয়েছে বলে দেখা যায়নি । পরন্তু বিশের এবং ত্রিশের দশকে পৃথিবীর বুকে দুর্বার ফ্যাসিস্ট শক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটে যা মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা বিপন্ন করে তুলেছিল এবং যাকে পরাস্ত করার জন্য পরে অরবিন্দকে নাকি যোগশক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল বলে প্রকাশ । এমনকি, তাঁর দেহে অধিমানস শক্তির অবতরণের দরুন তিনি তাঁর মূত্রাশয়ের ব্যাধি থেকেও নিস্তার পাননি এবং এই ব্যাধিতেই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয় । তখন বিশ্বাসী আশ্রমবাসীরা তাঁর মৃতদেহ এক স্বর্গীয় আলোকে দ্যুতিমান দেখতে পান । কিন্তু ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতেও দু-তিনদিনের মধ্যে সেই দেহে পচনক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তা সমাধিস্থ করা হয় । এই ভক্তরাই আবার পরে রটনা করতে থাকেন যে, চন্দ্র-অভিযান শেষ করে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পথে এপোলো-১২-র বৈমানিক চার্লস কনার্ড ভেনাসের মতন বৃহদাকার এক আলোর বন্যাকে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের দিকে প্রবহমান দেখতে পান এবং এই আলোর বন্যাই নাকি অরবিন্দ-কথিত অতিমানসিক আলো । কিন্তু অধিমানস হোক অথবা অতিমানস হোক অরবিন্দের দেহকে আশ্রয় করেও সে মানস তার পচনক্রিয়া নিবারণ করতে পারেনি ।[৯]

১৯২৬ সালের অধিমানসের অবতরণের পর ১৯৩৪ সালে অতিমানস স্বয়ং অবতরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন বলে অরবিন্দ টের পেয়েছিলেন । কিন্তু সেদিন তাঁকে গ্রহণ করার মতন কয়েকজন যোগীর অভাবে অতিমানস আবার নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন । তবে অরবিন্দের মৃত্যুর পরে অতিমানস 'শ্রীমায়ের' দেহে অবতরণ করেছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছিল । কিন্তু তা যদি হয়ে থাকে তার ফলে পৃথিবী দিব্য রূপান্তরের পথে কতখানি এগিয়েছে তা বিচার্য বিষয় । 'শ্রীমায়ের' দেহাবসানের পরে আশ্রমবাসীরাই বর্তমানে যেভাবে কলহে লিপ্ত হয়েছেন তা থেকে এর উত্তর সহজলভ্য হবে । এই কলহের জন্য আশ্রমের কর্তৃত্বভার আজ ভারত সরকারকে নিজের হাতে নিতে হয়েছে ।

এ তো গেল অতি-মানসিক ও অধি-মানসিক শক্তির কথা । সাধারণ যোগশক্তি-বলে অরবিন্দ কী সব মানবহিতকর অসাধারণ কাজকর্ম করেছেন তার এক ফিরিস্তিও স্বয়ং অরবিন্দ ও তাঁর অনুরাগী ভক্তদের কাছ থেকে পাওয়া যায় । যথা অরবিন্দের যোগশক্তি লেনিনের পিছনে ছিল বলেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে রুশ বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ডানকার্কের পতনের পর অরবিন্দ তাঁর যোগবল

মিত্রপক্ষের অনুকূলে ব্যবহার করেছিলেন বলেই এইসময় থেকে যুদ্ধের গতি বদলায় এবং জাপানের বিরুদ্ধে তাঁর যোগশক্তি প্রযুক্ত হয় পার্ল হারবারের ধ্বংসলীলার পরে। তারপর ষাটের দশকের শেষভাগে ভারত-চীন যুদ্ধ চলাকালে বিজয়ী চীনা সৈন্য যখন আকস্মিকভাবে পশ্চাদপসরণ শুরু করল তখন ভক্তদের বিশ্বাস হয়েছিল যে, 'শ্রীমা' কর্তৃক (কারণ অরবিন্দের ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে) তাঁর যোগশক্তি ব্যবহারের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এমনকি, অরবিন্দের যোগশক্তির প্রভাবেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছে, এর বড় 'প্রমাণ' হলো ভারতবর্ষ যে তারিখে (১৫ আগস্ট) স্বাধীনতা পেয়েছে সেটি অরবিন্দের জন্ম তারিখ।[১০] এইসব ধারণার পেছনে এক ধরনের যাদুবিশ্বাস কাজ করছে। যেমন যাদু দুটি সাদৃশ্যযুক্ত বস্তু কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত বলে বিশ্বাস করে তেমনই তা আরও বিশ্বাস করে যে, কোনো কর্ম অনুষ্ঠান (যাগযজ্ঞ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি) বা কোনো কোনো বাক্যের আবৃত্তি (যেমন মন্ত্র) এমন এক শক্তি সৃষ্টি করে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'অপূর্ব' অর্থাৎ পূর্বে যার অস্তিত্ব ছিল না। 'অপূর্ব' দূরস্থিত উদ্দেশ্যসাধনেও সমর্থ হয়।

মানবেন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে আমরা অরবিন্দের অতিমানস শক্তির অবতরণ নিয়ে মাতামাতিকে লর্ড নর্থক্লিফের শেষ বয়সের মানসিক ব্যাধির সঙ্গে তুলনা করতে পারি। জাপানি বিভীষিকা, ডাচ সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি যে কোনো আন্তর্জাতিক জটিলতা নিয়েই নর্থক্লিফ লিখুন না কেন তার ভেতর অবশ্যম্ভাবীরূপে জন্মহার বিষয়টি এসে যেত। তার ফলে লোকের মনে উক্ত লর্ডের মানসিক ভারসাম্য সম্পর্কে সন্দেহ জন্মে। শেষে তাঁর লিখিত সমস্ত প্রবন্ধই প্রকাশের আগে তাঁর কর্মচারিদের দ্বারা ভালোভাবে পরীক্ষিত হতো।[১১] নর্থক্লিফের কাছে মনুষ্য জন্মহার যা ছিল অরবিন্দের কাছে অতিমানস শক্তির অবতরণও তা-ই ছিল। তিনি যেভাবে বিশ্বের সব সমস্যার সমাধান, এমনকি ভারতবর্ষের অর্থনীতিক উন্নতির কাজও এই অবতরণ-নির্ভর বলে প্রচার করেছেন তাতে তাঁর মানসিক স্থিরতা সম্পর্কেও অনেকের মনে সন্দেহ আসতে পারে। পুলিস রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, অরবিন্দের পূর্বতন রাজনীতিক জীবনে তাঁর বক্তৃতা, প্রবন্ধাদি শুনে বা পাঠ করে সমকালীন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক নেতাদের অনেকে তাঁর প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন।[১২] এই প্রকৃতিস্থতা তিনি তাঁর অবশিষ্ট জীবনেও লাভ করেছিলেন বলে মনে হয় না।

উল্লেখপঞ্জী :

১. প্রথম জীবনের কথা বলতে গিয়ে অরবিন্দ স্বয়ং নিজেকে 'এক মস্ত কাপুরুষ' বলে উল্লেখ করেছেন— (Purani, *Aurobindo in England*, পৃ. ১৮)। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর শিক্ষানবিশী কালে অরবিন্দ যে একাধিকবার অশ্বারোহণ পরীক্ষায় উপস্থিত হননি তার মূলেও ছিল তাঁর 'উৎকণ্ঠা ও নৈতিক ভীরুতা'—(Government of India, *Judicial and Public File 1926 of 1892*).
নৈতিক সাহসের অভাবে এইসময় অরবিন্দ 'সত্যি কথা বলতে বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন না' বলে নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু শুধু তাই নয়, তিনি তখন তঞ্চকতা করতেও কসুর করতেন না। অর্থের অভাবে দর্জির দোকান থেকে ধারে এক প্রস্থ পরিচ্ছদ তৈরি করে তার মূল্যশোধের ব্যবস্থা না করেই বরোদার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। দর্জি পরে মহারাজকে সমস্ত ঘটনা জানালে মহারাজার নির্দেশে অরবিন্দ টাকা পাঠিয়ে দেন।—

Purani, *Evening Talks* (তৃতীয় ভাগ)।

২. অধিকতর বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের "Yoga and Human Anatomy", *Radical Humanist*, অক্টোবর, ১৯৭৯ ও বিপিনবিহারী সোমের প্রবন্ধ 'Physical Errors of Hinduism', *Calcutta Review* জুন, ১৮৪৯।
হিন্দুদের শবদেহ সম্পর্কিত কুসংস্কার উনবিংশ শতাব্দীতেও প্রবলভাবে বর্তমান ছিল। ১৮৩৫ সালে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত কলকাতা কলেজে মনুষ্যশব ব্যবচ্ছেদ করা হয়। তখন মধুসূদন গুপ্ত নামে একজন মাত্র বৈদ্যসন্তান এগিয়ে এসেছিলেন ও ফোর্ট থেকে কামান দেগে তাঁর কাজকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল।

৩. J. C. Oman, *Cults, Customs and Superstitions of India,* পৃ. ১৩৩।

৪. 'কথামৃত', ৩য় ভাগ, পৃ. ২৭৩।

৫. গম্ভীরানন্দ, 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ', ৩য় ভাগ।

৬. Taylor, *Primitive Culture*, Vol. I, পৃ. ২২৭।

৭. J. Filliozat, *The Classical Doctrine of Indian Medicine.*

৮. *Madame Blavatsky, Her Tricks and Dupes* (মাদ্রাজের ক্রিশ্চিয়ান লিটারেরি সোসাইটি-কর্তৃক প্রকাশিত); Edmund Garrett, *Isis Very Much Unveiled*।

৯. Kishore Gandhi (ed.) *Contemporary Relevance of Sri Aurobindo.*

১০. *Sri Aurobindo on Himself* পৃ. ৪০৪; Purrani, *Evening Talks.*

১১. মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ "Spiritual Communism", *Vanguard*, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯২৩।

১২. Govt of India, Home Deptt, Political A. October, 1909, Nos, 230-48 পৃ. ৪।

প্রবাল দাশগুপ্ত

দুই সোস্যুরের ভাষাচিন্তা

ভূ মি কা

সুইসদেশে দুই ভাই ছিলেন। ফেয়ারদিনাঁ দ্য সোস্যুর, র‍্যানে দ্য সোস্যুর। ফেয়াবদিনাঁর বই ইংরিজিতে পাওয়া যায়। র‍্যানের বোধহয় অনুবাদ নেই। দুজনেই এ শতকের আরম্ভে ভাষাচিন্তার নতুন পথ তৈরি করেছিলেন।

ফেয়ারদিনাঁর চিন্তা ছিল সময়োপযোগী। অনেকে তাঁর কথা লুফে নেয়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান জন্মায়। তাব সেই প্রথম পর্ব, সংগঠনী বা স্ট্রাকচারাল ভাষাবিজ্ঞান, আশেপাশের কোনো কোনো মহলেও ফসল ফলিয়েছে, যেমন ক্লোদ লেভি-স্ত্রোসের নৃবৈজ্ঞানিক ভাবনার ফসল। এখন সংগঠনী ভাবনার দম ফুরিয়ে গেছে। অন্য ঝোঁক চলছে এখন, নোআম চমস্কির, জোন ব্রেজনানের। এই নতুন দ্রষ্টা দ্রষ্ট্রী ভাষাচিন্তাব হাওয়া অনেকটাই বদলে দিয়েছেন। ফলে, র‍্যানে দ্য সোস্যুরের লেখা এখন হাতে পেয়ে লোকেরা লুফে নিলেও নিতে পারে।

লুফে যদি নেয়, তাহলে বোধহয় ফেয়ারদিনাঁর কাজেরও নতুন করে মূল্যায়ন হবে র‍্যানের পাশাপাশি। অলস জল্পনা ছেড়ে এবার প্রথমে ফেয়ারদিনাঁর কথা বলি কিছু কিছু। তারপর র‍্যানের পালা।

ফে য়া র দি নাঁ

প্রথম যৌবনেই তাক-লাগানো কাজ। সংস্কৃত লাতিন গ্রীক ফারসি আইরিশ দিনেমার ইত্যাদির জননী যে আদি ভারোপীয় (ভাবত-ইউরোপীয়) ভাষা—যার কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই কিন্তু যা নিশ্চয়ই একদা বলা হতো—সেই ভাষায় আ এ ও এইসব স্বরের কী গতিবিধি ছিল তাই নিয়ে গবেষণা করলেন ফেয়ারদিনাঁ, কুড়ি পেরনোরও আগে। লেখাটা যে প্রতিভাদীপ্ত সেটা তখনই দেখা গেছিল। প্রশংসাও হলো। কিন্তু বহুদিন বাদে, ১৯২০-৩০ নাগাদ, আস্তে আস্তে বোঝা গেল ফেয়ারদিনাঁ অল্প বয়সে ১৮৭৯ সালে যা করেছিলেন সেটা কী সাংঘাতিক কাজ। গোয়েন্দাগিরি ক'রে বেরোলো যে, আদি ভারোপীয় ভাষায় যে হ্ ধ্বনির অস্তিত্ব ফেয়ারদিনাঁ কল্পনা করেছিলেন, সেই হ্ সত্যিই যে ছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে হিত্তী ভাষার সদ্য-আবিষ্কৃত পুরনো দলিলে। তার কথা ফেয়ারদিনাঁ বেঁচে থাকতে কেউ জানত না। ওই হ্ ধ্বনির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছিল না ফেয়ারদিনাঁর জানা কোনো ভারোপীয় ভাষার। হ্-টার কথা উনি প্রায় মন্ত্রবলে জেনেছিলেন বলতে হবে।

সেই মন্ত্রে উনি পরে দীক্ষা দিলেন ছাত্রদের—জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বই লিখে

যেতে পারেননি। কয়েকজন ছাত্র ওঁর ক্লাসে যা নোট নিয়েছিলো তাই জড়ো ক'রে বেঁধে-গেঁথে একটা বই বেরলো ওঁর মৃত্যুর পর ১৯১৫-য়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের সবাইকেই জেনেভায় প্রক্সিতে ক্লাস করতে হয় ওই বইটার মারফত : 'নির্বিশেষ ভাষাবিজ্ঞানের পাঠক্রম'। ভাষার নির্বিশেষ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রথম সার্থক চেষ্টা ওই বইয়ে।

সামাজিকতার সময় 'ভাষাবিজ্ঞানী' শুনলেই লোকে জিগেস করে, কোন কোন ভাষা নিয়ে এই বিশেষ বিজ্ঞতা ? উনিশ শতকে শব্দবিদ্যা বা ফিললজি বলে যে শাস্ত্রটা ছিল তার শাস্ত্রীরা এ প্রশ্নের জবাব সহজেই দিতে পারতেন। কেউ ছিলেন লাতিন থেকে উদ্ভূত ভাষা-সমূহের বিশেষজ্ঞ। কেউ-বা চীনের অনেকগুলো ভাষার খবর রাখতেন। শব্দবিদ্যা সারাক্ষণ খালি ভাষা থেকে ভাষান্তরে চরে বেড়ায় ; এতে অতৃপ্তি বোধ করে, 'এই কি জননী তুমি ?' বলে-টলে, ভাষাজিজ্ঞাসুরা এ ভাষা ও ভাষার প্রজাপতিদশা ছেড়ে এসেছেন ক্রমশ। শব্দবিদ্যা থেকে ভাষাবিজ্ঞানে এই উত্তরণ শুরু হয়েছে ফেয়ারদিনাঁর কালে। প্রক্রিয়াটা হয়তো শেষ হয়নি এখনও।

স্লাভিক শব্দবিদ্যা, টিউটনিক শব্দবিদ্যা, সংস্কৃত-প্রাকৃত শব্দবিদ্যা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্র্যাকটিকালের উপকরণ-বৈচিত্র্যেব আড়ালে অভিন্ন যে থিওরি তার উনিশশতকী অনুসন্ধানেই নির্বিশেষ ভাষাজিজ্ঞাসার ভিত্তি তৈরির চেষ্টা শুরু হয়। ফেয়ারদিনাঁর অধ্যাপনায় ওই চেষ্টার যে পরিস্ফুটন পাই সেটা দেখতে খুব সহজ। উনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, একটা ভাষা কী জিনিস ? ওঁর কাছে আমরা শিখি যে এটাই নির্বিশেষ ভাষাবিজ্ঞানের আসল প্রশ্ন ; জিজ্ঞেস করতে জানা চাই ; প্রশ্নটার উত্তর খোঁজার প্রচলিত উপায়গুলো তেমন কাজের নয়।

ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা দুটো ব্যাপার ভাষা থেকে কীসে আলাদা সেই কথা তুলে ফেয়ারদিনাঁ নেতি নেতির পথে এগিয়েছেন। একটা হলো বাক্ বা বাক্‌শক্তি যা সব মানুষের আছে। কিন্তু সবাই তো এক ভাষা বলে না। একটা নেতি এই : ভাষা বাক্ নয়। ভাষা আর যা নয় তা হলো বলন ('কী চলন চলে, কী বলন বলে')। পাঁচজন যদি কুড়িবার করে 'তরকারি' বলে তাহলে একশোটা তরকারি-বলন হলো। তাই বলে 'তরকারি' শব্দটার একতা কি শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাবে ? ভাষা অনেকগুলো বটে। কিন্তু প্রত্যেকটা ভাষার নিজস্ব সংহতি রয়েছে। সেই ঐক্যের আধার ভাষাভাষীদের একেকটা সম্প্রদায়। তেলেগুভাষী সমাজে তেলেগুর ঐক্য। ওড়িয়াভাষী সম্প্রদায়ে ওড়িয়ার সংহতি।

বলনের আধার সমাজ নয়, ব্যক্তি ; কবার তরকারি বলব তা আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। বাকেরও আধার সমাজ নয়—মানবজাতি। সে স্তরে ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রশ্ন ওঠে না।

ভাষাই সমাজে অবস্থিত। তার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার জোর খাটে না ; খাটলে প্রত্যেকে নিজস্ব ভাষায় কথা বলত, ফলে কেউ বুঝত না। মানবজাতির বাক্‌শক্তিও ভাষার চেহারার নিয়ন্তা নয় ; তা যদি হতো তাহলে সব যুগের সব মানুষের ভাষা এক হতো (তাতে কী ক্ষতি হতো পাঠকই ভেবে দেখুন)। বলনের ব্যক্তিস্বাধীনতা একদিকে, বাকের জাতিজৈব বাধ্যতা অন্যদিকে। মাঝখানে একেকটা সমাজ আছে যে যার নিজের

ভাষা নিয়ে । ভাষায় স্বাধীনতাও আছে, আবশ্যিকতাও আছে । স্বাধীনতার কথাই আগে বলি ।

ফেয়ারদিনাঁ মুদ্রার সঙ্গে তুলনা করেছেন ভাষার এককের । এক পিঠে উচ্চারণ, উলটো পিঠে তাৎপর্য । ভাষার একককে উনি বলতেন 'সিঞ' Signe,তার প্রতিশব্দ হিসেবে 'কথা' চলতে পারে বাংলায় । 'তরকারি'ও একটা কথা, 'তরকারি ভালো হয়নি'ও একটা কথা, তবে জোটবাঁধা কথা, ওর ভেতরে একাধিক কথা রয়েছে । 'তরকারি' একা কথা । ইংরিজি 'ভেজিটেবল' আর ফরাসি 'লেগ্যুম'-এর প্রতিশব্দ 'তরকারি' । স্পষ্টতই বাংলাতেও কথাটা 'তরকারি' হবার কোনো প্রয়োজন ছিল না । প্রয়োজন থাকলে, ইংরেজ-ফরাসিরা ওরকম বিদঘুটে কথা বলে পার পেয়ে যেত না—ওরাও 'তরকারি' বলতে বাধ্য হতো । আসলে, যে ভাষার যা প্রাণ চায় । আনতাবড়ি বা যদৃচ্ছ একেকটা চেহারা একেক ভাষায় প্রচলিত । এইখানে ভাষার স্বাধীনতা । ফেয়ারদিনাঁ এটাকে বলেন কথার যদৃচ্ছা ।

ব্যাপারটা খালি এ নয় ভাষাভেদে একই তাৎপর্যের ধ্বনিরূপ পালটে যায় । কথাগুলোই আলাদা । বাঙলা 'কাঁটা, হাড়' কথা-দুটোর সঙ্গে ইংরিজি 'থর্ন, বোন' মিলিয়ে দেখুন —

	ফুলের	মাছের	জন্তুর
বাঙলা	কাঁটা	কাঁটা	হাড়
ইংরিজি	থর্ন	বোন	বোন

বাস্তবের একটা করে টুকরোর সঙ্গে আওয়াজের একটা করে খণ্ডের বিয়ে হয়ে কথা তৈরি হচ্ছে দুই ভাষাতেই । কিন্তু শুধু আওয়াজই আলাদা নয় । বাস্তবকে ভাগ করে নেওয়ার ধরনটাও ভিন্ন । কাঁটার সঙ্গে হাড়ের যেখানে তফাত, থর্ন আর বোনের সীমারেখা ঠিক সে জায়গায় নয় । এটাই 'কথার যদৃচ্ছা'র, ভাষার স্বাধীনতার, গভীরতর মানে ।

স্বাধীনতা মানে স্ব-অধীনতা । বাংলার স্ব অর্থাৎ নিজস্বতা এই যে, ধরুন, বাংলায় ভেজিটেবল বা লেগ্যুম না বলে তরকারি বলা হয় । কিন্তু একবার সেই স্ব ঠিক হয়ে যাওয়াতে তার অধীনে তার নিয়ম মেনেই চলছে বাঙালিরা । তরকারি বোঝাতে আমরা একবার পুনশ্চ, একবার দ্রিঘাংচু, একবার চাণক্য বলি না । (কেন, সবজি বলি তো ? ঠিকই, কিন্তু যা খুশি তাই বলি না, সেই কথা হচ্ছে ।) তরকারি বলতে আমরা একবার রাস্তা, একবার ডিম, একবার আকাশ বুঝি না । যথাযথ তরকারিই বলি এবং বুঝি । এই যথাযথর ব্যাপারটাই কথার আবশ্যিকতা ।

বিভিন্ন পরিবেশে যে তরকারি কথাটা একই থাকে, তার উচ্চারণ আর তার মানে যে যথানিয়মে মুদ্রার দু' পিঠের মতো অবিচ্ছেদ্য রয়ে যায়, এই অবিকল আবশ্যিকতার একটা জরুরি দৃষ্টান্ত পাই জোটবাঁধা কথায় । 'তরকারি' তো একা কথা, 'তরকারি ভালো হয়নি' জোটবাঁধা কথা, 'লুচির সঙ্গে তরকারি না হলে চলে না' আরেকটা জোটবাঁধা কথা । এই শেষের দুটো জোটে প্রায় সবই আলাদা । মিল আছে 'তরকারি' কথাটাতে, দুই জোটেরই সদস্য সে । তরকারি ভালো হয়নি বোঝাতে লোকে যদি বলত 'জগঝম্প', এবং লুচির সঙ্গে তরকারি না হলে চলে না বোঝাতে 'সংকর্তব্যবিমূঢ়', তাহলে স্বীকার

করতেই হতো যে তার আবশ্যিকতা মেনে চলার রেওয়াজ নেই, সবই ভাষার খামখেয়াল। কিন্তু ভাষা তো সেরকম নয়। একা কথারা দরকার মতো জোটই বাঁধে, জটিল-মানে-ওয়ালা কোটি কোটি একা-কথা গজিয়ে ওঠার বদলে।

তা, জোটবাঁধা কথা আর একা কথা তো ঠিক একভাবে কাজ করে না। কোনো একটা ভাষায় একা কথার সংখ্যা যতই বেশি হোক খুব বেশি না—দশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার, এইরকম। অভিধানে ধরানো যায়। কিন্তু জোটবাঁধা কথা তো সত্যিসত্যিই অগুনতি। যত লম্বা তালিকাই করুন থই পাবেন না। কাজেই সে চেষ্টাও করে না কেউ। একটা ভাষার বর্ণনা দেবার সময় লোকে দু'রকম কাজ করে — ক. সেই ভাষায় যত একা কথা আছে তার অল্পবিস্তর সম্পূর্ণ তালিকা দেয়, সেটাকে বলে অভিধান; খ. একা কথারা কীভাবে জোট বাঁধে তার রীতির কথা বলে, সেটার নাম ব্যাকরণ।

'তরকারি'র মানে আর উচ্চারণ নানারকম জোটে এক থাকে, এই নিয়ে এক্ষুনি যে কথাটা হচ্ছিল তার সূত্রে বলা চলে, ভাষার আবশ্যিকতার অন্যতম প্রধান প্রকাশ দেখি একা কথাদের জোট বাঁধার ধরনে। খালি 'তরকারি'র দিকে তাকালে আপনি প্রধানত এটাই খেয়াল করবেন যে ধ্বনি-তাৎপর্য-মেলানো এই রূপ নির্বাচনের ব্যাপারে বাংলা তার স্বাধীনতা খাটিয়েছে। তরকারিকে 'তরকারি' বলার কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু, জোটবাঁধা কথার দিকে তাকান এবার।

১. তরকারি ছাড়া　　　　২. তরকারি সমেত
৩. মাংস ছাড়া　　　　৪. মাংস সমেত

'তরকারি' বলার কোনো কারণ না থাকলেও 'তরকারি ছাড়া' বলবার কিন্তু দরকার আছে। ১.-এর আরম্ভে ২.-এর প্রথম অংশের সঙ্গে মিল চাই, আর ৩.-এর আরম্ভের সঙ্গে চাই তফাৎ। ১.-এর শেষ ভাগে ২.-এর দ্বিতীয়ার্ধের সঙ্গে তফাত চাই, আর ৩.-এর শেষের সঙ্গে চাই মিল। এইসব মিল আর তফাত চাইলে তো ১.-এর জোটে প্রথম সদস্য হিসেবে তরকারিকে এবং দ্বিতীয় সদস্য হিসেবে ছাড়াকে বাছতেই হবে। এখানে বাংলার স্বায়ত্তশাসনের শাসনগত দিকটা দেখতে পাচ্ছি।

জোটবাঁধা কথায় যদি ভাষার শাসনের প্রকাশ দেখি, আর একা কথায় ভাষার স্বাধীনতার প্রকাশ, তাহলে বলতে পারি, একটা ভাষার ব্যাকরণে তার নিয়ম অর্থাৎ আবশ্যিকতার খবর থাকবে, আর অভিধানে পাব একা কথাদের তালিকা—যেসব অকারণ, বেনিয়মী রূপ স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে তাদের তালিকা, যেমন 'তরকারি', 'মাংস', 'ছাড়া' 'সমেত'। জোটবাঁধা কথাদের তো তালিকা সম্ভব নয়, আর একা কথাদের বেলায় তালিকাই একমাত্র গতি; সেজন্যেই এক যাত্রায় পৃথক ফল।

কথাদের জোটবাঁধার নিয়ম নিয়ে ফেয়ারদিনাঁ সামান্য কিছু কিছু সূত্র ধরিয়ে দিয়ে গেছেন। যেমন, উনি খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন জোটের দুই আয়তন বা ডাইমেনশনের কথা।

৫. { { ফিল্ম শেষ হওয়ার / নটার } পরে / সঙ্গে-সঙ্গে } ট্রামে ভিড় বাড়ল।

৬. (ক) ফিল্ম শেষ হওয়ার পরে ট্রামে ভিড় বাড়ল ।
(খ) ন'টার পরে ট্রামে ভিড় বাড়ল ।
(গ) সঙ্গে-সঙ্গে ট্রামে ভিড় বাড়ল ।

দু-রকম সম্পর্কের নমুনা আছে এখানে—একত্রতার সম্পর্ক আর সাম্যের সম্পর্ক । ব্যাকরণের দিক থেকে দেখলে ক. -এর 'ফিল্ম শেষ হওয়ার' আর খ. -এর 'নটার' পরস্পরের সমান; ওদের সাম্যের সম্পর্কটা দেখানো রয়েছে ৫.-এ । ক.-এ একত্র হয়েছে 'ফিল্ম শেষ হওয়ার' আর 'পরে'; ওদের একত্রতার সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট । একই জোটে 'ফিল্ম শেষ হওয়ার' বসেছে 'পরে'-র আগে—এটাই ওদের একত্রতা ।

৫. -এর জ্যামিতিতে দুই আয়তন ধরে কথারা এই দুজাতীয় সম্পর্ক পাতায় : বাঁ-ডানের আয়তনটা একত্রতার সম্পত্তি । ওপর-নিচের মই বেয়ে সাম্যের সম্পর্ক উঠবোস করে । মই না বলে একটা উপাদেয় সংস্কৃত শব্দ লাগাতে পারি : পর্যায় । 'ফিল্ম শেষ হওয়ার পরে', 'নটার পরে' আর 'সঙ্গে-সঙ্গে' এরা তিনজন একই পর্যায়ভুক্ত ; এরা পরস্পরের পর্যায়সঙ্গী । বাঁ-ডানের দিকটা জোটের দিক । গ.-এ 'সঙ্গে-সঙ্গে' আর 'ট্রামে ভিড় বাড়ল ' একই জোটে বাঁধা ; এরা পরস্পরের জোটসঙ্গী ।

একটা ভাষার নানারকম জোটে আর নানা ধবনের পর্যায়ে একা-কথারা কীরকম সঙ্গ দেয় পরস্পরকে—এইটে সেই ভাষার সংগঠন অর্থাৎ স্ট্রাকচারের প্রশ্ন। এই প্রশ্ন পর্যন্ত নির্বিশেষ ভাষাবিজ্ঞানকে ঠেলে নিয়ে এসেছেন ফেয়ারাদিনাঁ দ্য সোস্যুর । এই শতাব্দীর ভাষাবিজ্ঞানের সর্বত্র ওই সংগঠনচিন্তার রেশ রয়ে গেছে ।

কিন্তু ভাষার এরকম ছবিকে কোনো ভারতীয় খুশি মনে স্বাগত জানাতে পারে কি ? ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়'তে বাক্য আর পদের আলোচনা ছিল । সে বইটা তো নির্বিশেষ ভাষাবিজ্ঞান নিয়েই লেখা । বাক্য আর পদ নিয়ে ফেয়ারাদিনাঁ কিছু বললেন না তো । পদকে একা কথার সমান ভাবা, কিংবা বাক্যকে জোটবাঁধা কথার সমান ভাবা, ঠিক নয় । 'তরকারি সমেত' জোটবাঁধা কথা, কিন্তু বাক্য নয় । 'নির্ভরযোগ্য' পদ, কিন্তু একা কথা নয়— 'নির্ভর' আর 'যোগ্য' জোট বেঁধেছে পদটাতে । 'লোকগুলোর' 'গুলো' একা কথা, কিন্তু পদ নয় ।

একত্রতা আর সাম্যের আওয়াজ তুলে কী ক'রে বাক্য আর পদের স্বরূপনির্দেশ হতে পারে, সংগঠনী ভাষাবৈজ্ঞানিক মহলে তা বার করবার চেষ্টা হয়েছিল বিস্তর । সাফল্য জুটল অল্প । বাক্যকে ঠিকমতো গুরুত্ব দিতে প্রথম পারল সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান, যার নেতা নোআম চমস্কি ষাটের দশকে ভাষাচিন্তার ধারা অনেকটা পালটে দিয়েছেন । পদের যে মর্যাদা পাওনা তাকে তা দেবার চেষ্টা করেছেন সঞ্জননী বিজ্ঞানীরাই কেউ কেউ । তাঁদের নেত্রী জোন ব্রেজনান । সঞ্জননী চিন্তার এই বিশেষ ধারা লেক্সিকালিস্ট বা পদাশ্রয়ী বলে পরিচিত। পদাশ্রয়ী চিন্তা এখনও শিশু । জ্যাকেনডফ, অ্যারোনফ, গ্রিম্‌শ, ব্রেম ইত্যাদির ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠা সূত্র জড়ো করে, ব্রেজনানের নিজের কাজের ভিত্তিতে এবং প্রধানত তাঁরই নেতৃত্বে, সঞ্জননী ভাষাজিজ্ঞাসার এই বিশিষ্ট ঘরানা নিজের পথ খুঁজে নেওয়া শুরু করে ১৯৭৫-এর পর ।

কম্রী, কীনান, পোস্টাল, পার্লামাটার, জনসন ইত্যাদি যেসব ভাষাবিজ্ঞানী কাজ করছিলেন সঞ্জননী চিন্তাধারার একটু তফাতে থেকে—নানা কারণে যাঁদের কাজ হালের

ভারতীয় পড়া-শোনার এপর বেশ ছায়া ফেলেছে—তাঁদের গবেষণারীতির সঙ্গে পদাশ্রয়ীদের মিল অনেকটাই। কম্ব্রী-জনসনরা নিজেদের কাজের ধরনটাকে বলেন রিলেশনাল অর্থাৎ যোগাচারী। যোগ তো সচরাচর পদের সঙ্গে পদেরই হয়। যোগাচারী আর পদাশ্রয়ী, দুই ঘরানাই কর্তা কর্ম ইত্যাদি কারক নিয়ে ভাবেন ; মিলটা প্রধানত এখানে। এবং এতে করে পাণিনীয় রীতির কাছাকাছি চলে এসেছেন দু' দলই।

র‍্যনে

এই আবহে যাঁদের ভাষাজিজ্ঞাসা আত্মপরিচয় খুঁজছে তাঁদের ভালো লাগার কথা ফেয়ারদিনাঁ দ্য সোস্যুরের ভাই র‍্যনে-কে। র‍্যনেও একেবারে অখ্যাত নন। প্রবাদের মুখে ছাই দিয়ে এই যোগী নিজের গাঁয়ে ভিখ পেয়েছেন। আন্তর্জাতিক ভাষা এস্পেরান্তোর র‍্যনে ছিলেন নামজাদা বৈয়াকরণ। ১৯১০ সালে উনি এস্পেরান্তো পদের নির্মাণরীতির যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার ভিত্তিতে র‍্যনে ১৯১৫ সালে এক চূড়ান্ত বিবরণ পেশ করেন। তৎকালীন বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর গৃহীত সেই দলিল এখনও এস্পেরান্তো ব্যাকরণের স্বীকৃত ভিত্তি। দলিলের নাম 'এস্পেরান্তো পদতত্ত্বের মূলনীতি'।

নির্বিশেষ ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় এ ধরনের দলিলকে অবান্তর মনে হতে পারে। অনেক পাঠক ভাববেন, এস্পেরান্তোর মতো ভাষাবিশেষে পদের অঙ্গসংস্থান যতই মনোযোগ্য হোক না কেন, সে জাতীয় অনুসন্ধান থেকে এমন কোনো সিদ্ধান্ত বেরবে না যার দাম আছে সব ভাষায়, চিরকাল। একবার আপত্তি তোলা আরম্ভ করে পাঠক সেই উৎসাহে আরো বলতে পারেন, পদ পদ করে এত মাতামাতি ভালো নয়, কারণ গ্রীনল্যাণ্ডীয় এস্কিমোর মতো কোনো কোনো ভাষায় স্ফীতকায় 'পদ' প্রায় বাক্যের সমান জটিল; পদ আর বাক্যের পার্থক্যের আলোচনা আদপেই নির্বিশেষ নয়।

গ্রীনল্যাণ্ডীয় আপত্তি তুলনেওয়ালা পাঠক নেহাৎই বৈনাশিক। তিনি বৈজ্ঞানিক চিন্তার অসম্ভাবনা প্রতিষ্ঠা করতেই আগ্রহী। তাঁর নির্বাসন হওয়া উচিত এমন গ্রহে যেখানে নির্বিশেষত্বের দোহাই দিয়ে প্রত্যেকটি স্থানীয় প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে গ্রহসুদ্ধু সকলের ভোট চাওয়া হয়। এস্কিমোর মতো স্ফীতপদ ভাষা অল্পই আছে। ব্যতিক্রমী ভাষারা কেন ব্যতিক্রম এই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখার মতো। কিন্তু, যেসব ভাষায় বাক্য আর পদের স্পষ্ট দ্বৈত আছে, সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখে পদ কী জিনিস তা যদি ভালো করে জেনে নিই, তাহলেই তো কোথাও কোথাও দ্বৈতটা কেন দুর্বল বা মৃতপ্রায় সেটা জিগেস করতেও সুবিধে হবে, তাই না ?

বৈনাশিকরাও উপকারী। আপত্তিটার জবাব দিতে গিয়ে দুয়েকটা কথা পরিষ্কার হলো। বেশি বেশি নির্বিশেষ হলে বৈজ্ঞানিকের বিপত্তি ঘটে। ফেয়ারদিনাঁর সেই বিপত্তি ঘটেছিল, সংগঠনী ভাষাবিজ্ঞানীরাও তাতে অংশীদার ছিলেন। ওঁরা ঠিক করেছিলেন, নির্বিশেষ ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র হিসেবে খালি তাই নেবেন যা সমস্ত ভাষার বেলায় খাটে। ফলে কয়েকটা স্পষ্ট অথচ অগভীর ধারণাকে ওঁরা ঘরে স্থান দিলেন। পদের কপালে জুটলো নির্বাসন। ওঁরা ভেবেছিলেন সরলতর ধারণার সাহায্যে বুঝি পদ ব্যাপারটা তৈরি করে নেওয়া যায়। দেখলেন তা যায় না। ভেবেছিলেন 'কথা', 'একা কথা' এগুলো অন্তত

তামাম ভাষায় পাওয়া যাবে। দেখলেন সে ধারণাও ভুল। ওই এস্কিমো-টেস্কিমোতেই আটকায়।

নির্বিশেষ গবেষণাকে একেবারে নাকচ করার কোনো মানে হয় না। একটু রয়ে-সয়ে কাজ চালাতে হবে, এই আর কী। আর, বৈজ্ঞানিক কর্মের অন্য পথ যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের ঠিক অতখানি চট্ ক'রে উড়িয়ে দেওয়া বোধহয় উচিত হবে না।

ফেয়ারদিনাঁর অম্বিষ্ট ছিল নির্বিশেষ ভাষাবিজ্ঞান। কোনো ভাষার বিজ্ঞান নয় ব'লেই তার সব ভাষায় চলবার কথা। র‍্যানে খাটছিলেন একটা নিরপেক্ষ অর্থাৎ রফা করা ভাষার তত্ত্বনির্মাণে। সে ভাষার রূপে অনেক উৎসের উপাদান নতুন সংহত বন্ধনে যুক্ত। কাজেই তার গঠনে কোনো বিশেষ উৎসের একপেশে প্রভাব নেই। স্বচ্ছ চেহারায় দেখতে পাই এমনসব বিন্যাস বা নিয়ম যা অনেকগুলো উৎস-ভাষাতেই অল্পবিস্তর স্পষ্টতায় হাজির রয়েছে। ফেয়ারদিনাঁর প্রস্তাবিত কর্মরীতি থেকে সর্বভাষা সমন্বিত কোনো আহামরি তত্ত্ব বেরোয়নি। ওঁর রীতির ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে যেসব আধুনিক পণ্ডিত সচেষ্ট তাঁদের সঙ্গে র‍্যানের সুর মিলছে আশ্চর্যরকম। দেখাই যাক না র‍্যানের মূল কথাগুলো কী ছিল।

একই এস্পেরান্তো শব্দের বিভক্তি পালটে বিশেষ্য, বিশেষণ আর ক্রিয়া এই তিন জাতির মধ্যে যাওয়া-আসা করা যায়। এই যাতায়াত নিয়ে র‍্যানে ভেবেছেন প্রচুর। প্রক্রিয়াটার নমুনা দিই। Helpi 'সাহায্য করা' এই ক্রিয়া থেকে চলে যেতে পারেন বিশেষ্যে —helpo 'সাহায্য'—অথবা বিশেষণে : helpa 'সহায়ক'। Honesta হোনেস্তা 'সৎ' এই বিশেষণ থেকে আসতে পারেন honesto 'সততা' এই বিশেষ্যে, কিংবা ক্রিয়ায় : honesti 'সদাচরণ করা'। Bruo ব্রুয়ো 'আওয়াজ' থেকে রওনা দিলে পৌঁছবেন এই দুয়ের একটাতে : brui ব্রুয়ি 'আওয়াজ করা', আর. brua ব্রুয়া 'সশব্দ'।

বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া, এদের এক জাত থেকে বেজাতে পরিবর্তনের এই ব্যবস্থা —স্রেফ বিভক্তি পালটানো। অর্থের সূক্ষ্ম বর্ণভেদ বোঝাতে প্রত্যয় চলে আসে বিভক্তির ঠিক আগে। Bru-a 'সশব্দ' কথাটাতে বিভক্তি হচ্ছে a: bru-em-a 'আওয়াজপ্রবণ' কথাটার em প্রত্যয় প্রবণতা বোঝাবার জন্যে বিভক্তির আগের জায়গাটা দখল করেছে। তেমনি bruantaয় ant প্রত্যয় থাকায় এর মানে আওয়াজ-করন্ত, আওয়াজ-করছে এমন। Bruanta tramo, আওয়াজ-কবছে-এমন-ট্রাম। তাহলে em, ant হচ্ছে প্রত্যয়, আর o, a, i বিভক্তি। কয়েকটা প্রত্যয়ের সঙ্গে র‍্যানে বিভক্তির বিশেষ সম্পর্কের কথা খেয়াল করিয়ে দিয়েছিলেন। একটা উদাহরণ দিই।

Honesta 'সৎ' থেকে রওনা হয়েছেন ব'লে সোজা honesto 'সততা' এই ভাববাচক বিশেষ্যে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু brua 'সশব্দ' থেকে ওভাবে bruoয় গিয়ে 'সশব্দতা' পাবেন না। কারণ brua কোনো টার্মিনাস নয়। ও স্টেশনটা মাঝখানে। Bruo ই টার্মিনাস, bruo মানে শব্দ। তাহলে কী করা? সশব্দতার এস্পেরান্তো কী? Brueco ব্রুয়েৎসো; ec প্রত্যয়টা সশব্দতার তায়ের মতন। ইচ্ছে করলে honestoকেও honesteco বলতে পারেন, বাংলায় অনেকে সখ্য বা প্রসারকে যেভাবে সখ্যতা বা প্রসারতা বলে। তবে, সখ্যতা প্রসারতার তায়ের মতোই, honesteco-র ec প্রত্যয়টা অতিরিক্ত—ওটা না রাখলেও চলে। সশব্দতার তা আর brueco-র ec কিন্তু অপরিহার্য। বাদ দিলে কথার

মানে পালটে যাবে । তার কারণ, র‍্যনের মতে, brueco 'সশব্দতা' কথাটাতে ec বলে দিচ্ছে যে আপনি bruo 'শব্দ' থেকে একবার brua 'সশব্দ'তে গিয়ে তারপর বিশেষ্য জাতিতে ফিরে আসছেন । আর honesta 'সৎ' নিজেই যেহেতু যাত্রা শুরুর জায়গা, সেইজন্যে, 'সততা' অর্থে honesteco বা honesto যেটাই বলুন, আপনি যে honesta থেকে বিশেষ্য জাতিতে আসছেন এটা আলাদা করে বোঝাবার জন্যে ec-এর মতো কিছু লাগবে না। আপনি এখানে ec বলতেও পারেন, না বললেও চলে ।

তথ্য থেকে তত্ত্ব আলাদা করার কাজে এবার হাত না দিলে এমন জট পাকিয়ে যাবে যে বলবার নয় । র‍্যনে দ্য সোস্যুর কিছু ভাবার আগেই এস্পেরান্তোভাষীরা সশব্দতাকে সবসময় brueco এবং সততাকে কখনো honesto কখনো বা honesteco বলতো। ওজন্যে র‍্যনের তত্ত্ব দায়ী নয় । ওটা এস্পেরান্তো ভাষার তথ্য । তত্ত্বের ভূমিকা এইখানে —র‍্যনে খেয়াল করিয়ে দিলেন যে সততার আরম্ভ বিশেষণজাতীয় honesta-য়, আর সশব্দতা রওনা হয়েছে বিশেষ্যজাতীয় bruo থেকে । র‍্যনে বললেন সেজন্যেই honesto honesteco দুটোই হয় অথচ brueco-র ec অপরিহার্য । র‍্যনের কাজে তথ্য আর তত্ত্বের সম্পর্কের এদিকটা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। এস্পেরান্তো যেভাবে এমনিতেই চলছে তার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটা কী—এই ছিল র‍্যনের প্রশ্ন । ফতোয়া জারি করতে বসেননি। যা চলছে তার ব্যাখ্যা খুঁজছিলেন ।

এমনিতেই এস্পেরান্তোয় প্রবণ-অর্থে ema ব্যবহৃত হয় স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে। আলাদা করে eco-রও ব্যবহার আছে, eco মানে বৈশিষ্ট্য । তাত্ত্বিকের একটা কাজ হলো এরকম খবরের প্রতি সদ্‌বিচার করা । স্পষ্টতই এই ভাষায় প্রত্যয়রাও শব্দের মতো। সব ভাষায় এমন নয় । বাংলায় তো বলি না 'ওই শহরের তিনটে তা—সশব্দতা, বর্ণিলতা, আগ্নেয়তা'। ইংরেজিতেও অচল the three nesses of that city—noisiness, colourfulness, fieriness। এস্পেরান্তোয় কিন্তু la tri ecoj de la urbo—brueco, koloreco, fajreco খুবই স্বাভাবিক শুনতে : লা ত্রি এৎসোই দে তিয়ু উর্বো—ব্রুয়েৎসো, কোলোরেৎসো, ফাইরেৎসো ।

এস্পেরান্তোর এই বৈশিষ্ট্যের ওপর র‍্যনে জোর দিয়েছিলেন । সেইসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিল ওঁর সংযম । প্রত্যয় শব্দের মতো, এ থেকে র‍্যনে অকস্মাৎ এই কল্পনায় পৌঁছে যাননি যে শব্দও প্রত্যয়ের জায়গা নিতে পারবেই পারবে । যেমন eco প্রত্যয়ের মোটামুটি সমার্থক শব্দ kvalito; la tri kvalitoj = la tri ecoj । তাই বলে আগ্নেয়তা অর্থে fajreco-র বদলে কিন্তু fajrkvalito বলা চলে না । ফাইর্‌ক্‌বালিতো উচ্চারণের মুশকিল তার একমাত্র কারণ নয়—ও বাধাটা চলে যায় fajrokvalito করে দিলেই । ব্যাপারটা হলো, fajrkvalito মানে 'আগ্নেয়তা' নয়, অন্য মানে—'আগুনের গুণ বা উৎকর্ষ' । Kvalito এখানেও তার দস্তুরমতো শব্দমর্যাদা বজায় রাখছে । Eco-র মতো নিছক প্রত্যয়ের কাজ সে করবে না । র‍্যনে এদিকে নজর রেখেছিলেন । Kvalito সর্বদাই স্বতন্ত্র বিশেষ্য । Eco স্বতন্ত্র শব্দরূপে ব্যবহৃত হলে সেইরকম, নইলে সে অস্বতন্ত্র বিশেষ্য—বিশেষ্যজাতীয় প্রত্যয় ।

র‍্যনে দ্য সোস্যুরের তত্ত্বের আসল উপাদানগুলো আপনাদের দেখা হয়ে গেছে। পদের অঙ্গেরা তিন শ্রেণীর : বিভক্তি, প্রত্যয়, শব্দ । শ্রেণীদের মধ্যে 'যাতায়াত' আছে

এই অর্থে যে, কোনো কোনো প্রত্যয় (যেমন ec) বিভক্তিদের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত (bruo থেকে brua হয়ে brueco), এবং অনেক প্রত্যয় দস্তুরমতো শব্দের কাজ করতে পারে (ema, eco)। যে কোনো বিভক্তি বা প্রত্যয় বা শব্দ জাতিবিশেষের নাগরিক। বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া—এই তিন প্রধান জাতিকে নিয়েই র‍্যানে ভেবেছেন সবচেয়ে বেশি। তিন জাতির মধ্যে পদের যাওয়া-আসা ঘটে বিভক্তি পালটে এবং দরকারমতো প্রত্যয় জুড়ে ।

পদের ভিতরে এই যে সংসার, এর বর্ণনা দিতে গিয়ে র‍্যানে লক্ষ করেছিলেন যে অঙ্গে অঙ্গ জুড়ে পদ তৈরির কাজটার সঙ্গে পদে পদ অন্বিত করে বাক্যবন্ধ রচনার আংশিক মিল আছে, কিন্তু একটা বিরাট তফাত । মিল আর তফাত দুটোই দেখবেন এই দৃষ্টান্তে :

৭. tagnokto তাগনোক্তো 'এক-দিন-এক রাত, পুরো (চব্বিশ ঘণ্টার) দিন'

৮. tago kaj nokto তাগো কাই নোক্তো 'দিন আর রাত'

দু' জায়গাতেই দিনবাচক আর রাতবাচক কথা জুড়ে 'দিন আর রাত' -বাচক কথা বানানো যাচ্ছে, এটাই মিল । আর তফাত এইখানে, ৭. -এর অর্ধস্ফুট tag-উপাদান ৮.-এ গিয়ে tago অর্থাৎ বিভক্তিওয়ালা পদ হিসাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, তাকে তাই বিশেষ অন্বয়ী শব্দ kaj 'আর' যতক্ষণ nokto-র সঙ্গে না বাঁধছে ততক্ষণ সে ধরা দেবে না ।

এই উদাহরণটুকু দেখে হয়তো পুরো ধরতে পারলেন না পদের ভিতরকার সংসারের নিয়ম আর পদে পদে সহকর্মের নিয়ম কতটা আলাদা । ৯.-১০. দেখুন :

৯. metal-simila মেতালসিমিলা 'ধাতু-সদৃশ'

১০ simila al metalo সিমিলা আল মেতালো 'ধাতুর মতো'

এবার খালি যে metal-এর বদলে metalo হচ্ছে আর তাকে simila - র সঙ্গে অন্বিত করার জন্যে al আসছে তাই নয়, 'ধাতু' আর 'সদৃশ' কথা-দুটোই ৯. থেকে ১০.-এ যেতে জায়গা বদলাচ্ছে । ধাতুবাচক শব্দের স্থান ৯.-এ প্রথম কিন্তু ১০.-এ দ্বিতীয় । দেখুন কত তফাত পদের সঙ্গে বাক্যবন্ধের । তার কারণ, বাক্যবন্ধে সবাই পদ । কেউ কারও কথা শুনতে বাধ্য নয় । প্রত্যেকে বিভক্তির তকমা এঁটে স্বমর্যাদায় ঘুরছে ফিরছে। ছোটো ছোটো অব্যয়রা এক পদকে আরেক পদের সঙ্গে অন্বিত করে দেয় । কিন্তু পদের ভিতরে শাসনটা অনেক বেশি বজ্র বজ্র টাইপের—এক অংশের খাতিরে আরেক অংশ অসম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করছে এটাই রেওয়াজ । তফাত তাই । আর মিল এই জন্যে যে, হাজার হোক, সমাসও জোটবাঁধা কথা, বাক্যবন্ধও তাই । জোট-বাঁধার কিছু কিছু নিয়ম তো সমান হবেই ।

র‍্যানের ভাবনার খুঁটিনাটি নিয়ে এর চেয়ে বেশি কথা বলার দরকার দেখছি না । ওঁর সঙ্গে ফেয়ারদিনাঁর কাজের তুলনার দুয়েকটা সূত্র ধরিয়ে দিই বরং ।

ফেয়ারদিনাঁ সব ভাষার ন্যূনতম নির্বিশেষ গুণাবলীর কথা বলতে গিয়ে যদৃচ্ছা আর বৈচিত্র্যের ওপর এত জোর দিয়েছিলেন যে বাক্য আর পদের, সংস্থানবর্ণনা তো দূরের কথা, সংজ্ঞার্থই তাঁর তত্ত্বে দাঁড় করানো যায়নি (পদের বেলায় এটা আরম্ভেই স্পষ্ট ছিল, বাক্যের বেলায় স্পষ্ট হয় পরে) । র‍্যানে তার বদলে বিশ্লেষণ দিয়েছেন একটা ভাষার- -নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ভাষা এস্পেরান্তোর । সেই বিশ্লেষণে পদের আর বাক্যবন্ধের বিষয়ে যেসব খবর পাওয়া গেল তা খুবই উন্নত নির্বিশেষ খবর । ১৯৮০-তে অনেকে

গবেষণা করছেন যাঁরা সেসব খবর শুনলে স্বীকার করবেন যে র‍্যানের তত্ত্ব আমাদের যুগের চেয়েও উন্নত ।

দু জাতি যখন বাণিজ্যসূত্রে যুক্ত হতে গিয়ে এক জাতির কথায় আরেক জাতির ব্যাকরণ মিশিয়ে, ভেঙে, বাণিজ্যিক বা বাজারি বুলি তৈরি করে, এবং পরে সেই বুলি কোনো সম্প্রদায়ের দস্তুরমতো ভাষায় পরিণত হয়, সেই প্রাক্তন-বাজারি ভাষাকে বলে ক্রিওল । এস্পেরান্তোকে কেউ কেউ বলেছেন ঘরে বসে বানানো ক্রিওল । যে কোনো ক্রিওলেই ব্যাকরণের গঠন খুব পরিষ্কার দেখায়, কারণ যোগাযোগের তাগিদে অনেক ফালতু উপাদান ঝরে গিয়ে খালি যারা জরুরি তারাই বাকি থাকে । এস্পেরান্তোতেও এই সুবিধেটা আছে । সেইজন্যে এস্পেরান্তো বিশেষ ভাষা হলেও সেখানে খুঁড়লে এমনসব তত্ত্ব মেলে যার সাহায্যে আরো অনেক ভাষার—পদওয়ালা যাবতীয় ভাষার—ব্যাকরণের নানা সমস্যার অল্পবিস্তর সুরাহা হতে পারে । এটা র‍্যানের সাফল্যের অন্যতম কারণ ।

স্বতঃস্ফূর্ত জন্ম নেয় যেসব ক্রিওল তাদের মতোই এস্পেরান্তোও বাক্যবন্ধ আর পদের তফাত সযত্নে রক্ষা করেছে । অথচ দেখতেই পাচ্ছি সমস্ত উটকো উপদ্রব ঝেড়ে ফেলতে পারলেই ক্রিওলের শান্তি । ফেয়ারদিনাঁর তত্ত্ব যদি যথেষ্ট হতো, যদৃচ্ছরূপ একা কথাদের জোট বাঁধার একত্রতায় সাম্যে মেলানো সূত্রই যদি ভাষার আসল কথা হতো, তাহলে তো ঠিক ক্রিওলদেরই হওয়া উচিত ছিল এমন ভাষা যেখানে পদ বলে কিছু থাকবেই না, যেখানে শব্দে শব্দ জুড়লে পদ হচ্ছে না বাক্যবন্ধ হচ্ছে জিগেস করবারই কোনো মানে হবে না । অথচ তা কিন্তু নয় । মারাঠি ভাষাকে ক্রিওল ভাবেন কেউ কেউ; মারাঠিতে পদ আর বাক্যবন্ধের খুবই তফাত ।

ভাষাকে ফেয়ারদিনাঁর তত্ত্বে যতখানি স্বাধীনতা দেওয়া ছিল, ততটা সে ব্যবহার করে না । রোগা লোককে মোটা লোকের আলখাল্লা পরিয়ে রেখে কী লাভ ? তার চেয়ে বরং ফেয়ারদিনাঁর শিক্ষার সঙ্গে র‍্যানের শিক্ষাও গ্রহণ করে বলি, কোনো কোনো কথা পদ, পদ তৈরির জন্যে বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া এই তিন জাতি আর শব্দ প্রত্যয় বিভক্তি এই তিন শ্রেণীর হস্তক্ষেপ লাগে—কোনো ভাষায় অল্প, কোনো ভাষায় বিস্তর । একা পদেরা জোট বাঁধলে বাক্যবন্ধ হয়, তাদেরও বাঁধনে আইন আছে, অন্যরকম আইন ।

একা কথাটি ফুরলো, জোটের গাছটি মুড়লো ।

আরতি সেন

ইভান ইলিচের শিক্ষাচিন্তা

এক

আমাদের সমসাময়িকদের ভিতরে যাঁদের সমাজচিন্তা পরবর্তী দশককে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে বলে আশা করা যায়, ইভান ইলিচ তাঁদের অন্যতম। ইভান ইলিচ ব্যক্তি স্বাধীনতা, সাম্য ও সহযোগিতাভিত্তিক মুক্ত সমাজচেতনার উদ্‌গাতা। সমস্ত-রকমের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি যা মানুষের স্বাধিকারকে বিপন্ন করে, তার বিরুদ্ধে তাঁর শাণিত যুক্তিগুলি তীক্ষ্ম খড়্গের মতো। মানবতাবোধের গভীর উপলব্ধিতে তাঁর কল্পনা ও ভাষা নিষিক্ত। অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বকে ঘিরে তাঁর চিন্তার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। মার্ক্সবাদ ও গান্ধীবাদ—এই দুই মতবাদের দ্বারাই তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত, যদিও তাঁর নিজের সমাজদর্শন এই দুই 'বাদ' থেকেই স্বতন্ত্র। আধুনিক জীবনে যন্ত্রের সর্বগ্রাসী প্রভাব তাঁর সংবেদনশীল মনকে অহরহ ক্লিষ্ট করে। কিন্তু তাঁকে যন্ত্রবিরোধী এবং আধুনিকতাবিমুখ মানুষ বলা যায় না কোনোক্রমেই। যন্ত্রযুগের অবদান এবং যন্ত্রের অপরিহার্যতাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি এবং আশা সেই ভবিষ্যতের দিকে যে ভবিষ্যতের মানুষ 'উৎপন্নের চাইতে মানুষকে বেশি ভালোবাসে।'

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করে ইভান ইলিচ লক্ষ করেছেন যে আদিম মানুষের কাছে জগৎ ছিল ভাগ্য, ঘটনা এবং প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরবর্তী যুগে সভ্য, সৃষ্টিশীল ও আবিষ্কর্তা মানুষ ভাগ্যকে, প্রকৃতিকে ও পরিবেশকে জয় করতে শিখল। আর আধুনিক যুগে মানুষ তার জগৎকে, তার পরিবেশকে বদলে দিতে দিতে এমনই একটা জায়গায় পৌঁছেছে যে, নিজের সৃষ্ট এই জগতে খাপ খাওয়াবার জন্য নিজেকেই বদলে ফেলতে হয়েছে অনেকখানি। মানুষ যা চায়, তাই উৎপাদন করতে পারে, এই প্রত্যয় জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে এ ধারণাও দৃঢ়মূল হতে থাকে যে মানুষ যা কিছু উৎপাদন করতে পারে, তার সব কিছুই তার দরকার। যে সর্বশক্তিমান যন্ত্র মানুষেরই হাতেব তৈরি, মানুষ আজ সেই যন্ত্রের দাসে পরিণত হয়েছে। এই যন্ত্র যে বেগে চাহিদা মেটায়, তারও চেয়ে বেগে চাহিদা সৃষ্টি করে—এবং ফলে পৃথিবীর যাবতীয় স্বাভাবিক সম্পদ নিঃশেষিতপ্রায়। যেমন—সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষি-উৎপাদন তিনগুণ বেড়ে গেছে বটে, কিন্তু তার জন্য যে পরিমাণ কীটনাশক ওষুধ, সার, জল ও বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করতে ও খরচ করতে হচ্ছে, তার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের উৎসেই টান পড়েছে। খনিতে তেলের ঘাটতি, বাতাসে অক্সিজেনের ঘাটতি, সমুদ্রের জল আজ মারাত্মকভাবে দূষিত।

ব্যক্তি-মানুষের শুভবুদ্ধির ওপর আমাদের আস্থা বিনষ্টপ্রায়, তার বদলে এসেছে প্রতিষ্ঠানের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা। মানুষ আজ বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ ও

পরিকল্পনাবিশারদদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে । ইভান ইলিচের মতে আধুনিককালে মানুষের মূল্যবোধগুলিই প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত । তার ফলে মানুষের একটা সার্বিক অধঃপতন ঘটেছে । পরিবেশদূষণ, সামাজিক মেরুকরণ (Polarization) এবং চিন্তার বন্ধ্যাত্ব—এই তিনটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে মানুষের এই অধঃপতনের ত্রিধা প্রকাশ।

গোটা সমাজটাই আজ 'প্রতিষ্ঠান'মুখী চিন্তায় এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জীবনদর্শন, জগৎবোধ, ন্যায়-অন্যায়বোধ—এই সবকিছুই আজ স্কুল আর হাসপাতাল—এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে । একজন আধুনিক মানুষের কাছে নিজের চিকিৎসা নিজে করা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক, স্বয়ংলব্ধ শিক্ষামাত্রেই অনির্ভরযোগ্য এবং সরকার অননুমোদিত প্রচেষ্টা মাত্রেই ধ্বংসাত্মক অথবা রাষ্ট্রবিরোধী । প্রতিষ্ঠানের ওপর এই অতিমাত্রায় নির্ভরতা গরীবদের অক্ষমতাবোধকে আরো বাড়িয়ে দেয়, কারণ এর ফলে পারিপার্শ্বিককে নিয়ন্ত্রণ করার অসামর্থ্যের সঙ্গে যুক্ত হয় একটা ব্যক্তিগত অক্ষমতাবোধ ।

ইভান ইলিচ তাঁর *Deschooling Society* গ্রন্থে বর্তমানকালের স্কুলভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে কুঠার হেনেছেন, আর সেই সঙ্গে দিয়েছেন শিক্ষার একটা বিকল্প-ব্যবস্থার প্রস্তাব, যা আগামী দিনের মুক্তসমাজের প্রতিশ্রুতি বহন করে । সারা বিশ্বের শিক্ষানুরাগী মানুষের চিন্তাক্ষেত্রে এই শিক্ষা-প্রস্তাব একটা নতুন আলোড়নের সৃষ্টি করেছে।

ইলিচের প্রধান বক্তব্য হলো এই যে স্কুল-ব্যবস্থা সমাজের ওপর একটা শিক্ষণবিরোধী প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রকৃত শিক্ষার বিস্তারে স্কুল যতই ব্যর্থ হয়েছে ততই মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে শিক্ষা বুঝি সত্যিই একটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া । শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সমস্ত অর্থবরাদ্দকে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিকেও স্কুল গ্রাস করে এবং অন্যান্য যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষাদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে । স্কুল-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে কতগুলি 'মিথ' বা চালু বিশ্বাস। যেমন, ১. অধিকাংশ শিক্ষালাভ হয় শিক্ষাদানের ফলে ; ২. শিক্ষালব্ধ সমস্ত পরিণতিই পরিমাপের বিষয় ; ৩. মূল্যবোধগুলিকে একটি প্যাকেজের মধ্যে একত্রিত করা যায় ; এবং ৪. উঁচু ক্লাশে ওঠা এবং মানসিক শক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটা, এ দুটো সমার্থক।

ইলিচের মতে এর প্রত্যেকটাই হচ্ছে ভ্রান্ত বিশ্বাস। প্রথমত, সত্যিকারের শিক্ষা আমরা স্কুলে নয়, স্কুলের বাইরেই অর্জন করি। বারো বছর ধরে ছাত্ররা স্কুলে যে জ্ঞান ও দক্ষতা আয়ত্ত করে, প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে সময় তার চেয়ে আসলে অনেক কম লাগে, যদি ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ ও চাহিদা যথাযথভাবে জাগ্রত হয় । একটা অর্থপূর্ণ পরিবেশে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়েই প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব এবং প্রত্যেক শিক্ষাই স্বয়ংলব্ধ। কিন্তু স্কুলে আমরা দেখি যে বাঁধাধরা কার্যসূচি আর ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভকে অভিন্ন করে দেখা হয় । স্কুলের নিয়ামকরা তাঁদের বাঁধাধরা কার্যসূচি দিয়ে প্রতিনিয়ত ছাত্রের কল্পনার পরিমণ্ডলকে সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর করে তুলছেন ।

দ্বিতীয়ত, মানুষের ব্যক্তিগত বিকাশ ও পরিণতি পরিমাপের বিষয় নয় । যে শিক্ষার ফলে মানুষ নিজেকে নিত্যনতুনভাবে সৃষ্টি করে চলে, কেমন করে তার পরিমাপ সম্ভব ? অথচ যেহেতু স্কুলে সব কিছুই পরিমাপভিত্তিক-মূল্যায়নের ওপর নির্ভরশীল, তাই ভালো ছাত্ররা পরিমাপনীয় অকিঞ্চিৎকর বিষয়গুলির চর্চাতেই নিজেদের নিবদ্ধ রাখে। পরিমাপের

ঊর্ধ্বে মানুষের যেসব অমূল্য অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি, তা ধরা দিলেও তারা দু' হাতে ঠেলে তাদের সরিয়ে দেয় জীবন থেকে, কারণ যা মাপা যায় না তা তাদের কাছে শুধু যে স্বল্পমূল্য তাই নয়, উদ্বেগজনকও বটে । একবার যদি মাথায় ঢোকে যে সবকিছুই মাপা যায়, তখন জীবনের সবক্ষেত্রেই পরিমাপের আধিপত্য মানুষ মাথা পেতে মেনে নেয় । তখন জাতীয় উন্নয়ন পরিমাপের বিষয়, বুদ্ধিবৃত্তি পরিমাপের বিষয়, এমনকি শান্তিও পরিমেয় !

তৃতীয়ত, মূল্যবোধগুলিকে একটা প্যাকেজের মধ্যে একত্রিত করে একটা নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির মধ্যে দিয়ে তাকে বিতরণ করা যায়—এই ধারণাটারও ঘোরতর প্রতিবাদ করেছেন ইলিচ । যেন শিক্ষা ব্যাপারটা একটা বাজারের পণ্যসামগ্রী । তথাকথিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এই পণ্য প্রস্তুত হয়; শিক্ষকরা বিক্রেতা, ছাত্ররা ক্রেতা । ক্রেতাদের কাছে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করা হবে, তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে পরবর্তী মডেল তৈবি করা হবে—স্কুল পদ্ধতিতে যার নাম 'গ্রেডবিহীন ব্যবস্থা', 'ছাত্রকেন্দ্রিক ব্যবস্থা', 'প্রসঙ্গ-কেন্দ্রিক ব্যবস্থা' বা 'যৌথ-শিক্ষণ ব্যবস্থা' । ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভালো ছাত্ররা যে আজকাল প্রায়ই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তার কারণ প্রধানত এই নয় যে স্কুলগুলি অতিরিক্ত কর্তৃত্বপরায়ণ । বিদ্রোহের প্রধান কারণ এই যে তারা কি শিখবে না শিখবে তা তাদের নিজেদের ইচ্ছা ও রুচির ওপর নির্ভর করে না—মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু তাদের ওপর চাপিয়ে দেয় ।

চতুর্থত,স্কুল প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে যদিও বা জ্ঞানপিপাসা কখনও মনের মধ্যে জাগ্রত হয়, কিন্তু আশ মিটিয়ে জ্ঞান অর্জনের কোনো অবকাশ স্কুলে নেই । সুতরাং জ্ঞানের আনন্দ ছাত্ররা যথেষ্ট পরিমাণে পায় না । একটা বিষয়ের সঙ্গে আর-একটা বিষয় বা আরো অনেক বিষয়, প্যাকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় । টেকস্ট্ বইয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে, জ্ঞানের বহর বাড়তে থাকে; কিন্তু এই ধরনের অগ্রগতি মানুষকে তার সর্বাঙ্গীণ পরিণতি, ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশে পৌঁছে দিতে পারে না ।

মৌলিক শিক্ষাচিন্তা করতে গেলে তাই এই 'মিথ'গুলির প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে । আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার নিরসনের জন্য শুধু পদ্ধতি বা সংগঠনের কথা চিন্তা করলেই হবে না, বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও পর্যালোচনা করতে হবে। ড্রপ-আউট ছাত্রদের সংখ্যা ভয়াবহভাবে বেড়ে যাচ্ছে । ছাত্রদের আচরণিক পরিবর্তনসাধন ও চরিত্র গঠনের কাজে শিক্ষকদের চরম ব্যর্থতা এবং সেই সঙ্গে তাঁদের প্রভুত্বপরায়ণ মনোভাব ইত্যাদি লোকচক্ষে তাঁদের ক্রমেই নিন্দার্হ করে তুলছে ।

ইলিচের মতে, আবশ্যিক গণতান্ত্রিক শিক্ষা কথাটার মধ্যে একটা হাস্যকর স্ববিরোধ আছে । এ যেন ভিয়েৎনামে আমেরিকার বাধ্যতামূলক গণতন্ত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা । আসলে এ যুগের শিক্ষাচিন্তায় নানা ক্ষেত্রেই এ ধরনের স্ববিরোধ দেখা যায় । যেমন, একদিকে বলা হচ্ছে ব্যক্তিগত শিক্ষা—প্যাকেজের সাহায্যে স্বয়ংশিক্ষণের কথা । অন্যদিকে শিক্ষালাভের একটা আবশ্যিক শর্ত হলো বয়স্কদের তত্ত্বাবধানে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া । কিন্তু এসব তত্ত্বগত বিরোধ যাই থাকুক না কেন, স্কুল-ব্যবস্থার সবচেয়ে কঠোর সমালোচকও কিন্তু এই ধারণা ত্যাগ করতে রাজী নন যে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাই হলো আর্থনীতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার উপায় ।

লোকের মনে এই ধারণা আজ বদ্ধমূল যে শিক্ষকের কাছে যা শেখা যায়, সমাজে তার একটা বিশেষ মূল্য আছে; কৈশোরকালই হলো সেই কাল, যখন মানুষের মধ্যে সামাজিক মানুষটি জন্মলাভ করে। আর এই জন্ম যদি হয় স্কুলের জঠর থেকে, তাহলেই সেটা হবে বৈধ জন্ম।

লোকে এও মনে করে যে তরুণরাই পারে সমাজের পরিবর্তন আনতে, কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান থেকে যথাযথভাবে বেরিয়ে আসার পর তবেই তারা এই সমাজ বদলের কাজে হাত দেবে। শিক্ষায় নবায়ণের কথা যাঁরা বলেন তাঁরাও কিন্তু এখনও পর্যন্ত মনে করেন যে শিক্ষা একটা প্রতিষ্ঠানগত প্রক্রিয়া, যার পরিচালক হচ্ছেন স্বয়ং শিক্ষকেরা।

এইসব অভ্যস্ত চিন্তার ঘূর্ণিপাক থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করবার দুটি পূর্বশর্ত হলো : এক, নতুন ধরনের গবেষণা এবং দুই, নতুন সংস্কৃতি গঠনেব উপযোগী একটা শিক্ষার স্টাইল। সারা দেশ জুড়ে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেবার জন্য এমন একটা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে যাতে জ্ঞানের বিষয়গুলি স্বতন্ত্রভাবে এবং অনন্যনির্ভরভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নাগালের মধ্যে আসতে পারে, যার সাহায্যে শিক্ষার্থী নিজেও জ্ঞানলাভ করতে পারে এবং অন্যকেও শিখতে সাহায্য করতে পারে। এজন্য স্কুলের ওপর নির্ভর করার অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে নতুন মনোভাব গড়ে তুলতে হবে, নতুন শিক্ষা-উপকরণ সৃষ্টি করতে হবে, এবং জীবনযাপনের পদ্ধতি পালটাতে হবে।

একটা ভালো শিক্ষাব্যবস্থায় ইলিচের মতে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি থাকা উচিত :

১. শিক্ষার্থীদের বয়স যাই হোক না কেন, শিক্ষা-উপকরণগুলি তাদের কাছে পৌঁছে যাবার পথে কোনো বাধা থাকবে না।

২. প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা অন্যকে শেখাবার অধিকার দিতে হবে।

৩. কোনো আবশ্যিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে রাখা হবে না।

৪. সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা-দ্বারা একজনের সঙ্গে আর একজনের পার্থক্য নিরূপণ করা হবে না।

৫. আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে, গণপ্রচার মাধ্যমের সাহায্যে বাক্-স্বাধীনতা, সম্মেলনের স্বাধীনতা এবং পত্রপত্রিকায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে কার্যকরী করে তুলতে হবে।

সত্যিকার শিক্ষার জন্য আসলে কি চাই ? শিশু একটা বস্তুজগতে জন্মায় ; তার চারপাশের মানুষজনকে দেখে এবং অনুকরণ করে তার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা আর মূল্যবোধ তৈরি হয়। সে কিছু সমবয়সী আর সমমনস্ক বন্ধুবান্ধব পায় যাদের সঙ্গে আলোচনা, তর্ক, প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে তার শিক্ষা পূর্ণতা পায়। এবং কোনো কোনো বয়স্ক ব্যক্তি নানা পরামর্শ উপদেশ প্রশংসা সমালোচনার মাধ্যমে তার শিক্ষালাভে সহায়তা করেন।

তাহলে স্কুলের বিকল্প হিসেবে এমন একটা বন্দোবস্ত করতে হবে যার মধ্যে ১. বস্তু, ২. মডেল, ৩. সতীর্থ এবং ৪. বয়স্ক-উপদেষ্টা—শিক্ষার এই চারটি উৎসেব নাগাল পাওয়া যে-কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ হয়। শিক্ষার্থীর সামনে বাঁধাধরা কোনো পাঠক্রম থাকবে না। কিন্তু এই চার রকম উৎসের সংস্পর্শে এসে সে তার নিজের

জন্য শিক্ষার্থীর লক্ষ্য নির্ণয় করতে এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে ।

পাঠাগার, পরীক্ষাগার, যাদুঘর প্রভৃতি স্থানে ওখানকার কর্মীদের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা প্রথম উৎসটির সংস্পর্শে আসতে পারে । বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা দক্ষতা অর্জন করেছেন তাঁদের নামের তালিকা তৈরি রেখে যাঁরা ঐ দক্ষতা অর্জনে ইচ্ছুক তাঁদের উক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া যায় । কোনো নির্দিষ্ট বিষয় জানতে ও বুঝতে যাঁরা আগ্রহী, তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের বন্দোবস্ত করা যায় । এবং পেশাদার, আধাপেশাদার অথবা স্বাধীন বিদ্যাজীবী যাঁরা আছেন, তাঁদের নাম, ঠিকানা, যোগ্যতা এবং যোগাযোগের শর্ত—এগুলি তালিকাভুক্ত করে রেখে প্রয়োজনমতো কাজে লাগানো যায় । একাজের জন্য দরকার হলে কম্পিউটারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

আজকাল শিক্ষার সুযোগ এবং উপকরণগুলিকে সাধারণ মানুষের অধিগম্য করবার জন্য নানারকম ভাবনা-চিন্তা এবং ব্যবস্থা হচ্ছে । কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে যে আদিম মানুষের কাছে প্রকৃতি যেমন দুরধিগম্য ছিল, মানুষের তৈরি পরিবেশ আজ মানুষের কাছে তেমনি দুরধিগম্য হয়ে আছে । পাঠাগারে বই আছে, পরীক্ষাগারে পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু শিক্ষকের নির্দেশ বা অনুমতি ছাড়া শিক্ষার্থী কিছুই ব্যবহার করতে পারে না । তাই শিক্ষা-উপকরণগুলি কখনই নিত্যব্যবহার্য হয়ে ওঠে না । তাছাড়া আবার যখনই স্কুল-কর্তৃপক্ষ কোনো নিত্যব্যবহার্য সাধারণ জিনিসকে শিক্ষা-উপকরণ হিসেবে ঘোষণা করেন তখনই তার দামও সাংঘাতিক বেড়ে যায় । শিক্ষার ওপর স্কুল এবং শিক্ষকের একচেটিয়া কর্তৃত্ব যদি ঘুচিয়ে দেওয়া যায়, তবে বাজারে বহু প্রকারের শিক্ষাসামগ্রী সহজে এবং স্বল্পমূল্যে পাওয়া যাবে । দোকানে, পাঠাগারে, পরীক্ষাগারে এবং খেলাঘরে ছেলে-মেয়েদের অবাধ প্রবেশাধিকার ঘটবে । পাড়ায় পাড়ায় নানা চিত্তাকর্ষক তথ্য সম্বলিত পত্রিকা ছাপা হবে, ক্লোজসার্কিট টেলিভিসন হবে, ফিল্‌ম কোম্পানিগুলি শিক্ষামূলক ছবি তৈরি করতে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে ।

ইভান ইলিচ এই ব্যবস্থাটির নাম দিয়েছেন শিক্ষার নেট্‌ওয়ার্ক । স্নায়ুতন্ত্র যেমন একটা সূক্ষ্ম জালের মতো সারা দেহে ব্যাপ্ত থেকে মানুষকে চৈতন্যময় ও কর্মপ্রবণ করে রাখে, শিক্ষার নেট্‌ওয়ার্ক তেমনি সমগ্র সমাজদেহে ব্যাপ্ত থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে যথার্থ শিক্ষার বিস্তার ঘটাবে । এই শিক্ষাজাল বিস্তারে যাঁদের সহায়তা দরকার, তাঁরা হলেন তত্ত্বাবধায়ক; শিক্ষক বলতে আজ আমরা যা বুঝি তা থেকে এঁদের ধরন হবে অনেকটাই পৃথক ।

জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের সুযোগ অনেক বেড়ে যাবে যদি আমরা শিক্ষার জন্য খোলা বাজার তৈরি করতে পারি । শিক্ষার্থীর মনে যখন কিছু জানতে বা শিখতে প্রবল আগ্রহ তৈরি হয় তখন তাকে উপযুক্ত গুরুর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া, প্রয়োজনীয় বই ও অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রী যোগাড় করে দেওয়া, এবং আলাপ-আলোচনার জন্য সমমনস্ক সমকক্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রিত করে দেওয়াটাই হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থার কাজ । বর্তমান স্কুল-ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের অধিকার শুধু ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষকেরই আছে । যে-কোনো মানুষেরই স্বয়ং শিক্ষার এবং অন্যকে শেখাবার অধিকার আছে যা বর্তমান স্কুল-ব্যবস্থায় অস্বীকৃত । কিন্তু ইলিচের 'বিদ্যালয়-বিলোপী' সমাজে যে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার কল্পনা করা হয়েছে সেখানে ননফরম্যাল বা অ-বিধিবদ্ধ শিক্ষার একটা বিরাট ভূমিকা আছে।

এই নতুন অ-বিধিবদ্ধ বা প্রাসঙ্গিক শিক্ষা অবশ্য গ্রামকেন্দ্রিক প্রাচীন সমাজের প্রাসঙ্গিক শিক্ষার সঙ্গে কোনোমতেই তুলনীয় নয়। প্রাচীন গ্রাম্যসমাজে ধর্ম, কর্ম, পারিবারিক প্রথা, অবসরবিনোদন, ভাষা, স্থাপত্য—এগুলির কারো সঙ্গে কারো বিরোধ বা অসংগতি ছিল না, সুতরাং জীবনযাপনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেখানে শিক্ষা স্বাভাবিকভাবেই চলত। কিন্তু আধুনিক যুগের সমাজ হচ্ছে পরিকল্পিত সমাজ, সুতরাং শিক্ষার সুযোগগুলিকেও পরিকল্পিতভাবেই বেছে নিতে হবে। ফ্যাক্টরি, হাসপাতাল, মিউজিয়াম, লাইব্রেরি প্রভৃতি যে-কোনো প্রতিষ্ঠানই আজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবেও কাজ করতে পারে। এযুগে কাজের জগৎ থেকে শিক্ষাকে পৃথক করে নেওয়ার ফলে শিক্ষা এবং কর্মের মধ্যে যে অ্যালিয়েনেসন তা আর্থনীতিক অ্যালিয়েনেসনের চেয়েও আরো মারাত্মক, কারণ এর ফলে কাজের জগৎ হয়েছে শিক্ষাসম্পর্ক-রহিত এবং শিক্ষা হয়েছে বাস্তববোধশূন্য। কর্মপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই বিচ্ছেদ দূর করতে হলে কর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। কর্মের সার্থকতা দেখেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের সার্থকতা যাচাই হবে।

শিক্ষাসংক্রান্ত গবেষণাগুলি থেকে ক্রমেই আমরা জানতে পারছি যে মানুষের গভীরতর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাগুলি স্কুলের বাইরেই লাভ হয়—বন্ধুদের কাছ থেকে বা শ্রদ্ধেয় কোনো উপদেষ্টার কাছ থেকে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, স্বাধীনভাবে বই পড়ে অথবা স্কুলের ভেতরে পাঠবহির্ভূত কাজকর্মের মধ্যে অংশগ্রহণ করে। সেদিক থেকে দেখলে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া নয়, শিক্ষকদের চাকরি দেওয়াই আজ স্কুলের প্রধান ভূমিকা।

স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী ছাত্রদের সেখানে পুরো সময়ের জন্য আবশ্যিকভাবে উপস্থিত থাকতে হয়। শিক্ষকরা নিয়মকানুন শিক্ষা দেন। রুটিনবাঁধা কাজে ছাত্রদের অভ্যস্ত করে তোলেন, দরকার মতো শাসন করেন, তাদের ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে খোঁজখবর কিছুটা রাখেন এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। ছাত্রের জীবনের ওপর শিক্ষকের এমন একটা সর্বব্যাপী অধিকার থাকার ফলে ছাত্রের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হতে বাধ্য। প্রাত্যহিক চলমান বাস্তব জগৎ থেকে দূরে একটা প্রাচীন, আদিম এবং সম্মোহনী পরিবেশ তৈরি করা হয় শ্রেণীকক্ষে। বিদ্যালয় যেন একটা মাতৃগর্ভ--যেখান থেকে শিক্ষার্থী বাস্তব জগতে ভূমিষ্ঠ হয় একেবারে শিক্ষাজীবনের শেষে।

শিক্ষাব্যবস্থায় যুগান্তর আনতে হলে আবশ্যিক পাঠক্রম এবং আবশ্যিক উপস্থিতি —এই দুটো ধারণা থেকেই আমাদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে। নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় এ প্রশ্ন উঠবে না যে ছাত্র কি শিখবে। প্রশ্নটা হবে এই যে ছাত্র যা শিখতে চায় তার জন্য কি ধরনের সামগ্রী এবং কি ধরনের মানুষের সংস্রবে আসতে হবে তাকে।

স্বাধীনভাবে সম্মেলন ডাকার অধিকার রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু কোনো সম্মেলনে যোগদান যদি বাধ্যতামূলক হয় তাহলে কি এই অধিকার অনেকটা খর্ব হয় না ? 'বিদ্যালয়-বিলোপ' মানে হলো কোনো একটি সমাবেশে কাউকে হাজির হতে বাধ্য করার অধিকার বাতিল করে দেওয়া। এমন একটা দিন আসবে যখন তথাকথিত স্কুল-ব্যবস্থার ওপর কারো আস্থা থাকবে না। বিদ্যালয়ভবনগুলিকে তখন কিভাবে কাজে লাগানো হবে সেটাই হবে সমস্যা। ঐগুলি তখন নানাভাবে মানুষের

শিক্ষালাভের কাজে লাগানো যাবে। কোথায় কোন্ ঘরে কি প্রোগাম হচ্ছে তা বুলেটিন বোর্ডে লেখা থাকবে। সেখানে শিক্ষকরা ক্লাশও নিতে পারেন এবং ছাত্ররা সেই ক্লাসে যোগও দিতে পারে। ছাত্র-উপস্থিতি-সংখ্যার ভিত্তিতে শিক্ষকের অর্থ বরাদ্দও করা যেতে পারে। সরকার-প্রদত্ত শিক্ষা-ভাউচারের বিনিময়ে ছাত্ররা যদি বছরে দশ ঘণ্টার মতো শিক্ষকের কাছ থেকে নির্দেশনা নেয় এবং বাকি সময়টা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করে, লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করে এবং বিশেষজ্ঞের কাছে শিক্ষানবীশী করে, তাহলে এমনকি উচ্চশিক্ষার পক্ষেও সেটাই যথেষ্ট।

কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন যে জ্ঞান-অর্জনের এই সাময়িক সঙ্গীনির্বাচনের ব্যবস্থাটা নিতান্তই কৃত্রিম, কারণ বছরের পর বছর ধরে অভিজ্ঞতা ও হৃদয় বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে যখন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে, তখনই তারা জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারেও পরস্পরের যোগ্য সঙ্গী হয়ে ওঠে। এ আপত্তির মধ্যে যুক্তি আছে স্বীকার করে নিয়েও ইভান ইলিচ বলেন যে, এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব তো স্কুলের বাইরেও গড়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রেই বরং একই ব্যক্তি ভিন্ন সূত্রে ভিন্ন বন্ধুমণ্ডলীতে বিচরণ করতে পারে এবং তার ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্প্রীতির এলাকা সম্প্রসারিত হয়। আজকের নাগরিক জীবনের একটা কুফল আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে প্রতিবেশীদের পরস্পারের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষালাভের জন্য সতীর্থ সমাবেশকে উপলক্ষ করে পাড়ায় পাড়ায় নানা উদ্দেশ্যে নানা শিক্ষার্থীগোষ্ঠী গড়ে উঠবে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যও গড়ে উঠবে।

বিদ্যালয়ের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হলে তখনই সত্যিকারের জ্ঞানী ও যোগ্য শিক্ষকের চাহিদা বেড়ে যাবে। স্কুলমাস্টার বিদায় নিলে তখনই শিক্ষাগুরুর আবির্ভাব হবে; এমনকি সন্তানদের মানুষ করে তোলবার জন্যে মা-বাবারাও তাঁদের কাছে উপদেশ নিতে ছুটবেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যে নতুন ধরনের সম্পর্ক তৈরি হবে তার মধ্যে যেহেতু কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না সেহেতু শৃঙ্খলাবিধানেরও কোনো প্রশ্ন থাকবে না। ছাত্ররা শিক্ষকের পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব ও পঠনপদ্ধতি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নিজেরাই তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে। এই নতুন ব্যবস্থাপনায় প্রশাসকদের কাজ হবে সকল রকম শিক্ষালাভের পথ সবার জন্য সুগম করে দেওয়া।

ইলিচ-প্রস্তাবিত এই যে শিক্ষা-বিপ্লবের কথা আলোচনা করা হলো এর সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করবে নতুন এক জীবনদর্শন ও সমাজব্যবস্থার ওপর। অত্যুগ্র ভোগবাদী জীবন-দর্শনের বদলে এক কর্মময় জীবনদর্শনকে বেছে নিতে হবে ; স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত জীবনযাপনপ্রণালী বেছে নিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে ইভান ইলিচ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির এক কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র দিয়েছেন। আমাদের চোখের সামনে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে; চিনে নিতে হবে কোনগুলি আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনের সহায়ক, কোনগুলিই বা প্রতিবন্ধক। সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে মিলিয়ে যদি একটি বর্ণালীর কল্পনা করা যায়, বর্ণালীর দক্ষিণ প্রান্তে রাখা যায় প্রতিবন্ধক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং বামদিকে সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলিকে, তাহলে দেখা যাবে যে আজকের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ-ঘেঁষা। যেমন যুদ্ধ একটা প্রতিষ্ঠান, যার কাজ হলো মানুষকে আটকে রাখা। মানসিক হাসপাতাল বা অনাথাশ্রমগুলিকেও

ভালো কিছু প্রতিষ্ঠান বলা যায় না ।

অন্যদিকে টেলিফোন, ডাক বা অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, জল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি হলো এমন প্রতিষ্ঠান যার উপযোগিতা সম্পর্কে মানুষকে বোঝাতে হয় না, কেবল তাদের অতি ব্যবহার বা অপব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক হতে হয় ।

বর্ণালীর দক্ষিণ প্রান্তের প্রতিষ্ঠানগুলি জটিল, ব্যয়বহুল, বিজ্ঞাপনধর্মী ও নেশাকর। বামপ্রান্তের প্রতিষ্ঠানগুলিরও নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে, কিন্তু নেই বিজ্ঞাপনের বাড়াবাড়ি ।

ভোগ্যপণ্য-উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমেই দক্ষিণ-ঘেঁষা হয়ে উঠছে । তারা যে শুধু পণ্য উৎপাদন করে তাই নয়, সেইসঙ্গে পণ্যের চাহিদাও তৈরি করে । যন্ত্র চালাবার ইচ্ছা, অতি দ্রুতবেগে ভ্রমণের ইচ্ছা, আরাম এবং বিলাসের চাহিদা--এর অনেকাংশই কৃত্রিমভাবে জাগানো হয় বাজারে তৈরি পণ্যের কাটতির উদ্দেশে । আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে পৃথিবীর গরীবদেশগুলোতে চালান করা হচ্ছে তিনভাবে :

১. পণ্যসামগ্রী রপ্তানী, ২. পণ্যউৎপাদনকারী ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা এবং ৩. পণ্য সামগ্রীর উৎপাদক ও ভোক্তা মানুষ যেখানে তৈরি হয় সেই বিদ্যালয়-সম্পর্কে চাহিদাসৃষ্টি । বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যারা বেরোয় তাদের মনে কতরকমের যে চাহিদা ! শিল্পায়ন চাই, হাইওয়ে চাই, বিমানবন্দর চাই । এই সবরকম কৃত্রিম চাহিদার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো চাহিদা হলো 'ইস্কুলের চাহিদা' । বর্ণালীর দক্ষিণ-ঘেঁষা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো স্কুল । তাই স্কুলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কেউ যদি কখনও সন্দিহান হন তক্ষুণি তাঁকে হৃদয়হীন অথবা সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলে চিহ্নিত করা হবে ।

সমাজবিপ্লবের কথা ভাবতে হলে আজ আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলির খোলনলচে পালটে ফেলতে হবে । মজার কথা এই যে ধনতান্ত্রিক দেশই হোক বা সমাজতান্ত্রিক দেশই হোক,সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যেও স্কুলের দাপট কিন্তু আমরা একইরকম দেখতে পাচ্ছি । সর্বত্রই স্কুল হয় আবশ্যিক, নয় আবশ্যিক হওয়ার পথে । স্কুল প্রধানত প্রতিযোগিতাধর্মী। স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, প্রশাসন এবং রাজনীতি সম্পর্কে ঐ একই কথা । সব দেশে সব প্রতিষ্ঠানই মূলত দক্ষিণপন্থী, সব প্রতিষ্ঠানেই বুরোক্রেসির প্রতাপ ।

মানুষ দু'ধরনের কাজ করে । এক ধরনের কাজ দিয়ে সে কিছু জিনিস তৈরি করে, আর এক ধরনের কাজ দিয়ে সে নিজেকে গড়ে তোলে । আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে মানুষের প্রথম ধরনের কাজ অর্জিত হয়েছে বা হচ্ছে যন্ত্রের হাতে, তাই আজ হোক বা কাল হোক, মানুষের হাতে থাকবে অখণ্ড অবসর । এই অবসর সে কাটাবে বিষণ্ণ কর্মহীনতার মধ্যে দিয়ে না আনন্দময় সৃজনকর্মের মধ্যে দিয়ে, তা নির্ভর করছে প্রতিষ্ঠানগুলির নব রূপায়ণের ওপব । প্রতিষ্ঠানগুলি যদি অবিরত ভোগের চাহিদা বাড়ায়, ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বাড়ায়, ভোগ এবং অপচয় বাড়ায়, তবে এই দুষ্টচক্রের আবর্তন চলতেই থাকবে, এর থেকে মানুষের মুক্তি নেই । তাহলে বিদ্যালয়-গমনের সঙ্গে শিক্ষালাভের অভেদ স্থাপিত হবে, মেডিক্যাল সার্ভিস আর সুস্বাস্থ্য একই জিনিস বলে ধরা হবে এবং অনুষ্ঠান দেখা আর চিত্তবিনোদন—এ-দুইয়েরও প্রভেদ স্বীকৃত হবে না। আধুনিক শব্দ-ভাণ্ডারে এরই নাম 'উন্নয়ন' । আর এর অন্য প্রান্তে আছে সেইসব

প্রতিষ্ঠান—উৎপাদন যেখানে সীমিত কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই 'বিকল্পটির' নাম 'স্থায়ী সামগ্রীর অর্থনীতি'—এমন সামগ্রী উৎপাদন করা যা দিয়ে মানুষ কিছু তৈরি করতে পারে, নানারকমভাবে ব্যবহার করতে পারে, নিজে নিজেই মেরামত করতে পারে এবং নিজে নিজেই কাজে লাগাতে পারে।

নতুন শিক্ষাব্যবস্থার কাজ হবে অতি-শিল্পায়ন, অতি-যন্ত্রায়ন এবং প্রতিষ্ঠানের উপর অতি-নির্ভরতা থেকে মানুষকে, ব্যক্তি-মানুষকে মুক্ত করা।

দুই

প্রচলিত স্কুল-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বিলোপ করে এই যে বিকল্প প্রস্তাবটি দিয়েছেন ইভান ইলিচ তাঁর 'ডিস্কুলিং সোসাইটি' নামে ক্ষুদ্রাকৃতি বইটিতে, তা যেন আমাদের কাছে জ্ঞানের আকাশে মুক্ত বিহঙ্গমের অবাধ পক্ষসঞ্চালনের বার্তা বয়ে আনে।[১] প্রস্তাবটি অভিনব, চিত্তাকর্ষক, চমৎকার। তাঁর সাবলীল ভাষা, শাণিত যুক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য, গভীর চিন্তাশীলতা, সংবেদনশীল মন, অসীম মানবপ্রীতি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি সুগভীর আস্থা—এ সবকিছুই আমাদের অভিভূত করে। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার অচলায়তনের মূলে তিনি যেন ডিনামাইট দিয়ে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষাজগতে তাঁর চিন্তা একটি প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, যার স্বীকৃতি আমরা পাই 'লারনিং টু বি' নামক ইউনেস্কো প্রকাশিত রিপোর্টে।[২] তাঁর জীবনদর্শন, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক চিন্তা এবং তার সমাজবোধের সঙ্গে তাঁর শিক্ষাচিন্তা ওতপ্রোতভাবে সমন্বিত।

তবুও নানা কারণে বাস্তবক্ষেত্রে এর প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে মনে সন্দেহ জাগে। একে একে সংশয়ের কারণগুলি উত্থাপন করা যাক্।

প্রথমত, ইভান ইলিচ আবশ্যিক শিক্ষা ও আবশ্যিক পাঠক্রমের বিরোধী। তাঁর মতে মানুষের জীবনের প্রয়োজনেই জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের চাহিদা তার মনে জন্মায়; এবং চাহিদা ও আগ্রহ থাকলে আবশ্যিকতা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কথাটা যে ইলিচ নতুন ভেবেছেন তা নয়, এর আগেও বহু শিক্ষাবিদ এটা উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অসুবিধা এই দাঁড়ায় যে কখন কোন শুভক্ষণে পরিস্থিতি অনুকূল হবে এবং মনে শেখবার প্রবল তাগিদ উপস্থিত হবে সেজন্য দীর্ঘকাল বসে থাকলে বয়স বসে থাকে না। শৈশবকাল থেকে কৈশোরকাল হলো নানাধরনের মানসিক ক্রিয়া পরিশীলনের জন্য 'পরমলগন'। সে লগ্ন হেলায় বয়ে যেতে দিলে পরে শেখবার ইচ্ছা উদগ্র হয়ে উঠলেও আর শেখবার তত ক্ষমতা থাকে না—এটা মনস্তাত্ত্বিক এবং এমনকি শারীরতাত্ত্বিক সত্য। শিক্ষার জন্য শরীরের এবং তার মাধ্যমে মনের যে নমনীয়তা দরকার, তা শৈশব থেকে কৈশোরকালের বিশেষ লক্ষণ। তাছাড়া ইচ্ছা জাগ্রত হলেও প্রত্যেক শিক্ষাপ্রণালীর স্তরে স্তরে এমন কতকগুলো কাজ আছে যেগুলো পুনরাবৃত্তিমূলক, পরিশ্রমসাধ্য এবং আপাতদৃষ্টিতে বিরক্তিকর। এ কাজগুলি ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করতে হয়, অথচ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের পথে ঐ কাজগুলি আবশ্যিক। সুতরাং অনিচ্ছুক ছাত্রের মনে কৃত্রিম উপায়ে ইচ্ছা জাগ্রত করবার জন্য, এমনকি ইচ্ছা জাগ্রত কখনও কখনও না হলেও প্রয়োজনীয় কাজ কর্তব্যজ্ঞানে সম্পাদনের জন্য, এবং বিরক্তিকর কাজেও ছাত্রকে সময়-বিশেষে লিপ্ত রাখার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় কিভাবে?

তাছাড়া জ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখার একটি নিজস্ব শৃঙ্খলা আছে, একটি নিজস্ব বিন্যাস আছে, যা নিয়মিতভাবে, এবং ধাপে ধাপে আয়ত্ত করলে, তবেই তাতে সম্যক অধিকার জন্মে। এই প্রত্যেকটি ধাপে জ্ঞানকে সর্বদাই প্রয়োজনভিত্তিক, প্রাসঙ্গিক অথবা প্রয়োগধর্মী করা যায় না, করা বাঞ্ছনীয়ও নয়। সর্বদাই যদি প্রয়োজনকে সামনে রেখে জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তবে তা খণ্ডিত, অগভীর এবং পল্লবগ্রাহী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। বিশুদ্ধ জ্ঞান অন্বেষণে মানুষের যে অপার আনন্দ ও বিস্ময়, তাও বিঘ্নিত বা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা। এসব কথাও ভালোভাবে ভেবে দেখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ট্রেনিংপ্রাপ্ত পেশাদার শিক্ষকসমাজের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেছেন ইলিচ। তাঁর মতে যাঁরাই জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছেন, তাঁরাই শিক্ষাদানের অধিকারী। তাঁরা কাজও করবেন এবং শিক্ষাও দেবেন—তবেই শিক্ষা-প্রক্রিয়াটি প্রাণবন্ত ও বাস্তবভিত্তিক হয়ে উঠবে, শিক্ষকতা নামে একটি আলাদা পেশা থাকা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

এ মতটা আলোচনাসাপেক্ষ। এটা অনেকেই উপলব্ধি করেছেন যে জ্ঞানের জগৎ, কর্মের জগৎ এবং শিক্ষার জগৎ—এই তিন ভুবনের বিচ্ছেদই আজকের সমাজে আত্মখণ্ডনের অভিশাপকে ডেকে এনেছে। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এই সমস্যার সমাধান হয় না। জ্ঞান ও দক্ষতা ছাড়া শিক্ষক হওয়া যায় না এটা যেমন সত্য, তেমনি জ্ঞানী ও কর্মীমাত্রেই ভালো শিক্ষক নন এটাও পরীক্ষিত সত্য। অবশ্য ইলিচ বলবেন যে সেরকম ভালো শিক্ষক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠানেও থাকতে পারে, সেরকম মন্দ শিক্ষক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও যথেষ্টই মিলবে। কে ভালো কে মন্দ তা জানবার জন্য ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেটের দরকার নেই—ছাত্ররাই তার বিচার করবে এবং নিজেদের জন্য শিক্ষক নির্বাচন করে নেবে। বাজারে যেমন ভালো মালের কাটতি কেউ ঠেকাতে পারে না, শিক্ষকও তেমনি বিদ্যালয়ের বাইরে খোলা বাজারে নিজের চাহিদা নিজেই তৈরি করবেন। যুক্তিটা ঠিক এবং ঠিকও নয়। কারণ ভালো শিক্ষক শুধু সহজাত গুণেই হয় না, সহজাত শক্তিকে শিক্ষাবিজ্ঞান এবং শিক্ষাপ্রযুক্তিবিদ্যা দ্বারা শাণিত ও পরিশীলিত করতে হয়। সেটা একটা পৃথক অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে হয়, যা যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মীর পক্ষে সর্বদা সম্ভব নাও হতে পারে। সুতরাং ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা থেকেই যায়। তবে শিক্ষকরা যাতে অন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রেখে কাজ করতে পারেন এমন ব্যবস্থা ভবিষ্যতের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে রাখা দরকার।

তৃতীয়, সহপাঠীদের একত্রিত করে একটা স্থায়ী ছাত্রগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন ইলিচ। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের এবং সমাজবিজ্ঞানের পরীক্ষানিরীক্ষাগুলি থেকে আমরা জানি যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শ্রেণীশিক্ষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সমবয়সী ছেলেমেয়েরা দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের সঙ্গে একত্র দিন কাটিয়ে, পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া, প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা ও যূথগত কার্যকলাপের মাধ্যমে শিক্ষালাভের যে প্রেরণা (গবেষণা উপযোগী) লাভ করে, ব্যক্তিগত স্বয়ংশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে কিংবা অপরিচিত বা অল্পপরিচিত সহশিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিশে সেই প্রেরণা জাগিয়ে তোলা সম্ভব

হবে বলে মনে হয় না।

চতুর্থত, কেবলমাত্র জ্ঞান ও দক্ষতালাভই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। শিশুদের মধ্যে বৃহত্তর অর্থে সমাজচেতনা জাগানো দরকার, যা প্রাথমিক সমাজপরিবেশ অর্থাৎ পরিবারকেন্দ্রিকতা থেকে তাদের বাইরের জগতে টেনে আনবে। দেশ সম্পর্কে, জাতি সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে তাদের মনে মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধকে সুপরিণত করে তুলতে হবে। আজকের বিদ্যালয় এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারছে না সেটা অন্য কথা। কিন্তু এ দায়িত্ব প্রধানত বিদ্যালয়েরই। এবং এজন্য ন্যূনতম একটা আবশ্যিক পাঠক্রমের মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের নিয়ে যাওয়ারও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। এই বৃহত্তর সমাজবোধ বিদ্যালয় ছাড়া গড়ে তোলা খুবই কঠিন। বিদ্যালয়ই হলো ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সেতু। অবশ্য আজকের বিদ্যালয়ের যা চেহারা, হয়তো সেটা অনেকটাই পাল্টে যাবে। সমাজবোধ জাগ্রত করার কাজ বিদ্যালয় অনেক সুষ্ঠুভাবে ও সফলভাবে করতে পারে যদি সে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান ও যোগসূত্র রেখে কাজ করার অভ্যাস তৈরি করে।

পঞ্চমত, শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাপ বা মূল্যায়ন পদ্ধতির যদিও অজস্র ত্রুটি বিদ্যমান যা আমাদের মনকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে ও গোটা শিক্ষা ব্যাপারটা সম্বন্ধেই আস্থাহীন করে তোলে, এবং যদিও প্রচুর মাথা ঘামিয়ে নানারকমভাবে চেষ্টা করেও এই ত্রুটিগুলি দূর করা যাচ্ছে না, তবু শিক্ষা এবং জীবন থেকে পরিমাপভিত্তিক মূল্যায়নকে আমরা বাদ দিয়ে চলতে পারি না। নানা উপলক্ষে, প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে, ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর মূল্যায়ন তো আমরা অহরহ করেই চলেছি। সুতরাং এই মূল্যায়নকে যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য ও নৈর্ব্যক্তিক করবার চেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে, এই কথাটা সর্বদাই স্মরণে রেখে যে কোনো মূল্যায়নই একেবারে অভ্রান্ত হয় না, সুতরাং কোনো মূল্যায়নই ব্যক্তি ও তার কৃতিত্ব সম্পর্কে শেষ কথা নয়। তাছাড়া আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যায়নের ভূমিকা শুধুমাত্র ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদানের উদ্দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। কনটিনিউয়াস অ্যাসেসমেণ্ট বা নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন শিক্ষাপ্রণালীর উপযোগিতা, পাঠক্রমের যাথার্থ্য, বিদ্যালয় পরিবেশের অবস্থা, ইত্যাদির যথাযথ বিশ্লেষণ করে তার উন্নতিবিধানে ফিডব্যাক্ হিসেবে কাজ করে।

ইলিচ-প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থার এইসব সমালোচনা করা গেলেও তাঁর শিক্ষাচিন্তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে কিন্তু অস্বীকার করার কোনো প্রশ্নই উঠছে না। যদিও ইলিচ প্রধানত পাশ্চাত্যদেশের আবশ্যিক এবং যন্ত্রসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধেই তিতিবিরক্ত এবং বিদ্রোহী. আর যদিও ভারতবর্ষের সর্বত্র আজও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়নি এবং কতদিনে হবে বলা শক্ত, তবুও ভারত ও অন্যান্য উন্নয়নশীল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশগুলিতে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে তাঁর শিক্ষাচিন্তার গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে নন-ফরম্যাল এডুকেশান বা প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে বিশ্বের সমস্ত উন্নত দেশগুলিতে ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থার একটা বিশাল ও ব্যাপক আয়োজন হয়েছিল, যার ফলে আবশ্যিক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, ব্যাপকতর মাধ্যমিক শিক্ষা ও আগের

তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপক উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছিল। সরকারি শিক্ষাখাতে ফরম্যাল শিক্ষার জন্য ব্যয়বরাদ্দ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। উন্নয়নশীল বা পশ্চাৎপদ দেশগুলিরও এই ধারণা জন্মেছিল যে উন্নততর স্কুল-ব্যবস্থাই উন্নত দেশগুলির শক্তি ও সমৃদ্ধির মূলে। ১৯৪৫থেকে ১৯৬৫—এই বিশ বছর ধরে পৃথিবীর সবদেশেই স্কুল-ভিত্তিক ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তারের জন্য একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এরপর থেকে নানা কারণে ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বড়োরকমের মোহভঙ্গ ঘটতে থাকল। ফরম্যাল শিক্ষার একদুয়ারি প্রবেশ ব্যবস্থা, বৎসরকালব্যাপী পাঠক্রম এবং বৎসর শেষে পরীক্ষান্তে প্রোমোশন, পূর্ণকালীন কোর্স এবং পেশাদার শিক্ষকমণ্ডলী এই সবকিছু ব্যবস্থাকে নানাদিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছিল। ঐসব সমালোচনাগুলি উন্নত এবং উন্নয়নশীল দুই ধরনের দেশ সম্পর্কেই প্রযোজ্য—দুই ভিন্ন কারণে। উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষাবিদরা বলছিলেন যে, যে প্রবলবেগে সমাজ বদলে যাচ্ছে তার সঙ্গে শিক্ষার তাল মিলিয়ে দেবার পক্ষে ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কেউ কেউ বলছিলেন যে, ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাদানের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে বেশি—কিন্তু নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষালাভের ওপর ঝোঁক দিতে হবে। অনেকেই মনে করেন যে উন্নততর শিক্ষা-প্রযুক্তিবিদ্যা, প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্বয়ংশিক্ষা এবং অংশকালীন শিক্ষার মধ্যে দিয়েই প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করা যায় এবং সেক্ষেত্রে পুরো সময়ের জন্য দশ-বারো বছর ধরে ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থা আসলে সময় ও অর্থের অপচয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অবশ্য ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে মোহভঙ্গের কারণ অন্যত্র। এইসব দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল যে, অর্থের অপ্রাচুর্যের ফলে ভালো মানের সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা প্রায় অসম্ভব। আরো দেখা গেল যে দেশের তাৎক্ষণিক সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে, দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য একটা জনজাগরণ সৃষ্টি করতে, সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে যথার্থ নেতৃত্ব তৈরি করতে এই ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ কোনো ভূমিকা নিতে পারছে না। পাশ্চাত্য মডেলে রূপায়িত এলিট-প্রধান শিক্ষাব্যবস্থায় ধনী ও কিছু মধ্যবিত্ত সন্তানের এক অর্থে উপকার হয়েছে বটে, কিন্তু মধ্যবিত্তদের মধ্যে একটা বিশাল সংখ্যা ক্রমে অপটু অকর্মণ্য বেকার সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। আর দেশের অধিকাংশ মানুষের অন্ধকার জীবনে শিক্ষার আলো একেবারেই পৌঁছতে পারেনি। ১৯৭২ সালে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন-কর্তৃক প্রকাশিত 'লারনিং টু বি' গ্রন্থে প্রথমে ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা যথোপযুক্তভাবে তুলে ধরা হলো এবং নন-ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হলো।

এই ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ইলিচ-প্রকল্পিত প্রস্তাব আজ সারা বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত। জে. পি. নায়েকের মতে ইলিচের সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো এই যে তিনি ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করে তুলেছেন।[৩] 'বিদ্যালয়-বিলোপ' প্রস্তাবটি মেনে নিন বা না মানুন সবাই কিন্তু ভাবছেন যে ১. বর্তমান স্কুলভিত্তিক ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর দরকার এবং ২. শিক্ষার সব সমস্যার মোকাবিলা যেহেতু ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থা করতে পারে না সেই-জন্য এই ব্যবস্থার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সংগ্রথিত নন-ফরম্যাল এবং ইনফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থা

ব্যাপকভাবে চালু করা প্রয়োজন ।

ভারতবর্ষেও দেশব্যাপী নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা দূর করার জন্য ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে নন-ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার ওপর প্রচুর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনাটিকে যদি আমরা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করি এবং নন-ফরম্যাল শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ইলিচ-প্রকল্পিত কর্মসূচি চালু করতে পারি তবে হয়তো গ্রামে ও শহরে স্থানীয় জনসাধারণের চেষ্টায় ও স্থানীয় শিক্ষিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নেতৃত্বে প্রয়োজনভিত্তিক বাস্তবানুগ কর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার রূপায়ণ সম্ভব হয়ে উঠবে । একাজের জন্য অর্থব্যয় সরকারি এবং বেসরকারি দুই-ই হতে পারে; নেতৃত্বটা কিন্তু সরকারি না হওয়াই মঙ্গল । স্থানীয় অধিবাসীদের চেষ্টায় স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে । ফরম্যাল ও নন-ফরম্যাল শিক্ষাব্যবস্থা পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে পাশাপাশি চলতে পারে । দুইয়ের মধ্যে একটি ব্যবস্থার যদি আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব থাকে, তা কালের বিচারেই প্রতিপন্ন হবে ।

উল্লেখপঞ্জী :

১. Ivan D. Illich, *Deschooling Society*, first ed. 1971; Penguin 1973.
২. Edgar Faure and Others, *Learning To Be : The World of Education Today and Tomorrow*, Unesco, Paris, 1973; Sterling, Delhi, 1973.
৩. J.P. Naik, *Some Perspectives on Non-Formal Education*, Allied, Bombay 1977.

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৮। দ্বিতীয় বর্ষ । দ্বিতীয় সংখ্যা

এলিজাবেথ বাচকোভস্কি

হাংগেরিয়ান সাহিত্য ও কবি এন্দ্রে অদি

এন্দ্রে অদি যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স মাত্র বিয়াল্লিশ। কিন্তু তাঁর স্বল্পায়ু জীবন ও সাহিত্যকৃতি এত ঘটনাবহুল যে আশি বছর অবধি বাঁচলেও তাঁর জীবন অথবা সৃষ্টি বিচিত্রতর হতো কিনা সন্দেহ। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর স্বাস্থ্য খুইয়ে ফেলেন—বয়ঃসন্ধিকালে সিফিলিসের আক্রমণ এরই ভূমিকা—কিন্তু তাঁর কবিতা হাংগেরিয়ান সাহিত্যে যুগান্তর ঘটায়। তাঁর সমকালীন হাংগেরির মধ্যবিত্ত মানস জগতে অদির সামাজিক ও রাজনৈতিক মনোভাবের বৈপ্লবিকতা প্রচণ্ড আলোড়ন তোলে। তৎকালে তাঁকে নিয়ে যে তিক্ত বিতর্ক শুরু হয়—অদি কি বদ্ধ উন্মাদ না মহাপ্রতিভাবান শিল্পী—তার রেশ এখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণা এখন আর ততটা ধারালো ঠেকে না বটে—এখন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সেইসব ধারণাকে দেখা হয়—কিন্তু অদির কল্পজগতের যে প্রবল বিমূর্ততা তাঁর রচনায় প্রকটিত সেটির সঙ্গে রফা করা এখনও অনেকের কাছে কঠিন ঠেকে। এইসব সমালোচক মনে করেন, অদির কবিতাবলী প্রকৃতপক্ষে এক উন্মাদের প্রলাপোক্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু অদির কাব্যজগৎ যতই বিমূর্ত ও ব্যক্তিগত হোক না কেন, সে জগতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার শিকড় হাংগেরিয়ান ভূমিতে প্রোথিত। অদি সচেতনভাবে হাংগেরিয়ান হবার চেষ্টা করেননি, কিন্তু আমাদের সাহিত্যে তাঁর মতো খাঁটি 'মজির' (Magyar) কবি দুর্লভ।[১] যে প্রাক্-খ্রিস্টিয়, পেগান, 'মজির' লোককাহিনীর জগৎ বহু শতাব্দী ধরে অলিখিত অবস্থায় অযত্নে লোকচেতনায় টিঁকে ছিল, অদির কবিতায় সেটি আবার উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

এই আদিম প্রাক্-খ্রিস্টিয় হাংগেরিয়ান সাহিত্যের কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় না, কিন্তু লোককাহিনী এবং লোকগীতির সূত্রে তার অস্তিত্ব অনুমান করা চলে। দশম শতকে রাজা স্টিফেন যখন এদেশে একটি খ্রিস্টধর্মী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তখন এই অলিখিত প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্য পিছু হটে যায়। হাংগেরিয়ানের বদলে লাতিন হয়ে ওঠে সাহিত্যের ভাষা, আর সে সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে মুখ্যত খ্রিস্টধর্মী।

হাংগেরিয়ান ভাষায় লিপিবদ্ধ সাহিত্যের প্রথম নিদর্শনটি তেরো শতকে রচিত। ষোলো শতক পর্যন্ত লাতিন ছিল এখানকার সাহিত্যের ভাষা, তবে লাতিন থেকে কিছু কিছু তর্জমা হয়েছিল হাংগেরিয়ানে। রিফর্মেশানের সময় থেকে মাতৃভাষার চর্চা সাহিত্যে স্বীকৃতি পায়। ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হাংগেরিয়ানের প্রথম নাটক লেখা হয়। আঠারো শতক পর্যন্ত এ ভাষায় ধর্মীয় বিষয় প্রাধান্য পেলেও ঐহিক সাহিত্যও একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। ঐহিক সাহিত্যের ধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ভ্রাম্যমান গাথককুল। হাংগেরিয়ানদের সঙ্গে তুর্কিদের যুদ্ধ নিয়ে নানা কাব্যকাহিনী এবং সৈন্যশিবিরে "কুরুস্"

নামে যেসব গান প্রচলিত ছিল তাদের বিষয়বস্তু ছিল ঐহিক।

উনিশ শতকের সূচনায় হাংগেরিয়ান ভাষায় প্রথম উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেন জির্‌জি বেশ্যোন্যেই (১৭৪৬-১৮১১)। তাঁর উপন্যাসগুলি দুর্বল ও উপদেশ-প্রধান বটে, কিন্তু নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন সাহিত্যরূপ নিয়ে মাতৃভাষায় তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং ফলে হাংগেরিয়ান সাহিত্যেরও বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। ১৮১৫ সালে যোঝেফ্‌ কতোন (১৭৯১-১৮৩০) লেখেন তাঁর বিখ্যাত নাটক 'বান্‌ক্‌ বান্‌'।[২] নাটকটির কাহিনীকাল তেরো শতক : বান্‌ক্‌ এবং তাঁর রানীর ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি এই নাটকের মুখ্য আখ্যানবস্তু হলেও তার আড়ালে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার নানা আভাস আছে। এই নাটকের চাষীচরিত্র তিবব্‌স্‌ আজ পর্যন্ত অত্যাচারিতের প্রতীক হিসেবে আবেদন করে। পরবর্তীকালে ফেরেন্‌স্‌ এর্‌কেল্‌ এই নাটকটিকে অবলম্বন করে ঐ নামে তাঁর বিখ্যাত অপেরা রচনা করেন।

হাংগেরিয়ান সাহিত্যে গত শতকের প্রধান দুই প্রতিভা হলেন সান্দর পেট্যাফি (১৮২৩-৪৯) এবং যানস্‌ অরন। পেট্যাফি ছিলেন জনপ্রিয় কবি ; তাঁর লেখায় ছিল সততা এবং প্রত্যয়ের স্বাক্ষর; তাঁর ভাষা ছিল সরল এবং সুস্পষ্ট; তাঁর লিরিক কবিতায় প্রগাঢ় মাধুর্য। যে-কোনো সাধারণ বিষয়েও তিনি কাব্যরসের সঞ্চার করতে পারতেন। তাঁর একটি সুপরিচিত কবিতার নাম "আমার মার মুরগি"; এই কবিতাটিতে অসামান্য দক্ষতায় তিনি সাধারণ হাংগেরিয়ান চাষীর ঘর-গেরস্থালিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর "স্বদেশী" কবিতায় সাহিত্যগুণ ততটা না থাকলেও তীব্র দেশপ্রেমের এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রাবল্যে সেসব কবিতা খুব প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৪৮ সালের হাংগেরিয়ান অভ্যুত্থানের সময়ে তিনি তাঁর সবচাইতে বিখ্যাত দেশপ্রেমের কবিতা "টল্‌পর্‌ মজির" ("হাংগেরিয়ানরা জাগো") স্বয়ং প্রকাশ্যে আবৃত্তি করেন। রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পেট্যাফি প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিলেন। ১৮৪৯ সালে একটি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি বিলুপ্ত হন—কারণ, মৃত্যু অথবা বন্দীত্ব, নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

যানস্‌ অরন ছিলেন পেট্যাফি থেকে ভিন্ন মেজাজের কবি। গ্রাম্য সরলতার বদলে তাঁর কবিতায় অনেক বেশি নাগরিক বৈদগ্ধ চোখে পড়ে। হাংগেরিয়ান ইতিহাস ও গাথাসাহিত্য থেকে তিনি সযত্নে বিষয়নির্বাচন করতেন। নিজের হৃদয়াবেগকে তিনি কবিতায় প্রকাশ করতে চাননি ; প্রেমের কবিতা তিনি আদৌ লেখেননি। অপরপক্ষে তিনখণ্ডে বিভক্ত তাঁর বিখ্যাত কাব্যকাহিনী 'তল্‌দি' হাংগেরিয়ান সাহিত্যের অন্যতম মহৎ রচনা। বাস্তব জগৎ এবং অবাস্তব কল্পনা এই দীর্ঘকাব্যে সার্থক সংযুক্তি লাভ করেছে।

দুই

১৯০৬ সালে অদির 'নূতন কবিতা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ হাংগেরিয়ান সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করে। তাঁর কবিতা গীতধর্মী বটে, কিন্তু পূর্ববর্তী কবিদের মেজাজের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। পূর্ববর্তী কবিরা যেসব প্রচলিত বাক্‌চিত্রের প্রয়োগ করেছেন অদির উন্মথিত আবেগের প্রকাশে তারা অসমর্থ; তাঁর নিউরটিক উচ্ছ্বাস ও বিষঙ্গকে রূপ দেবার জন্য ভাষার বিশিষ্টভাবে প্রতীকী প্রয়োগ অনিবার্য ছিল। পেট্যাফির সরল মোহন প্রেমের কবিতার বদলে অদি আনলেন তীব্র অগ্নিময় প্যাশনের কবিতা; কোমল জ্যোৎস্নালোকিত

রাত্রির প্রেমিকাযুগল রূপান্তরিত হলো আর্ত অন্ধকারের ভাগ্যাহত মিথুনে। অদির কবিতায় প্রকৃতির ভূমিকা সীমাবদ্ধ; সেখানে প্রকৃতি সান্ত্বনার উৎস নয়; তাঁর গাছেরা নিষ্পত্র, অথবা হেমন্তের হাওয়ায় গাছের পাতারা পীতবর্ণ ও কম্পমান। তুষারের হিমস্পর্শে ফুলেরা বিবর্ণ ও নতশির। হেমন্তই অদির ঋতু—যখন দীর্ঘ, রিক্ত, কঠিন শীতের জন্য প্রকৃতি নিজেকে প্রস্তুত করে। তাঁর কবিতার জগতে যখন গ্রীষ্ম দেখা দেয়, তখন সেই গ্রীষ্মে সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে সবকিছুই দগ্ধ, বিধ্বস্ত।

হাংগেরির পূর্বাঞ্চলে এর্ মিন্দসেন্ট্ নামে একটি গ্রামে ১৮৭৭ সালের ২২ নভেম্বর অদির জন্ম। অদির বাবা ছিলেন এখানে ছোট একটুকরো জমির মালিক; সে জমি আকারে এতই ছোট যে লোকে বলত এই জমিতে বড়জোর সাতটি কুলগাছ দাঁড়াতে পারে। অদির মায়ের পরিবার ছিলেন কালভিনপন্থী; কয়েক পুরুষ ধরে তাঁদের বংশে বেশ কিছু মানুষ কালভিনিস্ট যাজক অথবা শিক্ষকের কাজ করেছেন। প্রথমদিকে অদিকে তাঁদের গ্রামের কালভিনিস্ট পাঠশালায় পাঠানো হয়; কিন্তু পাঠশালার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বাবার বিবাদ হওয়ার ফলে ন-বছর বয়সে অদি স্থানীয় ক্যাথলিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। যখন তাঁর এগারো বছর বয়স তখন তাঁকে কাছাকাছি ন্যাজকারল শহরে পিয়্যারিস্ট (ক্যাথলিক) বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। কৈশোর পেরোবার আগেই অদির দুর্নাম রটে তিনি খারাপ মেয়েদের সঙ্গে মেশেন, বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই অভিযোগ আসে। অদির বাবা অতঃপর ছেলেকে জিলই উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন; এটি ছিল প্রটেস্ট্যান্টদের পরিচালিত স্কুল; এখানে ছাত্রদের ধূম্রপান ও মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল না। এখানকার শিক্ষকরা মোটামুটি উদার ছিলেন কিন্তু অদির অমিতাচার তাঁদের পক্ষেও সহনীয় ঠেকেনি। ছাত্র এবং কবি হিসেবে বিদ্যালয়ে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি থাকলেও আচার-আচরণে মাত্রাধিক্যের ফলে তাঁকে বিদ্যালয় থেকে বিতাড়নের ভয় দেখানো হয়। পয়লা নম্বরের মদ্যপ হিসেবে তাঁর নাম এইসময় থেকেই রটে। ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁর বাবা তাঁকে উনিশ বছর বয়সে পাঠিয়ে দেন দেব্রেসেন-এ আইন পড়তে। দেব্রেসেন্ হাংগেরির পূর্বাঞ্চলের একটি ছোটো মফস্বল শহর ; এই অঞ্চলের নাম অলফ্যাল্দ—এখানকার সমতলভূমি উত্তর-পূর্ব হাংগেরি থেকে দানিয়্যুব পর্যন্ত বিস্তৃত। নিয়ত বাতাহত, ধূলিধূসর যে প্রান্তরকে বলা হয় হর্‌ত্‌বাজি, সেটি এই অঞ্চলে অবস্থিত। হর্‌ত্‌বাজির অধিবাসী হলো ঘোড়া গোরু আর ভেড়া, আর যারা তাদের পালক সেই মানুষরা। হাংগেরিয়ান লোকসাহিত্যে এদের নিয়ে অজস্র গাথাকাহিনী রচিত হয়েছে। সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন এই মানুষরা—পশু এবং প্রকৃতির সঙ্গেই যাদের বসবাস—তাদের রহস্যময় জীবন নিয়ে জল্পনাকল্পনার শেষ নেই। গ্রীষ্মে তারা নক্ষত্রখচিত উন্মুক্ত আকাশের নীচে ঘুমোয়, আর শীতে প্রখর হিম হাওয়ার সঙ্গে তারা লড়াই করে। কিংবদন্তী-অনুসারে এই পশুচারকরা একধরনের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী, গ্রাম অথবা শহরের অধিবাসীদের মধ্যে যা মেলে না।

দেব্রেসেন্-এ থাকাকালে অদি হর্‌ত্‌বাজির বিস্তৃত রহস্যময় প্রান্তরের প্রতি গভীর-ভাবে আকৃষ্ট হন ; এখানকার আদিম অনাবাদী সৌন্দর্য তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। পরবর্তীকালে তাঁর কবিতায় হর্‌ত্‌বাজির বহু অনুষঙ্গ লক্ষণীয়।

আইনপাঠে অদি মোটেই মন বসাতে পারেননি। পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে কিছুকাল

তিনি ভ্রাম্যমান অবস্থায় কাটান; তারপর আবার দেব্‌রেসেন্‌-এ ফিরে এসে বাবার ইচ্ছাপূরণ করবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু দেব্‌রেসেন্‌-এর একটি খবরের কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটার ফলে আইনচর্চাকে তিনি চিরকালের মতো পরিত্যাগ করেন। এইসময়ে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়; কিন্তু সেই কবিতাগুলিতে পরবর্তীকালের অদির প্রতিভার পরিচয় মেলে না। অপরপক্ষে এইসময়ে লেখা একটি গদ্যরচনায় তাঁর স্বকীয় মেজাজের উপস্থিতি দেখতে পাই। এখানে অদি লেখেন :

> এই জগতের কোনো কিছুই আমাকে উদ্দীপিত করে না। ...আমি অসুস্থ, নানা অলৌকিক দৃশ্য দেখি। আমার চোখের সামনে সহস্র ছায়ামূর্তি আর দৃশ্য নিয়তই পালটে যাচ্ছে। ...দেখতে পাচ্ছি বুভুক্ষু মানুষের ভীড়; রুটি নিয়ে তারা মারামারি করছে। যেখানে মাটিতে সবচাইতে বড়ো রুটির টুকরো পড়ে সেখানে লড়াই সবচাইতে হিংস্র। ...জনতা জন্তুর মতো আর্তনাদ করছে। ...দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের যাদের মুখের আদল দেবীর মতো, কিন্তু যাদের চোখে কুৎসিৎ আমন্ত্রণের ইঙ্গিত। ...দেখছি অক্ষতযোনি নারীদের যাদের ললাট কলঙ্ক-চিহ্নিত, যাদের পিছনে প্রলোভনের দেবদূতরা দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখছি এক কবিকে যার হৃদয়ের অগ্নিশিখা পুরো জগৎকে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম, কিন্তু যে ঘৃণিত, পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে পচা খড়ের বিছানায় ... হায়, আমি যদি হৃদয়হীন হতাম তাহলেও এইসব অলৌকিক দৃশ্য আমাকে পাগল করে দিতো।[৩]

১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসে অদি পূর্ব-হাংগেরির ন্যাজ্‌বারদ শহরে এসে সেখানে একটি খবরের কাগজে চাকরি যোগাড় করেন। এখানে আসবার বছর তিনেক পরে অ্যাদন দ্যাসির সঙ্গে পরিচয় তাঁর জীবনে নতুন মোড় আনে। স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর স্ত্রী অ্যাদনের কুমারী অবস্থার নাম ছিল অডেল ব্রাল্ল; অডেল নামটির অক্ষরগুলির স্থান পরিবর্তন করে অদি তাঁর কবিতায় এঁর নাম দেন লেইড বা লিডা। এই লেইড হয়ে ওঠেন কবির প্রেরণা। অদি প্রথম দর্শনেই অ্যাদনের প্রেমে পড়েন, কিন্তু এই অভিজ্ঞা বিবাহিতা একত্রিশ বৎসর-বয়স্কা মহিলা যে ছাব্বিশ বছর বয়সী মফস্বলনিবাসী কবি-সাংবাদিকের প্রতি গোড়ারদিকে বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের চিঠিপত্র থেকে তা মনে হয় না। মাদাম দ্যাসি প্রায়ই প্যারি শহরে বেড়াতে যেতেন; অদি তাঁকে অনুসরণ করে সেখানে যান আর সেখানেই তাঁদের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্ক পরবর্তী আট বছর টিঁকেছিল। মাদাম দ্যাসি অদিকে সমকালীন ফ্রান্সের শিল্পসাহিত্যের বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত করেন। এই পরিচয় অদিকে কতটা প্রভাবান্বিত করেছিল সে-সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কিছু বলবার জন্য আরো বিস্তর গবেষণা দরকার।

১৯০৩ সালে অদির যে কাব্যগ্রন্থ ('পুনরায়') প্রকাশিত হয়েছিল তার লেখাগুলিকে মোটামুটিভাবে কাঁচা বলা চলে। কিন্তু ১৯০৬ সালে প্রকাশিত 'নতুন কবিতা' গ্রন্থে তাঁর পরিণত কবিপ্রতিভা প্রকটিত। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর এই অসামান্য বিকাশ রহস্যময়। 'নতুন কবিতা' কাব্যগ্রন্থ লেইডকে উৎসর্গ করে অদি সূচনায় লেখেন :

> এই কবিতাগুচ্ছ চেয়েছিল আর ভালোবেসেছিল একটি মেয়ে—এগুলি তাই সেই লেইডের। আমার ক্ষীয়মাণ জীবনে প্রবল জ্বরের ঘোরে আমি আমার কবিতাকে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিতাম প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ায়, পুড়িয়ে দিতাম নরকের উগ্র অগ্নি-

শিখায় । শুধু এই কটি কবিতাকে আমি দয়া দেখিয়েছি । তাদের বাঁচতে দিয়েছি, ফুটতে দিয়েছি, আর এখন লেইড নামে মেয়ের হাতে তাদের সমর্পণ করলাম ।[৪]

'নতুন কবিতা' কাব্যগ্রন্থে ঘুরে ফিরে এসেছে লেইডের কথা । কিন্তু এদের লেইডের উদ্দেশ্যে রচিত প্রেমের কবিতা বললে অতিসরলীকরণ হবে । এদের চরণে চরণে আবেগের প্রচণ্ড ওঠাপড়া, কামনা ও প্রত্যাখ্যান, বিরহ ও মিলন, প্রত্যাশা ও আতঙ্ক, ছন্দে-ধৃত প্রলাপোক্তি ও অলৌকিক দৃশ্যের আবর্তন প্রচলিত অর্থে প্রেমের কবিতা পর্যায়ে পড়ে না । যে সম্পর্ক এই কবিতাগুচ্ছের কেন্দ্রে, তাতে আনন্দ বা সুখের বিন্দুমাত্র আভাস নেই । বোঝা যায় কবির যন্ত্রণা অসহ্য, কিন্তু তিনি চাইছেন আরো যন্ত্রণা, আরো আঘাত । "আমি এক জ্বলন্ত ক্ষত" নামে কবিতায় তিনি লিখছেন :

জ্বলন্ত, বিষিত এক ক্ষত আমি, প্রদাহ বিসার,
রোদে হিমে সমান যন্ত্রণা,
চাই, চাই তোমাকেই, তোমার জন্যেই শুধু আসা,
হানো আরো, তোমাকেই চাই ।[৫]

তাঁর স্বপ্নের নারী কখনো গণিকা, কখনো কুমারী, কখনো সে রক্তবস্ত্রপরিহিতা, কখনো শুভ্রবসনা, কখনো রাজ্ঞী, কখনো ডাইনি, কখনো স্নিগ্ধ তার চুম্বন, কখনো সে হৃদয়কে উপড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয় । তার সঙ্গে মিলনে কোনো সুখশান্তি আনন্দ নেই, প্যাশনের ঝোড়ো পর্বতশৃঙ্গে সেই মিলনের অনিশ্চিত অবস্থান ।

পাহাড়ের নির্জন দূরারোহ চূড়ায়
উলঙ্গ আলোয় দুই অনাথের মতো
এ ওকে আঁকড়ে ধরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি
চোখে নেই জল, মুখে নেই কথা,
একটু নড়লেই অতলে পতন ।

তবু যতক্ষণ আমাদের দুইজোড়া ঠোঁট
হিমনীল শিহরণে একত্রে পাক খায়
বিক্ষত মাংসের মুঠো থাকে শক্ত
চুমোর বন্ধনে আমরা রক্ষিত,
কথাটি বললেই অতলে পতন ।[৬]

আরেকটি কবিতায় লেইড এবং কবি কল্পিত হয়েছেন নিয়তিদণ্ডিত যুগলরূপে । একটি নৃত্যোৎসবের উষ্ণ নিশ্চিন্ত আনন্দ-অনুষ্ঠানে যেই তাঁরা প্রবেশ করলেন, পরিবেশে সঞ্চারিত হলো হিম আতঙ্ক :

সুরের ধারা বয়, ঊর্ধ্বে ওঠে,
সুখী ও সুরভিত তরুণ-তরুণীরা
পুষ্পমুকুটিত বিলোল নর্তনে,
সহসা সন্ত্রাস তাদের চোখে ।

'কারা এ দুইজন ?' আমরা ঢুকতেই
ত্রস্ত নীরবতা । মৃত্যুপাণ্ডুর
মুখের পরে টেনে আঁধার আবরণ
প্রবেশ আমাদের ছড়িয়ে ঝরাফুল ।

স্তব্ধ সঙ্গীত । জলসাঘরে বয়
শীতের হিম হাওয়া । পাণ্ডু শিখা কাঁপে ।
আমরা নাচি আর ত্রস্ত যুগলেরা
পালায় শিহরিত পিছনে ফেলে সুখ ।[৭]

অদির কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করা খুবই কঠিন । আবেগ-উন্মথিত যে ভাষায় তিনি লিখেছেন, ইংরেজিতে তার অনুরূপ ভাষা মেলে না । তাছাড়া হাংগেরিয়ান ভাষায় অনেকগুলি শব্দকে একত্রে জুড়ে তাদের অন্তে প্রত্যয় যোগ করে সুদীর্ঘ শব্দ রচনা করা যায় যা ইংরেজিতে অথবা অন্য ভাষায় করা খুব কঠিন ।

অ্যাদন দ্যাসির আগে এবং পরে অদির জীবনে অনেক মেয়েই এসেছিল, কিন্তু তিনিই ছিলেন তাঁর প্রথম এবং প্রধান নায়িকা । এই সুবিদগ্ধা মহিলা—যাঁর মুখাকৃতিতে অনুভব করি এক অসামান্য আকর্ষণী শক্তি—কবির চেতনায় এমন এক প্রক্রিয়া সূচিত করেছিলেন, আর কোনো মেয়েই যা পারেনি । যে নারী অদির কবিতার উদ্দিষ্ট, রক্তমাংসের অডেল না হলেও তিনি সেই অডেলেরই ভাবরূপ । সেই নারীকে বর্ণনা করা যায় না, তাকে শুধু অনুভবে ধরা চলে । সারাজীবন ধরে অদি কামনায় পুড়েছিলেন; সেই কামনা কোনো প্রাপ্তিতে পৌঁছয়নি; প্রাপ্তির চরিতার্থতা তিনি আদৌ চেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ ।

এই খণ্ডিত মুহূর্তাবলীর ভিতরেই তোমাকে রাখতে চাই
আর তাই তো তোমার প্রহরীরূপে আমি বেছেছি
দূরত্বকে—যে দূরত্ব সৌন্দর্যসঞ্চারী

আমার আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নরূপ হয়েই তুমি থাক
যাকে চিরদিন ভালোবাসা যায়, যার কাছে
যতই চেষ্টা করি না কেন কখনো পৌঁছন যায় না ।[৮]

অদির অনেক কবিতাতেই প্রাচ্যের প্রতি তাঁর পিছুটান প্রকটিত । প্রাচ্য মহাদেশকেই তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের আদিম নিবাস বলে মনে করতেন । এইদিক থেকেই তাঁকে 'মজির' আত্মার কবি বলা চলে । একদা মজির উপজাতিরা এশিয়ার দূরবিস্তৃত তৃণভূমিতে ভ্রাম্যমান ছিল ; তারই স্মৃতি মজিরদের রক্তে; অদি সেই স্মৃতির অংশভাক্ । অরন অথবা পেট্যোফির অর্থে তিনি 'হাংগেরিয়ান' নন; হাংগেরিয়ান ইতিহাস থেকে কোনো কাহিনী অথবা সেখানকার গ্রাম কিংবা শহরের বর্ণনা তাঁর কবিতায় মেলে না । কিন্তু তাঁর কবিতা এমন একটি মানসিক অবস্থার উদ্রেক করে যা বিশিষ্টভাবেই হাংগেরিয়ান। লোকগাথায় যে অস্পষ্ট অতীত হাংগেরি বিদ্যমান অদি আমাদের সেখানে নিয়ে যান। যা যুক্তি-বহির্ভূত, যাদুবিদ্যা এবং প্রাচীন গুহ্যপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যা যুক্ত, তার প্রতি তাঁর

প্রবল আকর্ষণ। তাঁর কবিতার জগতে অদৃশ্য অশ্বারোহীরা ধাবমান, বিধবা মেয়েরা মাঝরাতে নাচ শুরু করে, পরিত্যক্ত দুর্গে ঘুরে বেড়ায় প্রেতমূর্তিরা।

"প্যারিসিয় প্রত্যূষ" নামে অদির একটি লিরিক কবিতায় তাঁর প্রাচ্য উত্তরাধিকার আর পশ্চিমের প্রতি আকর্ষণের ভিতরে অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্র প্রকাশ দেখি। পূর্বপুরুষদের যে শক্তি ছিল স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ করবার সেটি কবি হারিয়েছেন; পশ্চিমের কাছে তিনি গিয়েছেন মুক্তির প্রত্যাশায়, যে মুক্তি তাঁর অনায়ত্ত। অবশ্য এভাবে অর্থ বিশ্লেষণ করলে কবিতাটির তীব্রতা ও ব্যঞ্জনা অনেকটাই হ্রাস পায়। ইংরেজি অনুবাদে এই কবিতাটি তার ঐশ্বর্য হারিয়েছে। যেমন মূলে আছে 'নপকেলেত' অর্থাৎ সূর্য-প্রাচী; এই শব্দের নিহিতার্থ বৈশ্বিক; ইংরেজিতে শুধু 'ইস্ট' বা প্রাচী শব্দে এই ব্যাপকতা ধরা পড়ে না। মূলে আছে 'টালটস'— যার অর্থ পুরোহিত-ঋত্বিক-যাদুকর; ইংরেজি 'সরসরার' বা যাদুকর-মায়াবী শব্দে টালটস-এর অলৌকিক বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার আভাস মেলে না। এই কবিতাটিতে নায়ক একটি সুর, একটি সুরভির দ্বারা অভিগ্রস্ত, যে সুর সুদূর অতীতে কোনো রহস্যময় ফুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে তাঁর মা হয়তো নিজের মনে গুনগুন করে গাইতেন। দীর্ঘ কবিতাটি থেকে দু'একটি টুকরো দেওয়া যাক :

> আমার মুখে এক অলৌকিক বিভা,
> আমার সাথে ওড়ে প্রগাঢ় নীরবতা,
> ধাক্কা মেরে আমি পাখীর ঘুম ভাঙাই,
> ভোরের আলো ঝরে আমার শিরে। ...
>
> এভো, সূর্যদেব, প্রাচীন অগ্নিশিখা।
> এই বিচিত্র অরণ্য এখনো গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন,
> আমি তোমার পুরোহিত, উন্মত্ত আমার দৃষ্টি,
> তোমার হয়ে আমি এই জগতের দর্শক-প্রহরী।
>
> সূর্য-প্রাচীর আমি শহীদ,
> এসেছি পালিয়ে পশ্চিমে,
> অভিশপ্ত ঋত্বিক মায়াবীদের আমি সন্তান
> পাণ্ডুর আমার মুখ ? দাও সে মুখে রক্তিমা ...
>
> আমার মজ্জির শোণিত আজ নিতান্ত মন্থর,
> শোষে যে প্রতীচী প্রবাহ যেন বিশুষ্ক প্রান্তর।
> সূর্যের আমি শামান, অপহৃত যার শক্তি
> অথবা সূর্যরশ্মি অতীতেই বিক্ষিপ্ত ... [১]

তিন

অদির জীবনযাত্রা তৎকালীন হাংগেরিয়ান সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিন্যাসও সে যুগে ছিল বৈপ্লবিক। তিনি প্রকাশ্যভাবেই র‍্যাডিক্যালদের সমর্থক ছিলেন;

তৎকালীন শাসনব্যবস্থা এবং সমকালীন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল দ্ব্যর্থহীন। তিনি ছিলেন অত্যাচারিতের মুখপাত্র। তবে অদির তথাকথিত 'মজির' কবিতাবলীকেও সঙ্কীর্ণ অর্থে রাজনৈতিক কবিতা বলা চলে না। অন্যায়, অত্যাচার, অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন, কিন্তু সম্প্রতিকালে তাকে যেভাবে 'প্রলেটারিয়েটের কবি' বলে দাবি করা হয় সে দাবি একেবারেই অসংগত। শহরবাসী শ্রমিকের কথা তিনি কোথাও উল্লেখ করেননি, এবং তাঁর কবিতার মেজাজ সংগ্রামাত্মক নয়। তার মূল সুর অপরিসীম বেদনার, কখনো-বা তাতে ব্যঙ্গের আভাস আছে। যারা দুঃখী, প্রত্যন্ত নিবাসী, গ্রামাঞ্চলেও যারা সবচাইতে অবহেলিত তাদের ব্যর্থতাবোধকে তিনি ভাষা দিয়েছেন। প্রতীকী ভাষায় ও লিরিক ঐকান্তিকতায় তিনি রূপ দিয়েছেন সেই অবক্ষয়মুখী পরিবেশকে

এইসব পরিত্যক্ত প্রান্তরে আমি ঘুরে বেড়াই।
অকর্ষিত ভূমি ছেয়ে গেছে নানা আগাছায়,
এইসব পতিত জমি আমার পরিচিত,
মজিরদের অনাবাদী এই প্রান্তর।

আমাকে ঘিরে ধরে যত বুনো আইভি লতা
উপুড় হয়ে যখন দেখি ঘুমন্ত মাটির কেরামতি,
শুকনো পচা ফুলের গন্ধ আমার চারপাশে,
সেই গন্ধে আমার হৃদয় বিবশ, ভাষাহীন।

এখানে কোনো শব্দ নেই। মাটির টানে শয়ান
আমার শরীর ক্রমে আচ্ছন্ন ঘুমপাড়ানি আগাছায়,
আর এখন বইছে হাস্যময়ী হাওয়া
মজিরদের অনাবাদী এই প্রান্তরে [১০]

১৯০৭ সাল থেকে অদির কবিতায় ধর্মীয়ভাব ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে। লেইডা এর সঙ্গে সম্পর্কের ভিতরে যে অনিশ্চয়তার চাপ ছিল তা যেমন দুঃসহ হয় তেমনি যে জনপ্রিয়তা ছিল অদির কাম্য তাও মেলে না। নিজের দুঃখ যন্ত্রণা নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথনের জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। বাইবেল হয় তার নিত্যসঙ্গী, একদিন এক পানশালায় বইটি ফেলে এসেছিলেন বলে দুদিন কাটে অসহ্য যন্ত্রণায় সেই বইয়ের খোঁজে।

১৯০৭-১৯১২ সালের কবিতায় অদির ঈশ্বরকে নানারূপে দেখতে পাই। কখনো তিনি বিচারক দেবতা, কঠিন, দুঃসহ তাঁর দেওয়া শাস্তি। কখনো তিনি এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি, মানুষের প্রতি একেবারে উদাসীন। কখনো সে দেবতা এক 'আদিম পশু' ব্যক্তির স্বাধীনতাহরণেই যার উল্লাস, আবার কখনো বা সে এক 'বিরাট তিমি মাছ' যার পিচ্ছিল পৃষ্ঠে বিশ্বজগৎ নৃত্যপর। "মহাকায় তিমির উদ্দেশ্যে" নামে কবিতায় অদি লেখেন

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, বিরাট, বীভৎস তিমি,
এই বিশ্বজগতে আমাদের নিয়তি কী, বলো।

তোমার পৃথুল পৃষ্ঠে আমরা চলেছি নেচে,
দোহাই তোমার, নড়ো না, পিঠ যে তোমার পিচ্ছিল ।

তোমার পিঠ তো পিচ্ছিল, তবুও তা ধরেছে
আমাদের সব আত্মা এবং বিশ্বপৃথিবী ।
আমিও শুধু এনেছি অপটু পদের উপহার
এবং ভীতু আত্মা, কম্পিত আর অনিচ্ছুক ।

তোমার কাছে প্রার্থনা, সরাও আমার আতঙ্ক
যে আতঙ্ক কুরছে আমার অস্থিমজ্জা ।
দোহাই তোমাব দেখাও তুমি যে নও খ্রিস্টান
এবং নও ইহুদী, একক তুমি প্রভু ।

তোমার পিঠের মাঝখানে আমাকে দাও দাঁড়াতে
খাড়া হবার সুযোগ দাও ঠকঠকে দুই পায়ে
যেন আমিও পারি দেখতে শান্ত স্বপ্ন,
যেন আমিও পারি রুখতে বুকের ধুকপুকি ।

নয়তো আমাকে ফেলে দাও চিরকালেব জন্য,
দোহাই তোমাব থামাও ঈষৎ পিঠ-ঝাঁকানি ।
আর সইতে পারি না । তোমাব মৃত তারাব দল
ছড়ায় হিম আভা আমার মুখের ওপবে । [১১]

এই সময়ের কবিতাগুচ্ছে যে মবিয়া মানুষটিকে দেখি, মনে হয় শেষ অন্ধকার নামবার আগে তিনি প্রাণপণে খুঁজছেন সংগতির কোনো সূত্র । এইসব কবিতায় বিভিন্ন আবেগের মধ্যে কবিচিত্ত দোলায়মান—ভয়, আশা, সংশয়, প্রণতি, অহঙ্কার, আক্রোশ—শুধু প্রার্থনা বা কোনো নির্দিষ্ট ছাঁচের ভিতরে তারা পড়ে না । ফলে ধর্মীয় কবিতা হওয়া সত্ত্বেও এদেব মধ্যে কোনো পুনবাবৃত্তির ভাব নেই ।

লেইডের সঙ্গে অদিব সম্পর্ক এতই দুঃসহ হয়ে ওঠে যে, ১৯১২ সালে অদিকে স্নায়বিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় । হাসপাতাল থেকে অদি লেইডের উদ্দেশ্যে "খারিজপত্র" নামে একটি কবিতা লেখেন ; তারই সঙ্গে একটি গদ্যরচনাও ছিল । গদ্যরচনাটিতে অদি লেখেন :

> যদি কোনো মেয়ের কাছে খুব বেশি প্রত্যাশা করে থাকো তাহলেই সর্বনাশ । তার মৃত্যুর পরেও সে তোমাকে ক্ষমা করতে অক্ষম । তোমার পৌরুষ দাবি করে যে তাকে ছেড়ে তুমি চলে যাও । কিন্তু তার অপূর্ণ, পরনির্ভর সত্তা তোমাকে নিয়ে অতৃপ্ত ভাবনায় নিমগ্ন । প্রতিশোধের বাসনায় সে খুঁজবে এমন কোনো দস্যুকে যে তোমার আত্মসম্মান কেড়ে নিতে পারে । [১২]

লেইডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার পর অদির জীবনের শেষ বছরগুলিতে তাঁর কবিত্বশক্তির দ্রুত ক্ষীয়মাণতা লক্ষণীয় । ১৯১৩ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে বেশ

কয়েকবার স্নায়বিক ব্যাধির আক্রমণে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এই সময়েও তাঁর জীবনে প্রণয়িনীদের আনাগোনা বন্ধ ছিল না। তাঁর কবিতা পড়ে বেরটুক বনজ নামে একটি অল্পবয়সী মেয়ে তাঁর প্রেমে পড়েন। তিনি ছিলেন ট্রানসিলভানিয়ার একটি সম্পন্ন জমিদারঘরের দুহিতা। ১৯১৩ সাল থেকে অদিকে বেরটুক উচ্ছ্বসিত প্রেমপত্র লিখতে শুরু করেন। ১৯১৪ সালের বসন্ত ঋতুতে বেরটুকের নিমন্ত্রণে অদি তাঁদের পারিবারিক প্রাসাদে আতিথ্যগ্রহণ করেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই অদি তাঁর এক বন্ধুকে লেখেন : 'হয়তো বলতে পারো আমার ভীমরতি হয়েছে, কিন্তু পাগলের মতো আমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছি, তার বয়স কুড়ি পেরিয়েছে কিনা সন্দেহ।' [১৩] গোড়াতে বেরটুকের বাবা আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত ১৯১৫ সালে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে অযাজকীয় পদ্ধতিতে অদির সঙ্গে বেরটুকের বিয়ে হয়। অদির জীবনে এটিই সম্ভবত সবচাইতে স্ববিরোধী ঘটনা। যে ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর আজীবন লড়াই সেই ব্যবস্থারই প্রতিনিধি-স্থানীয় একটি পরিবারের কন্যাকে তিনি স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করলেন। এ-সম্পর্কে তিনি তাঁর ভাইকে লেখেন : 'এই ব্যাপারে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি বটে, কিন্তু বিয়ের ফলে আমি পেয়েছি নিজের কাছ থেকে মুক্তি, নিজেকে গোপন করবার আশ্রয়, আর এক নতুন মাদক।' [১৪] বেরটুক কিন্তু শেষ পর্যন্ত একান্ত নিষ্ঠায় অদির সেবাযত্ন করেন। তাঁর তরুণী বয়সের নানা স্বপ্ন অচরিতার্থ হওয়া সত্ত্বেও তিনি অদিকে ত্যাগ করেননি। তিনি সুখী কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বলেন : 'দিনের বেলায় সুখী বটে...।' [১৫]

অদির শেষ বছরগুলি হাসপাতালে-হাসপাতালেই কাটে। বন্ধুদের পরামর্শে তাঁকে একজন মনোরোগচিকিৎসকের কাছে পাঠানো হয়। সেই বিশেষজ্ঞ বলেন অদির কোনো মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। অদি বিশেষজ্ঞের কথা মেনে নেন। কিন্তু ঐ বিশেষজ্ঞ অদির অন্তরঙ্গ বন্ধুদের জানান যে অদি খুবই অসুস্থ, তবে চিকিৎসার দ্বারা কবির সৃজনীপ্রতিভার ব্যাঘাত ঘটাতে তিনি (চিকিৎসক) অনিচ্ছুক।

যেসব ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অদির অন্তর্জীবনকে বিধ্বস্ত করেছিল তাদের তিনি উল্লেখ করেছেন ১৯১৬ সালে লেখা একটি কবিতার প্রথম স্তবকে :

আমার বুকের ওপরে ভেঙেছে বহু বন্দুকের কুঁদা,
আমার চোখের ওপরে আছড়েছে কত সহস্র আতঙ্ক;
আমার গলার নালীতে চেপে বসেছে বোবা এক প্রেত,
আমার মগজে হাতুড়ি ঠুকেছে হিংস্র উন্মত্ততা।[১৬]

সারাজীবন ধরেই অদি দেহে এবং মনে যন্ত্রণা পেয়েছেন, কিন্তু মনে হয় যন্ত্রণাই যেন ছিল তাঁর কাম্য। অনেক তাঁর স্বপ্ন ছিল, বেশিরভাগই পূর্ণ হয়নি, কিন্তু সার্থকতা তিনি চাননি। বন্ধুদের দ্বারা তিনি পরিবৃত ছিলেন, তাঁদের ভিতরে অনেকেই শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতি অনুগত থাকেন, কিন্তু তিনি নিজের ভিতরেই বহন করতেন দুঃসহ একাকিত্বের বোঝা। অসংখ্য মেয়ের সঙ্গে তাঁর প্রণয় হয়, কিন্তু প্রেমের আনন্দ তাঁর কাছে অনাস্বাদিত থেকে যায়। প্যাশনের জন্য তাঁর অতৃপ্ত পিপাসা তাঁকে ধ্বংসের কিনারায় ঠেলে দেয়। তিনি ভেবেছিলেন প্রাচ্যেই বুঝি তাঁর শিকড়; তিনি চেয়েছিলেন প্রতীচ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই জগৎ থেকেই তিনি বিচ্ছিন্ন। এই নিরাশ্রয় বিচ্ছিন্নতাবোধই

তাঁর অধিকাংশ কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ ।

১৯১৯ সালের ২৭ জানুয়ারি অদি মারা যান । মৃত্যুশয্যায় বেরটুক (আদর করে যাকে অদি ডাকতেন চিন্‌স্‌ক বলে) তাঁর পাশেই ছিলেন । অদির কবিতা হাংগেরিয়ান সাহিত্যে শুধু নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেনি, সে সাহিত্যে শিল্পী-বিষয়ে নতুন পরি-প্রেক্ষিতও রচনা করেছে ।

উল্লেখপঞ্জী :

১. হাংগেরির অধিবাসীদের 'মজির' বলা হয় । আদিতে এরা ছিল ফিনো-উগ্রিয়ান গোষ্ঠী, থাকতো উরালস্-এর অপরদিকে । খ্রিস্টিয়যুগের সূচনায় এরা বিতাড়িত হয়ে তৃণ-প্রান্তরবাসী হয়, সেখানে তুর্কি-গোষ্ঠীদের সঙ্গে এদের মিশ্রণ ঘটে । পঞ্চম থেকে নবম শতাব্দীকাল এবা 'অন-ওগুর' (দশতীর)-এর পিছনে এবং আশেপাশে বাস করতো ; তার থেকেই 'হাংগেরিয়ান' নামের উদ্ভব । এরাই হাংগেরির প্রতিষ্ঠাতা ।

২. বান্‌ক্ ব্যক্তির নাম ; বান্ তার উপাধি।

৩. অদি-র কিছু কবিতা হাংগেরিয়ান থেকে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয়েছে । সেই গ্রন্থগুলির তালিকা দেওয়া গেল :
Anton N. Nyerges, *Poems of Endre Ady*, Buffalo, New York, 1969 ; Joseph Grosz and W. Arthur Boggs, *Hungarian Anthology, A Collection of Poems*. Rene Bonnerjea, *Endre Ady : Poems* ; Budapest, 1941.
এখানে উদ্ধৃত অংশটির ইংরেজি ভাষান্তরের জন্য দ্রষ্টব্য : Nyerges, p. 21.

৪. মূল হাংগেরিয়ান থেকে লেখিকাকৃত ইংরেজি ভাষান্তর অবলম্বনে ।

৫. লেখিকাকৃত ভাষান্তর অবলম্বনে ।

৬. ইংরেজি ভাষান্তরের জন্য দ্রষ্টব্য : Grosz and Boggs, p. 100.

৭. দ্রষ্টব্য : Rene Bonnerjea, p.65

৮. ঐ, পৃ. ৪০ ।

৯. দ্রষ্টব্য : Nyerges pp. 80-81

১০. দ্রষ্টব্য . Grosz and Boggs, pp. 107-08.

১১. ঐ, পৃ. ১১৬-১৭

১২. ঐ Nyerges, p. 49

১৩. ঐ, পৃ. ৫২ ।

১৪. ঐ ।

১৫. ঐ, পৃ. ৫৩ ।

১৬. দ্রষ্টব্য : Grosz and Boggs, pp. 129-30

অমিতাভ চক্রবর্তী

রেমোঁ আরোঁ : চিন্তা-জীবনী

'রেমোঁ আরোঁকে সত্য পথে অনুসরণ করার চেয়ে সার্ত্রের সঙ্গে ভুল পথে যাওয়াও ভালো।' এই কথাটি কে বলেছিলেন মনে পড়ছে না। দুই বন্ধুকে প্রশ্ন করলাম, তারা বলল, 'ঠিক, পড়েছি বটে। তবে কার কথা তা মনে নেই।' হয়তো এই ভালো। ব্যক্তিবিশেষের উক্তির সীমা ছাড়িয়ে কথাটি এক সময়ের 'মতবাদিক আবহাওয়ার' পরিচায়ক।

সার্ত্র আর আরোঁকে পাশাপাশি করে দেখা শিক্ষাপ্রদ। ফ্রান্সের গত কয়েক দশকের নানাদিক (চিন্তাশীলদের গুরুভার বই, সাংবাদিকের প্রবন্ধ, রাস্তার মিছিল) এঁদের দুজনের চিন্তার এবং প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। চিন্তা-গুরুদের যুগ গত বলে মনে হয়। এঁরাই হয়তো শেষ জমকালো উদাহরণ।

সাহিত্যিক-দার্শনিক সার্ত্রের খ্যাতির আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি এমনই যে তাঁর পরিচয় দেবার কোনোই প্রয়োজন হয় না। ফ্রান্সের বাইরে আরোঁর খ্যাতি সম্ভবত বিশেষজ্ঞ মহলে আবদ্ধ। সার্ত্রের বহুমুখী দীপ্ত প্রতিভার, তাঁর সৃজনীশক্তির সঙ্গে আরোঁ কখনো নিজের তুলনা করেননি। সহজ, স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছেন সার্ত্রের স্থান উঁচুতে, অন্য স্তরে। তবে সমাজতাত্ত্বিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সার্ত্রের (সর্বদাই সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষিত) মতামত আরোঁর চোখে প্রায়ই আবেগ-আবিল। এইখানে তিনি আনতেন তাঁর 'ক্লার্তে গ্লাসে', চিন্তার শীতল পরিচ্ছন্নতা। কথাটি আরোঁর নিজের নয়। তাঁর বিষয়ে মন্তব্যকারদের এই বিশেষণটির পৌনঃপুনিক ব্যবহার আরোঁর পক্ষে কিছুটা বিরক্তিজনক। তাঁর স্মৃতিকথায় এটি স্পষ্ট (ঐরে আবার; ফ্রঁসোয়া মোরিয়াক্‌ও কি অন্য শব্দ খুঁজে পেলেন না)। হার্দ্য উত্তাপের আপাত অনুপস্থিতি, অনেকের আরোঁকে ঠিক পথেও অনুসরণে আপত্তির হয়তো একটি কারণ। তবে সার্ত্র এবং বামপন্থীদের অনেকের সঙ্গে বিচ্ছেদের মূল কারণ সোভিয়েত রাশিয়া ও ১৯৬৮-র ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে আরোঁর মতামত। এইসব বিষয়ে পরে ফিরে আসব।

আরোঁ ইতিহাসদর্শনের আলোচনা দিয়ে কাজ শুরু করেন।[১] সার্ত্র (তখনও বন্ধু) তাঁর "লেতর্ এ ল্য নেঅঁ" এই লিখে আরোঁকে উপহার দেন: 'আমার কমবয়সের সাথীকে, ইতিহাসদর্শনের ভূমিকা সম্বন্ধে এই তাত্ত্বিক ভূমিকা'।[২] কিন্তু আরোঁ তাঁর চিন্তার ক্ষেত্র ক্রমশ প্রসার করে চলেন। দৈনিক পত্রিকাতেও লিখতে থাকেন। হয়ে ওঠেন (এক ইংরাজ সাংবাদিকের ভাষায়) 'ফরাসিদেশের সবচেয়ে সমাদৃত রাজনৈতিক স্তম্ভলেখক, ফরাসি রাজনৈতিক সাংবাদিকতার বৌদ্ধিক জগতের এক দেবতাবিশেষ'। দৈনন্দিন সংঘাতসঙ্কুল ক্ষেত্রেও তিনি কিছুটা দার্শনিক-দূরত্ব, বিশ্লেষকের শীতল দৃষ্টি বজায় রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন।

সাংবাদিকতায় তিনি সীমিত হয়ে পড়েননি । সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি সব বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহুপঠিত, বহুআলোচিত বই একটির পর একটি লিখে গেছেন । অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি, বক্তৃতার আমন্ত্রণ, জার্মানির 'প্রি গ্যয়তে' এই চিন্তাপরিক্রমার স্বীকৃতি । হেনরি কিসিংগার-এর 'মেমোআর' উৎসর্গীকৃত 'আমার গুরু রেমোঁ আরোঁকে' । আজ সার্ত্র, আরোঁ দুজনেই গত । জীবনের প্রান্তে এসে আরোঁ (ঠাস-বুনন সাড়ে সাতশো পাতায়) তাঁর শেষ বই 'স্মৃতিকথা' প্রকাশিত, আলোচিত দেখে যেতে পেরেছিলেন ।[৩] এতে সব বিষয়ে তাঁর চিন্তা, অবদানের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনস্মৃতি জড়ানো । স্কুলে দর্শনের প্রথম ক্লাসে যে ছাত্র হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে অনুভব করেছিল 'এইখানে মোর স্থান' সে ক্রমশ বাস্তব জগতে কি ঘটছে, কি ঘটতে পারে, কেন, কিরকমভাবে তা বুদ্ধি, বিশ্লেষণ দিয়ে বুঝবার তাগিদে ক্রমাগত ধৈর্যশীলভাবে তার চিন্তাক্ষেত্রের পরিধি প্রসারিত করে চলল । বইয়ের পর বই । অজস্র প্রবন্ধ লিখে, বক্তৃতা দিয়ে, আলোচনা করে সে অন্যদের বোঝাতে থাকলো সে কি বুঝেছে। যখন সে অনুভব করলো সময় বেশি নেই তখন সে সারাজীবনে কি করতে চেষ্টা করেছিল নিজের চোখে কোথায় সফল হয়েছিল কিছুটা, কোথায় হয়নি, অন্যেরা কিভাবে নিয়েছিল তার ব্যথা, বিরক্তি, কৃতজ্ঞতা, আনন্দ—এইসব স্বচ্ছ শৈলীতে গুছিয়ে লিখল । কয়েক পাতায় এবংবিধ এক বইয়ের একটু ধারণা দেবার চেষ্টা করবো।

এক ইহুদী পরিবারে তিন ভাইয়ের জন্ম শতাব্দীর প্রথম দিকে—আদ্রিয়া (১৯০২), রেমোঁ (১৯০৩), রব্যার (১৯০৫) । পিতা তাঁর বুদ্ধি ও শিক্ষার তুলনায় জীবনে যশ, কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি । তাঁর বিফলতার, বিমর্ষভাবের ছায়া রেমোঁ অনুভব করেন অল্প বয়েসই । তীক্ষ্ণধী বড়ো ভাই প্রথম জীবনে টেনিস এবং ব্রিজ খেলায় ধুরন্ধর হয়ে পরে ডাকটিকিট জমিয়ে দিন কাটালেন । বাবার আক্ষেপ যেন আমার দিকে তাকিয়ে কিছু লাঘব হয়—এই ভাব দ্বিতীয় পুত্রের মনে প্রথম থেকেই ছিল । তাঁর বাবা বেশিদিন বাঁচেননি । কিন্তু সরবনে প্রফেসর হওয়া, বিশেষ সাম্মানিক উপাধি পাওয়া এসব মুহূর্তে রেমোঁর মনে হতো বাবা দেখলে খুশি হতেন ।

আগেই বলেছি স্কুলে দর্শনের প্রথম ক্লাসেই কিশোর রেমোঁর সামনে খুলে যায় এক আশ্চর্য জগৎ । (ফরাসি শিক্ষাব্যবস্থায় স্কুল থেকেই দর্শনচর্চা আরম্ভ হয় ।) চিন্তা দ্বারা, বিশ্লেষণের মাধ্যমে জগৎকে, মানুষকে বোঝার চেষ্টা—এ এক অপূর্ব অনুভূতি । তখনই এইসঙ্গে বুঝলেন গণিতে তিনি অস্বচ্ছন্দ—পাশ কাটাতে হবে ঠিক করে নিলেন। এরপরে একোল নরমালের স্মৃতির উজ্জ্বল অধ্যায় ।—[ফ্রান্সে বাকালোরেয়া পরীক্ষা দিয়ে স্কুলের পর্ব শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্যে ফ্যাকালটিতে সরাসরি না গিয়ে দুবছর কঠোর পরিশ্রমে তৈরি হয়ে, প্রতিযোগিতায় সফল হলে কোনো একটি 'গ্রাঁদজেকোল'-এ ঢোকা যায় । দেশের 'এলিত্' এইসব একোলেই তৈরি হয় ।] আরোঁ লিখছেন—'হয়তো কারো কারো হাসি পাবে, কিন্তু সোজাসুজি বলছি এখানে এসে আমার মন আনন্দে, বিস্ময়ে ধাঁধিয়ে গেল । এত অল্প পরিসরে এত বুদ্ধিওয়ালা মাথার সমাবেশ কখনও দেখিনি। আর এই দীপ্ত মণ্ডলীর মধ্যে আমরা আর সবাই জঁ-পোল সার্ত্র আর নিজাঁকে বিশেষ স্থান দিতাম ।'

পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে এই মূল্যায়নের সম্পর্ক ছিল না । শেষের পরীক্ষায় প্রথম

হন আরোঁ, সার্ত্র ফেল করেন প্রথমবার, নিজাঁ আগেই ছেড়ে চলে যান। অবশ্য সার্ত্র পরীক্ষায় নিজের মতামত জাহির করা বিপদজনক বুঝে সামলে নিয়ে দ্বিতীয়বারে খুবই ভালোভাবে প্রথম হন। সার্ত্রের আত্মবিশ্বাস বরাবরই পূর্ণ, প্রবল। আরোঁ লিখেছেন: 'সার্ত্রের সঙ্গে কথা হলো, ও বিখ্যাত দার্শনিক হবে সে বিষয় নিশ্চিত। বলল, হ্যাঁ, হেগেলের সমস্তরে তো যাবই, তবে তার ওপরে উঠতে গেলে সত্যি খাটতে হবে।' আরোঁ তাঁর ডিপ্লোমার জন্যে লিখেছিলেন কান্টের বিষয়ে।[৪] এইসময় ফ্রান্স দর্শনে সৃষ্টির কেন্দ্র তা বলা যায় না—বের্গসঁ বৃদ্ধ, স্তিমিত, আল্যাঁ এবং ব্রুনশভিক ফরাসি ছাত্র এবং অ্যাকাডেমিক মহলে প্রভাবশালী এইমাত্র বলা যায়। এতে আরোঁর ঠিক মন ভরছিল না। তবে অন্যপথে সুযোগ এল, নতুন আর এক জগৎ খুলে গেল। বইটির তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম "জার্মানি আবিষ্কার"।

কল্‌ন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেও স্পিৎজের-এর সহকারীর কাজ নিয়ে আরোঁ জার্মানি আসেন ১৯৩০ সালে। এইখানে কয়েক বছর তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। 'জার্মান কৃষ্টি চিরকালের জন্য আমার মনোহরণ করলো।' কাণ্ট, হেগেল আগেই পড়েছিলেন। এবার আনন্দ বিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন হুসের্ল, হাইডেগের। ফ্রান্সে তখন দ্যুর্কাইম-এর শিষ্যদের সমাজতত্ত্বের শিক্ষার একচ্ছত্র প্রভাব। দ্যুর্কাইমের ফরমূলা 'ঈশ্বর কিংবা সমাজ' আরোঁর বিরক্তিকর লাগত। ধর্মের বদলে সমাজের নাম করে নীতিশিক্ষা দেওয়া তাঁর কাছে ক্যাথলিক শিক্ষাপদ্ধতির সহজ ভঙ্গুর রূপান্তর মনে হতো। এবার খোঁজ পেলেন নতুন সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার। আরোঁ বরাবরের মতো একজনের ভক্ত হয়ে পড়লেন: ম্যাক্স ভেবের-এর। এই প্রথম পড়লেন মার্ক্স-এর 'কাপিতাল'। [এই সময় একটি ক্ষেত্রে চিন্তায় যে গভীর, সুদূরপ্রসারী বিপ্লব ঘটছিল সে বিষয় কিন্তু মনে হয় যে আরোঁ অচেতন থেকে গেলেন। বিষয়টি কোয়াণ্টাম ফিজিক্স-এর অভ্যুত্থান। এর একটি প্রধান কেন্দ্র জার্মানির গ্যতিংগেন। হাইসেনবার্গের নাম কোথাও নেই। আইনস্টাইনের নাম অবশ্য একপাতায় আছে। আরোঁর গণিত-বিমুখতাই কি এর কারণ? আইনস্টাইনের ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই হয়তো দার্শনিকেরা আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে দ্রুত সচেতন হন। সময়ের রহস্য এইদিক থেকে বোঝার কিছুটা চেষ্টা করেন। কোয়াণ্টাম্ থিয়োরির গভীরতর বিপ্লব-সম্পর্কে চেতনা আসতে সময় যায়।]

জার্মান ছাত্রদের ফরাসি পড়াচ্ছেন আর প্রবল উৎসাহে দর্শন, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি পড়ে চলেছেন। রজনী সেনের ভাষায় গামছা পরে নেমে গেছেন। এইভাবে এইসময়ে জীবনের লক্ষ্য তাঁর মনে ক্রমশ রূপ নিল। শুধু অধিবিদ্যা নিয়ে থাকার ইচ্ছা আর রইল না। ইতিহাসের পটভূমিতে মানুষকে বুঝতে হবে—এবং এই প্রচেষ্টায় থাকবে দার্শনিক বিশ্লেষণের কঠোর শৃঙ্খলা। বাস্তব জগৎকে গভীরভাবে বুঝতে হবে। কিন্তু দৈনন্দিন ঘটনার জঙ্গলে পথ যেন না হারায়। আমি (ফরাসি, ইহুদি) এই বিপুল সমাবেশের অণুমাত্র—আমি কি আমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণের বাইরে জায়গা করে এই সমগ্রকে বুঝতে পারি? এই হবে আমার সাধনা। রাইন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে একদিন তরুণ আরোঁ এই সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ছোটভাইকে আবেগে-ঝাপসা এক চিঠি লিখে ফেললেন। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে দর্শন, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি-এসবের চর্চা একত্রে

করতেই তো হবে। কিন্তু আরোঁর এ প্রচেষ্টা তো শুধু এ্যাকাডেমিক থাকার উপায় ছিল না। তাঁর জার্মানি নিবাসকাল ১৯৩০-৩৩। নাৎসী জার্মানির উত্থান তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। হ্বাইমার রিপাব্লিক মৃত্যুপথে। বন্ধু গোলো মানের সঙ্গে একত্রে দাঁড়িয়ে দেখেছেন গ্যব্বেল্স্ দলবল নিয়ে রাস্তায় বই আগুনে পোড়াচ্ছে—ফ্রয়েড, টমাস্ মান, মুসিল পুড়ছে, বর্বরতার শিখা কৃষ্টিকে গ্রাস করছে। চলমান ইতিহাসকে বুঝতে হবে, এ তাগিদ আরও গভীর হয়ে উঠল। এই সময়েই আলাপ হয় আঁদ্রে এবং ক্লারা মাল্‌রোর সঙ্গে। এক স্থায়ী বন্ধুত্বের সূত্রপাত। প্রথম দেখা হয় সুজান্ গোশোঁর সঙ্গে, তাঁর ভাবী স্ত্রী এবং সারাজীবন-সঙ্গিনী।

ফ্রান্সে ফিরে উদ্বিগ্ন আগ্রহে আন্তর্জাতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ, কঠোর পরিশ্রমে দ্রুত পরপর তাঁর প্রথম তিনটি বই লিখে ফেলা এবং সরবনে ডক্টরেট থিসিসের 'ডিফেন্স' — যুদ্ধের আগে কয়েকটি বছর আরোঁর দেখতে দেখতে কেটে যায়। প্রথম তিনটি বইয়ের নাম থেকেই বোঝা যায় যে আরোঁ তার লক্ষ্যপথে দৃঢ় সঙ্কল্পে এগিয়ে চলেছেন: 'সমসাময়িক জার্মান সমাজবিদ্যা' (১৯৩৫), 'ইতিহাসদর্শনের ভূমিকা' (১৯৩৮) এবং 'সমসাময়িক জার্মানির এক ইতিহাসতত্ত্ব বিষয়ে নিবন্ধ'।[৫,৬,৭]

আরোঁব থিসিস্ দ্বিতীয়টিকে ভিত্তি করে। পরের এডিশনে সংযোজিত একটি প্রবন্ধের নাম বিষয়কে স্পষ্টতর করে।[৮] বইটির যথোপযুক্ত আলোচনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু দু-একটি কথা বলা দরকার মনে হয়, তদানীন্তন ফরাসি অ্যাকাদেমিক-আঁতেলেক্‌তুয়েল আবহাওয়ার পরিচয় হিসাবে। ফ্রান্সে থিসিসের 'সুতনঁস্' শুধু লিখে খালাস হওয়া যায় না। একদিন এক জুরির মুখোমুখী হয়ে প্রশ্নোত্তরের আসরে দীর্ঘ সময় ধরে নিজের থিসিস্‌কে সমর্থন করতে হয়। দর্শন, সমাজতত্ত্ব এইসব বিষয়ে প্রশ্ন ও মন্তব্য রীতিমতো আক্রমণাত্মক হতে পারে। অন্যান্য দেশে কতদূর এইরকম হয় বা হয় না, তা আমি ঠিক জানি না। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল বিখ্যাত সমাজশাস্ত্রজ্ঞ বুরদিয়্য এক ক্যাণ্ডিডেটকে বলেছিলেন: 'তুমি যা বল্‌ছ শুনে মেরে তোমার মুখ থেঁতলে দেবার ইচ্ছা হচ্ছে'। এতদূর অবশ্য সহজে গড়ায় না। আরোঁকে যখন তাঁর থিসিসের সমর্থনে প্রশ্নোত্তরের জন্য বসতে হয় তখন জুরির একজন মন্তব্য করেন, লোকটা মরিয়া না শয়তান ? আরোঁ জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসজ্ঞান কি তা বোঝার চেষ্টা করছেন। তাতে এমন কি থাকতে পারে যে কেউ কেউ এতটা উত্তেজিত হন যে তাকে শয়তানি বলেন ? ঐ সময় দ্যুর্কাইম, ব্রুনশ্‌ভিক ইত্যাদির স্থানীয় প্রভাবে ফ্রান্সে দার্শনিক-সমাজতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক চিন্তা বেশ আদর্শবাদী, আশাবাদী ছিল। হিটলারের ধাপে ধাপে ক্ষমতালাভ সত্ত্বেও বিভিন্ন সমাজের বিবর্তন যে মূলে উন্নতির দিকে নয়, তা মানা কঠিন ছিল ঐ মহলে। আরোঁর বিশ্লেষণ এই আশাবাদের বিরুদ্ধে যাওয়ায় কারু কারু অসহ্য লাগে। নিজের বই থেকে আরোঁর উদ্ধৃতিগুলি পড়লে আজ মনে হয়—এসব তো অতি সাধারণ কথা। এসব ছাড়া তাঁর মূল প্রচেষ্টা ছিল অনুধাবন এবং কার্যকারণ এই দুটি প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ ইতিহাসের গতিবিধির পরিপ্রেক্ষিতে। আরোঁর উপাধি লাভ হলো এবং তাঁর কাজের প্রচুর সমাদর ও প্রচারও হলো।

এই থিসিস্ ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে ফ্রঁ পপ্যুলের এল, গেল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ ঘটল। হিটলার ক্রমশ ক্ষমতা বিস্তার করতে থাকাকালে ফ্রান্সে দলাদলি ঝগড়াঝগড়ি, ক্ষণস্থায়ী মন্ত্রীসভার প্রহসন চলতে লাগল। তারপরে এল ১৯৩৯ এবং মহাযুদ্ধ। আরোঁকে দেখি ফরাসি সৈন্যের ইউনিফর্মে (সার্জেন্ট) কিন্তু এক আবহাওয়াতত্ত্বের কেন্দ্রে কাজে নিযুক্ত। শেষ পর্যন্ত এক ব্রিটিশ জাহাজে চড়ে লণ্ডনে পৌঁছোন। সেখানে তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। অঁদ্রে লাবার্থ প্রতিষ্ঠিত 'লা ফ্রাঁস লিবর্' কাগজে নিয়মিত প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় লিখতে শুরু করলেন। আরোঁর কলম এই পত্রিকাকে একটি বিশেষ স্তরে নিয়ে যায়। দ্যগোলের প্রোপাগ্যাণ্ডা বা জার্মানির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহ্বান একভাবে চালিয়ে যাওয়া আরোঁ তাঁর কাজ মনে করেননি। যা ঘটছে তার তাৎপর্য কি যথাসম্ভব শান্তভাবে তাই বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করতেন তাঁর লেখায়। এইজন্যেই এইসব প্রবন্ধের সংগ্রহ আজও ঐতিহাসিকদের কাছে মূল্যবান। তবে নিঃশর্ত সমর্থক না হওয়ায় দ্যগোল ক্রমশই আরোঁর ওপর বিরূপ হয়ে ওঠেন। একটি বিষয়ে আরোঁ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন—'তখন বুঝতে পারিনি, কারণ ভাবতে পারিনি'। হিটলার-অধিকৃত ইউরোপে ইহুদিদের অবস্থা কিরকম, ভিশি সরকারের এ-বিষয়ে ঘৃণ্য সহযোগিতা—সবই তাঁর জানা ছিল, শুধু চরম সত্যটি ছাড়া। তিনি আউশ্‌ভিৎস্-বির্‌কেনাউ, ত্রেব্‌লিঙ্কার গ্যাসচেম্বারের কথা জানতেন না। তিনি মনে করেন এ-খবর তাঁর জানা সম্ভব হয়নি কারণ এটা কল্পনা করা সম্ভব হয়নি। তিনি জানলে এবং লিখলে অবস্থা নিশ্চয় কিছুই বদলাতো না। তবু অপরাধ বোধ না করে উপায় কি?

যুদ্ধের পরে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্-এ উঁচুপদ প্রত্যাখ্যান করে ফ্রান্সে ফিরে এলেন। নতুন যে জীবন আরম্ভ করেছেন তার স্বাদ তখনও আকর্ষণীয়। আরোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ না খুঁজে সাংবাদিকতায় পুরোপুরি নেমে পড়লেন। নানা কাগজে, বিশেষ করে 'ফিগারোতে' নিয়মিত লিখতে শুরু করলেন। ('ফিগারো' রক্ষণশীল কাগজ।) এর ফলে বামপন্থীরা অনেকেই ক্রমশ আরোঁকে বিরুদ্ধদলীয় হিসাবে দেখতে শুরু করেন। আরোঁর বিচার অনুসারে বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী বলে দেওয়াল তুলে আলাদা করা বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। মূল বিরোধ গণতন্ত্র আর সার্বিক একনায়কতন্ত্রের মধ্যে। স্তালিনের সোভিয়েত রাশিয়ার সমালোচনা ফরাসি বামপন্থী মহলে, শুধু কম্যুনিস্টদের নয়, আরও অনেকের কাছেই তখন অসহ্য। সার্ত্র, ম্যারলো-পোঁতি প্রমুখ অনেক প্রখ্যাত 'তারকা' আরোঁর বিরুদ্ধে উগ্র 'পোলেমিক্' শুরু করেন। সার্ত্রের সঙ্গে নরম্যালের বন্ধুত্ব ক্রমশই ক্ষয়ে যেতে থাকে।

আরোঁর মনেও ক্রমশ অস্বস্তি জমে ওঠে। এই ধরনের জার্নালিজম কি তাঁর কাজ? তাঁর বাবার আক্ষেপ মনে পড়ে। জীবনের সদ্ব্যবহার করছি কি? একটি পরিচ্ছেদের প্রথম লাইনে পড়া যায়—'ভাবছিলাম এটির মাথায় লিখব দশটি বছর নষ্ট'। অবশ্য পত্রিকায় লেখা ছাড়াও এই সময়ে তিনি নানা দেশে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সমিতিতে বক্তৃতা দিয়েছেন। বইও লিখেছেন, যার মধ্যে 'লা গ্রাঁ শিজম্' বেশ নাম করে—এক দার্শনিক-জার্নালিস্টের আন্তর্জাতিক অবস্থার বিশ্লেষণ। একটি বিতর্কের ঝড়-তোলা বই লিখে তিনি জীবনের এই পর্ব শেষ করেন: 'বুদ্ধিজীবীদের অহিফেন'। বামপন্থীদের সমবেত প্রবল সমালোচনা স্বাভাবিক। ধর্ম-সম্পর্কে মার্কসের ব্যঙ্গোক্তি ঘুরিয়ে মার্কসিজম্-এর ঘাড়ে

চাপালে, মার্কসের প্রতি শ্রদ্ধায় ঝিমন্ত চোখে সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রকে দেখে তার স্বরূপ বুঝতে পারছে না এই অভিযোগ করলে, বামপন্থীদের পক্ষে তা মানা শক্ত। খ্যাতি, অখ্যাতি দুই-ই হলো । জুলিয়াঁ বাঁদা-র বিখ্যাত 'লা ত্রয়িজঁ দে ক্লের্ক' [১০] এর সঙ্গে নানাভাবে (প্রশংসা বা হেনস্থা করার জন্য) তুলনা করা হলো। আরোঁ লিখছেন, 'আমার বই-এর মধ্যে শুধু এইটির সমালোচনা প্রতিটি লেখক নিছক দলীয় আনুগত্য হিসাবে করলেন ।'

যাই হোক এরপরেই আরোঁ জীবনের মোড় ঘোরালেন আবার । সরবনে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপকের পদ নিলেন । এইখানে শুরু হলো তাঁর স্মৃতিকথার তৃতীয় অধ্যায় (১৯৫৫-৬৯)—নানা ঝড়ঝাপ্টার স্মৃতি মিশিয়ে আছে । ১৯৫৬ সালেই পরপর তিনটি ঘটনা ইউরোপ আলোড়িত করে । ক্রুশ্চেভের বক্তৃতা (সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে), হাঙ্গারির বিপ্লব এবং নাসেরের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধাভিযান সুয়েজ উপলক্ষে । ফরাসি বুদ্ধিজীবীরা অভ্যাস এবং ঐতিহ্যমাফিক অবশ্য হৈ চৈ বিতর্কে ঝাঁপিয়ে পড়েন । কিন্তু ভেদ, বিরোধ, তিক্ত আক্রোশ চরমে ওঠে এর পরের বছরগুলিতে আলজেরিয়ানদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ঘিরে । আগে ভিয়েৎনামের বিষয় আরোঁ বিশেষ কিছু লেখেননি । কিন্তু 'লা ত্রাজেদি আলজেরিয়েন' (১৯৫৭) লিখে বহু শত্রু (এবং অনেক সমর্থকও) সৃষ্টি করলেন । সোজাসুজি লিখলেন আলজেরিয়ার স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী। এ এখনি স্বীকার করে নিয়ে ওখানে বসতি করা ফরাসি 'কোলোঁ'দের ফিরিয়ে আনতে হবে। পরে এ সবই হলো । তবে প্রথমেই সোচ্চার কণ্ঠে বলার গুণ বামপন্থীরা প্রায় কেউই স্বীকার করলেন না এবং অনেক ফ্যানাটিক-এর চোখে আরোঁ বরাবরের মতো শত্রু হলেন। এই পর্বের শেষের দিকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল এক বৈপ্লবিক দমকা হাওয়া, ১৯৬৮-র মে মাসে । সেকথায় আসার আগে আরোঁর শিক্ষক জীবনের দিকে তাকানো যাক ।

সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে অধ্যাপক আরোঁ সমাজতত্ত্বের ক্লাসে নতুনত্ব আনলেন। অ্যাকাদেমিক সমাজতত্ত্বের সঙ্গে রাজনীতি, অর্থনীতি মিশে বাস্তব জগতের হাওয়া ক্লাসঘরে ঢুকল । আরোঁ লিখছেন, 'কম্যুনিস্ট ছাত্ররা আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য ওৎপেতে থাকত, তাই আমায় প্রথমেই প্রমাণ করতে হতো যে মার্কসীয় দর্শন এবং অর্থনীতি খুব ভালোই জানি । তারপরে তারা মন দিয়ে শুনত অনেকেই ।' তাঁর 'কুর' (কোর্স)-গুলি প্রায়ই বই হয়ে বেরত যেমন—'শিল্পপ্রধান সমাজ'; 'শ্রেণী সংগ্রাম'; 'গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র' ।[১১,১২,১৩] এগুলি কয়েকবছর পরে বই হয়ে বেরোয় । এই নামগুলি থেকেই আরোঁর সমাজতত্ত্বের ক্লাসের আবহাওয়ার আভাস পাওয়া যাবে ।

ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর মনের মতন হয় না । সহকারীদের সঙ্গে সম্পর্কও সবসময় সহজ থাকে না । এতে তিনি কিছুটা নিজের দোষ দেখেন (আমি বরাবরই একটু বেশিমাত্রায় স্পর্শকাতর) । আর কিছুটা ফরাসি ফ্যাকালটির আবহাওয়ার, ফরাসি 'সিস্টেমের' দোষ । বিদেশে প্রায়ই বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পান । দেখেন আমেরিকান, জার্মান, ইংরাজ সব ছাত্ররাই বেশ সহজে এগিয়ে এসে মন খুলে কথা বলে, আলোচনা করে । ফরাসি ছাত্ররা সাধারণত চুপচাপ বসে থাকে । তবে গুণী সহকারী বা ছাত্রদের

তারিফ করে লিখতে ভোলেননি ।

আরোঁ বাক্যবিন্যাসের সাহায্যে তথ্যের ও বিশ্লেষণের দুর্বলতা ঢাকার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন । ফলে তিনি জুরিতে থাকলে থিসিসের ডিফেন্সে মাঝে মাঝে বেকায়দা অবস্থার সৃষ্টি হতো । আল্যাঁ তুরেন বিখ্যাত সোসিওলজিস্ট । তাঁর থিসিসের সুতনঁসের স্মৃতি তিনি ভুলবেন না । তিনি নিজেই আরোঁকে জুরিতে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন । কিন্তু আরোঁর মনে হয়, যেসব দার্শনিকতত্ত্ব তুরেন তাঁর থিসিসে ঢুকিয়েছিলেন সেগুলির ওপর তুরেনের যথেষ্ট দখল ছিল না । আরোঁ লিখছেন—'তুরেন তাঁর বক্তব্যের অবতারণা করলেন বিজেতার উদ্দীপনা নিয়ে, উপসংহার করলেন স্প্যানিশ কবিতা দিয়ে । তারপর সভাপতি আমাকে আলোচনায় যোগ দিতে অনুরোধ করলেন । আমি প্রথমেই বললাম, এবার মাটির কাছাকাছি নেমে আসা যাক । তারপরে শুরু হলো সমালোচনা । তুরেন নিরুৎসাহ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম করলেন । দমবন্ধকরা আবহাওয়া । আর এক জুরি ফিস্‌ফিস্ করে আরোঁকে বললেন, 'এ বড়োই বাড়াবাড়ি, অসম্ভব ব্যাপার করে তুলছো ।' (যাই হোক শেষরক্ষা হয়েছিল) ।

এই সময়ের সরবনের লেকচারের সঙ্গে হার্ভার্ডের লেকচার একত্র করে পরে আরোঁ তাঁর একটি বড়ো কাজ প্রকাশ করেন : 'জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ ও শান্তি' ।[১৪] এর চারটি ভাগ—থিওরি, সোশিওলজি, হিস্টরি, প্রাক্সিওলজি । এর প্রথম অংশের মূলে ক্লাউসেভিৎস্-এর চিন্তার 'আরোনিয়ান' বিশ্লেষণ । ক্লাউসেভিৎস্ বহুদিন থেকেই আরোঁকে মুগ্ধ করেছেন । পরে কলেজ দ্য ফ্রাঁস-এ দেওয়া লেকচার ভিত্তি করে লেখেন আর একটি বই, 'যুদ্ধ নিয়ে চিন্তা : ক্লাউসেভিৎস্' ।[১৫] এই দুটি বই, 'ওপিয়ম্' এবং 'ইতিহাসদর্শনের ভূমিকা'—মোট এই চারটি বই আরোঁকে কিছুটা সন্তোষ দেয় বিগত জীবনের দিকে ফিরে তাকালে । লেনিনও ক্লাউসেভিৎস্-এর গুণগ্রাহী ছিলেন—তাঁর কপির মার্জিনে নানা মন্তব্য পাওয়া যায় । ক্লাউসেভিৎস্ লিখছেন, 'বিজেতা সর্বদাই শান্তিপ্রিয়; আমাদের দেশে শান্তিপূর্ণভাবে ঢুকে পড়তে খুবই চায় ।' মার্জিনে লেনিনের হস্তাক্ষরে মন্তব্য : 'আহ্, চমৎকার' ! জার্মান বিশেষজ্ঞ কারেল শ্মিট লিখলেন আরোঁকে 'তোমার বই পড়লেও লেনিন মার্জিনে এইরকম সব মন্তব্য করতেন' । ক্লাউসেভিৎস্ এর বিখ্যাত বচন : 'যুদ্ধ হলো রাজনীতিরই এক ভিন্নরূপী প্রলম্বন' । আরোঁ রাজনীতি বুঝতে গিয়ে ঠিক করেছিলেন যুদ্ধ কি তা বুঝতে হবে । অতএব ক্লাউসেভিৎস্ এবং পারমাণবিক অস্ত্রের যুগে রণকৌশল এবং রাজনীতির 'রূপান্তরিত প্রলম্বন' সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করতে শেখা ।

এইভাবে আরোঁর সরবনের বছরগুলি কেটে যাচ্ছিল । কিন্তু এসে পড়ল ১৯৬৮ সালের মে মাস । "উনি আমাদের বুঝলেন না" পরিচ্ছেদে এই পর্বের কাহিনী । ছাত্র আন্দোলন দিয়ে আরম্ভ । দেশব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘট তার সঙ্গে যুক্ত হয় । ছাত্রদের স্বপ্ন সব অথরিটি বা কর্তৃপক্ষ উল্টে ফেলে নতুন সমাজের, নতুন জীবনের পত্তন । তাদের স্লোগান 'নিষিদ্ধ হোক নিষেধ' ।[১৬] এই ধরনের অ্যানার্কিষ্ট উদ্দীপনা থেকে কম্যুনিস্ট পার্টি শ্রমিক আন্দোলনকে সন্তর্পণে আলাদা করে রাখল । তাদের লক্ষ্য আলাদা থাকল।

ছাত্রদের দিকটি দেখা যাক । ফ্রান্সের অত্যধিক কেন্দ্রীকৃত শিক্ষাব্যবস্থায় তখন বিশ্ববিদ্যালয় বলতে প্রায় শুধু পারিই আছে বলা যায় । কাতারে কাতারে ছাত্র । প্রফেসররা

সব 'ম্যাণ্ডারিন'; তাঁরা আবির্ভূত হয়ে প্রামাণিক ব্যাখ্যাভাষ্য দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যান। অনেক ছাত্রই চুপচাপ নিরুৎসাহে লেকচার শোনে । এ শুনে কি হবে, পরে কি করব —দুশ্চিন্তার ভাব । এই শিক্ষার জোরে কর্মজীবনে পথ করে নেওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিল । এলিতরা আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে 'গ্রাঁদজেকোল' থেকে। এইসব অসন্তোষ বিস্ফোরণ আনে । তবে ছাত্ররা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যারা সমাজব্যবস্থাও পালটাতে চাইছিল। সার্ত্র মাঝে বেশ কিছুদিন কম্যুনিস্ট পার্টির পথের সাথী ছিলেন। এবার তিনি পূর্ণ সহানুভূতি নিয়ে এই ছাত্রদের সঙ্গে হাত মেলালেন । আর আরোঁ রইলেন 'হিমশীতল'। দ্রুত একটি বই লিখলেন : 'বেঠিকানা বিপ্লব' ।[১১] বইটির বিষয় কয়েকটি কথার আগেই এর প্রতিক্রিয়া দেখা যাক ।

আরোঁর বিরুদ্ধে বিপ্লবী ছাত্রদের বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল । সার্ত্রের আক্রমণ হলো অতি কঠোর । তিনি লিখলেন, আরোঁ শুধু তাঁর পুরোনো ধারণাগুলির পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন—তাঁর বক্তব্য জ্ঞানের ওপরে দাঁড়িয়ে নেই । ক্লাসে সমালোচনার সুযোগ না থাকায় ছাত্ররা বাধ্য হয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনে । আরোঁর মনে হলো তাঁকে আঘাত করার জন্য সার্ত্র ব্যবহার করছেন সচেতন মিথ্যাভাষণ । তিনি অত্যন্ত আহত হলেন । উত্তর দিলেন না তখনই ।

তবে শুধু চরমপন্থীরা নয় অন্য অনেকেও আরোঁর দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে পারল না। একজন লিখলেন '...যে ছাত্ররা তোমার ভক্ত ছিল এবং মোটেই ক্রুদ্ধ নয়, তারাও বলছে রেমোঁ আরোঁ আমাদের বুঝতে পারেননি ।'

আরোঁ এই বিক্ষোভের ভিতরে বিপ্লব খুঁজে পাননি । তাঁর কাছে এ ছিল অলীক বিপ্লব । প্রথম কথা রাষ্ট্রের ও সমাজের গভীর ওলটপালট সম্ভব ছিল না । কম্যুনিস্ট পার্টি অ্যানার্কির ছোঁয়াচ এড়ানোর জন্য শ্রমিক-ছাত্র ঐক্য হতে দেয়নি । এমনকি যদি দ্যগোল ক্ষমতা ত্যাগ করতেন তাহলে (আরোঁর মতে) ম্যাঁদেস ফ্রঁস শাসনভার নিতেন এবং পার্টির শাসন বহাল থাকত, ওপর ওপর কিছু পরিবর্তন হলেও । দ্বিতীয় কথা, ছাত্রদের কতকগুলি দাবি (শিক্ষক নির্বাচনে ছাত্রদের ভোট, থিসিসের জুরিতে ছাত্রদেরও থাকা ইত্যাদি) মেনে নিলে সব বন্ধন মোচন না হয়ে উল্টে শিক্ষাব্যবস্থার গলায় ফাঁস পড়ত। কারণ সবচেয়ে শৃঙ্খলিত ও সংগঠিত কয়েকটি রাজনৈতিক দলের ছাত্ররা তাদের প্রতিনিধি বসাতো সর্বত্র । শিক্ষকের রাজনৈতিক আনুগত্য ছাড়া অন্য কোনো যোগ্যতার দাম থাকত না । উপাধি পেত সহজে বিশেষ বিশেষ দলের ছাত্ররা—বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে । পলিটিকস্ শিক্ষার টুটি টিপে ধরত । এইরকম ছিল আরোঁর বক্তব্য। এইসব ঘটনার অনেক আগে থেকেই তিনি ফরাসি শিক্ষাব্যবস্থার নানা ত্রুটির তীব্র সমালোচনা একভাবে করে এসেছিলেন । সেই মে মাসের স্বপ্নের মধ্যে তিনি সমাধান খুঁজে পাননি ।

যাই হোক ৩০শে মে এল । দ্যগোল সমস্ত সামলে নিজের দলের ক্ষমতা আরও দৃঢ় করলেন । তবে এ দিনগুলি অনেক আশা ও স্বপ্ন অপূর্ণ রাখলেও একেবারে ব্যর্থ হলো না । নানা পরিবর্তন হলো । শ্রমিকদের 'ন্যূনতম বেতন' অনেক বাড়ল, অন্যান্য সুবিধাও হলো । শিক্ষাব্যবস্থারও নানা বদল হলো—কতগুলি সফল, কতগুলি তেমন

নয় হয়তো । তবে আগের দিনগুলি ফিরে এল তা মোটেই বলা যায় না ।

এরপরে আরোঁকে দেখতে পাই সরবন্ ছেড়ে কলেজ দ্য ফ্রাঁস-এ লেকচার দিচ্ছেন। ফরাসি অ্যাকাদেমিক জীবনে এই পদই সর্বোচ্চ সম্মান বলা যায় । এই পর্বের একটি বইয়ের কথা আগেই বলেছি (ক্লাউসেভিৎস), অন্যান্য বইয়ের মধ্যে দুটি যুগ্মভাবে পুরস্কার (প্রি দ্য লা ক্রিতিক) পায় । একটিতে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ভূমিকার বিশ্লেষণ।[১৮] অন্যটি নিয়ে আবার সেই সার্ত্র-আরোঁ প্রসঙ্গে ফিরে আসতে হয়।[১৯] এটি সার্ত্রের গুরুভার 'ক্রিতিক দ্য লা রেজঁ দিআলেকতিক্'-এর আলোচনা । সার্ত্রের এই বইটি দুষ্পাঠ্য হিসাবে সুবিদিত । আরোঁর বই সম্পর্কে সার্ত্রের মন্তব্য, 'ও অন্তত আমার লেখাটি পড়েছে' । পড়ে একমত হননি । তবে এই বই লেখাটাই আরোঁ-চরিত্রের উত্তম পরিচয় । ১৯৬৮-তে (এর আগে ও পরেও) সার্ত্রের হিংস্র আক্রমণের ব্যথা মনের কোণে সরিয়ে রেখে সার্ত্রের সৃজনী প্রতিভাকে আবার সেলাম জানালেন । সার্ত্রের নানা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের উল্লেখ করে তারিফ করলেন । কোথায় একমত নয় তাও বিশদভাবে, শান্তভাবে জানালেন ।

দ্যগোলের ক্ষমতা ত্যাগ ও মৃত্যু, পৌঁপিদু, জিস্কার্ দেস্তাঁর নির্বাচন, আরোঁর নিজের 'ফিগারো' থেকে কাজ ছাড়া (ত্রিশ বছর লেখার পর নতুন মনিব তাঁর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করায়) —এই সবের পাশ কাটিয়ে আরোঁর জীবন ওলটপালট্ করে দেওয়া একটি ঘটনায় আসি । এর মূলে অতি ক্ষুদ্র একটি জিনিস । রক্তের জমাটবাঁধা একটি দানা । পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'লাম্বোলি' ।

আরোঁ পূর্ণোদ্যমে কাজ করছেন । ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনায় ভরপুর । বয়সের কথা ভাবেন না । ১৯৭৭ সালের মে মাসে একদিন এক ধমনীর পথরুদ্ধ হলো । 'মৃত্যু, যা ছিল এতদিন একটি বিমূর্ত ধারণা, এবার হয়ে উঠল প্রতিদিনের জীবনের প্রত্যন্ত সত্য' । হাসপাতালে বাক্শক্তিরহিত, প্যারালাইজড্ অবস্থায় শুনছেন ডাক্তারেরা আলোচনা করছে—এর মুখটা কোন দিকে বেঁকেছে, ডানদিকে না বাঁদিকে ? সেই অবস্থাতেও মনে হাসি এল, তাই থেকে ভরসাও ফিরে এল । ক্রমে সচল হলেন । লেখা, বক্তৃতা দেওয়া কঠোর সঙ্কল্পে চেষ্টা করে আবার আরম্ভ করলেন । কিন্তু ঠিক আগের মতো আর হলো না । হঠাৎ এক একটি শব্দ মুখ দিয়ে বেরোতে চায় না । কাজের বিষয় বুঝলেন যত সাধ তত সাধ্য আর নেই । বেছে নিতে হবে । এই ঘটনার আগে তিনটি পরিকল্পনা মনে ছিল । ভাবছিলেন প্রথম জীবনের কাজের বৃত্ত সম্পূর্ণ করে লিখবেন মানুষের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বিষয়ে । আবার ভাবছিলেন মার্কসীয় চিন্তার বিষয়ে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা ও অভিজ্ঞতা একত্র করে লিখবেন । আরও ভাবছিলেন স্মৃতিকথা লিখবেন । শেষটিই বেছে নিলেন । স্মৃতিকথার শেষের একটি পরিচ্ছেদের নাম : 'একটি যুগের অবসান', অর্থাৎ সার্ত্র-আরোঁর প্রজন্মের শেষ ।

ভিয়েৎনামের উচ্ছিন্ন আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যকল্পে একটি সভায় আরোঁ উপস্থিত । একটু পরে অঁদ্রে গ্লুক্সমানের হাতে ভর দিয়ে অন্ধপ্রায়, অথর্ব সার্ত্রের প্রবেশ । তাঁর এই করুণ অবস্থা দেখে সমবেদনায় তাঁর হাত ধরে আরোঁ মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন তাঁদের ছাত্রজীবনের পরিচিত ভাষায়, 'সুপ্রভাত, কম বয়সেব বন্ধু' । সার্ত্র ভাবলেশহীন,

নিরুত্তর। হয়তো-বা সুপ্রভাত বললেন। এই হাত মেলানোর ছবি শতাধিক দেশে ছাপা হলো।

মনে পড়ে সিমোন দ্য বোভয়ার-এর স্মৃতিকথায় তরুণ সার্ত্র-আরোঁর ছবি। জার্মানি-ফেরৎ আরোঁ কাফেতে বসে হুর্সেল্ এবং ফেনোমেনোলজির কথা বলছেন। দ্য বোভয়ারের ভাষায় শুনতে শুনতে সার্ত্র 'আবেগে পাংশু' হয়ে গেলেন। এইরকম কোনো দর্শনই তিনি খুঁজছিলেন। প্রথম জীবনে দার্শনিক আলোচনা, বিতর্ক প্রায়ই হতো। সার্ত্রের স্মৃতি : 'আরোঁ আমায় কোণঠাসা করত'। সিমোন লিখেছেন প্রায়ই আরোঁ চেপে ধরতেন, 'বন্ধু, দুয়ের ভিতরে একটা ...'। [এই লব্জটি আমাকেও সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় থেকে থেকে শুনতে হয়েছে। ফরাসিরা তাদের যুক্তির বাঁধুনী সম্পর্কে গর্বিত। দুটি সম্ভাবনার মধ্যে একটি তুমি বেছে নিতে যুক্তিমতে বাধ্য। কোন্ পথে পা বাড়াবে বল।]

আরও মনে পড়ে, স্মৃতিকথা প্রকাশের পর পিভোর আপোস্ত্রফ্ প্রোগ্রামে আরোঁ। হাত, মুখ ঈষৎ কাঁপছে। কথা মাঝে মাঝে একটু থমকানো। বললেন : 'আর একটি বই লিখব ভাবছি'। সে সময় পাননি।

আজকাল নবচিন্তকেরা বাজার গরম করছেন, কিন্তু তাঁরা চিন্তার ক্ষেত্রে সার্ত্র, আরোঁ প্রমুখ পূর্বসূরীদের আসন নিতে পারেননি। তাই 'একটি যুগের অবসান' বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

গ্রীষ্মে তুর্কি ভ্রমণে গিয়েছিলাম। ইস্তানবুলের রাস্তায় একটি শো-কেসে একটি পকেটবুকের দিকে তাকিয়ে খেয়াল হলো যে এটি আরোঁর 'সমাজবৈজ্ঞানিক চিন্তার সোপান' [২১], বইটির তুর্কি অনুবাদ। বইটির মলাটে আরোঁর আলোচ্যদের নাম — মঁতেসকিয়্য, কোঁৎ, মার্কস, দ্য তক্ভিল, দ্যুর্কাইম, পারেতো, হ্বেবের। এও কি ফরাসি কৃষ্টির প্রভাবের প্রসার ?

উল্লেখপঞ্জী :

1. Raymond Aron, *Introduction a la Philosophy de l' Histoire*
2. Jean-Paul Sartre, *L'Etre et le Neant.*
3. Aron, *Memoires : 50 ans de reflexion politique*
4. Aron, *L'intemporel dans la philosophie de Kant*
5. Aron, *La Sociologie Allemande Contemporaine (1935).*
6. Aron, *Introduction a la Philosophie de l'' Histoire : Essai sur les limites de l 'objectivite* (1938).
7. Aron, *Essai sur une theorie de l'histoire dans l''Allemagne Contemporaine* (1938).
8. Aron, 'Comment l'historien ecrit l' epistemologie'
9. Aron, *L'opium des Intellectuels (1955).*
10. Julien Benda, *La Trahison des clercs.*
11. Aron, *18 Lecons sur la Societe industrielle* (1955-56).
12. Aron, *La Lutte des classes* (1956-57).
13. Aron, *Democratie et totalitarianisme* (1957-58).

14. Aron, *Paix et Guerre entre Nations* (1962).
15. Aron, *Penser la guerre, Clausewitz* (1976).
16. "interdit d' interdir".
17. Aron, *La Revolution introuvable* (1968)
18. Aron, *Republique imperiale.*
19. Aron, *Histoire et dialectique de la Violence.*
20. J-P. Sartre, *Critique de le raison dialectique.*
21. Aron, *Les etapes de la pensie sociologique.*

কেতকী কুশারী ডাইসন

'শয়তানী পদাবলী' প্রসঙ্গে কিছু চিন্তা

চলতি বছরে (১৯৮৯) যখন কয়েক মাসের জন্য ভারতে ছিলাম তখন সাল্‌মান রুশ্‌দির বিতর্কিত বই 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' সম্পর্কে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। তখনও বইটি পড়িনি। সম্প্রতি বইটি পড়লাম। যে-দু'চার কথা মনের মধ্যে দানা বাঁধছে সেগুলিকে গোছানোর চেষ্টায় এই লেখা। বইটি আপনাদের কাছে অপ্রাপ্য, তাই খুব বেশি খুঁটিনাটির মধ্যে যাওয়া অর্থহীন হবে। এমন একটা আলোচনার সূত্রপাত করতে চেষ্টা করছি, যা অত্যধিকভাবে আনুপুঙ্খিক না হয়েও আপনাদের ভাবনাকে উস্‌কে দিতে পারে।

প্রথমেই বলতে হয় যে বইটিকে নিয়ে গোঁড়া মুসলমান সমাজে যে এত প্রবল আপত্তির ঢেউ উঠেছে, তা নেহাত অকারণে নয়। বলাই বাহুল্য, আমি ধর্মান্ধদের হিংস্র দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক নই, কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই বইয়ের মধ্যে এমন কিছু কিছু অংশ আছে, যেগুলি গোঁড়া মুসলমানদের কাছে আপত্তিকর ঠেকতেই পারে, এমন-কি যাঁরা গোঁড়া নন তাঁদের কাছেও তাঁদের ঐতিহ্যের পক্ষে অসম্মানজনক ব'লে মনে হতে পারে। তাঁদের কাছে সম্ভবত সব থেকে বেশি অপ্রীতিকর "রিটার্ন টু জাহিলিয়া" —নামক বিভাগের একটি অংশ, যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে জাহিলিয়ার গণিকালয়ে গণিকারা মাহুণ্ড অর্থাৎ পয়গম্বর মহম্মদের বারোজন স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় ক'রে খদ্দেরদের যৌন ফ্যান্টাসিকে তৃপ্ত করতেন। অংশটি সুলিখিত, কিন্তু রুশ্‌দি অথবা তাঁর প্রকাশক যে কী ক'রে ভাবলেন ঐ পাতাগুলি বার ক'রে তাঁরা পার পাবেন তা আমি জানি না। বর্তমান সময়ে ইসলামি গোঁড়ামির একটা অসহিষ্ণু আগ্নেয়রূপ সর্বত্র বর্ধমান; আলোচ্য পাতাগুলি যে ঐ আগুনে ঘৃতাহুতি দেবে তা কি তাঁরা বুঝতে পারেননি, অথবা বুঝেও বুঝতে চাননি?

দ্বিতীয়ত, বইটির নামকরণের মধ্যেই এমন একটা ব্যঞ্জনা আছে যা ধার্মিক মুসলমানদের কাছে অপ্রীতিকর। বইটি পড়লে জানা যাবে যে তার ভিতরের কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে ঐ নামের একটা সীমাবদ্ধ মানে আছে। কিন্তু যে-কোনো বইয়ের নামকরণ একটা গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার, পাঠক বই প'ড়ে উঠবার আগেই তা সমগ্র গ্রন্থের পরিচয় বহন করে। নাম বইকে চিনিয়ে দেয়। তাই মনে হয় যে একটা দ্ব্যর্থকতা এখানে ইচ্ছে ক'রেই রেখে দেওয়া হয়েছে, একটা ইঙ্গিত—যেন সমগ্র কোরানই 'শয়তানী পদাবলী'।

তৃতীয়ত, মহম্মদের মডেলে রুশ্‌দি যে চরিত্রটি তৈরি করেছেন তার জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন 'মাহুণ্ড' নামটি। এটি 'মহম্মদ' নামেরই একটি মধ্যযুগীয় ইংরেজি রূপ। মধ্যযুগের ইংরেজি সাহিত্য যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে এই নামটি সদর্থক অর্থ বহন করে না। এর মধ্যে আছে মিথ্যা পয়গম্বর, ঝুটা দেবতা, শয়তানের একটি নাম

ইত্যাদি অনুষঙ্গ । অভিধানেও এইসব অনুষঙ্গ স্বীকৃত । ইসলামের প্রতি মধ্যযুগের ইয়োরোপে বিদ্বেষের এবং অবজ্ঞার যে-মনোভাব ছিল, তা এই নামের মধ্যে ঘনীভূত। সেক্ষেত্রে এই নামের নির্বাচন লেখকের একটা বিশেষ পক্ষপাতেরই সূচক ।

কিছুদিন আগে একটি খবরে পড়লাম যে সৌদি আরব দেশে প্রবেশরত কেরলের একজন এনজিনিয়রের মালপত্রের মধ্যে কথাকলি-নাচ-বিষয়ক একটি বই এবং অন্য একটি প্রখ্যাত মলয়ালি সাহিত্যগ্রন্থ পাওয়া যায় এবং হিঁদুয়ানি প্রচারের উপকরণ হিসাবে তাদের পোড়ানো হয় । একথা পড়ে আমাদের মুখে হাসি ফুটতে পারে বটে । কিন্তু 'শয়তানী পদাবলী'-কে কেন্দ্র ক'রে গোঁড়া মুসলমানদের মধ্যে যে বিক্ষোভ জেগেছে তা ঠিক হেসে উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয় ।

গা ঢাকা দেবার আগে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে রুশ্‌দি বলেন যে তিনি চান মহম্মদকে মানুষ হিসাবে দেখা হোক । কিন্তু মহম্মদ তো মানুষই, যদিও বিশ্বাসীর বিশ্বাস অনুসারে তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত, ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত, অতএব বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বটেন । ভারাক্রান্ত 'মাহুণ্ড' নামটি স্পষ্টত রুশ্‌দির ঘোষিত উদ্দেশ্যের বিরোধিতাই করে । লেখক সম্ভবত চেয়েছিলেন মুসলমান সমাজে সেকুলার চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে—অন্তত তর্কের খাতিরে এটুকু আমরা মেনে নিতে পারি । কিন্তু এই চিন্তাবিপ্লব প্রয়োজনীয় এবং কাম্য হলেও তাকে আনবার জন্য এ ধরনের বই-ই প্রকৃষ্ট কি না তা তর্কসাপেক্ষ । আপাতত দেখতে পাচ্ছি যে তাঁর বই গোঁড়ামিকে আরও মূলবদ্ধ করেছে । ব্রিটেনে প্রতিক্রিয়া দুই শিবিরে দ্বিধাবিভক্ত । একদিকে 'উদারনৈতিক' বুদ্ধিজীবীরা লেখকদের বাকস্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । টোনি হ্যারিসন নামে একজন কবি রুশ্‌দির সপক্ষে একটা পুরো টেলিভিশন অনুষ্ঠান ক'রে ফেললেন । ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ চাননি যে সেটি প্রচারিত হয়, তবু তা হয়েছে । অন্যদিকে গোঁড়া মুসলমানরা চান যে এই বইয়ের প্রচার ব্রিটিশ সরকার-কর্তৃক নিষিদ্ধ হোক । খ্রিস্টধর্মসংক্রান্ত প্রকাশের ব্যাপারে ব্রিটেনে ব্ল্যাস্‌ফেমি-বিরোধী আইন আছে । গোঁড়া মুসলমানরা বলছেন যে সেই আইনের পরিধি বর্ধিত হওয়া উচিত, ইসলামসংক্রান্ত প্রকাশও যেন তার আওতায় আসে। এই আন্দোলনের যাঁরা ঠাণ্ডা মাথার নেতা তাঁদের উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে কর্তৃপক্ষের উপরে চাপ সৃষ্টি ক'রে এই পরিবর্তন আনা । কিন্তু চরমপন্থীরা খোমেইনির উস্‌কানি পেয়েছিলেন । সন্ত্রাসবাদীরা এখনও বইয়ের দোকানের সামনে বোমা ফাটানোর চেষ্টা করছেন । অনুমান করি রুশ্‌দির মাথা এখনও তাঁদের ঈপ্সিত । অতএব তাঁর অজ্ঞাতবাস যে শীঘ্রই শেষ হবে তা তো মনে হয় না ।

মনে হয় ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা মুনাফা লুটে নিচ্ছেন বইটির প্রকাশক । অবশ্য তাঁদের বইয়ের দোকানগুলি এবং তাঁদের রক্ষানাস্ত লেখকের নিরাপত্তার ব্যবস্থায় তাঁদের কিছুটা টাকা ঢালতে হচ্ছে, তবে দিয়ে-থুয়েও নিশ্চয় তাঁদের হাতে মন্দ টাকা থাকছে না । শুনছি ব্রিটেনেই দু' লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে, পেপারব্যাকের প্রকাশও নাকি আসন্ন । রয়াল্‌টির সূত্রে লেখকও নিঃসন্দেহে সেই মুনাফার অংশভাক্‌, যদিও অজ্ঞাতবাসে ব'সে সেই উপার্জন তিনি কিভাবে ভোগ করবেন তা জানি না । সম্প্রতি টেলিভিশন-আয়োজিত একটি আলোচনাচক্রে পুস্তকবিক্রেতাদের একজন প্রতিনিধি এই মত প্রকাশ করলেন যে পেপারব্যাক প্রকাশ করা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক হবে । তিনি মনে করেন যে

এই সিদ্ধান্তের দ্বারা চরমপন্থীদের আন্দোলন দৃঢ়ীকৃত হবে । নিরপরাধ কতগুলি মানুষ, যাঁরা বইয়ের দোকানে বই কিনতে আসেন অথবা সেখানে কাজ করেন, অকারণে প্রাণ হারাতে পারেন ।

এই হৈ-চৈ-এর মধ্যে যে-কথাটা হারিয়ে যাচ্ছে সেটা হলো এই : সাহিত্যের বিচারে বইটি সত্যি কি রকম ? যে-দু' লক্ষ কপি এদেশে বিক্রি হয়েছে তা কি হয়েছে সাহিত্যরসের গুণে ? 'শয়তানী পদাবলী'-র নির্মাণরীতি বা শৈলী আদৌ সাধারণ পাঠকের জন্য নয় । দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই বইয়ের বহু ব্যঙ্গ-ইঙ্গিত-রসিকতা কথিত হিন্দি-উর্দুর কিছুটা জ্ঞান ব্যতীত বোধগম্যই নয় । আমি না-হয় এগুলো ধরতে পারছি কিন্তু নেটিভ ইংরেজরা ? যাঁরা হিন্দি বা উর্দু একেবারেই জানেন না ? তাঁরা হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে বইটা পড়ছেন কিসের লোভে ? মনে হয় এই তাগিদের একটা বড়ো অংশ হচ্ছে 'দেখি দেখি রুশ্‌দি ইসলামকে কিরকম বাঁশ দিয়েছেন ।' লণ্ডনস্থ আমার এক বিচক্ষণ বান্ধবীকে রুশ্‌দির জনপ্রিয়তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি জবাব দিলেন, 'যেহেতু সবাই জানে তিনি একটা দুষ্টুমি করেছেন । লণ্ডনের সাহিত্যিকমহল দুষ্টুমি বড়ো ভালোবাসেন ।'

রুশ্‌দির কলম নিঃসন্দেহে একধরনের ক্ষমতা ও চাতুর্যের অধিকারী । আমি কিন্তু তাঁর লেখায় সেই সংবেদনশীলতা ও অনুকম্পা, সেই রূপ-রস প্রজ্ঞা পাই না যা আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে । পাশ্চাত্য জগৎ শক্তিমত্তা ও চাতুরীর বিশেষ সমঝদার, তাই 'মিডনাইটস্ চিল্‌ড্রেন'-এর প্রকাশকাল থেকেই তিনি বাহবা পেয়ে আসছেন ; কিন্তু সাম্প্রতিক ডামাডোলের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করবার সময় এসেছে : রুশদির উপন্যাসগুলিতে মহৎ সাহিত্যের অভিজ্ঞান কতদূর উপস্থিত ?

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'গ্রাইমাস্' আমি পড়িনি । যে-বর্ণনা পড়েছি, তা থেকে মনে হয় না যে উপন্যাসটি আমাকে আকর্ষণ করবে । যাই হোক, যে-বই পড়িনি সে সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা ধৃষ্টতা হবে । 'মিডনাইটস্ চিল্‌ড্রেন' নতুন ধরনের লেখা, মনে কিছুটা দাগ কাটবেই । আমার ভালো লেগেছিল প্রথমার্ধ, যেখানে লেখকের পারিবারিক পটভূমিকা এবং বোম্বাইয়ে বাল্যকালের স্মৃতি একটা ছাপ রেখেছে । দ্বিতীয়ার্ধে তিনি চ'লে যান বিশুদ্ধ ফ্যাণ্টাসিতে ; এ অংশ আমার তেমন বিশ্বাসযোগ্য ঠেকেনি, আমাকে তেমন স্পর্শ করেনি । 'শেইম'-এর চাতুর্য ও ঝাঁজ অনস্বীকার্য । এখানে রুশ্‌দি পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার এমন একটা ছবি আঁকতে চেয়েছেন যা হবে অবক্ষয়েব একটা বিরাট দেয়ালচিত্র । উপন্যাসটি আগাপাশতলা স্যাটায়ারের উপাদানে গঠিত । কোথাও কোনো বিশ্রাম, করুণা, স্নিগ্ধতা বা মমতার মুহূর্ত নেই । কারও কারও এ-ধরনেব লেখা ভালো লাগতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় এরকম ক্ষেত্রে উপন্যাসের উপন্যাসত্বে একটা ফাঁক থেকে যায় । তাছাড়া থেকে যায় সত্যের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রশ্ন । যে-অন্ধকার তিনি এঁকেছেন তা কি সত্যিই অতটা নিরেট ছিল ? তার মধ্যে কি কোনো আশার শুকতারা, কোনো সম্ভাবনার বীজ ছিল না ? ঐ গ্লানির আবহে কিছু কিছু লোকের মধ্যে কিছু শুভবুদ্ধি যদি না থেকে থাকবে, তাহলে পাকিস্তানে সাম্প্রতিককালে গণতন্ত্রের অভ্যুদয় কিভাবে সম্ভব হলো ? এই সম্ভাবনার পূর্বাভাস কি রুশ্‌দির চালচিত্রে ধরা পড়া উচিত ছিল না ? 'শেইম' প্রবলভাবে রাজনৈতিক ব'লেই, তার মধ্যে জিয়া-ভুট্টো স্পষ্টত উপস্থিত বলেই, প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক ।

'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস'-এ থেকে থেকে সৃষ্টিশীল প্রতিভার একটা ঝলকানি দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে বইটিকে মহৎ সাহিত্যকীর্তি ব'লে আমার মনে হয় না। 'মিডনাইট্‌স্ চিল্‌ড্রেন'-এর মতো এখানেও যেখানে যেখানে সম্ভবত কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছায়া পড়েছে, সেখানে জীবনের সত্য মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠেছে। যেমন বালক সালাহ্‌উদ্দীন চামচাওয়ালার প্রথম বিলেতি অভিজ্ঞতাগুলির বিবরণে, যেখানে সম্ভবত লেখকের নিজস্ব কিছু স্মৃতির পুঁজি বিনিয়োজিত। ছেলেটি স্কুলের প্রাতরাশে নব্বই মিনিট ধ'রে অন্যান্য নীরব বালকদের দৃষ্টির সামনে কাঁটাসুদ্ধ 'কিপার' অর্থাৎ স্মোক্‌ড্ হেরিংমাছ খায়, এবং তার মনে হয় যে 'ইংল্যাণ্ড একটা অদ্ভুত স্বাদের স্মোক্‌ড্ মাছ, অজস্র কাঁটায় ভর্তি, আর তাকে কিভাবে খেতে হবে তা কেউ তাকে বলবে না।' বর্ণনাটি মর্মস্পর্শী ও লক্ষ্যভেদী, কিন্তু এই ধরনের মুহূর্ত বইটিতে দুর্লভ। বইটির নির্মাণকৌশল জটিল, কিন্তু তার দ্বারা যে কোনো বড়ো মাপের শিল্পগত উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে তা বলতে পারি না। টুকরো টুকরো গল্পগুলি নিজেদের পথ ধ'রে চলে, পরস্পরকে এমনভাবে সাহায্য করে না যে সমস্ত জিনিসটা একটা মানবিক আয়তনের উপন্যাস হয়ে উঠবে। এই বইয়েও কোনো কোনো চরিত্র এক অর্থে জীবন থেকে নেওয়া। জিব্রিল ফারিশ্‌তা সীমাবদ্ধ অর্থে অমিতাভ বচ্চনের ছায়ায় গঠিত। সাদৃশ্যটা উপরে উপরে—বেশি দূর যায় না। তাছাড়া বচ্চন একজন সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব হিসাবে আলাদাভাবে উল্লিখিত হয়েছেন, অর্থাৎ লেখক জানিয়ে দিয়েছেন যে বচ্চন আর ফারিস্তার সমীকরণ যুক্তিযুক্ত হবে না। খোমেইনির চ'টে যাবার যথেষ্ট কারণ ছিল, কেননা তাঁর ছায়ায় গঠিত একটি চরিত্রও আছে। উপরে উল্লিখিত চামচাওয়ালা বা সংক্ষেপে চামচার মধ্যে লেখকের বেশ কিছুটা আত্ম-অভিক্ষেপ আছে, এবং মনে হয় এই চরিত্রের মাধ্যমে তিনি তাঁর ভারতীয় শিকড়বাকড় তথা ব্রিটিশ জীবনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর ভারতীয় শিকড়বাকড়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করার প্রয়াস অর্ধমনস্ক ও অমনোযোগী; যতটা ভঙ্গি আছে, ততটা আন্তরিক বেগ নেই। ভারতীয় এবং ব্রিটিশ উভয় জীবনের রূপদানেই তিনি এত বেশি উদ্ভটরস ব্যবহার করেছেন যে তাঁর বক্তব্যগুলি ঠিক কবে প্রতিষ্ঠা পায় না, একটা গোলকধাঁধার মধ্যে হারিয়ে যায়। যেখানে সবকিছুই মোটের উপর আজগুবি, আজগুবি হওয়াই প্রথম পাতা থেকে যে-বইয়ের ঘোষিত ধর্ম, সেখানে কাহিনীর বা চরিত্রচিত্রণের পরিচিত মাপকাঠিগুলি খাটে না। 'শয়তানী পদাবলী'-র ঘটনাবলী বা চরিত্রদের কাছ থেকে জীবনের প্রতি কোনো বিশ্বস্ততা প্রত্যাশা করা বৃথা। এর প্রায় কোনো চরিত্র প্রীতিকর নয়, এমন নয় যাকে আপনার জীবনে জানতে ইচ্ছা করবে, বোধহয় একমাত্র মির্জা সঈদের চরিত্রটি ছাড়া। এই একটি চরিত্র আভাস দেয় যে হয়তো চেষ্টা করলে রুশ্‌দি অন্যজাতের উপন্যাসও লিখতে পারতেন, কিন্তু এ-পর্যন্ত তিনি শয়ান আছেন আজব কল্পনার এক ক্ষীরসাগরে।

কেউ কেউ বলবেন, ক্ষতি কী, ফ্যান্টাসি গোত্রের কথাসাহিত্য ঐরকমই হয়, তার মধ্যে খুব বেশি মানবিক আয়তন খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। হয়তো তাই; হয়তো রুশ্‌দিকে নিয়ে আমার অসুবিধার মূলই এই যে ফ্যান্টাসি-নামধেয় আধুনিক জাঁর-টির প্রতি আমার ব্যক্তিগত আকর্ষণ কম। অনেকেই বলেন যে রুশ্‌দি গুণ্টার গ্রাস-দ্বারা প্রভাবিত। গ্রাসের বিখ্যাত 'টিনের ঢোলক' আমি অর্ধেকটা প'ড়ে বাকিটা আর শেষ করতে পারিনি। কাউকে

কাউকে জানি যাঁদের 'মিডনাইট্‌স্ চিল্‌ড্রেন' এবং 'শেইম্' পড়ার অভিজ্ঞতাও অবিকল তাই। রুশ্‌দির একজন বিশেষ প্রিয় লেখক মিলান কুন্দেরা। কৌতূহলপ্রণোদিত হয়ে এঁর একটি বই পড়েছিলাম, কিন্তু মুগ্ধ হইনি।

লাতিন-মার্কিনরা নাকি ফ্যান্টাসি রীতির প্রতিভূ। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস্-এর 'নির্জনতার এক শতাব্দী' প'ড়ে মনে হয়েছিলো বটে যে হ্যাঁ, একটা আশ্চর্য বই পড়লাম, যদিও আমার ধারণা এখানেও শেষের দিকে ফ্যান্টাসির আতিশয্য শিল্পের সীমাকে লঙ্ঘন করেছে। ইসাবেল আলিয়েন্দে-র 'প্রেতাত্মাদের বাসভবন' ফ্যান্টাসি হয়েও মানবিক আয়তনে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। আমার বিশেষ ভালো লেগেছে শ্রীমতী আলিয়েন্দে-র আরেকটি উপন্যাস, 'প্রেম এবং ছায়াদের বিষয়ে', যেখানে মানুষিক কাহিনীই প্রবল, উজ্জ্বল এবং মর্মস্পর্শী। এই তিনটি বইয়ের জাদু কিন্তু রুশ্‌দির বইগুলিতে নেই।

'শয়তানী পদাবলী'-র শিল্পগত কাজগুলি মোটাদাগের, বোম্বাইয়ের 'ব্লকবাস্টার' সিনেমার মতো। সূক্ষ্মতা বা সৌকুমার্য তাদের প্রধান গুণ নয়। একটা বড়ো অন্তরায় লেখকের ভাষা। সেখানে রূপের চাইতে মুদ্রাদোষ এবং স্থূল রসিকতা বেশি। ইংরেজি তথা ভারতীয় উৎসের খিস্তির ফেনা পেরিয়ে রসের চুমুকে পৌঁছতে আমার অন্তত বেশ অসুবিধা হয়। এই মাত্রাতিরিক্ত খিস্তিপ্রয়োগের কোনো শৈল্পিক সার্থকতা আমি দেখতে পাই না। এটাকে আমার বিরক্তিকর নাবালকত্ব ব'লেই মনে হয়। ক্রমাগত এইসব ভুড়ভুড়ি ফাটার আওয়াজে সারের অভাব ঢাকা পড়ে না। হিন্দি-উর্দু শব্দ, বাক্যাংশ বা বাগ্‌রীতিকে তিনি যেভাবে ব্যবহার করেন তা যে তাঁর শৈলীকে কোনো বিশেষ জাদু দেয় এমন বলতে পারি না। এইসব অংশ ঝোলের উপরে প্রয়োজনাতিরিক্ত তেলের মতন ভেসে থাকে। হয়তো এদের সাহায্যে ইংরেজ পাঠকদের কাছে একটা মজাদার ভারতীয় আবহ তৈরি হয়, কিন্তু এর মধ্যে একটা চালাকি বা প্রতারণা আছে। রুশ্‌দির কাছে এগুলি বুকনি-মাত্র, কথার ফোড়ন, উপরের অলংকার। এগুলি বড়জোর একটা ভিন্ন আবহের মেজাজ সৃষ্টি করে, বড়জোর ব্যঙ্গচিত্রের আভাস আনে, কিন্তু এদের সাহায্যে আমরা কখনো কোনো ভারতীয় মননের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি না। রুশ্‌দি এগুলো মশলার মতো ছিটিয়ে দেন বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তিনি মূলত একভাষী লেখক। উর্দুতে তিনি লেখেন না, লিখতে পারেন না। এই অক্ষমতার কি একটা বৌদ্ধিক পরিণাম নেই, থাকবে না?

আমার তো মনে হয় পরিণাম আছে, থাকতে বাধ্য। রুশ্‌দি যদি সত্যিই উর্দুতেও বই লিখতে পারতেন, উর্দুভাষী আধুনিক পাঠকসমাজের সঙ্গে, তাঁদের ভাবনার সঙ্গে তাঁর যদি একটা প্রত্যক্ষ, হার্দ্য যোগ থাকতো, তাহলে এই বইয়ে তিনি যে-বেহিসাবী কাজ করেছেন হয়তো তা করতেন না। হয়তো তাহলে তাঁর ভারতবিষয়ক কথাশিল্পের টিউনিংটা সূক্ষ্মতর হতো, কথাসাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামি গোঁড়ামির সমালোচনা কিভাবে করতে হবে সে-বিষয়ে তিনি ঢের বেশি বিচক্ষণ হতেন। মধ্যযুগের ইয়োরোপের ক্রুসেডারদের মতন ঝাঁপিয়ে পড়তেন না—যেমন এখন করেছেন। অবশ্য তাহলে তিনি লণ্ডনের হাততালি পেতেন কি না তা বলতে পারি না। এখানে সীমাবদ্ধ ভারতীয়ত্বেরই (এবং 'দুষ্টুমি'র) কদর বেশি।

'শয়তানী পদাবলী'-তে অলৌকিক ঘটনাবলী খুব বেশি। এখানে শূন্যে বোমা-বিধ্বস্ত

বিমান থেকে প'ড়ে গিয়েও লোক বাঁচে, মানুষের মাথায় রীতিমতো শিঙ গজায়, আত্মঘাতিনীর প্রেত যখন-তখন ভেসে আসে, প্রজাপতির ঝাঁক নগ্নদেহকে ঢেকে দেয় ইত্যাদি। তাছাড়া পয়গম্বর মহম্মদের জীবন, সময়, সমসাময়িক সমাজকে নিয়ে তিনি কাহিনী রচনার চেষ্টা করেছেন। এই অংশে অনস্বীকার্য বৈদগ্ধ্য আছে; মনে হয় তিনি বেশ খানিকটা পড়াশোনা ক'রে নিয়েছেন। তবু জিজ্ঞাস্য : রুশ্‌দি যদি মহম্মদকে মানুষ হিসাবে দেখতে চেয়ে থাকেন, গোঁড়া ধার্মিকদের পৌরাণিকতাকে ভাঙতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন, তবে অলৌকিকতার উপর নির্ভরশীল, মিথরচনায় আগ্রহী তাঁর এই আঙ্গিক কতটা উপযুক্ত ? আধুনিক মিথের সৃষ্টির দ্বারা কি সেক্যুলার মূল্যবোধের এবং যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়, হওয়া সম্ভব ? না কি তার জন্য ঢের বেশি কাজের হতো যুক্তিধর্মী প্রবন্ধ ? রুশ্‌দি প্রবন্ধের মাধ্যমে গোঁড়া মুসলমানদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামেন না কেন ? 'শয়তানী পদাবলী'-তে তাঁর উদ্দেশ্য ও আঙ্গিকের মধ্যে কি একটা বিরোধ নেই ?

এই প্রবন্ধ যাঁরা পড়ছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জানেন যে আমার নিজের একটি বইয়ে আমি উপন্যাস আর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধকে একসঙ্গে ব্যবহার করেছিলাম। আমার ধারণা, ঐ মিশ্র আঙ্গিকের সাহায্যে আমি এমন কতকগুলো বক্তব্যকে রূপ দিতে পেরেছিলাম, যেগুলো বিশুদ্ধ উপন্যাস বা বিশুদ্ধ প্রবন্ধের মাধ্যমে ধরা পড়ত না। আমি চেষ্টা করেছিলাম যাতে দুটো জিনিস পরস্পরকে আলোকিত করে, অথচ তাদের মধ্যে একটা সীমারেখা বজায় থাকে। 'শয়তানী পদাবলী'-র কৌশল এর ঠিক উল্‌টো। রুশ্‌দি সবকিছু গুলে, ঘেঁটে, হাতা দিয়ে নেড়ে, সজোরে মন্ত্র প'ড়ে—খিস্তির মন্ত্র—একাকার ক'রে দিতে ভালোবাসেন। তাঁর আঙ্গিক ফ্যান্টাসি তৈরি করে ঠিকই, কিন্তু কোনো বৌদ্ধিক বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা দেয় না। আমার নিজের সন্দেহ, রূপকথা রচনাই তাঁর আসল লক্ষ্য, ভাবনাজগতে কোনো পরিবর্তন আনা তাঁর কাছে গৌণ ব্যাপারমাত্র। বইটির মধ্যে তৃতীয় বিভাগে তিনি খামকা একটি আর্জেন্টাইন কাহিনী ঢুকিয়েছেন, গল্প বলা ছাড়া যেটির আর কোনো ভূমিকা দেখি না। তিনি গল্প বলুন তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে বড়োদের জন্য আজগুবি গল্প বলাই যদি তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য হয়, তা হলে মহম্মদকে নিয়ে টানাটানি করার কী প্রয়োজন ছিল ?

সাংবাদিকরা ফরাসি কায়দায় যার নাম দিয়েছিলেন 'লাফেয়ার রুশ্‌দি', সেই রুশ্‌দি অ্যাফেয়ারের হট্টগোলের মধ্যে অনেক প্রাসঙ্গিক কথাই চাপা প'ড়ে যাচ্ছে, আলোচিত হচ্ছে না। আগেই বলেছি যে রুশ্‌দির লেখায় আমি যথেষ্ট সংবেদনশীলতা ও অনুকম্পার স্পর্শ পাই না। তিনি মুসলমানদের কিভাবে আঘাত দিয়েছেন সেই ব্যাপারটা আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু 'শয়তানী পদাবলী'-তে ব্রিটেনের কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রো-ক্যারিবিয় সম্প্রদায়ের চিত্রণ মোটেও প্রীতিকর নয়, এবং সাধারণভাবে—তাঁর প্রধান তিনটি উপন্যাসেই একথা সত্য—মেয়েদের তিনি সহানুভূতির সঙ্গে আঁকেন না। তিনি যখন মেয়েদের বর্ণনা করেন তখন তাঁর বর্ণনায় প্রায়ই একটা ঘৃণার এবং অবজ্ঞার ভাব থাকে। তাঁর লেখায় নারীপ্রকৃতির, শিশুপ্রকৃতির, নিছক প্রকৃতির অথবা সাধারণ নরনারীর সুখদুঃখের বিশেষ স্বীকৃতি বা সমাদর নেই। এই অভাব একজন ঔপন্যাসিকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতাই বটে। রুশ্‌দি মূলত গ্রোটেস্ক বা বীভৎসরসের রসিক। তাঁর

মধ্যে আমি সেই কবির মন পাই না, যাকে আমি উপন্যাসেও খুঁজি, যাকে বাদ দিয়ে, আমার মতে মহৎ সাহিত্য হয় না। বরঞ্চ তাঁর মধ্যে কখনো কখনো বর্ণবিদ্বেষ বা নারীবিদ্বেষের একটা বিপজ্জনক আভাসই দেখতে পাওয়া যায়।

উদ্ভট গল্পে বাস্তবানুগতার প্রশ্ন ওঠে না, তবু লেখক যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছবি আঁকেন, তাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্যও থাকে, তখন তাঁর শিল্পসার্থকতা বিচারের আর কী মানদণ্ড থাকতে পারে জানি না। একটি ব্রিটেনপ্রবাসী বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ-পরিবারের যে ছবি তিনি এঁকেছেন, তা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য ঠেকে না। পরিবারের কর্তা মহম্মদ সুফিয়ান বেঁটে এবং মোটা, এককালে ঢাকায় স্কুলশিক্ষক ছিলেন। বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রাচীন সাহিত্যে তিনি পারদর্শী। তিনি যে কেবল ঋগ্‌বেদ আর কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারেন তা নয়, লাতিন সাহিত্যও তাঁর নখদর্পণে। তাঁর গৃহিণী হিন্দ্, বয়স্ক মহিলাদের বর্ণনায় রুশ্‌দির সাধারণ কানুন মেনে, ভয়ংকর মোটা তো বটেই—রুশ্‌দির জগতে মোটা হওয়াটা একটা নৈতিক ও নান্দনিক অপরাধ—উপরন্তু চেঁচিয়ে কথা বলেন, এবং তাঁর ঢাকাবাসকালে তিনি তাঁর পণ্ডিত স্বামীর যোগ্য হয়ে উঠবার সাধনায় 'বিভূতিভূষণ ব্যানার্জির উপন্যাস আর টাগোরের মেটাফিজিক্‌সের সঙ্গে ধস্তাধস্তি' করেছিলেন। তাঁর স্বামীর ছিল মুক্ত অনেকান্তবাদী সেক্যুলার মন; ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতিগুলিকে তিনি আপন ক'রে নিয়েছিলেন। বেচারী হিন্দ্ পতির মতো বৌদ্ধিক জগতে বিচরণ করতে না পেরে আপন ক'রে নিয়েছিলেন কাশ্মীর থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রন্ধনপ্রণালীগুলিকে। তিনি ভালোবাসতেন রাঁধতে আর খেতে। এবং অত খাওয়ার ফলেই তাঁর শরীরে একটা পরিবর্তন ঘটতে থাকে, 'কেননা অতসব খাবারকে তো কোথাও না কোথাও আশ্রয় পেতে হবে, এবং ক্রমশ তার সাদৃশ্য ফুটে উঠতে লাগলো সেই বিশাল গড়িয়ে যাওয়া স্থলভাগের সঙ্গেই, সীমানাবর্জিত উপমহাদেশের সঙ্গে, কারণ আপনি যে সীমানার কথাই তুলুন না কেন, খাবার তাকে পেরিয়ে যায়'। এটি কোনো ঔপন্যাসিক মনুষ্যচরিত্র নয়, বৃহদাকার ব্যঙ্গচিত্র। সুফিয়ান আর হিন্দ্ দুজনে বাঙালি চরিত্রের ক্যারিকেচার, একজন বাঙালি পুরুষের বিদ্যানুরাগের, অন্যজন বাঙালি নারীর রন্ধন-ভোজনবিলাসিতার। লক্ষণীয় লেখক কিভাবে দুম্ ক'রে দুজন বিখ্যাত বাঙালির নাম এই বর্ণনার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, নাম ছিটানোর কায়দায়। কিন্তু বিভূতিভূষণ আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঢাকার মেয়েকে অত ধস্তাধস্তি করতে হবে কেন? এরাঁ তো যে-কোনো বাংলাভাষীর স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। আর সাধারণ বাঙালি মেয়ে রবীন্দ্রনাথের 'মেটাফিজিক্‌স্' নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে খুব সম্ভব রবীন্দ্রসংগীতের রসেই ডুবে থাকবেন। আমার আন্দাজ যে আসলে 'ধস্তাধস্তি' করতে হয়েছে রুশ্‌দিকেই। সম্ভবত তিনি ইংরেজি টেক্সটে এই লেখকদ্বয়কে নিয়ে 'ধস্তাধস্তি' করেছেন, ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন। কোনো রসের স্বাদ হয়তো পাননি। অন্তত বাক্যটি প'ড়ে তাই মনে হয়। বিভূতিভূষণ বা রবীন্দ্রনাথের নাম তাই রুশ্‌দির কথাসাহিত্যে উর্দু বুকনির মতোই কেবল ফোড়নের মশলা। এই উল্লেখের মধ্যে আমি তো কোনো বুঝদার মনের ছাপ পাই না, বরং একটা সস্তা চালিয়াতিই দেখতে পাই। পাশ্চাত্য সমালোচকরা রুশ্‌দির মধ্যে একজন 'আন্তর্জাতিক' লেখকের সন্ধান পেয়েছেন। সেই 'আন্তর্জাতিকতা' যে প্রকৃতপক্ষে কতটা সীমাবদ্ধ তা এই ধরনের ফাল্‌তু মন্তব্যের মধ্যে ধরা প'ড়ে যায়।

ভাগ্যের পরিহাস এই যে রুশ্‌দি আজ জগৎসভায় আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এক্সটার্নাল স্টাডিজ' বিভাগের একটি চল্‌তি কোর্স বিষয়ে একটি কাগজ আমার হাতে এসেছে। পাঠ্যক্রমটির নাম 'ব্রিটিশ রাজের আগে এবং পরে : ভারতের পরিবর্তনশীল সাহিত্যগুলি'। কিন্তু নাম শুনে আপনাদের যা মনে হবে, কোর্সটি তা নয়। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে :

> ইংরেজিতে প্রাপ্তব্য ভারতীয় সাহিত্যের একটি বিশাল পরিসরের ভূমিকাস্বরূপ এই পাঠ্যক্রম। অধ্যয়নের যে-গ্রন্থগুলি নির্বাচিত হয়েছে সেগুলি অনেক শতাব্দীর মধ্যে সেতুবন্ধন করে, খ্রিস্টোত্তর চতুর্থ শতাব্দী থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত। এগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত : প্রাচীন সংস্কৃত ঐতিহ্য, ব্রিটিশ রাজত্বের সময়ে অথবা তাব বিষয়ে লেখা উপন্যাস, এবং সমকালীন ভারতের বহু কণ্ঠস্বরের মধ্যে কয়েকটি।

তারপর পাঠ্যসূচি। প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনুবাদের মাধ্যমে কিছু নমুনা : কবিতা, কাহিনী, এবং 'শকুন্তলা'। তারপরেই, বহু শতাব্দী বাদ দিয়ে— না, সেতু-টেতু বেঁধে নয়, একেবারে ঝাঁপ দিয়ে—মধ্যবর্তী শতাব্দীগুলিকে একেবারে না ছুঁয়ে, আমরা সোজা চ'লে আসি বিংশ শতাব্দীতে, এবং কিমাশ্চর্যমতঃপরং, আদৌ ভারতীয় সাহিত্যে নয়, একেবারে ইংরেজি সাহিত্যে : রাডিয়ার্ড কিপলিঙের 'কিম', ই. এম. ফর্স্টারের 'আ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া', এবং পল স্কটের 'স্টেইং অন্'। সব শেষে সমকালীন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে এ. কে. রামানুজনের অনুবাদে অনন্তমূর্তির উপন্যাস 'সংস্কার', ঐ রামানুজনেরই 'সিলেক্‌টেড পোয়েমস্', এবং রুশ্‌দির 'মিডনাইট্‌স্ চিল্‌ড্রেন'।

কোর্সটি যিনি তৈরি করেছেন এ ়ং পড়াচ্ছেন তাঁর ডক্‌ট্‌রেটসমেত দুটি স্নাতকোত্তর উপাধি আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ৵ .প্রক্ষিত ব'লে তাঁর কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। নয়তো তিনি কী মনে ক'্. ঐ শিরোনামের নিচে এহেন একটি পাঠ্যসূচি তৈরি করতে পারলেন। 'এক্সটার্নাল স্টাডিজ' বিভাগের কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য নয়। এ থেকে কোনো ডিগ্রিলাভ হয় না। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষেরা সপ্তাহে একদিন এ ধরনের ক্লাস করতে আসেন। তাই বলে এই বিভাগের কাজে এতটা হেলাফেলা থাকবে ? বরং কিছুটা বাড়তি যত্ন নিয়েই তো এই বিভাগের কর্মসূচি প্রস্তুত করা উচিত, যাতে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে কোনো বৌদ্ধিক বিভ্রান্তি না ছড়ায়। বিদ্যার জগতে, একটা স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকাব নিচে, এমন হেলাফেলা শোভা পায় না। ব্রিটিশরাজের আগে মানেই একেবারে সংস্কৃত সাহিত্য ? সংস্কৃত সাহিত্য আর ব্রিটিশরাজের মাঝখানে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে আর কিছু নেই ? আর কিপ্‌লিং-ফার্স্টার-স্কট ভারতীয় সাহিত্য ? জীববিদ্যায় ট্যাক্সোনমি বা জীবদের জাতকুলবিচার একটা বড়ো শাখা। বলতেই হয়, বায়োলজির মতন সাহিত্যালোচনাতেও ট্যাক্সোনমির একটা স্থান আছে। কোনো কোনো লেখক অবশ্যই একসঙ্গে একাধিক গোষ্ঠীর সভ্য হতে পারেন, কিন্তু ঐ তিনজন সে-জাতের লেখক নন। ভারতবিষয়ে লেখা আর ভারতীয় লেখক হওয়া এক জিনিস নয়। বস্তুত, যদিও শিরোনামে বলা হয়েছে 'ভারতের পরিবর্তনশীল সাহিত্যগুলি', কার্যত কিন্তু পাঠ্যবস্তুর এই বিচিত্র সমাহারে একমাত্র কানাড়া ছাড়া ('সংস্কার') আর কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষা স্থান পায়নি।

'গৌরবে বহুবচন' হয়তো একেই বলে । রামানুজনের নিজের ইংরেজি কবিতা নেবার আগে তাঁর করা প্রাচীন তামিল কবিতার অনুবাদ নেওয়া বেশি সঙ্গত হতো । আর উত্তর ভারতের কোনো ভাষারই প্রতিনিধি এখানে নেই । ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' বা রাদিচে-র অনুবাদগুচ্ছ থাকতে পারত । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নেই, আছেন রুশ্‌দি ।

এই নাকের-বদলে-নরুন-পেলাম-জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জাতক । ১৮৩৫ সালে মেকলে বলেছিলেন যে ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের এমন একটি ইংরেজিশিক্ষিত শ্রেণী তৈরি করতে হবে, যার সভ্যরা হবে 'রক্তে ও রঙে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, মতামতে, নীতিবোধে ও ধীশক্তিতে ইংরেজ' । ইংরেজিভাষী জগৎ এখনও এই শ্রেণীর লোকেদেরই ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধি ব'লে গণ্য করেন । তাই ভারতীয় ভাষার লেখকদের ডিঙিয়ে যে ভারতীয়রা ইংরেজিতে লেখেন তাঁরাই ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন । তাঁরা ভাবতের যে ছবি আঁকেন তা-ই ভারতের যথার্থ চিত্র হিসাবে গৃহীত হয় । ভারতের কিছু কিছু 'স্মার্ট' সমালোচকও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মদত দিয়ে থাকেন । তাঁদের কাছে লণ্ডন-নিউ ইয়র্কের হাততালিই সাহিত্যবিচারের নিকষ । এটা একধরনের নব্য উপনিবেশবাদ, নব্য মেকলে-বাদ । রুশ্‌দি নিজে চান বা না চান, এই নব্য উপনিবেশবাদ বা নব্য মেকলে-বাদ স্বপ্রয়োজনে তাঁকে ব্যবহার করে ।

রুশ্‌দি সেটা বোঝেন কিনা আমি জানি না । ব্রিটেনের বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এবং থ্যাচারতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'শয়তানী পদাবলী'-তে সোচ্চার প্রতিবাদ আছে । তাঁর মধ্যে একটা দ্বিত্ব আছে : তিনি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছেন, আবার নিজে তার দিকে বিপজ্জনকভাবে ঘেঁষেও গেছেন । মিসেস থ্যাচার এই বইয়ে উল্লিখিত হ'য়েছেন 'মিসেস টর্চার' নামে । অবশ্য সেজন্যে মিসেস থ্যাচার লেখকের মাথা দাবি করেননি । এবং নিয়তির পরিহাস এই যে যদিও এই বইয়ে রুশ্‌দি ব্রিটিশ পুলিশের খুব খারাপ ছবি এঁকেছেন, তবুও বর্তমানে তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ঐ ঘৃণিত ব্রিটিশ পুলিশের সহায়তা ব্যতীত সম্ভবই নয় ।

রুশ্‌দির বর্তমান জীবন তাঁর এবং তাঁর পবিবারের পক্ষে নিঃসন্দেহে কষ্টকর অভিজ্ঞতা । শুনছি তাঁর মার্কিন স্ত্রীও নাকি অনির্দিষ্টকালের জন্য অজ্ঞাতবাসকে দুঃসহ মনে ক'রে তাঁকে ছেড়ে স্বদেশে চ'লে গেছেন । একে তিনি আধুনিক মার্কিন মেয়ে, তায় তিনি নিজে লেখিকা । আর কতদিন তিনি নিজের কর্মক্ষেত্র ছেড়ে লুকিয়ে থাকবেন ? তাঁর কাছ থেকে সীতার স্টাইলের পাতিব্রত্য আশা করা যায় না । মনে হয় রুশ্‌দি এখন একেবারেই একা । কোনো লেখকের পক্ষে, কোনো মানুষের পক্ষে এ অবস্থা সুখকর হতে পারে না । এ যেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড । তিনি কি কোনোদিন নিরাপদে বাইরে বেরোতে পারবেন, স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবেন ? অনেকেই বলেছেন, তাঁকে আত্মপরিচয় বদলাতে হবে, প্ল্যাস্টিক সার্জারির সাহায্যে মুখের চেহারা বদলাতে হবে, নয়তো তাঁর পক্ষে বাইরে বেরোনো নিরাপদ হবে না । কিন্তু চেহারা যদি-বা বদলানো যায়, একজন লেখকের পক্ষে তাঁর স্বকীয় লেখার স্টাইল বদলানো কি সম্ভব ? না কি তাঁকে বাঁচতে হবে দুই স্তরে—বাইরে বেরোবেন নতুন নামে, নতুন মুখে, ছদ্মপরিচয়ে, কিন্তু বই লিখে যাবেন আগের মতোই আগেকার নামে ? কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া পুরো পরিচয়ে কেউ তাঁকে জানবেন না ?

লণ্ডনের সাহিত্যিক হোমরাচোমরাদের পৃষ্ঠপোষকতা রুশ্‌দি পেয়েছিলেন, কিন্তু

আধুনিক সন্ত্রাসবাদের মুখোমুখি এঁরা তাঁকে বর্তমান দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করতে অক্ষম। প্রশ্ন তোলা যায়, তিনি যে বিশ্রী বেকায়দায় পড়েছেন তার সমস্তটাই কি আপতিক, নাকি এর পিছনে জটিলতর পটভূমি, কোনো প্রতিষ্ঠানের কায়েমী স্বার্থ আছে ? তিনি কি কোনো গোষ্ঠীর হাতে 'ব্যবহৃত' দাবাখেলার বড়ে ? যাঁরা তাঁকে সাহিত্যিক মহলে 'দুষ্টুমি করতে' প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, লুক্কায়িত লেখকের বই বিক্রি ক'রে যাঁদের মুনাফাবৃদ্ধি হচ্ছে, তাঁদের স্বার্থ কি এর সঙ্গে জড়িত ? 'আন্তর্জাতিক' লেখক হওয়ার একটা পরিণাম কি আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের কাছে আত্মবিক্রয়, এবং সেক্ষেত্রে আলোচ্য লেখকের নিঃসঙ্গ জীবনের রয়ালটির টাকা কি এক ধরনের সান্ত্বনা পুরস্কার ?

মার্কিন কবি সিলভিয়া প্লাথের কথা মনে পড়ছে। এঁকেও লণ্ডনের সমালোচকরা খুব উপরে তুলেছিলেন, বীভৎসরসের লেখিকা হতে জোরসে মদত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মানসিক ভাঙনের সময় তাঁরা কিছু করতে পারেননি, আত্মহত্যার হাত থেকে তাঁকে বাঁচাতে পারেননি।

ভারতে বইটির প্রচার নিষিদ্ধ ক'রে দিল্লি সরকার অনিবার্যত বাকস্বাধীনতাপ্রেমিকদের সমালোচনাভাজন হয়েছেন। লেখকদের বাকস্বাধীনতায় আমরা কে না বিশ্বাস করি। এই পত্রিকা যাঁরা পড়েন, এখানে যাঁরা লেখেন, তাঁরা সকলেই এই স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। লেখা আমার নিজের বৃত্তি ; সুতরাং বাকস্বাধীনতার সঙ্গে আমার নিজের স্বার্থও জড়িত। কিন্তু সব স্বাধীনতাকেই বুঝতে হবে একটা প্রসঙ্গে, একটা বাস্তবতার অভ্যন্তরে। জীবন তো কেবল তত্ত্বের ব্যাপার নয়, তার একটা ব্যবহারিক দিক আছে। আপনার স্বাধীনতা যদি হয় আমার পরাধীনতা, তাহলে সে-স্বাধীনতা অচল। হিংসার, পরপীড়নের, চৌর্যের, পর্নোগ্রাফির—এবংবিধ আরও অনেক কাজের—স্বাধীনতার কোনো ভিত্তি নেই। সব স্বাধীনতাই সীমাবদ্ধ।

এক্ষেত্রে দিল্লি সরকারের সামনে আর কোনো বিকল্প ছিল বলে মনে হয় না। আজ না হোক কাল এই বই গোঁড়া মুসলমানদের বিক্ষোভের কারণ হতোই, তাকে ঠেকানো যেত না। অশান্তি এড়াবার জন্যই যে এই সরকারি সিদ্ধান্ত, বইটি পড়ার পরে এটুকু বুঝতে পারছি। সান্ত্বনা এই যে নিষেধাজ্ঞার ফলে ভারতীয় পাঠকরা কোনো অনুপম সাহিত্যকীর্তির রস থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না, এবং রাষ্ট্রের শান্তি হয়তো কিছুটা রক্ষিত হয়েছে।

স্বাধীনতা দাবি করার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও নিতে হবে। ট্র্যাফিকের স্রোতে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে যেমন, তেমন বই লেখা ও বার করার ক্ষেত্রেও কিছু-কিছু নিয়ম থাকাই স্বাভাবিক, যদিও সেগুলি অলিখিত হতে পারে। যখন আমরা চাইবো যে আমাদের আত্মপ্রকাশের উপরে কোনো সরকারি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে না, তখন সর্বাগ্রে আমাদের নিজেদেরই দায়িত্বশীল ও শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠতে হবে। প্রয়োজনবোধে আত্মসংযম, লেখনীসংযম সেই কর্তব্যের অন্তর্গত। মনে হয় রুশদির সেখানেই একটা ত্রুটি হয়ে গেছে।

অক্সফোর্ড, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

লোকনাথ ভট্টাচার্য

একটি গভীরতার নাম, আন্তোনিও পোর্কিয়া

আন্তোনিও পোর্কিয়া-কে (Antonio Porchia) নিয়ে লিখতে চাওয়া হয়তো আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তাঁর সম্বন্ধে চেষ্টাচরিত্র ক'রে যেটুকু জানতে পেরেছি, তাকে কোনো জানা বলা যায় না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁর নাম আমার অজ্ঞাত ছিল, আজ পর্যন্ত তাঁর কোনো ফোটোগ্রাফও আমার নজরে পড়েনি। তার উপর, প্রচলিত অর্থে কবি-সাহিত্যিক তিনি ছিলেন না, যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর লিখিত উক্তিসমূহের কিছু অংশ সংকলিত হ'য়ে 'স্বর' নামে একটি গ্রন্থাকারে বেরিয়ে যায়। এসব উক্তি একদিন ছাপা হবে ব'লে যে তিনি সেগুলি লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পান, তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞাত তথ্য থেকে এমন ধারণা একেবারেই হয় না। অতি সাধারণ মানুষ ছিলেন তিনি, সারাজীবন ছোটখাটো কাজ ক'রে জীবিকা অর্জন করেছেন, এবং সেসব কাজের সঙ্গে সাহিত্য-জগতের সম্পর্ক ছিল না। তবু সেই সাহিত্য-জগতেরই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কাছে তিনি গুরুর স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন—সেই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে রথী-মহারথীর অভাব নেই।

তাই এমন একটি ব্যক্তিকে নিয়ে যে কিংবদন্তীর সূত্রপাত হবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। যদিও আজও তাঁর সম্বন্ধে জানার মতো মালমশলা খুবই কম, তবু তাঁকে নিয়ে সেই কিংবদন্তী কয়েক দশক ধ'রে একটু-একটু ক'রে বাড়ছে।

তাঁর জীবন সম্বন্ধে যে-মুখ্য তথ্যগুলি জ্ঞাত, তা দু-এক কথায় সেরে নেওয়া যায়। ইতালির দক্ষিণ প্রান্তস্থিত কালাব্রিয়া নামক অঞ্চলে ১৮৮৬ সালে তাঁর জন্ম হয়; অতি অল্প বয়সেই তিনি আর্জেন্টিনায় দেশান্তরী হন। সারা জীবন আর্জেন্টিনাতেই কাটে, সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৯৬৮ সালে। তাঁর লেখাগুলি তাই বলা বাহুল্য স্প্যানিশ ভাষাতেই। বুয়েনোস এয়ারেসের বন্দরে এক সামান্য কেরানির কাজ করেন বহুকাল, পরে কিছু সময় এক ছাপাখানায় কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর লিখিত বই বলতে ঐ 'স্বর'-ই সবেধন নীলমণি, তাঁর জীবিতকালে সেটির প্রথম সংস্করণ যে ঠিক কোন্ সালে বেরোয় তা আমি জানি না, তবে বইটির একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ তাঁর মৃত্যুর সাত বছর পরে বুয়েনোস এয়ারেস থেকে ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এর বেশ কিছু আগে মূল বইটির প্রথম সংস্করণের কিছু অংশ রজে কাইওয়া (Roger Caillois) ফরাসিতে অনুবাদ করেন, এবং সেই অনুবাদটি ছোট গ্রন্থাকারে প্যারিস থেকে বেরোয় ১৯৪৯ সালে। এর পরে আরও বেশ কয়েক বছর যায়, শেষে ১৯৭৫ সালে মূল স্প্যানিশে বইটির যে-পরিবর্ধিত সংস্করণটি বেরোয়, সেটির একটি সম্পূর্ণ ফরাসি অনুবাদ ১৯৭৮ সালে প্যারিস থেকে বেরোয়, এবারের অনুবাদক হলেন রজে ম্যুনিয়ে (Roger Munier)—বইটির গোড়ায় রয়েছে হর্হে লুইস বর্হেস (Jorge Luis Borges)-কর্তৃক লিখিত একটি দু'পৃষ্ঠার মুখবন্ধ, শেষে রয়েছে তেরো পৃষ্ঠার একটি মন্তব্যরূপ

সংযোজনী, যেটি লিখেছেন রবের্তো হুয়ারস (Roberto Juarroz)। বলা বাহুল্য, যেমন ঐ ভূমিকাটি, তেমনি সংযোজনীটিও মূল স্প্যানিশ থেকে একই অনুবাদকের দ্বারা ফরাসিতে অনূদিত।

পোর্কিয়া সম্বন্ধে আমি যেটুকু জেনেছি, এবং বর্তমান এই রচনাটির প্রায় আগাগোড়া খোরাকই যেখান থেকে পেয়েছি, তা হ'লো উক্ত ঐ রজে ম্যুনিয়ে-কৃত ফরাসি অনুবাদটিই। লেখক (এবং বিশেষত, হুয়ারস, পোর্কিয়া ও অক্তাভিয়ো পাজ-এর অনুবাদক) হিসেবে ফরাসি সাহিত্য মহলে রজে ম্যুনিয়ে একটি শ্রদ্ধেয় নাম। আর হুয়ারস তো আর্জেন্টিনার এক বড়ো কবি, এবং আজকের জীবিতদের মধ্যে তিনিই বোধহয় পোর্কিয়াকে অতি নিকট থেকে ও অতি আন্তরিকভাবে চিনেছিলেন। এবং বর্হেস সম্বন্ধে কীই বা বলব! কোন্ ধরনের মহারথী তিনি, তা সারা জগতে বিদিত। ১৮৯৯-এ জন্ম তাঁর, ১৯৮৬-তে মৃত্যু, এই দীর্ঘ জীবনের সাহিত্য-কীর্তি বিংশ শতাব্দীর এক গরিমা। তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি, সেটা তাঁর দুর্ভাগ্য নয়, নোবেল পুরস্কারেরই দুর্ভাগ্য।

পোর্কিয়াকে প্রথম যিনি ফরাসিতে (এবং সেই মাধ্যমে বৃহত্তর বিশ্বেও) প্রচার করেন, সেই রজে কাইওয়া (১৯১৩-১৯৭৮) শুধু ফরাসি প্রবন্ধকার হিসেবেই এক অনন্য-কীর্তির অধিকারী নন, স্বীয় অনুবাদের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে স্প্যানিশ সাহিত্যের প্রসারে তাঁর অবদান আজও অতুলনীয় ব'লে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, বুয়েনোস এয়ারেসে ফরাসি ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও তিনি খ্যাত।

তবে পোর্কিয়াকে নিয়ে আমার আগ্রহের কারণ যে তাঁর সঙ্গে এই বিখ্যাত নামগুলির সম্পর্কটিই, তেমন মনে করা অন্যায় হবে। যদিও বর্হেস যেচে এসে ভূমিকা (এবং কী ভূমিকা!) লিখবেন এক সংকলনের, এই বার্তাটুকুই অগ্রিম এক কৌতূহলে আকৃষ্ট হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সে-বার্তাটুকুও আমি আগে পাইনি, পেলাম অনেক চেষ্টা ক'রে বইটি যোগাড় করার পরই।

অতি সম্প্রতিকালে-ঘটিত প্যারিসের এক সভায় হুয়ারস ছিলেন নিমন্ত্রিত বিশেষ-অতিথি। তাঁর কিছু-কিছু রচনা সেদিন তিনি মূল স্প্যানিশে পাঠ করলেন, তাঁর মুখ্য ফরাসি অনুবাদক রজে ম্যুনিয়েও উপস্থিত ছিলেন একই মঞ্চে, তিনি এবং আরো দুয়েকজন যে-রচনাগুলি হুয়ারস পাঠ করলেন, সেগুলির ফরাসি অনুবাদ প'ড়ে শোনালেন। পাঠের পরে প্রশ্নোত্তরের জন্যে কিছু সময় নির্ধারিত ছিল, তখনই আলোচনার প্রসঙ্গে একাধিক মুখ থেকে পোর্কিয়ার নাম বেরিয়ে এল। সেইদিন থেকে আমি খুঁজছি প'ড়ে জানবার মতো তাঁর সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য। দেখলাম, আমার অতি সীমিত বন্ধুমহলেও এই নামটি নিতান্ত অপরিচিত নয়, বরং সেই কিংবদন্তীর পুরু একটা প্রলেপ কোথাও-কোথাও যেন বেশ ঘনভাবেই প'ড়ে গিয়েছে।

বইটি যোগাড় ক'রে বর্হেসের ভূমিকা বা হুয়ারসের সংযোজনীটি পড়ার আগে নজর দিতে যাই স্বয়ং পোর্কিয়ার রচনার নমুনাগুলিতে, তখন দেখি এও সেই একই বচনাত্মক সূত্র-ঘেঁসা জ্ঞানগর্ভ উক্তির সমষ্টি, যার পরিচয় ইদানীংকালের ফরাসি কবিদের মধ্যে একটু বড্ড বেশি ক'রে পেয়েছি—যেন aphorismes একটা অতি পবিত্র শব্দে দাঁড়িয়ে গেছে আজকের সাহিত্যে। তবু খুব বড়ো বড়ো কবিদেরও এই ধরনের রচনা আমার কাছে

অনেক সময় অতীব ক্লান্তিকর ঠেকেছে—যেন তা বুলিমাত্র, আসলে অনেক সময় তা বুলিই মাত্র, কবিদের যে প্রজ্ঞাপারমিতা লাভ হয়েছে, তা জানানোর জন্যে তাঁরা যেন অতীব ব্যস্ত। অথচ জানি তো, এঁদের অনেকেই আরো একটু নাম করার জন্যে বা অমুক-তমুক পুরস্কার পাওয়ার বাসনায় ও প্রচেষ্টায় একমুহূর্ত ক্ষান্ত নন—তখন তাঁদের সেই প্রজ্ঞা যায় কোন্ চুলোয়।

পোর্কিয়াকে পড়তে গিয়ে ভয় হয় তাই, কিন্তু সে-ভয় যে কত অমূলক, তা তাঁকে পড়তে আরম্ভ ক'রেই বুঝলাম। এ একেবারে উৎস হ'তে উৎসারিত বাক্য, জ্ঞান নয়, জ্ঞানগর্ভ হওয়ার প্রচেষ্টাও নয়, শুধু ভিতরটা খুলে দেওয়া, অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশ্রিত সরলতা, স্বচ্ছতা, গভীরতা। তিনি তো পুরস্কারের পিছনে ছোটার লোক ছিলেন না, নিজেকে সাহিত্যিকও মনে করতেন না—এ এক অন্য জাতের জিনিস, অন্য জগতের জিনিস। 'স্বর' তাই আমাদের সময়কার এক অন্যতম আধ্যাত্মিক দলিল, ম্যুনিয়ে-কর্তৃক-দত্ত বইটির হেন পরিচয় গ্রাহ্য ব'লে ঠেকে।

দুই

আমি এখানে প্রথমে তুলে দিচ্ছি বর্হেসের ভূমিকাটি, পরে দৃষ্টান্ত হিসাবে পোর্কিয়ার কিছু উক্তি, শেষে হুয়ারসের সংযোজনীর অংশবিশেষের অনুবাদ। অর্থাৎ বইটির এখানে আলোচিত সংস্করণটিতে যে-ধারা রক্ষিত হয়েছে, তা-ই পালন করছি এই নিবন্ধে। এর ফলে হুয়ারস যা বলছেন, তার সত্যতা বর্তমান নিবন্ধের পাঠকেরা নিজেরাই যাচাই ক'রে নিতে পারবেন, কারণ তার আগেই পোর্কিয়ার বেশ কিছু উক্তির নমুনা তাঁরা প'ড়ে ফেলেছেন।

ভূমিকায় বর্হেস বলছেন :

"বচনের মতো উক্তিতে ঝুঁকি হলো এই : তাকে ঠেকতে পারে এক শুদ্ধ বাচনিক সমীকরণ মাত্র। সেখানে আমরা আবিষ্কার করতে প্রলুব্ধ হই সুযোগ বুঝে এসে পড়া কিছু কথার খেলা বা কোনো সংমিশ্রণী শিল্পের কাজ। কিন্তু এ-কথা প্রযোজ্য হবে না নভালিসের ক্ষেত্রে, বা লা রশফুকোর ক্ষেত্রে, বা আন্তোনিও পোর্কিয়ার ক্ষেত্রে। তাঁদের মধ্যে পাঠক পান এক মানুষের অব্যবহিত উপস্থিতির চেতনা, সেই মানুষের নিয়তির বোধ।

"তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় আমার ছিল না। তাঁর নাম প্রথম শুনি দৃষ্টিবান শিল্পী ক্‌জুল সোলারের মুখে। তাঁরা ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন, এ-কথা আমি অবলীলাক্রমে চালাতে পারি, সেটা বললে তাঁদের দুজনের কেউই আজ আমায় শোধরাতে পারবেন না। কিন্তু যেটা জোর দিয়ে বলতে পারি, তা হলো এই যে তাঁর 'স্বর'-এর মাধ্যমে আন্তোনিও পোর্কিয়া আজ আমার আন্তরিক বন্ধু, যদিও সেটা তিনি নিজে হয়তো জানেননি।

"সবাই স্বীকার করবে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধ'রে ভার্জিলীয় বাচনভঙ্গি ও বাইবেলিয় বাচনভঙ্গি নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্যে পৃথকীকৃত হ'য়ে এসেছে। সন্দেহের মুহূর্তে কেউ তেমন কিছু না ভেবে-চিন্তে খুলল কোনো গ্রন্থ (সেটা যে না ভেবে-চিন্তেই, আসলে তা নয়), এবং তখুনি পেল ভার্জিলের উপদেশ বা পবিত্র আত্মার উপদেশ। পোর্কিয়ার রচনা নিয়ে এ পন্থার আশ্রয় আমিও অনেকবার নিয়েছি। এখুনি সেটা আবার নেওয়া যাক।

বই খুলতেই পাচ্ছি এই : 'ভূতপ্রেত নিয়ে নিজের জগৎ যে ভরে না, সে থাকে একলা।'

"সুখের কথা, যেটা আমাদের দুঃখেরও কথা, ভূতপ্রেতের অভাব আমাদের কারুরই নেই। আমরা মনে করি আমরা আর্জেন্টিন, চিলিদেশীয়, ফরাসি, অমুক বিশ্বাসের ভক্ত, তমুক পার্টির সদস্য, কোনো একটি ঐতিহ্যের আশ্রয়ী, কোনো একটি নামধারী, কোনো বাড়ি বা শতাব্দীর অধিবাসী, অনেক অন্যান্য মুখের মধ্যে একটি কোনো মুখের কর্তা। হেন ভূতপ্রেতের বিরাম নেই, তবু এটাও অসম্ভব নয় যে মৃত্যুর মুহূর্তে তারা আমাদের ছেড়ে দেয় একলা, ভয়ংকরভাবে একলা।"

"আরেকটি পৃষ্ঠার সন্ধান নেওয়া যাক, বই খুলতেই পাচ্ছি : 'যার ব্যবহারিক জ্ঞান নেই, সে তবু জেনেছিল ঈশ্বর তৈরি কবতে।'

"এখানে আমি পাচ্ছি এক প্রাচীন বিচিকিৎসার স্বীকৃতি। আমার চিরকাল মনে হয়েছে যে ঈশ্বর, অর্থাৎ ধর্মতাত্ত্বিকদের সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তিনি কাল্পনিক সাহিত্যের এক অদ্ভুততম উদ্ভাবন।

"অন্য এক পৃষ্ঠায় পোর্কিয়াকে দেখছি বলতে : 'দূরত্ব কিছুই করতে পারেনি, সবই রয়েছে এখানে।'

"কার্লাইলকে নিয়ে একটা গল্প আমার মনে পড়ছে। অস্ট্রেলিয়ায় রওনা হচ্ছে, এরকম একদল দেশান্তরী তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে আসে। কার্লাইল তাঁদের বলেন : 'কী হবে ভ্রমণ ক'রে ? তোমাদের অস্ট্রেলিয়া রয়েছে এখানেই, এখনই।' পোর্কিয়ার বাক্যটিকে অন্য আরেক প্রকারেও ব্যাখ্যা করা যায়। শুধু বর্তমানই আছে, গতকাল এবং আজ ভ্রান্তি মাত্র।

"তাদের কথাগুলি যা বলছে তার চেয়ে আরো অনেক দূরে নিয়ে যায় এই গ্রন্থের প্রবচনগুলি। এরা কোনো সমাপ্তি নয়, এক আরম্ভ শুধু। কোনো ফল উৎপাদন এদের অভিষ্ট নয়। এমন ধারণা করা চলে যে তাঁর নিজের জন্যেই লেখক এগুলি লিখেছিলেন, তিনি জানতেই পারেননি যে এদের মাধ্যমে অন্যদের জন্যে তিনি অঙ্কিত ক'রে চলেছেন নির্জন ও প্রাঞ্জলতাপূর্ণ এমন একটি মানুষের চিত্র যে প্রতিটি ক্ষণের অনন্যরহস্য বিষয়ে সচেতন।"

তিন

বর্হেস এই ভূমিকাটি লেখেন ১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বরে, অর্থাৎ পোর্কিয়ার মৃত্যুর দশ বছর পরে।

এইবারে আসা যাক স্বয়ং পোর্কিয়ায়। তাঁর সবসুদ্ধ ছ' শো মতন উক্তি এ-বইয়ে সংকলিত হয়েছে, অধিকাংশই আড়াই থেকে তিন লাইনের, কোনো-কোনোটি আরো ছোট; এক লাইনেরও কিছু-কিছু উক্তি রয়েছে। অন্যদিকে আরো কয়েকটি আছে যা তিন বা চার, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পাঁচ লাইনেরও। ভাষা হিসেবে ফরাসি ও স্প্যানিশ সহোদরা দুই বোন, একটি থেকে আরেকটিতে অনুবাদে মূলকে অবিকল ধ'রে রাখা প্রায় সবক্ষেত্রেই মোটামুটি সহজে আয়াসসাধ্য—বাংলার অনুবাদে সে-কথা খাটবে না। ধ্বনি-মাধুর্য তো মার খাবেই, তার ওপর একই রকম ধ্বনির দুটি বা তিনটি বিভিন্ন কথার

ব্যবহারে ফরাসি হ'তে স্প্যানিশে বা স্প্যানিশ হ'তে ফরাসিতে ভাব নিয়ে নানারকমের যে-লুকোচুরি খেলা করা যায়, তার আংশিক রক্ষণও বাংলা অনুবাদে প্রায়ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। অতএব পোর্কিয়ার বচন হ'তে সামান্য কয়েকটি নমুনার যে-নির্বাচন আমি এখানে বাংলায় উপস্থাপিত করছি, তা পড়ার সময় পাঠকেরা ভাষাগত এই পার্থক্যজনিত ত্রুটিময় দূরত্বের সম্ভাবনাটিকে মনে রাখবেন।

আমাদের সুখের বিষয়, পোর্কিয়া মানুষটি যেমন ছিলেন, তাঁর ভাষাও তেমনি সহজসরল—হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌ৢপ্তঃ। অভিজ্ঞতায় ও প্রকাশে কৃত্রিমতা না থাকাতে এখানে যে-কোনো ভাষাতেই অনুবাদকের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হ'য়ে দাঁড়ায়। তাঁর উক্তিগুলি নিঃসৃত তাঁরই জীবন হ'তে।

কিছু উক্তি অতএব দেখা যেতে পারে এবার :

"বেশ কিছু নীহারিকাপুঞ্জের দূরত্বে স্থিত হ'য়ে আমি যা করছি তা করছি, যাতে বিশ্বজগৎ হারায় না তার সাম্য, যে-সাম্যের আমি স্বয়ং এক অংশ।"

"যে দেখেছে সব নিঃশেষিত হ'তে, সে প্রায় জেনে ফেলেছে কিসে সব ভরে ওঠে।"

"আমার পথটা পেরোনোর আগে আমি নিজেই ছিলাম সেই পথ।"

"আমার প্রথম বিশ্বটিকে আমি আগাগোড়া খুঁজে পাই আমার শীর্ণ রুটিখণ্ডে।"

"চ'লে যাবার সময় পিতা আমার শৈশবকে উপহার দিয়ে যান এক অর্ধ-শতাব্দী।"

"ক্ষুদ্র জিনিসগুলি চিরন্তন, বাকি যা-কিছু, অন্য সবকিছু, ক্ষণস্থায়ী, অতীব ক্ষণ-স্থায়ী।"

"সত্যের বন্ধুরা খুবই অল্পসংখ্যক, এবং যে ক'টি বন্ধু তার আছে, তারা সবাই এগোয় আত্মহত্যার দিকে।"

"আমার সঙ্গে যে-ব্যবহার করা উচিত ব'লে তুমি ভাবো, সেই ব্যবহারই করো, যে ব্যবহারের আমি যোগ্য, সেই ব্যবহার নয়।"

"মানুষ যায় না কোথাও, সবই আসে তার কাছে, এই যেমন আগামীকাল।"

"বেঁধে যে রেখেছে আমায়, সে শক্ত নয়, বন্ধনটা শক্ত।"

"আমাকে কেউ খুলে দেয় একটি দরজা, যেই ঢুকি, অমনি নিজেকে খুঁজে পাই একশোটা বন্ধ দরজার সামনে।"

"আমার দারিদ্র্য সম্পূর্ণ নয়, তাতে নেই শুধু আমি নিজে।"

"চোখ যদি ঊর্ধ্বে না তোলো তুমি, তোমার মনে হবে তুমিই উচ্চতম শীর্ষ।"

"কী ক'রে বাঁচতে হয়, তা আমি খুঁজে পাইনি কারুরই মধ্যে। এবং রইলামও সেইরকমই : যেন কেউই নই আমি।"

"বিশ্বাস না করার যে-পাপ, তা অল্প বিশ্বাস করায়।"

"তোমার যে কিছু নেই, তা আমি জানি। তাইতো আমি তোমার কাছে চাইছি সব। যাতে সবই তোমার হয়।"

"আসছি আমি মরার থেকে, জন্মানোর থেকে নয়। জন্মানোর থেকে আমি পালাচ্ছি।"

"হে আমার ঈশ্বর, আমি কখনো তোমাতে বিশ্বাস প্রায় করিইনি, কিন্তু চিরকাল ভালোবেসেছি তোমায় ।"

"যদি হতাম কোনো শিলার মতো, কোনো মেঘের মতো নয়, তবে আমার চিন্তা যা হাওয়ার মতো, তা আমায় ছেড়ে চ'লে যেত ।"

"একদিন স্মৃতি হ'তে পারবে, সেই আশা নিয়ে বাঁচে মানুষ ।"

"কাদা আমি প্রায় ছুঁই-ই নি, আমি নিজেই কাদা ।"

"আমার মনে হয় আত্মা যা, তা আত্মার অসুখ। কারণ যে-আত্মা তার অসুখ থেকে সেরে ওঠে, সে মারা যায় ।"

"উচ্চতা পথ দেখায়, কিন্তু তা উচ্চতাতেই ।"

"আলোর এক রশ্মি মুছে দিল তোমার নাম । তুমি কে, আর তা জানি না ।"

"মানুষ যখন শুধু তা-ই যা মানুষ ব'লে মনে হয়, তখন সে প্রায় কিছুই নয় ।"

"ওদের সঙ্গে মিলিত হবে যখন, তখন দেখবে সেই দূরত্ব যা তোমাকে পৃথক করে ওদের থেকে ।"

"একশো লোক, একত্রে, একটি লোকের এক শতাংশ ।"

"কখনো-কখনো দুঃখকে আমার এত বিরাট ঠেকে যে ভয় করে ভাবতে একদিন তার দরকার হ'তে পারে আমার ।"

"তুমি মনে করছ তুমি আমায় হত্যা করছ । আমার ধারণা তুমি আত্মহত্যা করছ ।"

"যেহেতু তুমি শ্রেষ্ঠ, এই জগতের মধ্যে, তুমি ভাবছ তুমি শ্রেষ্ঠ এই জগতের পক্ষে । আমাদের চোখে কী ধুলোই না দেয় আমাদের বিশ্বাস ।"

"দূর, অতি দূর, সুদূরতম, তাকে আমায় খুঁজে পেতে হ'লো শুধু আমারই রক্তে ।"

"রহস্য শান্ত করে আমার চোখ, তাকে অন্ধ করে না ।"

"কোনো জিনিস, যতক্ষণ-না তা সব হয়, তা কোলাহল, সব হ'লেই, সে নীরবতা ।"

"কিছু যা নয় তা শুধু কিছু নয়ই নয়, তা আমাদের কারাগারও ।"

"আমরা ছিলাম, আমি ও সমুদ্র । সমুদ্র ছিল একা, আমিও একা । এই দুইয়ের একজনের অভাব ছিল ।"

"পৃথিবীতে শুধু তাই আছে যা তুমি মাটি থেকে উপরে তোলো । আর কিছু নেই তার ।"

"ঢুকল এক নতুন বেদনা, এবং ঘরের পুরানো বেদনাগুলো তাকে গ্রহণ করল নিঃশব্দে, নিজেরা এতটুকুও না স'রে গিয়ে ।"

"না, আমি ঢুকছি না । কারণ ঢুকি যদি তো কেউ-ই নেই ।"

"কোনো-কোনো যন্ত্রণা আছে যারা স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে, যারা মনে করতে পারে না কেন তারা যন্ত্রণা ।"

"যদি তোমারই পথে তুমি চলো তো লোকে বলবে তুমি চলেছ ভুল পথে ।"

"ডানা আকাশও নয়, মাটিও নয় ।"

"সবকিছুর এক হাতের মধ্যে আমি পৌঁছে গেছি, এবং রয়েছি সেখানেই, সবকিছু থেকে দূরে, এক হাতের ব্যবধানে ।"

"মেঘের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আমার চিন্তার শরীর শুধু আমার শরীরেই নয়।"

"তোমার হাত আমার পক্ষে যথেষ্ট, কারণ তা আমায় সম্পূর্ণ ক'রে ঢাকে এবং তা স্বচ্ছ নয় ।"'

"ঈশ্বর মানুষকে অনেক দিয়েছেন, কিন্তু মানুষ চায় মানুষের কাছ থেকে কিছু ।"

"সবই অর্জিত হয়েছে যখন, সকাল তখন বিষণ্ণ ।"

"যে-জানালা দিয়ে তুমি চোখ বাড়াও, সেটা যদি তোমায় বন্ধ করতে হয়ই তো আগে চোখটা বন্ধ করো ।"

"রাত্রে আমি কখনো-কখনো আলো জ্বালাই, যাতে না দেখতে পারি ।"

"তুমি যে সব দিয়েছ, সেটা কেউ বুঝছে না । তোমাকে আরো দিতে হবে ।"

"আত্মার হননকারী একশো আত্মাকে হত্যা করে না । সে হত্যা করে একটি আত্মাকে, একশোবার ।"

"রাস্তাতে রাস্তা ছাড়া আর কিছু নেই, এবং তোমার বাড়িতে কিছুই নেই, রাস্তা পর্যন্ত নেই ।"

"আমার নীরবতায় কিছুরই অভাব নেই, শুধু আমার স্বরটি ছাড়া । "

"ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের দুঃখের আকার থাকে না । যদি তাকে জাগানো যায়, সে আকার নেয় তারই যে তাকে জাগিয়েছে ।"

"ক্ষীণতম প্রদীপও জ্বলে যেখানে, সেখানে আমার আলোটি জ্বালাব না ।"

"কোনো-কোনো জিনিস এত বেশি ক'রে আমাদের হ'য়ে ওঠে যে তাদের অস্তিত্ব আমরা ভুলে যাই ।"

"অনন্ত আলো পারল না আমার চোখকে সম্পূর্ণ ক'রে খুলতে । অনন্ত রাত্রি কি পারবে তাকে সম্পূর্ণ ক'রে বোঝাতে ? কে পারে জানতে !"

"আমি যখন মরব, সেই প্রথমবার নিজেকে আমি মরতে দেখব না ।"

"আমি এক বাসিন্দে, কিন্তু কোথাকার ?"

"ছায়াগুলি : কোনোটি ঢাকে, কোনোটি ঢাকনা উন্মোচন করে ।"

"সবকিছুই একটু-একটু অন্ধকার, মায় আলো পর্যন্ত ।"

"বহু জিনিস আমাকে তাদের অনস্তিত্ব দেখানোর জন্যে আমার হ'য়ে দাঁড়ায় ।"

"নিজের ভালোতে যে আরো ভালো খুঁজে বেড়ায়, সে তার ভালোটিকে হারায় ।"

"অন্ধমানুষ ঘাড়ে তারকা নিয়ে ঘোরে ।"

"একটা এত বড়ো, এত বিশাল বিশ্ব, তা একটা মস্তিষ্ককে চালানোর জন্যে, একটা সামান্য মস্তিষ্ককে ।'

"যে-প্রেম সর্বৈব দুঃখ নয়, তা সর্বৈব প্রেম নয় ।"

"কেন তুমি ফিরে আসছ জীবনে ? বুঝতে পারছি । সবই ক্লান্তিকর হ'য়ে ওঠে ।

মৃত থাকাটাও ।"

"মানুষ এক, নদী এক, নক্ষত্র এক । এক, এক, এক । একের একটি অনন্ত রয়েছে । এবং একটিও দুই কোথাও নেই ।"

চার

পোর্কিয়ার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যেটুকু খবর আর্জেন্টিনার বাইরে ছড়াতে পেরেছে, তার জন্য মুখ্যত হুয়ারসের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ । সেই কারণে এ-বইটির শেষে হুয়ারসের নাতিদীর্ঘ যে-মন্তব্যটি যুক্ত হয়েছে, তার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি এখানে সমীচীন হবে ।

গোড়াতেই হুয়াবস বলছেন, "জীবনেব প্রজ্ঞার সঙ্গে ভাষার প্রজ্ঞার এমন উচ্চস্তরের যোগাযোগ আমি একমাত্র আন্তোনিও পোর্কিয়ার মধ্যেই পেয়েছি । প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যাঁকে বলা চলে এক আপেক্ষিক ও এমনকি সঙ্কীর্ণ সংস্কৃতিরই মানুষ, কী ক'রে তাঁর মধ্যে এমন এক আশ্চর্য মিলন ঘটতে পারে, এবং তাও এমন এক যুগে যখন প্রজ্ঞা নামক বিস্তারটি প্রায় হারিয়েই গিয়েছে, তার কারণ বোঝার চেষ্টায় আমি অনেকদিন আগেই বিরত হয়েছি । ...কিন্তু জীবন ও উচ্চারণের একমাত্র এই দুর্লভ ঐক্য বা সমতার ফলেই যে সত্যকারের প্রজ্ঞা জন্ম নেয়, সে-বিশ্বাস আমি ত্যাগ করিনি । যে-অভিজ্ঞতার মূল্য আছে, যে-সাহিত্যের মূল্য আছে, তাও সম্ভব একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই ।"

পোর্কিয়ার আরো একটি উক্তি : "গভীরতাকে যখন দেখা যায় গভীরতা দিয়ে, তা-ই উপরিভাগ ।" এই উক্তিটির সম্পর্কে বলতে গিয়ে হুয়ারস মঁতেরলাঁ-র (Montherlant) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন : "বাস্তব আছে, অবাস্তব আছে । বাস্তব-অবাস্তব ছাড়িয়ে যা আছে, তা গভীরতা ।"

জন্মটাই ইতালিতে, নইলে মোটামুটি সারাটা জীবনই তাঁর কাটে বুয়েনোস এয়ারেসে, মৃত্যুও সেই শহরে—এক একটানা, দীর্ঘ, অতি সাধারণ জীবন । তবু, বলছেন হুয়াবস, "ক্ষোভ বা নৈরাশ্যের একটি কথাও তাঁব মুখে কখনো শুনিনি । ...একই সঙ্গে এত সরল ও রুচিপূর্ণ ব্যক্তি আমি আর দেখিনি । জামা প্রায় তিনি কখনো পরতেনই না, গরমকালে হয়তো রাত্তিবে শোওয়ার পাজামার উপরি-অংশটা গায়ে চাপালেন, শীতে আরো গরম একটা কোট; কোটের ভিতরে গলার একটা চাদর ঢুকিয়ে দেওয়া, খুলে না যায়, তার জন্যে চাদরটা একটা পিন দিয়ে আটকানো । কিছু গল্প-সল্পের পর তাঁর খুব সাধারণ টেবিলটার উপর এনে হাজির করতেন এক বোতল মোদ, খানিকটা চিজ, সসিজ, রুটি, যার সবই নিজেই বাজারে কিনতে যেতেন ছোট একটা থলি হাতে ক'রে । সরল বন্ধুত্ব ছিল তাঁর আর্ট, তা তিনি ঘিরে রাখতেন কী যত্ন দিয়ে, কী স্নেহ দিয়ে । ঠিক সেই একই স্বাভাবিক সরলতায় ঝাঁটা হাতে ধরতেন বাড়ি পরিষ্কার করতে বা বাগানে যেতেন গর্ত খুঁড়ে গাছের চারা পুঁততে । ...আমরা তাঁকে ডাকতাম দন আন্তোনিও ব'লে । ...বারবার তিনি আমাদের বলতেন, 'ধৈর্য হারিয়ো না, অপেক্ষা করতে শেখো' । এটা তাঁর একটা বড়ো শিক্ষা ছিল ।...

"একদিন আমায় তিনি গল্প করেন, একেবারে শিশু তখন তিনি, খিদেয় ছটফট করছেন, এমন অবস্থায় একটা বল নিয়ে খেলতে শুরু করেন । হঠাৎ একটা লাফ

মারতেই অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে যান । এর থেকে তাঁর ধারণা জন্মায়, ক্ষুধা আনন্দের পথে অন্তরায় নয় । মানুষের খিদে থাকতে পারে, তা সত্ত্বে সে সুখীও হ'তে পারে : 'রুটি নিয়ে যে স্বর্গ রচনা করে, সে ক্ষুধার নরকে ভোগে ।'...

"তাঁর প্রথম বইটির যত কপি ছাপা হয়, তার প্রায় সবটাই তিনি এক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে জমা দেন । সেই প্রতিষ্ঠানের কোনো-কোনো সদস্য যখন আপত্তি তোলেন এই ব'লে যে তাঁর বইটি বড্ড বেশি জায়গা নিচ্ছে, তখন তিনি বইগুলি নীরবে তুলে নিয়ে সর্বসাধারণের কয়েকটি গ্রন্থাগারে সেগুলি উপহার দেন । একবার যখন বুয়েনোস এয়ারেসের এক নামকরা সাহিত্য পত্রিকা তাঁর কাছ থেকে কিছু লেখা চায় ও সেই লেখা পাওয়ার পর তা শোধরাতে বসে এই অজুহাতে যে তাতে ব্যাকরণের ভুল আছে—পোর্কিয়ার সেই লেখা, যার সম্বন্ধে এক ইউরোপিয় লেখক এই আশ্চর্যজনক বিবৃতি দেন যে তিনি তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কীর্তি ত্যাগ করতে রাজী আছেন টুকরো-টুকরো এই কয়েকটি রচনার বিনিময়ে—পোর্কিয়া তখুনি-তখুনি টুঁ শব্দটি না ক'রে লেখাগুলি সেখানে থেকে তুলে আনতে দ্বিধা করেননি । তাঁর তুলনাহীন বিনয় ও অসামান্য নিরাসক্তির সঙ্গে দুর্বলতার কোনো সম্পর্ক কখনো ছিল না ।...

"খুবই ভালোবেসেছিলেন তিনি । এসব ব্যাপারে তাঁর প্রচণ্ড সতর্কতা সত্ত্বেও একদিন তিনি আমাদের ব'লে ফেলেন এক চপলা রমণীর সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় সম্বন্ধের কথা, যে-রমণীটিকে বিবাহ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন । পরে আমরা জানতে পাই, যারা নিজেদের স্বার্থে এই রমণীকে ব্যবহার করত, তারা তাকে কত ভয় দেখায়, শাসায়, যাতে পোর্কিয়ার সঙ্গে সে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে । জানি, এর ফলে পোর্কিয়া নিজেকে কীভাবে দূরে সরিয়ে নেন, তাঁর আপন নিরাপত্তার জন্যে নয়, সে-নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি একেবারেই বিচলিত ছিলেন না, কিন্তু রমণীটিরই নিরাপত্তার জন্যে । তাঁর 'স্বর'-গুলির একটির উৎস এই ঘটনা, উক্তিটি হলো : 'ঝ'রে-পড়া ফুলের মধ্যেই সবচেয়ে সুন্দর ফুলটিকে আমি খুঁজে পেয়েছি ।' প্রেমের সঙ্গে ফুলের সম্পর্ক তাঁর চিন্তার একটি অতি বিশিষ্ট অঙ্গ ।"

এ-ধরনের আরো কিছু-কিছু কথা হুয়ারস জানাচ্ছেন তাঁর সংযোজনীতে । পোর্কিয়ার মৃত্যুব ঘটনাটিও তিনি জানাচ্ছেন, বলছেন, সে-ঘটনার সময় পোর্কিয়ার পাশে থাকার ভাগ্য তাঁর হয়নি । কিন্তু মৃত্যু কোথায় ? আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ বারবার এই প্রশ্ন তুলেছে অনাদিকাল থেকে । এক আশ্চর্যের সামনে প'ড়ে আজ আমরা সামান্যেরাও সেই প্রশ্ন তুলছি ।

প্রতিভা বসু

নায়িকা সত্যবতী

এক

রাজা শান্তনুর মৃত্যু হয়েছে, জ্যেষ্ঠ পৌত্র অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজত্ব করছেন, তাঁর শতপুত্র দুর্যোধন দুঃশাসন ইত্যাদিরা সুখে-স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হচ্ছে, জ্যেষ্ঠ দুর্যোধনের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার আয়োজন চলছে, এইরকম সময়ে সত্যবতীর কনিষ্ঠ পৌত্র পাণ্ডুর পত্নী কুন্তী সহসা একদিন জটাবল্কলধারী পাঁচটি কিশোরকে নিয়ে হস্তিনানগরে এসে পৌঁছলেন। জানা গেল এই কিশোররা পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র। তিনটি কুন্তীর গর্ভজাত, দুটি মাদ্রীর গর্ভজাত। জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের বয়স ষোলো, মধ্যম ভীমের বয়স পনেরো, কনিষ্ঠ অর্জুন চৌদ্দ। এই তিনজন তাঁর, মানে কুন্তীর, অন্য দু'জন নকুল-সহদেবের বয়স তেরো, এরা মাদ্রীর।

পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর ঠিক কুলপ্রথা অনুযায়ী বিবাহ হয়নি। কুরুবংশের নিয়ম অনুসারে কন্যাকে স্বগৃহে নিয়ে এসে বিবাহ করতে হয়। কুন্তী নিজেই স্বয়ংবর সভায় পাণ্ডুর গলায় মাল্যদান করেছিলেন। পরে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম প্রথামত মদ্রকন্যা মাদ্রীকে নিয়ে এসে পাণ্ডুকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেন। প্রথম জীবনে পাণ্ডু পত্নীদের রেখে রাজ্য-জয়ে বেরুলেও অনতিপরেই রাজ্যের ভার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের হস্তে সমর্পন করে পত্নীদের নিয়ে হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিহার করছিলেন। সন্তানজন্ম দেবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর।

এতকাল বাদে পাঁচটি কিশোরকে দেখে যেমন নগরবাসীরা বিস্মিত হলো তেমনি পরিবারের আর সকলেও কম বিস্মিত হলো না। প্রথমে ভাবলো এরা কারা ? তারপরে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র শুনে ভাবলো, এত বড়ো বড়ো সব ছেলে অথচ এতদিনের মধ্যেও এই সংবাদ তারা ঘুণাক্ষরেও জানলো না কেন ? নগরবাসীরা বলতে লাগলো পাণ্ডু তো অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, তাঁর কোনো পুত্র আছে বলে তো শুনিনি, তবে এরা কি ক'রে কুরুবংশধর হবে ? সাক্ষী কে ? পাণ্ডুও মৃত, মাদ্রীও মৃত। পাণ্ডু কবে মারা গেছেন তারও কোনো নির্দিষ্ট সময় জানা যায় না। মহাভারতে এ বিষয়ে দু' তিন জায়গায় দু' তিনরকম লেখা আছে। হিমালয়শৃঙ্গ থেকে কয়েকজন মুনি কুন্তীদের পৌঁছে দিতে এসেছিলেন, তাঁরা কোনো আতিথেয়তা গ্রহণ না ক'রেই সংক্ষেপে দু'চারটা কথা বলে চলে গেছেন।

জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্মের পুত্র, মধ্যম ভীম পবনপুত্র, কনিষ্ঠ অর্জুন ইন্দ্রপুত্র আর নকুল সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সন্তান। স্বামী ব্যতীত আরো চারটি প্রার্থিত পুরুষের অঙ্কশায়িনী হ'য়ে কুন্তী তিনজনের দ্বারা এই তিনটির জন্ম দিয়েছেন এবং সূর্যের অঙ্কশায়িনী হ'য়ে কুমারী অবস্থায় জন্ম দিয়েছিলেন কর্ণকে। এই রহস্যজনক পাঁচটি জটাবল্কলধারী কিশোরকে নিয়ে কুন্তী যখন হস্তিনাপুরে এসে হাজির হলেন এবং নানাজনে কথা বলতে

শুরু করলো, পরিবারের প্রপিতামহী সত্যবতী সেসব সমালোচনা অগ্রাহ্য ক'রে, ঐ পাঁচটি বালককে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র হিসেবে নিজেও মেনে নিলেন, ধৃতরাষ্ট্রকেও তাদের পুত্রজ্ঞানে গ্রহণ করতে বললেন। রাজবাড়ির শিক্ষাদীক্ষা বিষয়ে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা যে গুরুর কাছে যেমন পাঠ নিচ্ছে, জটাবল্কলধারী এই পাঁচটি বালককেও যেন সেই শিক্ষাদীক্ষার পাঠ সেই গুরুর কাছেই দেওয়া হয় এই হুকুমও জারি করলেন। এরপরে এই পঞ্চভ্রাতা কুরুবংশেরই বংশধর হিসেবে গণ্য হ'য়ে রাজবাড়ির শিক্ষাদীক্ষা সহবতের অন্তর্গত হলো। হস্তিনাপুরবাসীরা জানলো পাণ্ডুর এই ক্ষেত্রজ পুত্রেরা তাদেরই পুত্রমিত্রশিষ্যসুহৃদ ও ভ্রাতাস্বরূপ। সত্যবতী যা সত্য বলে ঘোষণা করেছেন তাতে তাদের আর অনাদর করবার বা অবিশ্বাস করবার কোনো প্রশ্ন রইলো না।

কেন রইলো না সেটাও কম আশ্চর্য নয়। সত্যবতী তখন রানী নন, রাজমাতাও নন, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পিতামহী মাত্র। তাঁর হুকুমের এতো জোর কেন? রাজমাতারা কোথায়?

ধৃতরাষ্ট্র ও নগরবাসীরা মেনে নিলেও দুর্যোধন ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তাঁর সংশয় তাঁকে পীড়া দিয়েছে, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছেন এরা কখনোই এই রাজত্বের বা এই বংশের উত্তরাধিকারী হ'তে পারে না। তাছাড়া বয়সের দিকে যা বলা হয়েছে তাতে যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের জ্যেষ্ঠ হিসেবে ধরা হয়, সেটাও দুর্যোধনের যথেষ্ট গাত্রদাহের কারণ হলো। পিতার পরে সকলের জ্যেষ্ঠ হিসেবে তাঁরই সিংহাসনের অধিকার অবধারিত ছিল। যুধিষ্ঠিরকে সামান্য বড়ো বানিয়ে তা ধূলিসাৎ করায় তার রাগ স্বাভাবিক। অথচ যুধিষ্ঠিরের বয়স ঠিক কত একথা বলবার মতো সাক্ষী কুন্তী ছাড়া আর কেউ নেই। দুর্যোধনের এসব কোনো যুক্তিই অনস্বীকার্য নয়। পাঁচটি ছেলে যে কার পুত্র, কোথা থেকে এল, রাজত্বের লোভেই এল কিনা এ নিয়ে সংশয়ের নিরসন হয়নি, হবেও না।

কিন্তু বৈধ-অবৈধ যাই হোক এই মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্তে সত্যবতী-চরিত্রে অদ্ভুত এক কর্ত্রীত্ব ও ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। সত্যবতী তখন রানী নন, রাজমাতা নন, সাধারণ নিয়ম অনুসারে তিনি কেউ নন। স্বামীর মৃত্যুর পরে তখনকার মহিলাদের বাণপ্রস্থ নেওয়াই ধর্ম ছিল। তা-ও তিনি নেননি। এই না নেওয়ার মধ্যে তাঁর অসাধারণত্বের হয়তো ইঙ্গিত আছে। মনে হয় কিছুই তিনি পরোয়া করতেন না। তাঁর ইচ্ছে তাঁর, তাঁর ধর্ম তাঁর, তাঁর সিদ্ধান্তও তাঁরই। স্বকীয়তায় তিনি অনন্যা। অনন্যা বলেই রাজা শান্তনু যখন পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ সম্মতিজ্ঞাপন করতে পারেননি। তা নইলে ঐরকম একটা অভাবনীয় সম্মানজনক প্রস্তাবে কৃতার্থ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল তাঁর পক্ষে। মৎস্যজীবীর পাটনীকন্যার ভূমিকা থেকে একলাফে একেবারে রাজমহিষী হ'য়ে যাবার বিস্ময়কর সৌভাগ্যকে অভিনন্দিত করতে পারলেন না কেন? কেন সেই প্রার্থনার বিনিময়ে ঐরকম এক কঠিন শর্ত আরোপ করলেন? মৃদু লজ্জাও কি একটু কুণ্ঠিত করলো না তাঁকে?

সত্যবতীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটা নির্দিষ্ট কারণ এই হ'তে পারে যে তিনি তথাকথিত বড়োঘরের কন্যা নন, আর্যরমণীদের মতো অন্তঃপুরচারিণী নন। তাঁর দাসপিতা কখনোই তাঁকে কোনো অবরোধ অথবা অধীনতার বশবর্তী ক'রে রাখেননি। এমনকি বৃদ্ধ দাসপিতাকে বিশ্রাম দিতে সত্যবতী যখন নৌকা চালিয়ে যমুনায় যাত্রী পারাপারও করেছেন

তখনো কোনো বাধাপ্রাপ্ত হননি । আর্যকন্যারা এই ধরনের স্বাধীনতা কল্পনাও করতে পারতেন না । গৃহাভ্যন্তরে থেকে পুরুষের সেবা করাই ছিল তাঁদের প্রধান কর্তব্য । শূদ্রদের মতো তাঁদেরও ভৈক্ষ হোম ব্রতে কোনো অধিকার ছিল না । উপদেশে আছে স্ত্রী বালক লঘুচেতা ও উন্মাদলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের সঙ্গে কখনো গূঢ় মন্ত্রণা করবে না। মেয়েদের প্রতি অবিচার এবং অবহেলায় আর্যরা কতটা নিষ্ঠুর ছিলেন এ থেকেই তার প্রমাণ মেলে । সোজা কথায় আর্যবিধানে মেয়েরা গাভীর সমগোত্র, বীজবপনের ক্ষেত্রমাত্র। মাননীয় অতিথি এলে সম্মান জানাতে অন্যান্য উপহারের সঙ্গে গাভীর মতো মেয়েদেরও উপঢৌকন দেওয়া হ'তো । তারা শুশ্রূষার যন্ত্র, পুরুষের ইচ্ছে পূরণের হাতিযার, কামাগ্নির আহুতি, পুত্রোৎপাদনের উপায় ।

সমাজের এই নিষ্পেষণে ভাঙা মেরুদণ্ড নিয়ে বড়ো হয়ে না ওঠার দরুনই হয়তো সত্যবতীব চরিত্রে এই ব্যক্তিত্বেব বিকাশ সম্ভব হয়েছিলো । তাঁর কুমারী অবস্থার পুত্র — যিনি সেকালেব সমাজ ও কালক্রমের সম্যক নিরূপক, যাঁর 'মনঃসাগরসম্ভূতঅমৃতনির্বিশেষ' মহাভারতীয় কথা হাজার হাজার বছর ধ'রে কীর্তিত হচ্ছে, লোমহর্ষণ-পুত্র সৌতি যে কাহিনী জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ থেকে ফিরে এসে সমবেত মহর্ষিদের কাছে বলেছেন, যা তিনি সেখানে দ্বৈপায়নশিষ্য বৈশম্পায়নের মুখে শুনে এসেছেন এবং যে কাহিনী সকল উপাখ্যানের চেয়ে মহৎ তার যিনি রচয়িতা—সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাদের কাছে তাঁর মাতার চারিত্রবিকাশ বিষয়ে বিশেষ কোনো আলোকপাত করেননি । মনে হয় একটা ধাঁধার ছক ফেলে দিয়ে বলেছেন, যার যার বুদ্ধিমতো বুঝে নাও এই মহাগ্রন্থের আসল নায়িকা কে ।

মহাভারত বস্তুতই অতীতের কোনো ইতিহাস কিনা তা নিয়ে বিস্তর তর্ক আছে । এ সম্পর্কে তর্কাতীত কিছু বলা না গেলেও, এই মহাকাব্যকে তৎকালীন সমাজের প্রতিবিম্ব ব'লে ধ'রে নিতে পারি । মূল রচয়িতা যিনিই হোন শেষ পর্যন্ত অন্য রচয়িতাদেরও যে হস্তাবলেপন ঘটেছে তা-ও নিঃসন্দেহে ধ'রে নিয়েছেন বিচক্ষণ ব্যক্তিরা। গভীর মনোযোগ সহকারে ঘটনা প্রবাহে অবগাহন করলে দেখা যায় এই বিচিত্র ইতিহাস সমুদ্রের তীরভূমির উচ্ছ্বসিত ফেনা পার হয়ে মধ্যসমুদ্রের লক্ষ্যে পৌঁছোনোমাত্র ভরতবংশের স্থাপয়িত্রী ভবতমাতা শকুন্তলার পরেই যে নারী প্রধান চরিত্র হিসেবে সগৌরবে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন তিনি সত্যবতী । তাঁর পুত্র তাঁর বিষয়ে যত কম আলোকপাতই ক'রে থাকুন না কেন, এই কাহিনীর তিনিই নায়িকা ! মহাযুদ্ধের সূচনা তিনিই করে গেছেন, আর কেউ না । যে ভরতবংশ শকুন্তলা তাঁর পুত্রের দ্বারা স্থাপন করেছিলেন, সত্যবতী তাঁর পুত্র দিয়ে সেই বংশের প্রত্যেকটি ফোঁটা রক্ত আপন হাতে মুছে দিয়ে গেছেন ।

ভরতবংশ স্থাপনার একটি সুন্দর কাহিনীও উপহার দিয়েছেন এই রচয়িতা । গল্পটা সকলেরই জানা । লক্ষ করলে বোঝা যাবে দুটি গল্পের কাঠামোই একরকম । । দুটি রমণীর মধ্যেও মিলের কোনো অভাব নেই ।

শকুন্তলা আশ্রমনিবাসিনী ছিলেন, পুণ্যতোয়া মালিনী নদী-বেষ্টিত বহু বৃক্ষ সমাকীর্ণ আশ্রমটি ছাড়া কিছুই তিনি দেখেননি, তিনি কণ্বমুনির পালিতা অতি সরলা একটি কন্যামাত্র । কিন্তু দুষ্মন্তের ডাক শুনে যখন তাড়াতাড়ি ব্যস্তসমস্ত হয়ে কুটির থেকে তিনি

বেরিয়ে এলেন, আর তাঁকে দেখামাত্রই দুষ্মন্তের কামস্পৃহা প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের মতো লেলিহান হ'য়ে উঠলো এবং তিনি বললেন, 'তোমার লাবণ্যসলিলে আমি আকণ্ঠ মগ্ন। তোমার শরীরের উপর তোমারই কর্তৃত্ব তাই তুমি আত্মসমর্পণ না করলে তোমাকে পেতে পারছি না, তুমি প্রার্থনা পূরণ করো', তখন শকুন্তলার মতো একটি সরল মধুর অপাপবিদ্ধ আশ্রমকন্যার পক্ষে যা অস্বাভাবিক, দেহ সমর্পণ করার পূর্বে তিনি কিন্তু সেইরকমই একটি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন দুষ্মন্তকে দিয়ে। ঠিক সত্যবতীর মতো বললেন, 'আপনার ঔরসে আমার গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে, আপনি বিদ্যমানে সে যুবরাজ হবে, এবং অবিদ্যমানে রাজা হবে।'

দুষ্মন্ত সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়'। তারপরেই গন্ধর্বমতে বিবাহ করে শকুন্তলার সমর্পিত দেহ নিয়ে সঙ্গমক্রীড়া সম্পন্ন ক'রে চলে গেলেন। বলে গেলেন, 'আমি তোমাকে যোগ্যসমাদরে নিয়ে যাবার জন্য চতুরঙ্গিনী সেনা পাঠাবো, রানীর সম্মানে তুমি রাজভবনে প্রবিষ্ট হবে।' ব্যস, সেই যে গেলেন, আর কোনো খবর নেই। ইতিমধ্যে যথাসময়ে শকুন্তলার মহাপরাক্রান্ত মহাবল অলৌকিক গুণসম্পন্ন এক পুত্রের জন্ম হলো। এর পরের ঘটনায় আসবার আগে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করতে বলি। মহাভারতের সমস্ত বিখ্যাত কন্যার জন্মই রূপকথার আচ্ছাদনে আবৃত। ইন্দ্রের নির্দেশে বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ ক'রে তাঁর সঙ্গে সঙ্গমজাত কন্যাকে জন্মানো মাত্রই তার মা অপ্সরা মেনকা মালিনী নদীর তীরে হিংস্র জন্তু-সমাকীর্ণ নির্জন বনে নিক্ষেপ ক'রে চলে গেলেন। কণ্বমুনি নদীতে স্নান করতে গিয়ে দেখলেন, পক্ষীরা একটি সদ্যোজাত শিশুকে জন্তুজানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে ঘিরে বসে আছে। মুনি দয়াপরবশ হ'য়ে কন্যাটিকে এনে আপন আশ্রমে আপন কন্যার মতো পালন করতে লাগলেন। সত্যবতী জন্মান মাছের পেটে; রাজা উপরিচরের স্খলিত শুক্রগ্রহণ ক'রে মৎসী গর্ভবতী হয়: মৎসীর গর্ভজাত কন্যাকে পালন করেন এক ধীবর; ধীবরকন্যারূপেই সত্যবতীর পরিচয়। পাণ্ডববধূ দ্রৌপদী যজ্ঞবেদী উত্থিতা। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এইসব কন্যাদের জন্মবৃত্তান্ত কেন রহস্যাবৃত করেছিলেন? তখনকার সমাজে এইসব কন্যাদের প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত বলায় বাধা ছিল বলেই কি তিনি অলৌকিকের আশ্রয় নিয়েছিলেন?

শকুন্তলার কথায় ফিরি। পুত্রের ছ' বছর বয়স হ'য়ে গেলেও যখন তার পিতা দুষ্মন্ত স্ত্রীকে সাড়ম্বরে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা কোনো খোঁজই আর নিলেন না, তখন কণ্বমুনি সপুত্র শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু রাজা তাঁর পত্নী-পুত্রকে গ্রহণ করলেন না, কটু ভর্ৎসনা ক'রে সম্পর্ক অস্বীকার করলেন। তাকে বললেন, 'স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মিথ্যেকথা বলে। কে তুমি দুষ্টা তাপসী? আমি তোমাকে চিনি না।'

সভাসদদের সামনে স্বামীর এই উক্তিতে শকুন্তলা প্রথমে স্তম্ভিত হ'লেন, পরে অপমানে লজ্জায় দুঃখে বিদীর্ণ হ'য়ে রোষকষায়িত রক্তচক্ষুর দ্বারা অগ্নিবান নিক্ষেপ ক'রে বললেন, 'জেনেশুনেও কেন অসংকোচে প্রাকৃতজনের মতো কথা বলছো জানি না। আমি যা বলেছি তা সত্য কি সত্য নয় সে বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণই সাক্ষী।' দুষ্মন্ত তখন শকুন্তলার মাতাকে অসতী এবং পিতাকে কামুক বলায় শকুন্তলা জ্ব'লে উঠে বললেন, 'জন্মের বিচারে আমি তোমার চাইতে অনেক উৎকৃষ্ট। শূকর যেমন মিষ্টান্ন

ত্যাগ ক'রে পুরীষ গ্রহণ করে, ইতরজন তেমনই সত্যকে ত্যাগ ক'রে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। তোমার সহায়তা ছাড়াই আমার পুত্র পৃথিবীর সম্রাট হবে।' এই সময় স্বর্গ থেকে দৈববাণী হলো (যা মহাভারতে সব সময়েই হয়ে থাকে এবং লোকেরা সুবিধেমতো গ্রহণ করে বা করে না), 'শকুন্তলাকে অপমান কোরো না, তাঁর সব কথাই সত্য। তাঁর গর্ভজাত স্বীয় পুত্রকে তুমি প্রতিপালন করো। এবং যেহেতু আমাদের অনুরোধে এই পুত্রকে ভরণ করা হলো সেজন্য এর নাম হোক ভরত।' এই নাম থেকে ভরতবংশের উৎপত্তি হলো।

অমনি দুষ্মন্ত বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো আমি জানি। কিন্তু হঠাৎ তোমাকে গ্রহণ করলে লোকে আমাকে কী বলতো? সেইজন্যই এতক্ষণ বিতণ্ডা করছিলাম তোমার সঙ্গে।'

আসলে শকুন্তলার অনবনত তেজ দেখে দুষ্মন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। বুঝতে পারছিলেন এই মেয়ে কলঙ্কের ভয়ে বা লজ্জায় পিছিয়ে যাবার পাত্রী নয়। এ তাঁকে সহজে ছেড়ে দেবে না। কিন্তু শকুন্তলা যদি আশ্রমকন্যা না হতেন, তবে কক্ষনো রাজাকে এভাবে শঙ্কিত করতে সাহস পেতেন না। যে বিবাহ দুষ্মন্ত কামবশত সকলের অজ্ঞাতে ক'রে এসে মুখ মুছে বসেছিলেন, সেই বিবাহ কিছুতেই মেনে নিতেন না তিনি। কিন্তু শকুন্তলা আশ্রমের স্বাধীনতায় বর্ধিত বলেই আহত হলে আঘাত ফিরিয়ে দেবার মনের জোর তাঁর ছিল। তাই রাজসভায় দাঁড়িয়ে সভাসদদের সামনে একাধারে স্বামী এবং ওরকম এক পরাক্রান্ত রাজাকে এভাবে স্পষ্টবাক্যে মিথ্যাবাদী দুরাচার পাপিষ্ঠ থেকে শুরু ক'রে শূকরের বিষ্ঠাভক্ষণের সঙ্গে পর্যন্ত তুলনা ক'রে তিরস্কার করতে পেরেছিলেন।

এই শকুন্তলার পরে সেই বংশের যিনি দ্বিতীয় লক্ষণীয় মহিলা, সেই সত্যবতীর মানসিকতাও তাঁরই সমগোত্র। অথচ সমাজের নিয়মকানুন তাৎপর্য বোঝাতে যিনি বিবিধ আশ্রমলক্ষণের নিদর্শন চর্তুবর্ণবিধান তপস্যা ব্রহ্মচর্য চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, ভূগোল বোঝাতে গ্রাম নগর নদনদী সমুদ্র পর্বত বন উপবন নিবিড় অরণ্য ইত্যাদির ব্যাখ্যা করেছেন, জরা মৃত্যু ভয় ব্যাধি বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছেন, এমনকি মানুষের কামনা বাসনা যে মানুষকে আমৃত্যু আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে রাখে সে বিষয়েও অবহিত করেছেন, সেই মহাপুরুষ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কেবলমাত্র ঐ একটি চরিত্রের উপরই এত কম আলো ফেললেন কেন? তা কি এইজন্যই যে তিনি জানেন এই বংশের ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন তাঁর মাতার দ্বারাই সংঘটিত হবে এবং তিনি হবেন সেই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত?

দুই

রাজা শান্তনু সত্যবতীকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে তার পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতো একজন রাজা— যিনি পরম প্রাজ্ঞ, পরম ধার্মিক, পরম ধীমান বলে বর্ণিত, যিনি দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের সম্মানভাজন, যাঁর ধার্মিকতা দেখে অন্যান্য নৃপতিরা তাঁকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেছিলেন, সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি হবার যিনি যোগ্য—সেই বিশুদ্ধ কুলীন কুরুপতির পক্ষে একজন ধীবরকন্যার জন্য তাঁর কুটিরে গিয়ে প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়ানোটা কি অত্যন্ত অস্বাভাবিক নয়? ধীবররা জাতিতে নিষাদ সুতরাং অন্ত্যজ এবং অস্পৃশ্য।

নীচজাতি বা অন্ত্যজদের প্রতি উচ্চজাতিদের কী মনোভাব ছিল শাস্ত্রে, পুরাণে, মহাকাব্যে তা কোথাও অপ্রকট নয় । নিষাদ কিশোর একলব্যকে দ্রোণ অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতি জ্ঞানে ধনুর্বেদে দীক্ষিত করেননি । উপরন্তু সেই বেদনাহত বালক যখন অরণ্যে গিয়ে মৃন্ময় দ্রোণ নির্মাণ ক'রে তাকেই গুরু হিসাবে গ্রহণ ক'রে অস্ত্রশিক্ষা সাধনায় কৃতকার্য হলো, সংবাদ পেয়েই দ্রোণ ছুটলেন সেখানে, গিয়ে বললেন, 'আমার গুরুদক্ষিণা দাও ।' কী দক্ষিণা ? না, 'তোমার দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন ক'রে আমাকে দাও !' একলব্য দিয়েছিল । দ্রোণ অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন । এই নিষ্ঠুর কর্ম দেখে অর্জুন খুব প্রসন্ন হলো । নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী সে সইতে পারে না ।

নীচজাতির প্রতি উচ্চজাতির মনোভাব এবং সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি অর্জুনের মনোভাব—মহাভারত এবং সত্যবতীকে বোঝবার জন্য এ দুটি চারিত্রিকের কথা মনে রাখা দরকার । এবং এ দুটি সবচাইতে প্রকট কর্ণের আচরণে । দ্রোণ ও কৃপাচার্যের শিক্ষায় তাঁদের ছাত্ররা কীরকম অস্ত্রবিদ হয়েছে তা দেখবার জন্য তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রকে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন । প্রভূত অর্থব্যয়ে ব্যবস্থা হলো । রাজপরিবারের সকলে এলেন । নগর ভেঙে লোক এল সেই নকল যুদ্ধ দেখতে । শ্বেতশুভ্রবসনে মাল্যোশোভিত হ'য়ে দ্রোণ এসে মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করলেন, রেফারি হিসেবে নিযুক্ত করলেন নিজপুত্র অশ্বত্থামাকে । আরম্ভ হলো খেলা । প্রত্যেকেই ক্রিয়াকৌশলের দক্ষতা দেখিয়ে দর্শকদের মোহিত ক'রে দিলো । সবশেষে এল অর্জুন । পেখম তোলা ময়ূরের মতো ঘুরে ঘুরে এদিক ওদিক তাকিয়ে শুরু করলো তার খেলা । অনেক ম্যাজিকই সে দেখালো, আগ্নেয় অস্ত্র দিয়ে অগ্নি সৃষ্টি করলো, বরুণাস্ত্র দিয়ে জল সৃষ্টি করলো, বায়বাস্ত্র দিয়ে ঝড় সৃষ্টি করলো, পর্জন্যাস্ত্র দিয়ে মেঘ সৃষ্টি করলো । লোকেরা ধন্য ধন্য করতে লাগলো । এই সময়ে বজ্রনির্ঘোষের মতো বাহ্বাস্ফোট শোনা গেল ফটকে । তাকিয়ে দেখা গেল দ্বারদেশে 'চন্দ্রসূর্যঅনলের' মতো দ্যুতিময় সহজাত কবচধারী যুবা কর্ণ কটিদেশে খড়্গ নিয়ে প্রবেশ করছেন । সেই উন্নতকায় সর্বাঙ্গসুন্দর যুবাটিকে দেখতে দেখতে লোকেরা ভাবতে লাগলো, 'ইনি কে ?'

কর্ণ রঙ্গস্থলের ভিতরে এসে দ্রোণ আর কৃপাচার্যকে প্রণাম ক'রে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে পার্থ ! তুমি এই মুহূর্তে এখানে যা যা দেখিয়েছ বা করেছ, আমি তার সবই জানি, সবই দেখাবো, আশ্চর্য হয়ো না ।' অর্জুন তাঁকে অনাহুত ব'লে কটূক্তি করায় কর্ণ তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন । কিন্তু কৃপাচার্য বুঝতে পারলেন এই যুদ্ধে কর্ণের সঙ্গে অর্জুন কখনোই জিততে পারবে না । তাড়াতাড়ি বললেন, 'শোনো কর্ণ ! অর্জুন হচ্ছে কুন্তীর গর্ভসম্ভূত এবং মহারাজা পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র । কিন্তু তুমি কে ? কোন কুলে তোমার জন্ম ? কোন রাজার বংশে ? পরিচয় না পেলে তো অর্জুন তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে না । রাজপুত্ররা অজ্ঞাতকুলশীলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে না ।'

একথা শুনে কর্ণ লজ্জায় মুখ নামালেন, তাঁর 'প্রস্ফুটিত কমলের মতো' চোখ জলে ভরে গেল ।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার কর্ণই একমাত্র কানীনপুত্র নন । স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়নও কানীনপুত্র । সত্যবতী যখন কুমারী অবস্থায় ধীবর পিতার হয়ে খেয়ার নৌকো বাইতেন তখন পরাশর মুনি তাঁকে দেখে মোহিত হ'য়ে স্বসৃজিত কুজ্ঝটিকার অন্ধকারে নৌকোর

উপরেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গম করেন । এবং সেই সঙ্গমের ফল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন । সত্যবতী একথা কারো কাছে গোপন করেননি । কিন্তু কুন্তী সত্যবতী নন । কর্ণকে সমস্ত নগরবাসী ও বিভিন্ন দেশের নৃপতিগণের সামনে এইভাবে অপমানিত করা হলো ; কুন্তী তখন পর্দার আড়ালে মূর্ছা গেলেন বটে কিন্তু সাহস ক'রে বলতে পারলেন না যে এই কর্ণ-ও তাঁর পুত্র, পরমপূজনীয় সূর্য যাঁর পিতা । কলঙ্কের ভয়ে জন্মানো মাত্রই একটি প্রশস্ত পেটিকায় শুইয়ে গোপনে তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে অবশ্য একপৃষ্ঠা ধরে বিলাপ। কিন্তু তারপর ? স্বামীর কাছে তো গোপন করেইছেন, পরবর্তী জীবনে সন্তানদের কাছেও কিছু বলেননি । এখনো বললেন না । কেন বললেন না ? কোথায় বাধা ? তিনি যাঁর গলায় মাল্যদান ক'রে বধূ হিসেবে হস্তিনাপুরে এলেন, সেই পাণ্ডুই তো কানীন-পুত্রের পুত্র । কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত কুন্তী নিজে গোপন করলেও ব্যাসদেব জানতেন, কৃষ্ণও জানতেন । এবং সবচেয়ে আশ্চর্য কর্ণও জানতেন । যুদ্ধের প্রারম্ভে কৃষ্ণ কর্ণকে সংগোপনে বলেছিলেন, 'কুমারী কন্যার গর্ভে দুইপ্রকার পুত্র হয় । কানীন আর সহোঢ় । শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন, সেই কন্যাকে যে বিবাহ করে সেই হয় তাদের পিতা । তুমি কুন্তীর কানীনপুত্র, অতএব পাণ্ডুই তোমার পিতা । তোমার পিতৃপক্ষীয় পাণ্ডবগণ এবং মাতৃপক্ষীয় বৃষ্ণিগণ সকলেই তোমার সহায় হবেন যদি তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে তাঁদের জানতে দাও যে তুমি যুধিষ্ঠিরেরও অগ্রজ । আমরা তোমাকে পৃথিবীর রাজপদে অভিষিক্ত করবো । যুধিষ্ঠির যুবরাজ হবেন, ভীমসেন মস্তকে ছত্র ধরবেন, অর্জুন সারথী হবেন। দ্রৌপদীও ষষ্ঠকালে (অর্থাৎ পাণ্ডবদের জন্য নির্ধারিত কাল অতিক্রান্ত হলে) তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন ।'

কর্ণ জবাব দিলেন, 'তুমি যা বললে আমি তা জানি । সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে আমার জন্ম । কুন্তী আমার হিতাহিত বিবেচনা না ক'রে আমাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন; কিন্তু অধিরথ আমাকে গৃহে আনেন, রাধার স্তনে আমার প্রতি স্নেহবশত দুগ্ধক্ষরিত হয়। অধিরথই আমার পিতা, রাধাই আমার মাতা । হে কৃষ্ণ, সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও আমি তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করতে পারি না, কোনো সুখের লোভেও নয়, কোনো ভয়ের শিকার হয়েও নয়। ' কর্ণ আরও বললেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি তুমি রুধিরাক্তা পৃথিবীকে হাতে ধ'রে নিক্ষেপ করছো আর সেই অস্থিস্তূপের উপরে উঠে যুধিষ্ঠির সুবর্ণপাত্রে ঘৃত পায়েস ভোজন করছেন এবং তোমার প্রদত্ত পৃথিবী গ্রাস করছেন ।' তারপর রথ থেকে নেমে কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করে বললেন, 'কৃষ্ণ আর কি আমাদের কখনো দেখা হবে ?'

কর্ণকে লোভ দেখানোর প্রস্তাব এখানেই শেষ নয় । যিনি মাতা হয়ে পুত্রের এত অপমান দেখেও একটা কথা বললেন না সেই মাতা গোপনে নিজেই তখন গিয়ে দেখা করলেন একদিন । কর্ণ সবিস্ময়ে প্রণাম করলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, 'আমি রাধার পুত্র কর্ণ ।' কুন্তীকে কর্ণ চিনতেন, জানতেন তিনিই তাঁর মাতা, কিন্তু আত্মপরিচয় তিনি এভাবেই দিলেন । এই প্রথম নিজের স্বার্থে নিজের মুখে কুন্তী বললেন, 'তুমি রাধার গর্ভজাত নও, অধিরথও তোমার পিতা নন । আমার কন্যা অবস্থায় তুমি আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলে । পুত্র, তুমি নিজের ভ্রাতাদের চেনো না, তাই দুর্যোধনাদির সেবা করো । সেটা উচিত নয় । কৌরবগণ দেখুক কর্ণার্জুন সৌভ্রাত্রবন্ধনে মিলিত হয়েছেন।

তুমি সর্বগুণসম্পন্ন, আমার পুত্রদের সর্বজ্যেষ্ঠ, তুমি পার্থ : তোমাকে যেন কেউ সূতপুত্র না বলে ।' কর্ণ জবাব দিলেন, 'ক্ষত্রিয়জননী, আপনার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা নেই, আপনার অনুরোধও আমি ধর্মসঙ্গত মনে করি না । তবে আপনার জন্য এটুকু করতে পারি, সমর্থ হ'লেও আমি আপনার সকল পুত্রকে বধ করবো না । যুদ্ধ আমার অর্জুনের সঙ্গে । অর্জুন বা আমি যে-ই মরুক না কেন, অর্জুন অথবা আমাকে নিয়ে আপনার পঞ্চপুত্রই জীবিত থাকবে ।'

স্বার্থপর কুন্তী তখন সরোদনে বললেন, 'প্রতিজ্ঞা মনে থাকে যেন ।' এই বলে চলে গেলেন ।

এই গ্রন্থের রচয়িতা বা সংকলনকর্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন । তিনি নিজেকে যদি সমাজের দ্বারা মানিয়ে নিতে সক্ষম হন তবে কর্ণকে কেন নয় ? এই প্রশ্ন কি থেকেই যায় না? যা করছেন, মাতা পুত্র মিলেই করছেন । কখনো মাতার পরামর্শে পুত্র, কখনো পুত্রের পরামর্শে মাতা । সত্যবতীর ব্যক্তিত্ব নিশ্চয়ই কুন্তীর ছিল না । সত্যবতী যেভাবে যখন তখন ডেকে পাঠাচ্ছেন তাঁর পুত্রকে তাতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এই যোগসাজস তাঁদের বরাবরই ছিল । কেন ছিল ? স্নেহবশত ? অথবা রাজনীতি ? উচ্চবর্ণ নীচবর্ণের চিরাচরিত শোধ প্রতিশোধ ? হিংসা প্রতিহিংসা ? যা আজকের সমাজে চার হাজার বছর পরেও নির্বারিত হয়নি ।

কর্ণকে চিনতে পেরেই কুন্তী মূর্ছা গিয়েছিলেন । গোপন পুত্রের হস্তে প্রকাশ্য রাজপুত্রটি যে পরাজিত হবেই, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে এবিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন । কর্ণের পালকপিতা অধিরথ এলে কর্ণ নতমস্তকে তাঁকে প্রণাম করতে গেলেন, অধিরথ সসম্ভ্রমে পা ঢেকে পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন । কেন পা ঢাকলেন ? তবে কি তিনিও কর্ণের জন্মরহস্য বিষয়ে অবহিত ছিলেন ?

কর্ণের অপমান মহাভারতের প্রতি ছত্রে । বিপদ্‌বারণ দ্বৈপায়ন, যিনি তাঁর জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা নিরীক্ষণ ক'রে পাণ্ডবদের সমস্ত বিপদকালে এসে দৈবের মতো উপস্থিত হন, তিনি কিন্তু কর্ণের বিপদে জেনেশুনে চুপ করেই থাকেন এবং কখনোই এসব ক্ষেত্রে আসেন না । অপরপক্ষে কর্ণ কখন কী অন্যায় করেছেন সেটা যথেষ্ট মোটা দাগেই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন । পাঞ্চালীর স্বয়ংবর সভায় সমাগত রাজারা যখন কেউ ধনুতে গুণও পরাতে পারছিলেন না, বরং তার আঘাতে ভূপতিত হচ্ছিলেন তখন কর্ণ অনায়াসে তাতে গুণ পরিয়ে শরসন্ধান করলেন । দ্রৌপদী অমনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'আমি সূতজাতীয়কে বরণ করবো না ।' আমরা জানি না ইতিপূর্বে দ্রৌপদী কবে কর্ণকে দেখেছিলেন যে দেখেই সূতজাতীয় বলে চিনতে পারলেন । এ বিষয়ে মহাভারত রচয়িতা আমাদের অবহিত করেননি । কর্ণের চেহারা বর্ণনা অনুযায়ী একঝলক আলো । অতি কান্তিমান যুবা । যে-কোনো যুবতীর হৃদয়হরণে সমর্থ । তাঁর বুকে তো তাঁর জাতির ফলক লটকানো ছিল না! তাছাড়া যুধিষ্ঠির বলছেন, 'পাঞ্চালরাজ তাঁর কন্যার বিবাহ বিষয়ে কুল শীল গোত্র নির্দেশ করেননি, তাঁর পণ শুধু লক্ষ্যভেদ ।' যদি তাই হয় তাহলে কর্ণকে কেন লক্ষ্যভেদ করতে দেওয়া হলো না ?

ঐরকম সভায় ঐরকম দেশ-বিদেশের সব সম্মানিত ব্যক্তি সমাগত দর্শক আত্মীয় কুটুম্ব ইত্যাদির সামনে এই অপমান কর্ণকে কত কষ্ট দিয়েছিল তার বিশেষ বিবরণ পাওয়া

যায় না। শুধু দেখা যায় নিঃশব্দে আরক্ত কর্ণ কান্নার অধিক হাস্যসহকারে কম্পিত ধনু পরিত্যাগ ক'রে সরে দাঁড়ালেন। যখনই অর্জুনের সঙ্গে এই ধরনের কোনো প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে অমনি তাঁকে এই ধরনের অপমানে দগ্ধ করা হয়েছে। অপরপক্ষে যুধিষ্ঠির যখন স্ত্রীকে পণ রেখে জুয়াতে হারলেন, এবং জয়ী দুর্যোধন দ্রৌপদীকে সভায় এনে অভদ্র ব্যবহার শুরু করলেন, তখন যে কর্ণ হৃষ্ট হয়ে হেসেছিলেন, সেটা কিন্তু মহাভারতে বারবার মহানিন্দনীয় কর্ম বলে উল্লিখিত হয়েছে। কর্ণের পক্ষে সেটা যোগ্য ব্যবহার হয়নি সেটা যত সত্য, কর্ণের অপমানের জ্বালাটাও তার চেয়ে একতিল কম সত্য নয়।

মহাভারত কাহিনীতে দেখা যায় সত্যবতীপুত্র পাণ্ডবদের প্রতি, বিশেষ ক'রে যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রায় বিচারহীনভাবে অনুরক্ত; অপরপক্ষে ভীষ্ম এবং কর্ণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। কেন ? কর্ণের অপমানের সময়ে না এলেও যে মুহূর্তে মায়ের আদেশে এক কন্যার সঙ্গে পাঁচ পুত্রের বিবাহ নিয়ে এক জটিল আবর্ত সৃষ্টি হলো, তৎক্ষণাৎ তিনি উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ তিনি এ বিবাহ বৈধ বলে ঘোষণা ক'রে সব সমস্যার সমাধান করলেন। যুদ্ধের কথা স্মরণ ক'রে দেখুন। সর্বনাশের মূল শিকড়টি সত্যবতী প্রোথিত করে গেলেও তাকে মহাদ্রুমে পরিণত করেন যুধিষ্ঠির। তাঁর জুয়াখেলা, কর্ণের ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা, রাজ্যলোভে অর্জুনকে অহেতুক গালিগালাজ করা, কৃষ্ণের পরামর্শে দ্রোণকে মিথ্যে কথা বলা—এর কোনোটাই সদাচারীর পরিচায়ক নয়। এইসব ঘটনার কথা লোকেদের মুখে মুখে রচিত হয়েছিল, দ্বৈপায়ন সেসব কথাকে বাধ্য হ'য়ে কাহিনীতে স্থান দিয়েছেন, কিন্তু নিয়তই আমাদের বুঝিয়েছেন যে যুধিষ্ঠির একজন মহাত্মা পুরুষ, ধর্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী। এবং তাঁর প্রচারের মহিমায় যুগ যুগ ধরে শ্রোতা ও পাঠকরা একথা বিশ্বাস ক'রে এসেছে। দ্বৈপায়নের এই যুধিষ্ঠির-প্রীতির কারণ নিয়ে বিবেচনার প্রয়োজন আছে।

তিন

সত্যবতীর সাহস ও ব্যক্তিত্ব এবং সমস্ত বাধাকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা যে কত প্রচণ্ড তা শুধু তাঁর বিবাহের সর্ত দিয়েই প্রমাণিত নয়। সত্যবতীর স্বামী শান্তনুরা তিন ভাই ছিলেন। জ্যেষ্ঠ অধীপ, মধ্যম শান্তনু, কনিষ্ঠ বহ্লীক। জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন, তাই মধ্যমভ্রাতা শান্তনু সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু কনিষ্ঠভ্রাতা বহ্লীক ঐ পরিবারভুক্তই ছিলেন। বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পরে তাঁর পত্নীদের গর্ভে যখন পুত্রোৎপাদনের প্রশ্ন তুললেন সত্যবতী তখন তিনি ভীষ্মকেই প্রথমে অনুরোধ করেছিলেন। অবশ্য তিনি জানতেন তাঁর বিবাহের সময় ভীষ্ম তাঁকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিবাহে সম্মত করিয়ে এই গৃহে নিয়ে এসেছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি তিনি কখনোই ভাঙবেন না। তবু বলতে হয় বলেই বোধহয় বলেছিলেন। সত্যবতীর অনুরোধের জবাবে ভীষ্ম বলেছিলেন, 'আপনি আমাকে অপোৎপাদন বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন, তা নিশ্চয় আপনার মনে আছে ? আমার দারপরিগ্রহ বিষয়েও পূর্বে যে সংকল্প করানো হ'য়েছিল তা-ও নিশ্চয়ই ভুলে যাননি।' শেষে বলেছিলেন, 'পরশুরাম যখন একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, তখন ক্ষত্রিয় রমণীরা ব্রাহ্মণ সহযোগে পুত্রবতী হয়ে

আবার ক্ষত্রিয়কুল বৃদ্ধি করেছিলেন। সেভাবেও আপনি বংশরক্ষা করতে পারেন।'

সত্যবতী সেকথা শোনেননি। রাজরক্তের অন্য কোনো সদস্যের কথা ভাবেননি, শান্তনুর ভ্রাতা বহ্লীক সপরিবারে রাজঅন্তঃপুরে বাস করা সত্ত্বেও শান্তনুর বংশরক্ষা করতে ঐ বংশের কোনো সন্তানকে অনুরোধ জানাননি। অবলীলাক্রমে নিজের বিবাহপূর্ব পুত্রটিকে ডেকে এনে পুত্রবধূদের গর্ভে পুত্রোৎপাদন করালেন। এই উৎপাদন রুচিসম্মত নয়, শাস্ত্রসম্মত নয়, ধর্মসংগতও নয়। তাছাড়া স্বামীর ইচ্ছেতে তার স্ত্রীর গর্ভে অন্যের ঔরসজাত সন্তানেরা ক্ষেত্রজ পুত্র হিসেবে সমাজে স্থান পেলেও শাশুড়ির ইচ্ছেতে পুত্রবধূদের গর্ভে পুত্রোৎপাদন মহাভারতেও অন্যত্র দেখিনি। এবং কার দ্বারা পুত্রোৎপাদন? যে তাদের কেউ নয়, যার মাতা তাদের শ্বশ্রূমাতা হবার অনেক আগেই এই সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।

দ্বৈপায়ন নিজে কালো, তাঁর মাতা কালো, তাঁর পিতা কালো। সুতরাং তিনি যে আর্য নন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। উপরন্তু তিনি তাঁর নিষাদীমাতার বৈধ সন্তান নন। যে মেয়ে দু'টি তাঁদের সেই শ্বশ্রূমাতার আদেশে তাঁর কাছে আত্মদান করতে বাধ্য হয়েছিল সে মেয়ে দু'টিও শান্তনুর রক্তসম্পর্কিত কেউ নয়, সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুও এই বংশের কেউ নয়।

সত্যবতীর অনুরোধে ভীষ্ম ব্রহ্মচর্য বিসর্জন দিতে অস্বীকার করলেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজের ব্রহ্মচর্য বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেননি। অসহায় এবং শোকার্ত বধূ দু'টির উপরে তিনি বা তাঁর মাতা কেউ খুব সুবিচার করেছেন বলে মনে হয় না। আমরা জানি, অসম্মত অনিচ্ছুক রমণীতে সংগত হওয়ার নাম বলাৎকার। সত্যবতী তাঁর কানীনপুত্রকে দিয়ে বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নীর উপরে সেটাই করিয়েছেন। একটি মেয়ে ভয়ে চোখ বুজেছিল, আর একজন ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের বেদনা নিয়ে কোনো হা-হুতাশ নেই কোথাও। জন্মালোও দু'টি প্রতিবন্ধী শিশু। বিদুরের মা দাসী, তার কাছে দ্বৈপায়ন দ্বৈপায়ন বলে নয়, সত্যবতীর পুত্র বলেই মহার্ঘ। দ্বৈপায়ন কত বড়ো পণ্ডিত কত বিদ্বান সেটার হিসেব তার জ্ঞানের অন্তর্গত হতে পারে না। সে ততটা শিক্ষিত কখনোই নয়। অপরপক্ষে দাসী হয়ে রানীর পুত্রকে শয্যায় পাওয়া বড়ো কম সম্মানের কথা নয়। চেহারা যেমনি হোক সেই সম্মান সে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল। সেইজন্য সুস্থ সন্তানেরও জন্ম দিতে পেরেছিল। দ্বৈপায়নের স্নেহও রাজকন্যাদের দুই পুত্রের চেয়ে দাসীপুত্রের প্রতিই বেশি ছিল। আবার ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের চাইতে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্রদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল অনেক বেশি। দেখা যাচ্ছে, অসিতাঙ্গ ও অবৈধ সন্তানদের প্রতি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের একটা বিশেষ আকর্ষণ, তাঁদের তিনি যে-কোনো প্রকারে হোক জিতিয়ে দিতে আগ্রহী।

তাঁর সংকলনে তিনিই সমাজের নিয়ামক, তাঁর কথাই চরম কথা, তাঁর বিধানই বিধান। নিজেকে তিনি নিজেই দ্রষ্টা হিসেবে দেখিয়েছেন। অনেক সময়েই বিবেকের মতো হঠাৎ উপস্থিত হয়ে তিনি সত্য উদ্‌ঘাটন করেন। কিন্তু তাঁর বিধানে কর্ণ অপাংক্তেয়। কর্ণকে তাঁর জন্মকলঙ্কের লজ্জা থেকে তিনি মুক্ত করেন না। পুত্রবধূ কুন্তীকে এ ব্যাপারে অভয়-দান করেন না। শুধু যে কর্ণের প্রতিই তিনি নির্মম তাই না, ভীষ্মের প্রতিও খুব তুষ্ট বলে মনে হয় না। ভীষ্মকে শেষ পর্যন্ত আমরা যে একজন বৃদ্ধ রাজকর্মচারি ছাড়া আর বিশেষ কিছু ভাবি না, সেই ছবিও সচেতনভাবে তাঁরই আঁকা। তিনিই এই ছবিটি কাহিনীর

বিভিন্ন পর্বে বারবার দেখিয়ে এতেই আমাদের এমন অভ্যস্ত করেছেন যে যিনি পিতার প্রিয়চিকীর্ষু হয়ে নিজের যৌবন উৎসর্গ করলেন, সেই উৎসর্গিত যৌবনের বীররূপ শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রায় স্মরণে থাকে না ।

সত্যবতীর দূরদর্শিতাও কি প্রথম থেকেই সীমাহীন ? নিজের বিবাহের আগে থেকেই কি তিনি তাঁর এই অবৈধ পুত্রটির ভবিষ্যৎ ভেবে রেখেছিলেন ? কানীনপুত্র রাজা হবে না, কিন্তু আটঘাঁট বেধে ব্যবস্থা করলে তার পুত্র তো হতে পারে । এটাই কি ছিল তাঁর সর্ত আরোপের পিছনকাব হিসেব ? মহাভারতের রূপেগুণে ঈর্ষাযোগ্য শ্রেষ্ঠ আর্য যুবকটিকে সেই কারণেই কি তাঁর স্বার্থসিদ্ধির বলি হ'তে হ'লো ? পর্বতবন সমাকীর্ণ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হ'য়ে ধর্মানুসারে প্রজাপালনে যিনি সক্ষম, যশ সত্য দম দান্তি তপস্যা ব্রহ্মচর্য দান ধ্যানে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁকেই হ'তে হলো কতগুলো অযোগ্য মানুষের হুকুম তামিলের দাস ! শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর দুইপুত্র, একজন চিত্রাঙ্গদ, একজন বিচিত্রবীর্য ; দু'টিই আস্ফালনে ও কামুকতায় সমান দক্ষ । সারা যৌবন ভীষ্মই বকলমে শাসনের দায়িত্ব বইলেন, কিন্তু নামে এঁরাই রাজা । তাদের বিবাহের জন্য ভীষ্মই কন্যাহরণ ক'রে আনলেন যুদ্ধ ক'রে । ঝুঁকি তাঁর, উপভোগ তাদের । যতদিন জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ জীবিত ছিল সে-ই ছিল রাজা । তার মৃত্যুর পরে সত্যবতী ভীষ্মের সাহায্যেই ছোট ছেলে বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে বসালেন । ঠিক আগের মতোই ভীষ্ম তাঁর প্রাজ্ঞতা দিয়ে, বিচক্ষণতা দিয়ে নির্বিঘ্নে রাজ্যচালনার চাকাটি তৈলাক্ত করতে লাগলেন । প্রজাদের সুখী ও শান্ত রাখতে রাখতে কবে যে তিনি একদিন বৃদ্ধ পিতামহে পরিণত হলেন, তা নিয়ে কেউ ভাবেনি ।

চার

প্রথম জীবনে সত্যবতী সম্ভবত ভীষ্মকে ততটা বিশ্বাস করতেন না । বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে সন্দেহের চোখেই দেখতেন । ভীষ্ম রাজা না হলেও রাজ্যের চাবি তাঁর হাতে। সত্যবতীর নিজের দুই ছেলে রাজ্যচালনায় প্রায় অক্ষম । দেশের প্রতিটি লোক ভীষ্মের অনুগত, ভীষ্মের ইচ্ছেতে বা ইঙ্গিতে একমুহূর্তেই রাজ্যব্যবস্থায় ওলোটপালট হয়ে যেতে পারে—সেটা বোধগম্য হ'তে সত্যবতীর মতো বুদ্ধিমতী রমণীর বেশি সময় লাগেনি । কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আগুন কখনোই জ্বললো না, শুধু তাপ দিল, আরাম দিল। তাঁর গর্ভজাত পুত্র দুজনের মৃত্যুজনিত কঠিন দুঃখই শুধু তাঁর সপত্নীপুত্র মোচন করতে পারেননি । কিন্তু জাগতিক সমস্ত দুঃখ-বিপদের হাত থেকে তিনিই তাঁর রক্ষাকর্তা। রাজমহিষী হিসেবে যে সম্মান ভোগ করেছেন, রাজমাতা হিসেবে যে সম্মানে ভূষিত থেকেছেন এবং পিতামহী হয়েও যে অপ্রতিহত কর্ত্রীত্বের আসনে আসীন থেকেছেন, সবই ভীষ্মের জন্য ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে ভীষ্মের সম্পর্ক কেমন ছিল ? যদিও সমস্ত দিক বিবেচনা করলে ভীষ্মের তুল্য এমন সর্বগুণসম্পন্ন মহৎ চরিত্র মহাভারতে আর একটিও নেই, তবু দ্বৈপায়নের প্রচারের মহিমায় শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে যুগ যুগ ধরে বন্দিত হয়েছেন যুধিষ্ঠির। অথচ তিনি যে এই সম্মানের যোগ্য নন এ তো আমরা আগে দেখিয়েছি । দ্বৈপায়নের প্রচারের ফলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠ বীর হিসেবে অর্জুন সমাদৃত । অথচ অর্জুন ভীষ্মের

সঙ্গেও সম্মুখ যুদ্ধে এগিয়ে আসেননি, কর্ণের ভার্গবাস্ত্র নিবারণের সামর্থ্যও তাঁর ছিল না, কর্ণের রথ মাটিতে বসে যাওয়ার সুযোগে ধর্মযুদ্ধের নিয়ম ভেঙে অর্জুন তাঁকে হত্যা করেন । কিন্তু কোনো কাহিনী যিনি বলেন বা লেখেন তাঁর শক্তি অবাধ । পাঠকদের ভালো লাগা বা মন্দ লাগা তাঁর ইচ্ছের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে । তাঁর ইচ্ছামতো তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা অকারণেও অনেক বাহবা পেয়ে যায় । মহাভাবত ভর্তিই এই অকারণ বাহবার ছড়াছড়ি । আমরা মেনেই নিয়েছি ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ দ্বৈপায়ন যা বলছেন তাই ধ্রুবসত্য । কিন্তু কেন তাঁর ঐ পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি, বিশেষ ক'রে যুধিষ্ঠিরের প্রতি এত কৃপা, এত মনোযোগ ?

এই কারণ অনুধাবন করতে হলে প্রথমেই খোঁজ করা দরকার যুধিষ্ঠিরের পিতা কে ? তাঁকে ধর্মপুত্র বলা হয় । মহাভারত অনুসারে দাসীর গর্ভে ধর্ম বিদুররূপে জন্মেছিলেন । সেই হিসেবে কুন্তীর গর্ভে হয়তো যুধিষ্ঠির বিদুরের ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রে থাকতে পারেন । কেননা একমাত্র বিদুরই মাঝে মাঝে ঐ কিরাত-নিষাদ অধ্যুষিত হিমালয়শৃঙ্গে পাণ্ডুর খবরাখবব করতে যেতেন । কুন্তীর সঙ্গে তাঁব প্রণয় থাকা অসম্ভব নয় । ছেলেদের চৌদ্দবছর বনবাসকালে কুন্তী তো বিদুরের গৃহেই ছিলেন । তাঁরা যে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন এ থেকে সেটা বোঝা যায় । তাছাড়া বিদুর যখন দেহত্যাগ করেন তখন, 'এক বৃক্ষে ঠেস দিয়ে বিদুব অনিমেষ নয়নে যুধিষ্ঠিরকেই দেখছিলেন । যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে নিজের দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গ্রামে ইন্দ্রিয়সকল সংযোজিত করে যোগের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবিষ্ট হলেন ।' তারপরেই বিদুরের দেহ প্রাণহীন হলো । পরের দিন ঊষাকালে ব্যাসদেব এসে বললেন, ধর্মই বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যুধিষ্ঠিরও ধর্ম থেকেই উৎপন্ন । তখন অবশ্য যুদ্ধ সমাপ্ত, দেশকে দেশ গ্রামকে গ্রাম সমস্তই ধ্বংস হ'যেছে, ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব কোনো রাজাই সম্ভবত জীবিত নেই, সেই ধ্বংসস্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে রাজা হ'য়েছেন যুধিষ্ঠির । কর্ণের দুঃস্বপ্ন বাস্তব হয়েছে। এখন যুধিষ্ঠির কার পুত্র এটা বলতে আর বাধা নেই কিছু । এর আগে কিন্তু ব্যাসদেব একথা উচ্চারণ করেননি ।

বিদুরও তাঁকে জীবদ্দশায় আপন পুত্র পরিচয় গোপন ক'রে গেছেন । কিন্তু যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা কখনো গোপন থাকেনি । তাঁদের সম্পর্ক যে অত্যন্ত নিকট ছিল তার এটাও একটা প্রমাণ যে ঐ পরিবারে শুধুমাত্র বিদুর এবং যুধিষ্ঠিরই আর্যরা যে ভাষাকে ম্লেচ্ছ ভাষা বলে জানেন তাই জানতেন। আর কেউ সে ভাষা বুঝতো না । শূদ্রানীর গর্ভজাত বিদুরের ভাষা কুন্তীর গর্ভজাত পুত্রের জানবার কথা নয় । যুক্তিসিদ্ধভাবেই ধ'রে নেওয়া যেতে পারে বিদুরকে যুধিষ্ঠির শৈশবে পর্বতশৃঙ্গে অনেকবার দেখেছেন, মিলিত হয়েছেন এবং এই ভাষা পিতার সঙ্গে কথা বলেই শিখেছেন । যুধিষ্ঠির যে আর্য নন তার আরো প্রমাণ আছে । পাঞ্চালরাজ যখন কন্যার পঞ্চস্বামী গ্রহণে আপত্তি জানিয়ে বলছেন, 'এই প্রস্তাব বেদ-বিরোধী, এক কন্যা কখনোই পাঁচটি পুরুষের স্ত্রী হতে পারে না', তখন যুধিষ্ঠির বলছেন, 'এই আচরণ আমাদের পূর্বপুরুষের নিয়ম অনুযায়ীই হচ্ছে ।' পূর্বপুরুষ নিশ্চয়ই আর্য নয় ।

দ্বৈপায়ন অনেকটা কোকিলের মতো । ডিম পেড়েই খালাস । যে মেয়ে দু'টি তাঁর প্রতি ঘৃণা সত্ত্বেও বাধ্যতামূলকভাবেই তাঁর সঙ্গম সহ্য ক'রে দুটি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম

দিয়েছিল, তাদের প্রতি তাঁর কোনো টান ছিল বলে মনে হয় না। কুরুকুলের জন্য উৎপাদিত পুত্রদুটি কীভাবে বড়ো হয়ে উঠেছিল সেটা তাঁর কাছে অবান্তর, সত্যবতীর ইচ্ছের আনুগত্যই সেখানে বড়ো কথা। পুত্র প্রসবের পর মাতা দু'টির আর কোনো ভূমিকা নেই। পিতাও পলাতক। কিন্তু সেই পিতাকেই বিদুরের প্রতি বেশ বৎসল পিতৃরূপে দেখতে পাই। দাসীপুত্রের উপরে ব্যাসদেবের টান অকুণ্ঠিত। ফলে বিদুরের পুত্রের প্রতিও সেই টান অব্যাহত থাকা স্বাভাবিক। এইজন্যই হয়তো তার আসল মনোযোগ যুধিষ্ঠিরের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। এজন্যেই হয়তো যুধিষ্ঠিরকে অগ্রগণ্য ক'রে জনমানসে নিজের পৌত্রের প্রভাব বিস্তার করা, তার প্রতি সহানুভূতি ও সম্মান আদায় করার চেষ্টা ছিল অপর্যাপ্ত। হয়তো তিনি শূদ্রানীর গর্ভজাত আপন পুত্রের পুত্রকেই সসাগরা পৃথিবীর রাজপদে বৃত করতে সংকল্প করেছিলেন।

তিনি নিজে কানীনপুত্র বলে যেমন তাঁর পক্ষে রাজা হওয়া অসম্ভব তেমনি দাসীপুত্র বলে বিদুরও কখনো রাজা হতে পারতেন না। অথচ দ্বৈপায়নের ঔরসজাত পুত্রদের মধ্যে বিদুরই ছিলেন রাজা হবার পক্ষে সবচেয়ে যোগ্য। কিন্তু বিদুর না হতে পারুন বিদুরের পুত্রটি যেন রাজা হন, এই অভিলাষ তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত ছিল বলেই কি যুধিষ্ঠিরের পিতৃপরিচয়টি প্রথমাবধি গোপন করা হয়েছিল ? তাঁর হৃদয়ও কি তবে তাঁর মায়ের হৃদয়ের মতোই সুদূর ভবিষ্যতের সূত্র বেয়ে জটিল পথে চলেছিল ?

কুন্তীর পাঁচটি পুত্রের জন্মবৃত্তান্ত সত্যিই রহস্যজনক। পাণ্ডুর জীবদ্দশায় পাণ্ডু হস্তিনাপুরে তাঁর মাতা, মাতামহী, জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র কারোকেই কিন্তু এই ক্ষেত্রজ পুত্র পাঁচটির কথা জানাননি। কখনো নিয়ে এসে পরিচয়ও করিয়ে দেননি। একবার শোনা গিয়েছিল কুন্তী পুত্রবতী হয়েছেন, তাই শুনে গান্ধারী নাকি নিজে নিজের গর্ভে আঘাত ক'রে গর্ভপাত ঘটিয়েছিলেন। তার ফলে একশো খণ্ড মাংসপিণ্ড কলসীতে ডুবিয়ে রেখে একশো পুত্রের আবির্ভাব ঘটানো হলো। এটা অবশ্য গল্পকথাই। পুত্ররা আর আর সকলের পুত্রের মতোই নিশ্চয় জন্মগ্রহণ করেছিল, তবে গান্ধারীর গর্ভে নয়। তারা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে দাসীদের গর্ভজাত সন্তান হতে পারে। তখনকার দিনে স্বামী যার গর্ভেই পুত্র উৎপাদন করুন না কেন, ধর্মপত্নীকে সেই পুত্রদের আপন পুত্রের মতোই বাৎসল্য দিয়ে পালন করা বিধি ছিল। গান্ধারীর মতো ধর্মপরায়ণা মনস্বিনী মহিলা সে বিধি নতমস্তকে মেনে নিয়েছিলেন। যেমন ক'রে মেনে নিয়েছিলেন অন্ধ স্বামীকে।

এই পঞ্চপুত্রের খবর তখনই জানা গেল যখন পাণ্ডু লোকান্তরিত। মাদ্রীও জীবিত নেই। সত্যবতী পুত্রদের মৃত্যু দেখেছেন, সহ্য করেছেন, পৌত্রের মৃত্যুও তাঁকে সহ্য করতে হলো। এই অজানা প্রপৌত্রদের মেনে নেওয়ার মধ্যে তাঁর মন না জানি কীভাবে কাজ করেছিল ! ব্যাসদেবের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অবারিত ছিল। প্রয়োজনমতো রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দ্বৈপায়নের কোনো বাধা ছিল না। এবং ব্যাসদেব যখন জানতেন যুধিষ্ঠিরের পিতা কে, তখন সেকথা তাঁর মাতারও নিশ্চয়ই অগোচর ছিল না। যুধিষ্ঠিরকে মেনে নিতে হলো বলেই হয়তো অন্য পুত্রদের মেনে নেবার প্রয়োজন ঘটলো ! ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পৌত্র, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা তাঁর পৌত্রের পুত্র। এঁরা কিছুটা দুরন্ত, দুর্যোধন বরাবরই কোপনস্বভাব, এঁদের প্রতি সত্যবতী স্নেহশীলা ছিলেন বলে মনে হয় না। দুর্যোধনদের পিতামহীরা জীবিত, তাঁদের কথা কোথাও উচ্চারিত নয়। পুত্রবধূদের প্রতি

সত্যবতী হয়তো তেমন তুষ্ট ছিলেন না । তাঁরা রাজকন্যা, তিনি দাসকন্যা । এখানেই একটা মস্ত বড়ো তফাৎ ছিল । তাছাড়া তাঁর কৃষ্ণবর্ণ পুত্রকে তাঁরা সমাদরে গ্রহণ করেননি। এই ক্ষোভও হয়তো তাঁকে বিচলিত করেছিল ।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসদেবের পক্ষপাত এই কাহিনীতে অত্যন্ত স্পষ্ট । যুধিষ্ঠির বয়সে সকলের জ্যেষ্ঠ, সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী সিংহাসনের অধিকার অবশ্যই তাঁর, সুতরাং অন্য চারটি ছেলে ভ্রাতা হিসাবে থাকলে ক্ষতি নেই । বরং ভালো । যুধিষ্ঠিরের মতো ঢিলেঢালা, সর্ববিষয়ে অপটু এবং জুয়াখেলায় আসক্ত ভালোমানুষের জন্য এই সহায় একান্ত প্রয়োজন । ভীমের মতো এমন অপরিমেয় শক্তিধর, অর্জুনের মতো এমন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, নকুল সহদেবের মতো এমন দু'টি অনুগত সহচর আর তিনি কোথায় পাবেন ? এদের মেনে নিলে অর্থাৎ সিংহাসনে দুর্যোধনের জায়গায় যুধিষ্ঠিরের অধিকার সাব্যস্ত হলে যুদ্ধাগ্নি যে একদিন প্রজ্জ্বলিত হয়ে তার দাউ দাউ শিখায় সমস্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেবে একথা যেমন ব্যাসদেব বুঝেছিলেন, তাঁর মাতাও কি বোঝেননি? শক্তিকামী, অহংকারী, কোপনস্বভাব দুর্যোধন কখনোই যে আগন্তুক এই ভাইটিকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবে না, দরকার হলে যুদ্ধ করবে, মাতাপুত্র দু'জনের কাছেই এ সত্য নিতান্ত স্পষ্ট ছিল । সত্যবতীর অন্ধ পৌত্র ধৃতরাষ্ট্রও যে নিজ পুত্রের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে ভ্রাতার ক্ষেত্রজ পুত্রের প্রতি অধিক দয়াবান হবেন না এও জানা কথা। এসব জেনেশুনেও সারা মহাভারত জুড়ে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের উপরে যত দোষারোপ করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তত দোষারোপ কি ন্যায়সংগত ? সাংসারিক মানুষমাত্র জাগতিক স্বার্থের দাস । ব্যাসদেব নিজেকে এই কাব্যকথনে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে নিজেও কি খুব নিরপেক্ষ থাকতে পেরেছেন ? যদি তাই পারতেন তাহলে তাঁর এই মহাগ্রন্থে কর্ণকে এমন অপাংক্তেয় ক'রে রাখতেন না । নিজে কুমারী মাতার সন্তান হয়ে সমাজে এত মর্যাদা ভোগ ক'রে কানীনপুত্র কর্ণকে এরকম লজ্জা আর অপমানে জর্জরিত করতে পারতেন না । অন্য সন্তানদের চাইতে বিদুরের উপরেই ব্যাসদেবের টান সবচেয়ে বেশি ছিল । সেটাও কি নিরপেক্ষতার পরিচয় ? রাজকন্যারা তাঁকে ঘৃণা করেছিলেন। কে জানে সত্যবতীর মতো তাঁর হৃদয়েও হয়তো সেই অপমানজাত বিদ্বেষ ও ক্রোধের শিখা ধূমায়িত হচ্ছিল । আর হয়তো সে কারণেই মহাযুদ্ধের এই দাবানল জ্বালতে তিনি প্রত্যক্ষে না হোক পরোক্ষে সাহায্য করলেন । যত ক্ষীণ ধারাতেই হোক তবুও যাদের শিরায় একবিন্দুও রাজরক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল অম্বিকার গর্ভসম্ভূত সেই ধৃতরাষ্ট্রের বংশকে তাই কি তিনি নির্বংশ করলেন শূদ্রানীর পৌত্রকে দিয়ে ? কুন্তীর পাঁচটি পুত্রকে মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাই কি তিনি ছুটে এসেছিলেন সত্যবতীর কাছে, প্রায় নির্ঘোষের মতোই বললেন, 'শীগ্গিরই সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে, আপনি এবার সরে পড়ুন।' কেন ? কীসের বিপদ ? কোন বিপদের গন্ধ তিনি পেয়েছেন ? যদি পেয়েই থাকেন তবে তিনিই কেন তা নিরসন করলেন না ? পৌত্রদের কলহাগ্নিতে তিনিই তো বারিসিঞ্চন করে সব বিপদ নিবারণ ক'রে দিতে পারতেন ।

আর তাঁর মাতা ? ঐ একটি কথাতেই গৃহত্যাগ করলেন ? কারো কথায়, কারো ইচ্ছেতে কিছু করবার পাত্রী কি তিনি ছিলেন ? যুধিষ্ঠিরকে স্বীকৃতি দেবার অর্থ গৃহযুদ্ধ । তাঁর অভীষ্টসিদ্ধি এবারে সুনিশ্চিত জেনেই কি সংসারত্যাগ করলেন ?

দ্রৌপদীর জন্মক্ষণে দৈববাণী হয়েছিল এর দ্বারাই কুরুকুল ধ্বংস হবে । কিন্তু আসল কথা হলো— দ্বৈপায়ন যেটি চেপে গেছেন—দ্রৌপদীর উদ্ভবের আগেই তাঁর স্বামীদের প্রপিতামহী সত্যবতী দ্রৌপদীর জ্যেষ্ঠস্বামী যুধিষ্ঠিরকে রাজকুমারদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে যুদ্ধাগ্নির শিখাটি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন । এই কালোবিদ্যুৎ নিষাদরমণীটির ব্যক্তিত্ব আর সকলের ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে অনেক অনেক ঊর্ধে উড্ডীন ছিল । মহাভারতের ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞের তিনিই ছিলেন উদ্যোক্তা আর তাঁর কৃষ্ণবর্ণ পুত্রই প্রধান পুরোহিত ।

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৩ । সপ্তম বর্ষ । দ্বিতীয় সংখ্যা

ঊর্মিলা চক্রবর্তী

সামাজিক মূল্যবোধ বনাম মহিলা সাহিত্য : সংগ্রামের সূচনা ও অ্যাফ্রা বেন

নারীমুক্তি আন্দোলন প্রকাশ্যে মাথা তুলেছে আজ বেশিদিন নয়। আর আজ পর্যন্ত এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা এই আন্দোলনকে কিছুটা অর্থহীন, কিছুটা হাস্যকর আর কিছুটা হয়তো-বা আপত্তিকর বলে মনে করেন। এটাই স্বাভাবিক। মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে অনাস্থা সমাজের সর্বস্তবে আজন্ম সংস্কারে পর্যবসিত। অপেক্ষাকৃত সহিষ্ণুজনও ভাবেন যে মেয়েরা স্বভাবতই বুদ্ধিবৃত্তিতে নিকৃষ্ট ও কল্পনাশক্তিতে ক্ষীণ না হলে চিন্তা ও সাহিত্যজগতে তাঁদের অবদান এত কম কেন ? লাইব্রেরিতে মেয়েদের লেখা বই কটা ? এ প্রশ্নের জবাব বিশ শতকের গোড়ার দিকে (১৯২৯) ভার্জিনিয়া উলফ্ তাঁর যুগান্তকারী বই 'এ রুম অফ ওয়ান্‌স্ ওন'-এ অবশ্য অনেকটাই দিয়ে গেছেন। শেক্সপিয়রেব কোনো সমান প্রতিভাশালিনী বোন যদি ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডে নাট্যকার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন তবে তাঁর কি শোচনীয় পরিণতি হতে পারত তার একটি রোমাঞ্চকর কাল্পনিক চিত্র এঁকেছেন লেখিকা। ঐতিহাসিক জি. এম. ট্রেভেলিয়ানের অঙ্কিত তৎকালীন সমাজচিত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই কল্পিত জীবনীর বাস্তব ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে ভার্জিনিয়া উলফ লিখছেন :

> .... it is unthinkable that any woman in Shakespeare's day should have had Shakespeare's genius. For genius like Shakespeare's is not born among labouring, uneducated, servile people. It was not born in England among the Saxons and Britons. It is not born today among the working classes. How, then, could it have been born among women whose work began, according to Professor Trevelyan, almost before they were out of the nursery, who were forced to it by their parents and held to it by all the power of law and custom ? ১

প্রতিভার স্ফুরণ কেবল নয়, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের জন্যও খোলা হাওয়ার প্রয়োজন। শিক্ষার সুযোগ, মুক্তচিন্তার আবহাওয়া, গণ্ডির বাইরের জীবনকে দেখবার, জানবার সুযোগ, এগুলো মেয়েরা আজও খুব কম স্তরেই পুরুষের সমান পাচ্ছেন। কিন্তু এটা কেবল একটা জটিল অবস্থার বাইরের চেহারাটুকু। ভেতরে একটা চিরন্তন বহুমুখী দ্বন্দ্ব। মেয়েরা যেদিন থেকে সামান্য লেখাপড়া শুরু করলেন এবং তাঁদের মতামত প্রকাশ করার ক্ষমতা পেলেন, সেদিন থেকেই সামাজিক চাপের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামের সূচনা। তখন থেকেই তাঁরা খতিয়ে দেখতে শুরু করলেন সেই চিরঅভ্যস্ত সামাজিক রীতিনীতির আদর্শ যা মেয়েদের পক্ষে চিরদিন কঠোর। সামনে এগুতে গিয়ে তাঁরা পদে পদে ঠোক্কর

খেলেন। মননশীল মেয়েদের মনে জমতে থাকল ক্ষোভ পুরুষ ও মেয়েদের পক্ষে সমাজের বিষম দৃষ্টির বিরুদ্ধে। অথচ তার প্রকাশ হয়ে রইল সীমিত বহু শতাব্দীর সংস্কারের কবলে। সংস্কারের বেড়াজাল অনেকে তবু ডিঙোলেন, কিন্তু মেয়েদের অধিকার নিয়ে যাঁরা সোচ্চার হলেন, সমাজেব কর্ণধার পুরুষজাতি তাঁদের ক্ষমা করলেন না। কিছুটা উপেক্ষা ও কিছুটা ঈর্ষায় মেয়েদের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল রচনাগুলি তাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে ঠেলে দিয়েছেন। মেরী ওলস্টোনক্রাফটের 'ভিণ্ডিকেশন অব দি রাইট্‌স্ অব ওম্যান'-এর মতো অসাধারণ বইও লেখিকার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণের বন্যায় তলিয়ে গিয়েছিল। আজকের নারীমুক্তি আন্দোলনের একজন মুখ্য প্রবক্তা ডেল স্পেণ্ডার লিখেছেন :

> If we live in a society where women's knowledge and theories are notable by their absence, in which women's ideas are neither respected nor preserved, it is not because women have not produced valuable cultural forms but because what they have produced has been perceived as dangerous by those who have the power to suppress and remove evidence. [২]

মেয়েদের উপর সমাজের চাপ ভিতর ও বাহির দু'দিক থেকেই কাজ করে। বাইরের চাপ হাজার হাজার বছরের অভ্যাসের ফলে ভেতরে কেটে ব'সে গেছে। সমাজের অসম দৃষ্টি সবাই মেনে নিতে পারছেন না, হয়তো-বা কারো কারো লেখার মধ্যে ফেটে পড়ছে প্রচণ্ড ক্ষোভ। অথচ আবার তাঁদেরই লেখায় হয়তো কখনো দেখি পুরুষশাসিত সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, যে আনুগত্যের ফলে তাঁরা স্বশক্তিতে আস্থা হারাচ্ছেন, নারীর নিজস্ব চিন্তার মূল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হচ্ছেন। এখানেই শুরু হয় এক আত্মবিধ্বংসী টানাপোড়েন, যার ফলে মেয়েদের মুক্তিচিন্তার ইতিহাস চিরদিন ক্ষতবিক্ষত।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের নারীজাগরণ সম্বন্ধে কথাগুলো বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। সেই শুরু। মহিলারা প্রথম ঘরে বসে একটু-আধটু লেখাপড়া শেখা ও অবসর-বিনোদন হিসাবে হাল্কা সাহিত্যচর্চার অধিকার পেলেন। মেয়েদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সেই প্রথম তাঁদের মনে স্পষ্ট একটা ধারণা হলো। সেখান থেকেই জাগল নানা প্রশ্ন, জমতে থাকল ক্ষোভ। অথচ সমাজের শিকল অলংকারের মতো অঙ্গে পরতে তাঁরা অভ্যস্ত। সেই প্রথম যুগেব মহিলা-সাহিত্যিকদেরই অভ্যাস ও মুক্তিচিন্তার টানাপোড়েনে সবচেয়ে বিপর্যস্ত হ'তে দেখি।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ সমাজে মেয়েদের ব্যাপারে একটু বেশিরকমের কড়াকড়ি ছিল। তার কারণ সহজেই অনুমেয়। চিরদিনই দেখা যায় যে পুরুষের চরিত্রহীনতার সঙ্গে সমানুপাতিক হারে বাড়ে তার ঘর সামলাবার প্রবণতা। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে পুরুষের চরিত্রহীনতা চরমে ওঠে। তার ফলভোগ করলেন মেয়েরা। সতীত্বের আদর্শ ছাড়াও একটা কাল্পনিক 'শালীনতার' ('modesty') আদর্শ মেয়েদের উপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া হলো। সতীত্বের সংজ্ঞা ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু শালীনতা ব্যাপারটি নেহাৎই মনগড়া। তার কোনো ধরাবাঁধা গণ্ডি না থাকায় তখনকার সমাজ

মেয়েদের যে-কোনো ধরনের আত্মপ্রকাশকেই শালীনতাবহির্ভূত ব'লে আখ্যা দিলেন। মেয়েদের 'আদর্শ' আচরণ তখন ছিল নিজেকে পুরুষের প্রচ্ছায়ায় যতদূর সম্ভব অবলুপ্ত ক'রে রাখা। তাই তখন দু'চারজন মহিলা অবসরবিনোদন হিসাবে কলম ধরলেও তাঁদের কোনো সাহিত্যিক মর্যাদা দাবি করবার কথা উঠত না, লেখা ছেপে লোকচক্ষুর সামনে আনলে অশালীন আত্মপ্রচারের অভিযোগ আসত। প্রতিবাদ স্বাভাবিকভাবেই মেয়েদের কলমেই বেজে উঠেছিল। লেডি উইনচেলসির কলমে শুনি তীব্র ক্ষোভ ও বিদ্রূপ :

Alas! a woman that attempts the pen,
Such a presumptuous creature is esteemed,
The fault can by no virtues be redeemed.
They tell us we mistake our sex and way ;
Good breeding, fashion, dancing, dressing, play,
Are the accomplishments we should desire ;
To write, or read, or think, or to enquire,
Would cloud our beauty, and exhaust our time,
And interrupt the conquests of our prime,
Whilst the dull manage of a servile house
Is held by some our utmost art and use. [৫]

এই সামান্য দু'চার পঙ্ক্তি উদ্ধৃতি থেকেই কি তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার একটা পরিচয় আমরা পাই না ? ভাষার বাঁধুনী ও প্রকাশের সাবলীলতার সঙ্গে যে বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গের সুর শোনা যায় সেযুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে তার তুলনা চলে। লেডি উইনচেলসি অবশ্য তাঁর সব লেখায় এই উজ্জ্বল ব্যঙ্গের সুর রাখতে পারেননি। কখনও কখনও তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় এক গভীর হতাশার সুর। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি যে কখনও বৃহত্তর পৃথিবীর আলো দেখবে না এই বোধ তাঁকে অস্থির ক'রে তুলেছে। কিন্তু তাঁর বেদনার কোনো মূল্য তখনকার সমাজে ছিল না, ছিল না কোনো সমবেদনা, এমনকি সহিষ্ণুতা। তাঁর যুগে তাঁর সমাজে তিনি ছিলেন বিদ্রূপের পাত্রী—

a blue stocking with an itch for scribbling.

লেখিকা হিসেবে এই তিক্ততার অভিজ্ঞতা মার্গারেট ক্যাভেণ্ডিসের হয়নি। তাঁর ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। ক্ষমতাশালী অভিজাত স্বামী ডিউক অব নিউকাস্‌ল্ মার্গারেটের সন্তানহীন জীবনকে সম্পূর্ণ ক'রে তোলবার জন্য নিজেই তাঁকে সাহিত্যরচনায় অনুপ্রাণিত করেন। প্রচুর অর্থব্যয়ে ডিউক স্ত্রীর লেখা বই ছাপান, নিজে মুখবন্ধ লিখে শালীনতাহানির দায় থেকে স্ত্রীকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেন। শেষরক্ষা তাও হলো না। জনমত তাঁকে আক্রমণ করল তাঁর কবিতার বই ছেপে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে। তিনি একেবারে একা হ'য়ে গেলেন, সমাজ থেকে স'রে আসতে বাধ্য হলেন। তাঁর সমসাময়িক সমাজ তাঁকে নতুন নাম দিল, 'ম্যাড ম্যাজ'।

মার্গারেট ক্যাভেণ্ডিসের মধ্যেই স্বাভাবিক প্রতিভা ও অভ্যস্ত সামাজিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব সবচেয়ে প্রকট। মেয়েদের অসহনীয় জীবন সম্বন্ধে গভীর বেদনা ও তিক্ততার খোঁজ পাওয়া যায় তাঁর লেখায় :

Women live like Bats or Owls, labour like Beasts and die like worms.[8]

অথচ এরই পাশে দেখি পুরুষের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সমাজে স্বীকৃত অভিমতের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা। স্বামীর সম্বন্ধে মার্গারেট লিখছেন :

> He creates himself with his pen, writing what his wit dictates to him, but I pass my time rather with scribbling than with writing, with words than with wit ...[9]

এ-ধরনের কথাকে ব্যক্তিগত বিনয় মনে করলে ভুল হবে, কারণ মেয়েদের স্বাভাবিক নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে সাধারণ উক্তিও তিনি করেছেন :

> Women's minds are like shops of small wares, wherein some have pretty toys, but nothing of any great value.[৬]

পাগলাটে, খামখেয়ালী 'ম্যাড ম্যাজ' ক্রমেই তাঁর প্রাসাদের একাকিত্বে আরও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। একদিকে অদমনীয় প্রতিভা এবং অন্যদিকে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নারীর মূল্যহীনতার বোধই কি তাঁকে মানসিকভাবে অসুস্থ ক'রে তুলেছিল ? আর সেই সঙ্গে হয়তো যোগ হয়েছিল কিছুটা বঞ্চনার বোধ। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে সমাজের বিরূপ প্রতিক্রিয়া যেমন তাকে আঘাত ক'রেছিল, তেমনি তাঁর নাটকগুলি কোনোদিনই আলো দেখেনি। সেগুলি যে মঞ্চস্থ করা যেতে পারে সেকথা তার অতি উদার স্বামীরও মাথায় আসেনি।

লেখা ছেপে লোকচক্ষুর সামনে নিজেকে তুলে ধরবার মতো অশালীন কাজের জন্য মার্গারেট ক্যাভেণ্ডিসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন সেযুগের পুরুষেরাই কেবল নয়, পুরুষের বেঁধে দেওয়া নিয়মে অভ্যস্ত মহিলারাও। সেযুগের মহিলাদের মধ্যে একমাত্র মার্গারেট ক্যাভেণ্ডিসেব প্রতিভা ছিল তা তো নয় ; তখনকার অভিজাত মহিলারা সকলেই সামান্য লেখাপড়া করেছেন, সুতরাং স্বাভাবিকভাবে অনেকের মধ্যেই প্রতিভাব আভাস পাওয়া যায়। অথচ তাঁরা পর্দার আড়ালে শালীনতা বাঁচিয়ে চলে পুরুষের মন যোগাতে ব্যস্ত ছিলেন। মেয়েদের স্বাভাবিক প্রতিভার যে নিদারুণ অপচয় যুগে যুগে হয়ে এসেছে তার নজির এইসব 'আদর্শ' মহিলারা। এঁদের বুদ্ধি ছিল, প্রতিভা ছিল, সাহিত্যিক বোধ ছিল, ছিল পরিশ্রম করবার ক্ষমতা; ছিল না কেবল লোকনিন্দাকে তুচ্ছ করবার মতো মনোবল, পুরুষশাসিত সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধকে প্রশ্ন করবার মতো সাহস।

এমনই একজন মহিলা ডরোথি অসবোর্ন। মার্গারেট ক্যাভেণ্ডিসের বই ছাপা হলে নারীত্বের অবমাননায় গভীর লজ্জা ও বিপন্নতাবোধে আক্রান্ত হয়ে প্রেমিক উইলিয়ম টেলরকে তিনি লিখলেন :

> You need not send me my Lady Newcastle's book, for I have seen it, and am satisfied that there are many soberer people in Bedlam. I'll swear her friends are much to blame to let her go abroad... there are certain things that custom has made almost of absolute neccessity, and reputation I take to be one of those : if one could be invisible I should choose that, but since all people are seen and known, and shall be talked of in spite of their

teeth's, who is it that does not desire at least that nothing of ill may be said of them ...'

বেচারি ডরোথি ! লেখার হাত, একটি স্পর্শকাতর মন ও সাহিত্যিক দৃষ্টি, সবই তাঁর ছিল । শালীনতার মুখ চেয়ে কেবল উইলিয়মকে দীর্ঘ সাত বছর ধ'রে লেখা অজস্র চিঠিতেই তিনি তাঁর সাহিত্যিক সম্ভাবনার পরিচয় রেখে গেলেন ।

মেয়েদের ভেতর থেকে সামাজিক বিধিনিষেধ কতটা কাজ করে-তার আরেকটি নজির ক্যাথারিন ফিলিপস্ । মার্গারেট ক্যাভেণ্ডিসের মতো নির্জন সন্তানহীন জীবনের ক্লান্তি-মোচনের জন্য তাঁকে কলম ধরতে হয়নি । সেযুগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আবহাওয়ায় তিনি লিখতেন । তিনি যে সাহিত্যগোষ্ঠীতে স্থান পেয়েছিলেন তার মধ্যে ছিলেন জেরেমি টেলর এবং হেনরি জনের মতো কবিরা । পাস্টোরাল কাব্য থেকে ধার করা ছদ্মনামে এই সাহিত্যগোষ্ঠীর কবিরা পরস্পরকে কবিতা লিখে পাঠাতেন । ক্যাথারিন ফিলিপসের রচনাশক্তির এতদূর খ্যাতি হয় যে আর্ল অব আরেরির আগ্রহে তিনি কর্নেই-এর 'পম্পে' অনুবাদ করেন । কিন্তু এখানেই তাঁর সাহসের শেষ । অনুবাদটি নিজের নামে ছাপাবার সাহস তাঁর হলো না ।

এরপরেই ঘটল একটা মজার ব্যাপার । ক্যাথারিনের কোনো বন্ধু তাঁর একটি কবিতার সংগ্রহ ছেপে বসলেন তাঁর অজান্তে । ব্যাস ! ক্যাথারিনের অবস্থা তখন পাগলের মতো । মানসম্ভ্রম সব গেল । কবিতাগুলি একান্ত সাহিত্যিক ঢঙে লেখা; তাদের মধ্যে আপত্তিকর কিছুই ছিল না, ছিল না কোনো নীতিবহির্ভূত উক্তি । কিন্তু কেবল ছেপে লোকচক্ষুর সামনে দেবার ফলে ক্যাথারিন ফিলিপসের সপ্তদশ শতকীয় শালীনতাবোধ গভীরভাবে আহত হয় । স্যার চার্লস কটারেলকে তিনি লিখলেন :

The injury done me by the printer and publisher surpasses all the troubles that to my remembrance I ever had...who never writ a line in my life with the intention of having it printed... you know me, Sir, to have been all along sufficiently distrustful of whatever my own want of company and better employment or the commands of others have seduced me to write, and that I have rather endeavoured never to have those trifles seen at all, than that they should be exposed to all the world ...'

এ-ধরনের চিঠি তিনি অনেককেই লিখেছিলেন । ডরোথি অসবোর্নও এমন একটি চিঠি পেয়েছিলেন । যাই হোক, শেষ পর্যন্ত প্রকাশক মশাইকে বইটা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য ক'রে ক্যাথারিন স্বস্তি পেলেন ।

সমাজের শাসনকে উপযুক্ত সম্মান দেবার পুরস্কার ক্যাথারিন ফিলিপস্ পেয়েছিলেন । তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বইখানি নতুন ক'রে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয় । মেয়েদের কবিতা প্রকাশনার বিরুদ্ধে তাঁর জোরালো চিঠিগুলি মুখবন্ধে ছাপা হয়ে তাঁর সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে তোলে । তাঁর ছদ্মনাম 'ওরিণ্ডা'-র সঙ্গে 'সতী' কথাটি যুক্ত হয়ে তাঁর নতুন নামকরণ হ'ল, 'চেস্ট ওরিণ্ডা' ।

ব্যাপারটি কি ঠিক হাস্যকর ? মেয়েদের চিন্তাশীলতা ও সৃজনশীলতার বিরুদ্ধে সাধারণ মত, আর মেয়েদের উপর সামাজিক চাপের এটিই কি সবচেয়ে ভয়াবহ দলিল

নয় ? আজ হয়তো অনেকে সাহসের অভাবের কথা বলছেন, কিন্তু তাঁরা কি মনে রাখছেন সমাজের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে, বহুবছর ধ'রে অভ্যস্ত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতে হ'লে কতখানি শক্তির প্রয়োজন ? সে শক্তি ক'জনের মধ্যে আশা করা যায়? একজনের মধ্যে থাকলে তাই তো অসম্ভব !

তবু সে শক্তি ঐ যুগেও একজনের মধ্যে দেখা গেছিল, আর তাঁর জন্যই প্রকৃতপক্ষে এই প্রবন্ধের অবতারণা । যখন অন্য মহিলারা হয় অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন, নয়তো নতমস্তকে পুরুষের নির্ধারিত মূল্যবোধ মেনে নিচ্ছেন, তখনও এমন একজন ছিলেন যিনি সমাজের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা অগ্রাহ্য ক'রে স্বশক্তিতে নিজেকে পুরুষের সমকক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন । তিনি জনমতকে নারীর মানবিক মর্যাদার উপরে স্থান দিতে অস্বীকার করলেন, পুরুষের প্রচ্ছায়াবিহীন উগ্র আলোতে সর্বসাধারণের সমক্ষে নিজের প্রতিভাকে মেলে ধরলেন । ইনি সেই অ্যাফ্রা বেন, যাঁর সম্বন্ধে কয়েক শতাব্দী বিস্মরণের পর ভার্জিনিয়া উলফ্ নতুন ক'রে বললেন :

All women together ought to let flowers fall upon the tomb of Aphra Behn ... for it was she who earned them the right to speak their minds.*

প্রখর বুদ্ধি ও প্রতিভার সঙ্গে নারীর মুক্তিচেতনার প্রথম সার্বিক প্রকাশ ঘটেছিল মধ্যবিত্তঘরের অল্পশিক্ষিত এই মহিলার মধ্যে ।

সাহিত্যিক হিসাবে অ্যাফ্রা বেন-এর স্বীকৃতি কতটুকু ? অথচ তাঁর সাহিত্যিক অবদানের কথা ভাবলে অবাক হতে হয় । তিনিই প্রথম মহিলা যিনি জোরগলায় বললেন যে তিনি অবসর বিনোদনের জন্য লেখেন না, পুরুষের সমকক্ষ হয়ে সাহিত্যিক হিসাবে রুজি-রোজগার করতে চান ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা চান । যত অনিচ্ছায়ই হোক, তাঁর দাবি তখনকার ইংরাজসমাজকে মেনে নিতে হয়েছিল । যখন লণ্ডনে দুটিমাত্র রঙ্গমঞ্চ ছিল, সেইসময় অ্যাফ্রা বেন সতেরো বছরে তাঁর সতেরোটি পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করেন। ড্যানিয়েল ডিফোর তিরিশ বছর আগে অ্যাফ্রা বেন মোট তেরোটি উপন্যাস লেখেন । হায়রে পুরুষের অহমিকা ! আজও সাহিত্যের ইতিহাসে 'রবিনসন ক্রুসো' প্রথম ইংরেজি উপন্যাস ! এছাড়াও অ্যাফ্রা বেন বহু বই অনুবাদ করেন, বহু কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করেন। একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকার হিসাবে সামান্য উল্লেখ পেলেও তাঁর লেখা নাটক 'এ গাউজ্যাণ্ড মার্টারস আই হ্যাভ মেড', অথবা 'লভ ইন ফ্যান্টাস্টিক ট্রায়াম্ফ স্যাট' সেযুগের বিশিষ্ট নাটকগুলির মধ্যে স্থান ক'রে নিতে পারে । তাঁর লেখার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রেছে এক গভীর সমাজচেতনা । এর উৎস লেখিকার অন্তরে । তীব্র স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও সামাজিক বৈষম্য সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা অ্যাফ্রা বেন-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল । তিনিই দাসত্বপ্রথার ভয়াবহতার প্রথম সাহিত্যিক চিত্র আঁকেন তাঁর 'ওরুনোকো'-তে ।

অদ্ভুত মহিলা ছিলেন অ্যাফ্রা বেন । আরও অদ্ভুত ছিল তাঁর জীবন । যে-কোনো দেশে যে কোনোকালেই তাঁর জীবন আশ্চর্য ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে তিনি ছিলেন এক মূর্তিমতী বিস্ময় । সেই আমলে তিনি সুদূর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে সমুদ্রযাত্রা ক'রে ক্রীতদাস বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন । দেশে ফিরে তাঁকে স্বাধীন উপার্জনের চিন্তা করতে হয় । তাঁর বিয়ের ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে কেউ জানে না । মিঃ বেন মহোদয়ের আদৌ কোনো বাস্তব অস্তিত্ব ছিল কিনা এ ব্যাপারেও অনেকে

সন্দিহান। মোটমাট এটুকু ঠিক যে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী স্বামীর তত্ত্বাবধানে তিনি জীবন কাটাননি । যাইহোক দেশে যখন ফিরলেন তখন দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসনে । রাজার গুপ্তচর বিভাগে নির্ভয়ে ঢুকে পড়লেন অ্যাফ্রা । তাঁর কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজা সময়মত না দেওয়াতে একবার ধারকর্জ মেটাতে না পেরে ডেটর্স প্রিজন্ ঘোরাও হ'য়ে গেল । শেষ পর্যন্ত সব ছেড়েছুড়ে নাট্যকার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার দুঃসাহসী উদ্যোগে তিনি নিজের প্রতিভাকে নিযুক্ত করেন । সমাজের ভ্রূকুটি তিনি কোনদিনই গ্রাহ্য করেননি । যেসময় মেয়েরা পুরোপুরি পুরুষের তত্ত্বধানে গৃহবদ্ধ জীবন যাপন করতেন তখন তিনি একা বহু পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে নিজের ক্ষমতায় রুজিরোজগার ক'রেছেন । সামাজিক রীতিনীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে নিজের পছন্দমত পুরুষের সঙ্গে থেকেছেন । মেয়েদের ধীশক্তির উপর যেসময় সমগ্র জগতের পূর্ণ অনাস্থা ছিল তখন সাহস ক'রে লেখিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা ক'রেছিলেন ।

অ্যাফ্রা বেন-এর জীবনই একটা প্রতিবাদ । প্রতিবাদ পুরুষশাসিত সমাজের লিঙ্গসাপেক্ষ অসম মানদণ্ডের বিরুদ্ধে । পুরুষদের রাজনৈতিক আলোচনায় ঘরে ব'সেও যখন মেয়েরা কোনো অংশগ্রহণ করতেন না, তখন অ্যাফ্রা নির্ভয়ে খোলাখুলিভাবে তাঁর নাটকের মাধ্যমে ও উইলস কফি হাউসে ব'সে সর্বসমক্ষে নিজের রাজনৈতিক মতবাদ (রয়্যালিস্ট মতবাদ) প্রচার ক'রে গেছেন । তিনিই প্রথম নারীমুক্তিবাদী যিনি পুরুষের সঙ্গে নারীর মর্যাদা নিয়ে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন ।

সেই যুদ্ধের কাহিনী চমকপ্রদ । এধরনের মহিলা সমাজে বা জাতে অপাংক্তেয় থাকবেন এতে অবাক হবার কিছু নেই । ভদ্রঘরের মহিলারা তাঁর নাম উচ্চারণ করতেও কুণ্ঠিত হ'তেন । নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কঠোর বাধার সামনে প'ড়ে অ্যাফ্রার চরিত্রের স্বাভাবিক শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হ'লো । তখন ড্রাইডেন পোয়েট লরিয়েট। সেটা ল্যাটিন কবি হোরেসের মত অনুসারী পণ্ডিতদের যুগ । মেয়েরা স্কুলেই যেতে পারতেন না, সুতরাং গ্রীক ল্যাটিন তাঁরা প'ড়বেন কি ক'রে ? মেয়েদের লেখা সম্বন্ধে তাই স্বভাবতই একটা অবহেলার ভাব ছিল । তাছাড়া মেয়েদের সৃজনীশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহও অত্যধিক ছিল । অথচ অ্যাফ্রা বেন-এর নাটকগুলি একের পর এক মঞ্চস্থ হ'চ্ছে । নাট্যকারদের মধ্যে একটা সব গেল,সব গেল ভাব ! ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটল । তাঁর তৃতীয় নাটক 'দি ডাচ্ লাভার' মঞ্চস্থ হবার দিন শুরু হ'ল অন্তর্ঘাত । নাটক শুরু হবার আগে প্রেক্ষাগৃহে জনৈক "ভদ্রলোক" উঠে দাঁড়িয়ে উঁচুগলায় মন্তব্য করলেন, সেখানে ভাল নাটক কোনমতেই আশা করা যায় না, কারণ সেটি একটি "মেয়েছেলের" ("ওম্যানস") লেখা । এরপর অ্যাফ্রা তাঁর নাটকের "এপিসল টু দি রীডার"-এ এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে ফেটে পড়লেন :

"I would not for a moment be taken arguing with such a propertie as this : but if I thought there were a man of any tolerable parts, who could upon mature deliberation distinguish well his right hand from his left, and justly state the difference between the number of sixteen and two, yet had this prejudice upon him ; I would take a little pain to make him know how much he errs. For waving the examination why women having equal

education with men, were not as capable of knowledge, of whatsoever sort as well as they : I'll only say as I have touched before, that plays have no great room for that which is men's great advantage over women, that is learning. We all well know that the immortal Shakespeare's plays (who was not guilty of much more of this [learning] than often falls to women's share) have better pleased the world than Jonson's works. ..." [১০]

মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি ও সৃজনীশক্তির সমর্থনে এই প্রথম জোরালো যুক্তি পাওয়া গেলো।

কিন্তু এখানেই অ্যাফ্রা বেন থামলেন না । সামাজিক নীতিবোধের পুরো কাঠামোর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন । সমাজের সব স্তরেই এই নীতিবোধ মেয়ে আর পুরুষের ক্ষেত্রে আলাদা । পুরুষের সুবিধার জন্য সৃষ্ট মেয়েদের সতীত্বের আদর্শ সমাজের প্রতি স্তরে কেটে বসেছে । দেশভেদ ও কালভেদে এর রূপের পরিবর্তন যেটুকু হয় সেটুকু নেহাৎ-ই বাইরের ব্যাপারে । এই আদর্শ দিয়ে মেয়েরা চিরদিন বাঁধা । প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও অ্যাফ্রা বেন সেই আমলে এই অসম মানদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ক'রেছিলেন । তাঁর প্রণয়ী জন হয়েল তাঁর কাছে একাগ্র প্রেম দাবী করেন, যদিও নিজে একনিষ্ঠ থাকবার মতো অসম্ভব কথা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মাথায় আসেনি । অ্যাফ্রা তাঁকে স্পষ্ট লিখলেন :

Be just, my lovely swain and do not take
Freedoms you'll not me allow:
Or give Amynta so much freedom back
That she may rove as well as you
Let us then love upon the honest square.[১১]

অ্যাফ্র বেন-এর সমান প্রতিভা ও চরিত্রবল কোনো পুরুষের থাকলে তিনি যুগান্তকারী প্রতিভা হিসাবে দেশে দেশে কালে কালে সম্মান পেতে পারতেন । সমাজের সঙ্গে বৃথা সংগ্রামে তাঁকে শক্তিক্ষয় করতে হ'তো না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে হ'তো না । একদিকে নারী হিসাবে সমগ্র সমাজের ঘৃণা ও অন্যদিকে লেখিকা হিসাবে প্রবলতর প্রতিপক্ষ পুরুষজাতির ঈর্ষান্বিত বিরোধিতা—এই ছিল অ্যাফ্রা বেন-এর পাওনা । এই দুয়ের চাপে তাঁর ভেতরে কতটা রক্তক্ষরণ হয়েছিল তার হিসাব কে রাখে ?

উল্লেখপঞ্জী :

১. ভার্জিনিয়া উলফ্, 'এ রুম অফ ওয়ানস ওন', লণ্ডন ১৯৫৪, পৃ. ৭৩ ।
২. 'ফেমিনিস্ট থিওরিস্টস', সম্পাদনা : ডেল স্পেণ্ডার, নিউ ইয়র্ক ১৯৮৩, পৃ. ২ ।
৩. উদ্ধৃতি, 'এ রুম অফ ওয়ানস্ ওন', পৃ. ৮৮-৮৯ ।
৪. উদ্ধৃতি, ঐ পৃ ৯২ ।
৫. মার্গারেট ক্যাভেণ্ডিস , ডাচেস্ অফ নিউকাস্‌ল্, 'এপিস্‌ল্', 'দি ওয়র্লডস্ ওলিও', লণ্ডন, পৃষ্ঠা অচিহ্নিত ।

৬. মার্গারেট ক্যাভেণ্ডিস, 'সোশিয়েবল্ লেটারস্', লণ্ডন, ১৬৬৪, পৃ. ১৪ ।

৭. উদ্ধৃতি, 'ফেমিনিস্ট থিওরিস্টস্', পৃ. ১৯ ।

৮. ক্যাথারিন ফিলিপস্, 'লেটারস্ ফ্রম ওরিণ্ডা টু পলিয়ার্কাস', লণ্ডন, ১৭০৫, পৃ. ২২৭-২৯ ।

৯. 'এ রুম অফ ওয়ানস্ ওন', পৃ. ৯৮ ।

১০ ও ১১. অ্যাফ্রা বেন, 'ওয়র্কস', সম্পাদক : মন্ট্যাগু সামার্স্, লণ্ডন, ১৯১৩ ।

মানসী দাশগুপ্ত

পুবের মেয়ে, পশ্চিমের মেয়ে : আশাপূর্ণা এবং অ্যালিস

অ্যালিস শুনলেই কারো কারো মনে পড়ে যেতে পারে 'অ্যালিস ইন দ্য ওয়ণ্ডারল্যাণ্ডের' কথা। আশাপূর্ণা নামটি চমকপ্রদ হলেও এই নাম ব্যবহৃত হয়নি কোনো কাহিনী-চরিত্রের জন্য। শুধু আশাপূর্ণা দেবীকেই পেয়েছি আমরা তাঁর লেখা কাহিনীর রূপকার হিসেবে। অন্যদিকে, আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্য-জগতে এসেছেন এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সে আজকের কথা নয় এবং অ্যালিস ওয়াকার রীতিমতো হালের লেখিকা, (জন্ম উনিশশো চুয়াল্লিশ) অথচ এই দ্বিতীয়জনকে নিয়ে (উনিশশো চুরাশি সালে পুলিৎসার পুরস্কার পাবামাত্র) 'নিউ ইর্য়ক টাইমস ম্যাগাজিন'-এ টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত তরুণ সাহিত্যসেবী ডেভিড ব্র্যাডলি এমন মাপে আলোচনা করেন যাতে সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত পশ্চিমী মানুষজন এই ফেমিনিস্ট (উওম্যানিস্ট—বলেন অ্যালিস) কালো মার্কিন লেখিকাকে নজর করে নিতে পারেন। অনুরূপ কোনো আলোচনা আশাপূর্ণা দেবী বিষয়ে তাঁর রচনাশৈলী যখন তীক্ষ্ণ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল তখন তো লেখা হয়ই-নি (যদিও তাঁর কলমের গুণ এবং বিশিষ্টতা নিয়ে কথা বলাবলি শোনা গেছে), এমনকি পুরস্কার প্রভৃতি পাওয়ার পরেও অনুরূপ লেখা পাওয়া যায়নি কেননা, প্রকৃত প্রস্তাবে কিছু 'আহা আহা' কিংবা 'ধ্যুৎ, কিছুই হচ্ছে না' এই দ্বিমাত্রিক ভাষ্যের অধিক কোনো সাহিত্যিক-আলোচনা বাংলা সাহিত্য নিয়ে বড়ো-একটা লেখাই হয় না বহুদিন। এ অবস্থায় মেয়েরা লিখছেন কী না, লিখলে কী লিখছেন এবং কেন—এরকম ধারাবাহিকতার কোনো সূত্র কোনো পর্যালোচক আন্তরিকভাবে খুঁজতে চাইবেন, এই প্রত্যাশা অসঙ্গত। বরং, যেরকম ছেলেখেলা ভাবে 'মেয়ে লেখকদের আলাদা পংক্তি নাকি, অ্যাঁ'—গোছের রটনা-আবহ নিয়ে হালকা কথা উঠেছে পড়েছে, সেটাই অত্যন্ত প্রত্যাশিত। এই প্রসঙ্গ এবং এর শোচনীয়তা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য অবশ্য নয়। উপস্থিত আলোচনা প্রবীণ এবং পুরস্কৃত আশাপূর্ণা দেবী আর নবীন এবং পুরস্কৃত অ্যালিস ওয়াকারের সাহিত্যিক ভাবনা, ভঙ্গিতে ধৃত মূল আবেগের গরমিল এবং মিল নিয়ে।

এঁদের ভিতরে গরমিলই প্রধান, প্রবল। কিন্তু সেই গরমিলের আলোচনা আদৌ সম্ভব হয়ে উঠতে পারে কিছু কিছু মৌল মিলে যার ভিতরে একটি এই যে, এঁদের সৃষ্ট সাহিত্য-জগতে পুরুষের আনাগোনা নেই এমন নয় (আলিসের 'দ্য থার্ড লাইফ অফ গ্র্যাণ্ড কোপল্যাণ্ড'-এর নাম-ভূমিকাতেই পুরুষ; আশাপূর্ণা-র 'নীলপর্দা' নামছে দুই পুরুষের মাঝখানে), কিন্তু সর্বত্রই প্রধান, কেন্দ্রীয় উপস্থিতি মেয়েদের, থেকে থেকে ছোটোদের —এককথায় কোণঠাসা মানুষদের। যে-মানুষ পাত্তা পায়নি মানুষের কাছে, এমন মানুষদের নিয়েই তাঁরা উভয়েই লেখেন।

হৃদয়বান পাঠকেরা সবাই জানেন, মানুষের পৃথিবীতে মানুষকে ঠেসে ধরবার কোণ

একটি নয়। বিত্তবান মানুষেরা (স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে) কোণঠাসা করে রাখে বিত্তহীন মানুষকে; শক্তিমান, গুরুজন (সংখ্যাগুরু, বয়ঃক্রমে গুরু, ওজনদার অভিভাবক) কোণঠাসা করে ফেলে অধীনস্থ ছোটদের—রমণী এবং শিশু যে-দলের প্রধান সদস্য; বুদ্ধি, বল ও সৌন্দর্যের আভিজাত্য আবার কখনো দীপ্তিহীন অনভিজাতকে ঠেলে দেয় কোণে। এমনি আছে হাজার রকম ঠেলাঠেলি এবং তাদের নানা উলটোউলটি মিশেল জঞ্জাল। এসবের কোন্‌টিকে অথবা কোন্‌গুলিকে সরালে এই মানুষের পৃথিবী নবজাতকের পক্ষে আর একটু বেশি বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে—এ প্রশ্নের হাতে-গড়া কোনো সঠিক উত্তর এখনো নেই কারো হাতে । কিন্তু কালক্রমের গতিকে এবং নিচুতলার মানুষের ঘরে কালো মেয়ে হয়ে এসে অ্যালিস ওয়াকার এই অবাক পৃথিবীর দিকে তর্জনী তুলেছেন খুবই খোলাখুলি। সত্যি বলতে, অনুরূপ নিঃসন্দিগ্ধ তর্জনীসংকেত আমরা পাইনি আশাপূর্ণা দেবীর কাছ থেকে। পেতে হবে এমন কোনো কথা ছিল কিংবা আছে তা হয়তো নয়। কত ছোটো গল্পে, নিতান্ত ঘরের মানুষদের আদলে-অবয়বে বিশ্বের দুঃখী, অবহেলিত ভীতু, নরম মানুষের সঙ্গে কত বোকা নিষ্ঠুর কিংবা চালাক, ভালো আবার মন্দ মানুষের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন আশাপূর্ণা কোনো বিচারকের তর্জনী না-তুলে। তীক্ষ্ণ, সপ্রভিত, একটু বাঁকা হাসিতে উজ্জ্বল এই সব লেখা ছুঁয়ে গেছে পাঠকের মন। 'আশাপূর্ণা দেবীর মতো লিখতে পারবেন?'—বলেছেন যে-কেউ নয়, আবু সয়ীদ আইয়ুব। আশাপূর্ণার শ্রেষ্ঠ গল্প-সংগ্রহের যুগ সেটা। তার পরে এলো তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (বাংলা সন ১৩৭১); জীবনের ছোটো-বড়ো মুহূর্তকে ধরে দেওয়ার পরিবর্তে তিনি উপন্যাসের ছকে নিয়ে এলেন সেই যে 'আজকের বাংলাদেশের অজস্র বকুল-পারুলদের পিছনে রয়েছে অনেক বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। ...তারা একলা এগিয়েছে।' —এমন সংগ্রামীদের কথা। গড়ে তুললেন 'সত্যবতী'কে। এই 'সত্যবতী'র লড়াই সংসার, সমাজ, বিরোধ-সংযোগ থেকে আলগা হতে পারে না তো। এখানে খবর করতেই হয় যে সেই সমাজ কোন সমাজ যেখানে একটা ছোট্ট আহ্লাদি মেয়েকেও প্রতিবাদী ঝঙ্কার তুলে বলতে হয় : 'এত যদি না দরকারের কথা তো মেয়েমানুষের জন্মাবারই বা দরকার কি তাই বল তো বাবা শুনি একবার?' ('প্রথম প্রতিশ্রুতি', পৃ ১২৩) একে আঠারোশ ষাট কি সত্তরের বাঙালি সমাজ বললে খুবই খণ্ড সত্য হয় সেই সরল উত্তর কেননা, বাঙালি সমাজ একটা অখণ্ড অবয়ব নয়। যতই না কেন আমরা আমাদের মূল্য-ভাবনাকে কেবল 'সংস্কৃতি' 'অপসংস্কৃতি', 'ভালো' 'মন্দ' ভাগ করা ঘেরাটোপ পরিয়ে রাখি, আমাদের 'সংস্কৃতি'র অভ্যন্তরে ছোটোবড়ো উপসংস্কৃতির (যাকে বিলিতি ভাষায় সমাজবিজ্ঞানী বলেন 'সাব্‌-কালচার') রীতিনীতি, দেখা, বোঝা নিয়ে আসে টানাপোড়েনের বিচিত্র বর্ণালী। এই বর্ণময়তা বিষয়ে অন্ধ না হ'লেই দেখতে পাওয়া যায় যে স্বর্ণকুমারী থেকে শুরু করে সীতাদেবী শান্তাদেবী লীলা মজুমদার প্রমুখের কলম যে-বাঙালি মেয়ের জগৎ আঁকে, আশাপূর্ণা দেবীর কলমে ধরা-পড়ে-যাওয়া বাঙালি মেয়েরা সে জগতের বাইরে এক পৃথক এবং বৃহৎ বাঙালি বৃত্তে অবস্থিত। তার কারণ এই নয় যে আশাপূর্ণা ইশকুলে যাননি ; তার কারণ বাঙালি মেয়ের জগৎ কোনো এক শিলাস্তম্ভ-চিহ্নিত প্রতিষ্ঠান হয়ে নেই আজ বহুদিন। উনিশ শতকী 'জাগরণ'-ঢেউয়ে তাল দিতে পেরেছিলেন যেসব সম্ভ্রান্ত নাগরিক বাঙালি এবং সেই তালের ছন্দ যাঁরা পরবর্তী নানা

আন্দোলন প্রতি-আন্দোলনে রক্ষা করে চলেছিলেন, তাঁদের পরিবারের মেয়েদের বাড়ির পুরুষেরা হাত ধরেই নিয়ে গেছেন প্রগতি সন্ধানে। সেই সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা তথা অভিজাত উপসংস্কৃতির কোনো অংশভাগ সমস্ত বাঙালি মেয়ে পায়নি । বড়োবাড়ির মেয়েরা যখন ছোটোবড়ো সভা এবং পত্রিকা/পুস্তক পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বলতা দান করেছেন সেই একই সময়ে শহরের ভিতরেই (আর এক কলকাতায়) গ্রাম-ঘেঁষা প্রাচীন অভ্যাস এবং ভাবনাধারার মহিমাকে মান্য করে চাকুরিজীবী বাঙালির বাড়ির মেয়েরা রাত-না-পোহাতে ইষ্টনাম নিয়ে উঠে গিয়েছেন গঙ্গায় ডুবটি দিয়ে আসতে এবং, ফিরে এসে অবশিষ্ট জাগ্রত সময় কাটিয়েছেন রান্নাঘরে ঘুঁটে-কয়লা, শিলনোড়া, বাসনকোসন, তরকারির ডালা আর মাছের চুবড়ি নিয়ে নিত্য ব্যস্ততায় । এইসব পরিবারে বয়স হতে-না-হতে বিবাহিত মেয়েদের দীক্ষা নেওয়া সারা কেননা, 'হাতের জল শুদ্ধ' হওয়া চাই । এরই মাঝখানে নিত্যনিয়মে এসেছে আঁতুড়ঘরের পালা, কখনো সূতিকাঘরে জীবনাবসান। এই মেয়েদের ভিতরে দু-চারজন মেয়ে তিনটে-চারটে ক্লাস ইশকুলে পড়েছে কি পড়েনি ('সত্যবতী'র ছোটমামী পড়েছিল ।) সে প্রশ্ন কতকটা অবান্তর হয়ে যায় কেননা, ইশকুলে যাওয়ার রাস্তা যদি-না কারো কাছে পরিবার বা বাড়ির গণ্ডি পেরিয়ে বাইরের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবার পথ হয়ে উঠতে পারে তাহলে সেই ইশকুলে যাওয়া-না-যাওয়া সমান । পরিবারের গণ্ডি-ঘেরা বাঙালি মেয়ের মন এখনো মূলত পারিবারিকতায় মগ্ন। প্রভেদ এইটুকু যে, সেদিনের বাঙালির মেয়ে বাড়ি-পরিবার বলতে জানতো শ্বশুরবাড়ি এবং স্বামীর আত্মজনকে । বিংশ শতাব্দীতে এই জানা গ্রাহ্য নয় আর । পরের ঘরের ভাষ্য শিরোধার্য করার বদলে নিজের জন্মদাতা পিতাকে আত্মস্থ, অঙ্গীকৃত করে সেই আদর্শ-মানুষটিকেই পরিবার ও মূল্য-ভাবনার শীর্ষস্থানে রাখার চেষ্টাতেই শুরু হয়েছে 'সত্যবতী'র আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম । এই একই সংগ্রাম ছিল 'কুমু'র-ও পিতৃপ্রতিম ভাইকে শিরোধার্য করে ('যোগাযোগ', রবীন্দ্রনাথ), কিন্তু 'কুমু' আর 'সত্যবতী'র মাঝখানে বড়োবাড়ি আর মাঝারিবাড়ির বেড়া । এই বেড়ার ভিতরে উভয়েই একা ঘোরে নিজ-নিজ পরিবারবৃত্তে, যেখানে তাদের মন ভরে যেত যদি স্বামী দুইজন হয়ে উঠতে পারতো তাদের আদর্শ পিতা বা পিতৃপ্রতিম পুরুষের মতো মহৎ এবং দৃঢ়, আসক্তিবিহীন ভালবাসায় সুন্দর । 'সত্যবতী'র একটা বড়ো কৃতিত্ব এই যে, নিজের আদর্শ-পিতাকেও হঠাৎ হঠাৎ অনিবার্যভাবে পুরুষশ্রেণীর প্রতিভূ বলে দেখতে পেয়েছে 'সত্যবতী'। এতে খেদ বেড়ে যায় তার । এই খেদই ইন্ধন জোগায় মেয়েদের সম্ভাব্য মুক্তির জন্য পথ খুঁজে যেতে যাতে 'হাজার হাজার সুবর্ণ'কে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যায় । এইরকম মুক্তিপথ-অনুসন্ধানী মেয়েদের চোখ দিয়ে দেখলে ১৮৭০-এর কলকাতা ১৯৭০-তুল্য অগ্নিগর্ভময় বোধ হতে পারে । আর সেই অগ্নিগর্ভ-সময়কে চিনতে না পেরে রীতিনীতি-প্রথা দিয়ে সেই সময়কেই চিরন্তন করে ধরে রেখেছিল যেসব মধ্যবিত্ত পরিবার তাদেরই ভিতরকার কথা যে বলেন আশাপূর্ণা দেবী এটা চোখে পড়ে । একটু বেশি স্পষ্টস্বরে বললেন এই প্রথম 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-তে । প্রতিশ্রুতি দিলেন স্পষ্টতর সীমারেখা টেনে দিয়ে যাবার । ইতিপূর্বে তিনি বলে যাচ্ছিলেন শুধু ভিন্নস্বাদী গল্প খুবই অবলীলাক্রমে । অহেতুক করুণ, কাতর ব্যাকুলতাকে প্রশ্রয় দেননি তিনি; মেয়ে হয়েও বাঙালির কান্নাতে কান না দিতে চাওয়ায় সম্পাদক এবং

প্রকাশক (যাঁরা সবাই পুরুষ) অভিভূত হয়ে থাকবেন; আশাপূর্ণা দেবীর রচনার চাহিদা বাড়তে থাকে । এজন্য (তিনি বলেন) তাঁকে কোনো চেষ্টা করতে হয়নি । কাহিনীর সন্ধানে তেমনি কাঁহা কাঁহা মুল্লুক ঘুরেও ফেরেননি তিনি । হাতের কাছে, কোলের কাছে, যা আছে তাই— চিরুনি, কাটারি-জাঁতি, বিকেলের কুঁচোনো কাপড়, রান্নাঘরের বাসি উনুন এসব থেকেই পেয়ে গেছেন তিনি গল্পকথা বলবার রশদ । বাংলায় যে-ঘরোয়া সংলাপ তাঁর চবিত্ররা সেই সংলাপে অভ্যস্ত । কলহ বিবাদে সেই সংলাপ সূচিমুখ কিন্তু 'পড়তে বেশ লাগে' (বলেন তাঁর প্রিয় পাঠক-পাঠিকা) । এই পড়তে-বেশ-লাগা থেকেই সম্ভবত জন্ম নিয়েছে এইরকম ধাবণা যে আশাপূর্ণা দেবী 'মিষ্টি' গল্প লেখেন । মিলনান্তক তাঁর গল্প । এই ধাবণাকে বলা যায় ভিত্তিহীন । "ছিন্নমস্তা ", "ছায়াসর্য " এমনি অজস্র গল্প লিখেছেন যে-কাহিনীকার তাঁকে মিলনান্ত রসের রসিক বলা ঠিক নয় । তবু-যে এই কথাটা চালু হতে পেরেছে তাব একটা কারণ হয়তো এই যে, আশাপূর্ণা দেবীর কলমে বিবহ বা ব্যর্থতায় কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতা অনাবৃত হলেও কাঁটা থাকে না কোথাও যেটা নির্ভুল বিঁধবে কোনোখানে ।

অ্যালিস ওয়াকারের কলমে সজারুর কাঁটা ভর্তি । এদিক ফিরতে ওদিক বেঁধে । মিলন না বিরহ এসবের চেয়ে আরও মৌলিক যে বেঁচে-থাকার প্রশ্ন, মানুষের মতো বেঁচে-থাকার সেই প্রশ্ন ফিরে ফিরে আসে অ্যালিসের কলমে—কবিতায় এবং গদ্যে । সেক্ষেত্রে কিছুটা শক্তই ঠিকঠাক নিষ্কণ্টক থাকা । শ্বেতকায়, সম্পদবান জনগোষ্ঠী যেখানে 'ব্রাহ্মণ', সেই সমাজে অব্রাহ্মণ কৃষ্ণকায়গোষ্ঠীর পরিবারের কন্যা অ্যালিস ওয়াকার। তরুণ-বয়সে " আমরা অতিক্রম করে যাবো " গাইতে গাইতে নাগরিক স্বাধীনাধিকার আন্দোলনে লড়েছেন এবং লড়তে লড়তে জেনেছেন, নিচুর ভিতরেও আরো নিচু, সবচেয়ে নিচু কালো মেয়েবা । অব্রাহ্মণেতর মেয়েদের কথা তাঁর প্রতিবাদী সাহিত্যসৃষ্টিতে ঠেলা দিয়েছে এভাবেই । তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে উচ্চশিক্ষার সুবিধা সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এমন নয়, কিন্তু তিনি জানেন এই বঞ্চনার চেহারা । এদের ভাবনা, ভয়, অসহায় রাগ এদেরই বাগভঙ্গি দিয়ে লিখে দেন তিনি । বাগভঙ্গির এই নির্বাচনে আশাপূর্ণার সঙ্গে অ্যালিসের দুস্তর প্রভেদ । আশাপূর্ণা দেবীর চরিত্ররা সকলেই ব্যাকরণসম্মত ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে । অ্যালিসেব অনেক চরিত্র যেন ব্যাকরণ বানায় । সেই নির্মাণের মধ্য দিয়ে তারা সত্য হয়ে ওঠে ; রক্তমাংসে রাগে আর লজ্জায় ওঠে বসে, পাঠককে জানায় তারাও আছে , এই পৃথিবীতেই আছে যেমন থাকে স্বপ্ন আর, স্বপ্ন-ভেঙে-যাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে ।

অ্যালিস ওয়াকারের মূল্যবান গ্রন্থ 'দ্য কালার পার্পল' যেমন, বলা যায়, অ্যালিসের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তেমনি আশাপূর্ণার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-ত্রয়ী । উপন্যাসটির তিন খণ্ড সমান নজর টানেনি সকলের, কিন্তু এরা পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত, এদের প্রথম পর্বের উপস্থাপনা থেকেই সেকথা স্পষ্ট । তাঁর ছোটো গল্প এবং ছোটোদের গল্প লেখার যুগে যে-উজ্জ্বল পরিহাসের ভঙ্গিটি আশাপূর্ণাকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল সেই পরিহাসী মনের ভিতরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ কাজ করছিল । সেই প্রতিবাদী মনের আক্ষেপ ও আবেগগুলিকেই এই তিনপর্বে খোলাখুলি খেলতে দিয়েছেন আশাপূর্ণা । রসরঙ্গ এখানে তেমন বেশি নেই । গম্ভীরভাবে গভীর কথাকে আপনি না হেসেই বলার চেষ্টা রয়েছে।

এই চেষ্টা তাঁর পক্ষে হয়তো শ্রমসাধ্য। হাসিখুশি মানুষ তিনি। তিনি তাই বলেন, উপন্যাস লেখার চেয়ে ছোটোগল্প, বিশেষত ছোটোদের গল্প লিখতেই আনন্দ হয় তাঁর ; উপন্যাস লেখা শেষ করে মনে হয় একটা কাজ সারা হলো। তবু এই 'কাজ' তিনি অন্তত ওই 'ত্রয়ী'-র বেলায় মনপ্রাণ দিয়ে সেরেছেন, একটু একটু বাঁকাহাসি এলোমেলো এড়াতে পারেননি। অ্যালিসের মেজাজে নেই এই হাল্‌কা হাসি। একটা অভাব সেটা 'কালার পার্পল'-এর। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (বাংলা ১৩৭১ সন) প্রকাশের পরেই রবীন্দ্র-পুরস্কার পায় বছরের মাথায়। তেরো বছর পরে যখন আশাপূর্ণা জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাচ্ছেন তার বছর চারেক আগে বাংলা ১৩৮০ সনে এই ত্রি-পর্ব উপন্যাসমালার শেষপর্ব 'বকুল-কথা'ও প্রকাশিত। সম্প্রতি যে ক্রমশ-প্রকাশ্য হিন্দি কথাচিত্র চলছে দূরদর্শনে 'প্রথম-প্রতিশ্রুতি'কে ভিত্তি করে এটা কোনো বড়ো খবব নয়। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনীভিত্তিক বহু চলচ্চিত্র ইতিপূর্বে হয়েছে ও পরেও, মনে হয়, হবে কিন্তু বড়ো কথা এই যে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' এনেছে 'সত্যবতী'-র কথা, পুরনো দিনের তেজি মেয়ে অথচ এখনো যার ভাবনায় ভাষায় আজকের বৃহদংশ বাঙালি মেয়ের মনে সাড়া তোলে : 'আমি 'সত্যবতী'। এই ত্রয়ী-তে জন্মপরম্পরাসূত্রে তিন প্রধানা কন্যার প্রথম 'সত্যবতী' (মা) দ্বিতীয় 'সুবর্ণলতা' (কন্যা) ও শেষ 'বকুল' (দৌহিত্রী)। 'সত্যবতী' ইতিপূর্বেই এই প্রবন্ধে রীতিমতো উল্লেখ পেয়েছে। 'সুবর্ণ' মায়ের মেয়ে, কিন্তু পিতামহীর হাতের পুতুল হয়ে জীবন শুরু হয় তার। এই মেয়ের হালছাড়া ব্যর্থতার কথা এসে শেষ হয় 'সুবর্ণ'-কন্যা 'বকুল'-এর "অনামিকা" কাহিনীতে। 'বকুল' লেখিকা। বর্তমানকালে সে উপস্থিত এবং আগ্রহী। কোনো বাহ্য প্রতিবাদ না-করেও, অন্য কারো হাতের পুতুল না-হয়েই স্বপ্রতিষ্ঠ, একা পেয়ে গেছে আত্মপ্রকাশের পথ। কিন্তু সেকি যথার্থই তার আত্মপ্রকাশ? লক্ষণীয় এই পর্বে, 'বকুল' শুধু-যে ছদ্মনাম্নী তা-ই নয়, যেন অনস্তিত্ব হয়ে থাকে সে নিজবাসভূমে পরবাসী—চিরদিন অতিথির মতো। লিখতেও বসে সে ঠিক নিজের কথা বলবে বলে নয় পরন্তু নিজেকে ভুলে থেকে কিছু কথা কাব্য কাহিনীর সাজি ভরে সকলের ভালোবাসা প্রসন্নতা পাবার আগ্রহে। ইশকুলে 'পদ্য' লিখে পটু, তাই তরুণ বয়সে বকুল নিজেরই প্রণয়ীর বিয়ের পদ্য লিখে মহত্ত্ব এবং সুনাম সংগ্রহ করে প্রণয়ীর মায়েব আগ্রহাতিশয্যে। এই 'বকুল'-এ পৌঁছে অতঃপর সেই 'সত্যবতী' হারিয়ে যায়, যে-'সত্যবতী' কোনো এক বউ-পেটানোর প্রতিবাদে তার প্রথম নিজস্ব ছড়াটি বেঁধেছিল, শিখিয়েছিল সেই ছড়া পাড়ার ক্ষুদে দলটিকে যাতে সেই অত্যাচারী 'জটাদা' লজ্জায় মরে। বকুলের নেই এই প্রতিবাদী বোধ, থাকলেও সে শেখাতে পারতো না কাউকেই প্রতিবাদের ভাষা। একজন জনপ্রিয়, প্রতিষ্ঠিত কথাকার হয়ে সে দলছাড়া। সে কি কখনো 'সত্যবতী'-র মতো বলে উঠতে পারে : 'তোমাদের ভয় এত কিসের বলতে পার?' ('প্রথম প্রতিশ্রুতি' পৃ ৩২) 'বকুল' জেনেছে মিষ্টি হাসিমুখ রাখতে জানলেই মিত্র মেলে, আর সজ্জন মিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে জনপ্রিয়তার সিঁড়ি ভাঙাই যাবে না। 'সত্যবতীর'-র নারীমুক্তির অনুসন্ধান ঠিক জনপ্রিয়তার অভিমুখে ছুটেছিল কিনা এ-প্রশ্ন বকুল তুলে ফেলতে যায় না। তার প্রশ্ন সমাজের, জীবনের গরমিল নিয়ে। 'বকুল' গবাক্ষে বসে দেখে জনপ্রবাহকে—দাবিদাওয়া, বিক্ষোভ, তর্জন—অশান্তি পায় ; উঠতি লেখিকাদের ভালোমন্দ নানান লেখার রাশি রাশি স্তূপ জমে তার কাছে, বিপন্ন বোধ করে। এদের

কারো সঙ্গে আন্তরিক সংযোগ নেই তার কোনোখানে। ঘর ঘরই নয় তার অথচ বাহিরও তার পর।'পারুল'-বোনটির কাছে ছাড়া মন খুলতেই পারে না 'বকুল'; কেবল 'পারুল'ই জানে 'বকুল'-এর ভাগ্যরাতের তারা 'নির্মল'। অবশেষে পারিবারিক বৃত্তের ভিতরে স্নেহভাগী ভ্রাতুষ্পুত্রী অনেক কৈশোরপ্রেমের খেলাধুলোর পর্ব পেরিয়ে যখন যথার্থ দুঃখী-তবু-বীর্যবান একটি পুরুষকে নিয়ে আন্তরিক মমতায় ঘর বাঁধে তখন 'বকুল' বোধ করে সার্থকতা : এই একটি মেয়ের মতো মেয়ে তবে হয়েছে বাপের বংশে 'বকুল'-এর। 'সত্যবতী'-র খুব বড়ো হার এখানেই। এইখানে তার প্রতিবাদী জীবনের শেষে এসেই কালো মেয়ে 'সেলি'-র জিত, অ্যালিসের উপন্যাসের নায়িকা 'সেলি', হারিয়ে ফের ফিরে-পাওয়া সন্তানদের মাঝখানে মনের তারুণ্যে দৃপ্ত 'সেলি'।

পুরুষ-আদর্শের রজ্জুতে মেয়েদের মন বাঁধা হয়ে গেলে এই পৃথিবীতে 'মেয়ে-মানুষের জন্মানোর দরকার'-কে ঠিক ধবা যায় না এ কথা 'সেলি'কে জানতে দেখি উপন্যাসটি খানিকটা এগোতেই। 'সেলি' দেখতে পায় 'সোফি' এবং আরো বহু ভিন্ন তবু একটাই পথের পথিক নারীকে, যারা অচেনা অন্ধকারে চলছে ওরই সঙ্গে। সহোদর বোনটিই যদিও 'সেলি'-বও নিকটতম সখী কিন্তু সেই সূত্রে পারিবারিক বৃত্তের ভিতরে মন আবদ্ধ হয় না তার। বরং বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে চলে যায় মন একই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে। স্বামী বা সংসারসুখ নয়, আরো ভিন্ন, সত্য পরিচয় 'সেলি' নিজের জন্য নিজে পেয়ে যায়। নজর করা দরকার, 'সত্যবতী'-র কাছেও বৃত্তান্তর ভাবনা ও সংযোগের অবকাশ এসেছিল মেয়েলি ব্রতের সূত্রে, যেখানে পুরুষ-প্রাধান্যের প্রতিকারে মন্ত্রের শক্তির খোঁজ চলে; বাপ 'রামকালী'-র তীব্র ধিক্কারে কুণ্ঠিত 'সত্যবতী' ধরতে পারেনি সেই সুতো। 'রাসুদা'-র দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে নিয়ে যখন 'সত্যবতী'-র বাবাকেই আড়ালে দুষছে বাড়ির মেয়েরা, তাদের মেয়েলিপণার তীব্র তিক্ত সহযোগ ঠিকমতো দুই হাতে মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগও ব্যর্থ গেছে। এরপরে কলকাতা শহরে এসে যখন ব্রাহ্ম-হয়ে-যাওয়া শিক্ষকের সহায়তায় 'সত্যবতী' স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে বাইবের হাওয়ায়, তখনও তাকে দেখা যায় না মেয়েদের বৃত্ত খুঁজে পেতে। বালিকা-বধূহত্যার প্রতিকারকল্পে সে নিজেই চিঠি লেখে (সাহেব) পুলিশকে, আশা করে নিজের ছেলেরাই তার পাশে দাঁড়িয়ে তারই মতো বলবে সেই সাহেবকে যে, ন্যায়নিষ্ঠ সভ্য মানুষ হিসেবে তোমরা এই নির্যাতন এবং অন্যায় দূর করো। কিন্তু নিজে ইশকুলে সে যাদের পড়ায় তাদের সঙ্গে সংযোগের কোনো উদ্যম যেমন দেখা যায় না তার, তেমনিই অন্যদিকে বাইরের সব সম্ভাব্য এবং আয়ত্তগম্য বৃত্তগুলি 'সত্যবতী'র কাছে অচেনা, অজানাই রয়ে যায়। 'সত্যবতী' প্রশ্নের উত্তর পেতে খোঁজে কেবল নিজের বাবাকেই। এই 'সত্যবতী' অতঃপর 'বকুল'-এ ঝরলে খুব বেশি হয়তো অসঙ্গত হয় না। আশাপূর্ণার এই উপস্থাপনায় বরং বেশ পরিচ্ছন্ন ধরা পড়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়ের স্বাধিকার-ভাবনায় আত্মদ্বিধাদীর্ণতার ছবি। প্রকৃত প্রস্তাবে সেদিক থেকেই 'প্রথম-প্রতিশ্রুতি'-ত্রয়ী অসামান্য মূল্যবান দলিলের তুল্য হয়েছে। এই দলিল কালো মার্কিন-মেয়ের স্বকীয়তালাভের ইতিকথার থেকে ভিন্ন সাক্ষ্য দেবে, এটা স্বাভাবিক।

যেখানে দাঁড়িয়ে সমবেত ভাবনা ভাবলে নিচুতলার মেয়ে আর উচ্চকোটির মেয়েরা পরস্পর-সম্বন্ধতায় নারীমুক্তি-চিন্তাকে এদেশে একটি পূর্ণ অবয়ব দিতে পারতো, সেই

মধ্যবিত্তস্তরে দাঁড়িয়েই 'সত্যবতী' পিতৃপুরুষের আদর্শ-নির্দেশ খুঁজেছে ; চেয়েছে পিতা এবং পরবর্তীকালে স্বামী-পুত্রের হৃদয়ের এবং উদ্যোগের পরিবর্তন । কখনো প্রশ্রয়ে পুলকিত, কখনো ধিক্কারে বিচলিত সেই 'সত্যবতী'-র মুক্তিপথ অনুসন্ধান অবশ্যই তাকে ব্যক্তিগত মহিমা দান করেছে । পূর্বদেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত মহিমা ব্যাপারটি অত্যন্ত মানানসই । তেমনি মানানসই ভাবেই আমাদের দুটি-চারটি মেয়ে উজ্জ্বল (কিংবা, মাটো) হয়ে এসেছেন এতাবৎ (কে না জানে গার্গী, মৈত্রেয়ীকে !) । যে-ব্যবস্থাপনায় মেয়েদের মানুষ হিসেবে পুরোপুরি দেখতে পাওয়া 'রামকালী'-র মতো সজ্জন ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব, সেই একই ব্যবস্থাপনাতে একটুও আঁচড় না-ফেলে, থেকে থেকে একটি কি দুটি রমণীকে আজও শিরোমণি করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা শক্ত নয়, করা হয়েই থাকে । 'সত্যবতীর'-র ঘরের 'বকুল' যে এই পাকে ধরা পড়েছে সে এজন্যই স্বাভাবিক । 'বকুল' সম্মানিত । যদি তার কোথাও কোনো অব্যবস্থিত ভাবনা থাকে, সে তার বাল্যের প্রেম, মৃদু, চারু, অনতিভাষিত । সে যে প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিক 'সে' হয়ে উঠল না, 'বকুল' হয়ে ওঠাই বাকি রয়ে গেল তার (এবং অন্য মেয়েদেরও) এ কথাটা 'বকুল' ওই সম্মানের খাঁচায় বসে ধরতে পারে না তো ।

এইরকম সত্তাহীন নয় কালো-মেয়ে । 'সেলি', 'নেটি', এমনকি সদ্যো-মার্কিন-কালোর ঘরে এসে-পৌঁছানো আফ্রিকার 'টাসি'-ও নয় । পশ্চিমী সাদা সংস্কৃতি-পরিবৃত হয়েও অ্যালিস খুব শক্ত হাতে তুলে নিয়ে ধরতে পেরেছেন কালো-নারীশক্তির শিকড় । সে জগতে অশরীরী সত্তা আসে, ছুঁয়ে যায় এবং সাহায্য করে আজকের জগতে অত্যাচারে বিড়ম্বিত মানবশরীরে আস্থা জাগিয়ে তুলতে। যে-আস্থার জোরে পূর্বদেশে, পশ্চিমে, সব মেয়েরাই হয়তো কোনোদিন, একদিন কাটিয়ে উঠবে সেই অবস্থা যেখানে নাকি 'সব মেয়েমানুষের মুখে দেখি এক 'রা', 'মরব', 'মরছি', 'মরণ হয় তো বাঁচি' ।' (পৃ ৭৮, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি')। নির্যাতিত 'সেলি'র যেমন এক জনমেই জন্ম-জন্মান্তর ঘটে যায়, তেমনি নবজন্ম পাবে সমস্ত মেয়েরা।

যে-কালে 'সত্যবতী'-কে ন্যস্ত করেছেন আশাপূর্ণা, ঐতিহাসিকভাবে সেই কালেরই ধারে-কাছে বেঁচেছিলেন রাসসুন্দরী—যাঁর জীবনকথায় পড়া যায় কীভাবে শ্বশুরঘরে পরবাসী মনটিকে তিনি বালিকাবয়স থেকেই ভরে তুলেছিলেন ব্যক্তিগত ঈশ্বর-বিশ্বাসে। তাঁর লেখাপড়া শেখার অসাধ্যসাধনেও তিনি বল পেয়েছিলেন এই প্রত্যয়েই। আশাপূর্ণা এরকম বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভিতরে দেখাননি 'সত্যবতী'-কে কিংবা, শেষপর্বের 'বকুল'-কে। উভয়েই নিভৃতক্ষণে ভাবে বিধাতার কথা, যে-বিধাতা ভাগ্যেরই অন্য নাম। কিন্তু ব্যক্তিগত শূন্যতায় যখন 'সত্যবতী'-র পিতৃগৃহে গিয়ে মনে হয় যেন সে এ-বাড়ির কেউ নয় আর, তখনও সে তবে কার ভাবতে গিয়েও কোনো ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি অভিমুখে যেতে দেখা যায় না তাকে। অভ্যাসবশত পূজা দিতে গেছে 'সত্যবতী' (যেমন, যখন 'নেড়ু' এলো) কিন্তু সে ভিন্ন কথা। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভিত্তি খুঁজতে যাওয়ার ব্যগ্রতা তাকে ব্যাকুল করে না, 'বকুল'-কেও নয় । সমাজের নাম, গোত্র, মর্যাদার বানানেই কাজ চলে যায় দুজনের। 'সেলি'-র চলেনি। প্রতিমুহূর্তে তাকে যখন জানতে হচ্ছে যে, সে কেউই নয়, তখনই তার নিজের সত্তায় আস্থা ফেরাতে অ্যালিস নির্দ্বিধায় ঈশ্বরকে উপস্থিত করেছেন কাহিনীতে। প্রেমস্বরূপ ভগবান কিন্তু পুরুষ নয়, সাদা নয়; সে হচ্ছে বর্ণময়

বিশ্বপ্রকৃতি। —ফুল কিংবা একটুকরো পাথর, যা ইচ্ছে ভেবে নাও—বলে গেছে অ্যালিসের 'শুগ্' । অসামান্য নারী 'শুগ আভেরি'।

'বকুলকথা'য় আশাপূর্ণা এনেছেন 'মাধুরী—বৌ'-কে। এই বৌয়ের আদল পাঠক ইতিপূর্বে তাঁর ছোটোগল্পের পৃষ্ঠায় কোথাও-কোথাও পেয়ে থাকবেন। সম্পূর্ণ অসূয়াশূন্য, অপূর্ব সুন্দরী বৌ 'বকুল'-কে মুগ্ধ করে, আপন করে, কিন্তু নিজে ঘরকরনা করে মরে যাওয়া ছাড়া আর কী যে করে জানা যায় না কোথাও। ভালো বৌ হয়ে থাকা ব্যতিরেকে আর কিছু করবার কি নেই মেয়েদের? এ প্রশ্নের উত্তর মেলে না 'মাধুরী-বৌ'য়ের কাছে। আর, এই 'মাধুরী-বৌ'য়ের প্রসঙ্গেই অ্যালিস এবং আশাপূর্ণার একটি ব্যাপক মিল ও গরমিল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুজনেরই কথা শেষ হয় ভালবাসায়। 'শুগ' এবং 'সেলি'; 'মাধুরী-বৌ' এবং 'বকুল'। দুটিই ভালবাসা, কিন্তু বানান কী অসম্ভব ভিন্ন এই দুয়ের । প্রথম জুটির ভালবাসা জীবনেই স্বতন্ত্র স্বাদ এনে দেয় আর, দ্বিতীয়টি মেলে এক মৃত্যুকে শিয়রে রেখে সকলের চোখের আড়ালে।

উল্লেখপঞ্জী :

প্রবন্ধে উদ্ধৃত পৃষ্ঠাসংখ্যা মিলবে : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', চতুর্বিংশ মুদ্রণ, ১৩৯২, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

আশাপূর্ণার ছোটোগল্প প্রসঙ্গে 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'স্বনির্বাচিত গল্প' ও 'গল্প-পঞ্চাশৎ' বিশেষভাবে দেখে নেওয়ার মতো।

প্রাসঙ্গিক পাঠ্য : "Attitude towards Women -Writers and Women's self image" নবনীতা দেবসেন, pp. 110-120, *Role and Status of Women in India* Firma KLM, 1978.

শান্তনু দাশগুপ্ত

ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষার উৎস-সন্ধানে

অন্যান্য বিষয়ের গবেষকদের মতো ভাষাবিজ্ঞানীরাও সাধারণত নিজের থিওরি বা মতামতকে সত্যের চাইতেও বেশি মূল্য দিয়ে থাকেন। সত্যি কথা বলতে কি বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করা প্রাসঙ্গিক ও অর্থপূর্ণ তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পরে সেই নিখুঁত ছবি বা মডেল রূঢ় বাস্তবের চাইতে অনেক সময়ই প্রিয় হয়ে ওঠে। এবং অন্য মতগুলিকে বুদ্ধিভ্রংশজনিত বা ঈর্ষাপ্রসূত অপপ্রচার বলে মনে হতে থাকে। ইতিহাস-সংক্রান্ত গবেষণায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম বলে এই বিষয়গুলিতে মতভেদের সম্ভাবনা ও তীব্রতা দুইই পরীক্ষা-নির্ভর বিজ্ঞানের চাইতে অনেক বেশি। বিবর্তনবাদ, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি ইতিহাসভিত্তিক বিষয়গুলির 'বৈজ্ঞানিক' সিদ্ধান্তগুলিতে তথ্যের চাইতে কবিকল্পনার অংশ কম নয়। চমকপ্রদ তথ্য ও তার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে আমরা এই কল্পনার অংশটুকু সম্বন্ধে সচেতন থাকি না। গবেষকেরাও তাঁদের কর্মধারার এমন একটা শীতল, আবেগবর্জিত, যুক্তিভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরেন যে তথ্য ও অনুমানে মেশানো ছবিটা যে সমসাময়িক প্রযুক্তি ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডিতে বাঁধা মডেলমাত্র তা ভুলে গিয়ে আমরা সেটাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করে থাকি। তবে মাঝে মাঝেই নতুন আবিষ্কৃত তথ্য এবং ভাবনার আঙ্গিকে বহুদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত, পণ্ডিত-সমাজে মেনে নেওয়া ধারণাও টলমল করে ওঠে এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদ ধর্মের অচলায়তনে অশ্মীভূত হবার আগেই ধূলিসাৎ হয়। সত্যসন্ধানে কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তি নিন্দনীয় নয়।

ভাষাবিজ্ঞানে সর্বাধুনিক কালাপাহাড় হলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ কলিন রেনফ্রু। ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষার আদি উৎস ও ইয়োরোপ-এশিয়া-আফ্রিকায় তাদের বিস্তারের গতিপথ ও বিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে বহুল-প্রচলিত ধারণাগুলিকে নাকচ করে পণ্ডিত-সমাজে তর্কের ঝড় তুলেছেন। ইয়োরোপের ভাষাগুলির আদি ইতিহাস নিয়ে মতবিরোধ ছিলই, এর উপরে ভারত-পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের ভাষাগুলির সঙ্গে তাদের নিকট আত্মীয়তা বেরিয়ে পড়বার পর থেকে আইসল্যাণ্ড থেকে শ্রীলঙ্কা অবধি এই বিশাল বৈচিত্র্যময় অঞ্চলের প্রায় সবাই কি করে এবং কবে ভাষার নকশিকাঁথার অংশ হয়ে উঠল তা নিয়ে কলহের অন্ত নেই। এই ঝগড়ার পুরোটাই অবশ্য আবেগহীন, তথ্যভিত্তিক বিচার নয়। সভ্যতার অভিব্যক্তি হিসেবে ভাষা ও কৃষ্টি অভিন্ন এবং ভাষার প্রাচীনতা গৌরবময় ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। পুরনো দিনের জাত্যভিমানী ইয়োরোপিয় পণ্ডিতদের পক্ষে নিজেদের ভাবগঙ্গার গঙ্গোত্রী যে এশিয়ায় বা 'অন্ধকার' আফ্রিকায়, সেটা মেনে নেওয়া শক্ত হয়ে পড়ত।

ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষার বিস্তার সম্বন্ধে সবচেয়ে পরিচিত ও বহুলপ্রচলিত ধারণা

অনুযায়ী ব্রোনজ্ বা তাম্রযুগের গোড়ার দিকে কৃষ্ণসাগরের উত্তরে স্তেপ অঞ্চল নিবাসী এক যাযাবর গোষ্ঠীর ভাষাই হলো আদিভাষা। অশ্বারোহী যোদ্ধার দল সেখান থেকে দিগ্বিদিকে বিজয় অভিযানে বেরিয়ে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বের বিশাল অঞ্চলগুলিতে নিজেদের আধিপত্য ও ভাষার প্রতিষ্ঠা করে । এই ভাষাই বর্তমান ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষার আদি পূর্বপুরুষ, উর (Ur) ভাষা বলে স্বীকৃত। বহু শতাব্দী ধরে আঞ্চলিক বিবর্তনের ফল হলো বিস্মৃত আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা আজকের ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষাগুলি। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী ও পুরাতাত্ত্বিকদের মধ্যে যাঁরা এই ট্র্যাডিশনাল ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তুলেছেন তাঁদের পুরোধা হলেন ডঃ কলিন রেনফ্রু। রেডিও কার্বন-ডেটিং বিশেষজ্ঞ এই ভদ্রলোক ব্রিটিশ ও গ্রীক দ্বীপপুঞ্জে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করে প্রাচীন প্রস্তরযুগীয় ভগ্নস্তূপ এবং অবসিডিয়ান (আগ্নেয়শিলার টুকরো) মুদ্রার মাধ্যমে বাণিজ্যিক লেনদেন পদ্ধতির বিশারদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন , কৃষ্টি বা সভ্যতার প্রসার সম্বন্ধে নিজের পুরাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সঙ্গে ইয়োরোপে ভাষা বিস্তারের ইতিহাস মেলাতে গিয়ে প্রচলিত ধারণায় আস্থা হারিয়েছেন। তার বদলে ভাষা ও কৃষিপদ্ধতির পরস্পরাশ্রয়ী, যৌথ প্রসারের এক সম্পূর্ণ নতুন মডেলের অবতারণা করেছেন। তার বিশদ বিবরণ যাঁরা চান তাঁদের ডঃ রেনফ্রুর 'প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষা : ইন্দো-ইয়োরোপিয়দের আদিরহস্য' *(Archaeology & Language: The Puzzle of Indo-European Origins,* A. Colin Renfrew, Cambridge University Press, 1988) বইটা পড়তে হবে ।

সংক্ষেপে, ডঃ রেনফ্রুর মতে কৃষ্ণসাগরের উত্তর থেকে হঠাৎ ধেয়ে আসা বিশাল বিজয় অভিযানের মাধ্যমে ইন্দো-ইয়োরোপিয় সভ্যতা ও ভাষার বিস্তার এক কষ্টকল্পিত মডেলবিশেষ, যাতে যুক্তিপ্রমাণের চাইতে কবিকল্পনার অংশ বেশি । কৃষিজীবী সমাজের শান্তিপূর্ণ ক্রমবৃদ্ধি ও উন্নতির এক স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই সারা ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় মানবসভ্যতার ধীরগতি, অব্যাহত প্রসার ঘটেছে । যে উন্নততর কৃষিপদ্ধতিকে আশ্রয় করে এই ক্রমবিকাশ ঘটেছে তার উৎস কৃষ্ণসাগরের উত্তরের স্তেপ অঞ্চল নয়, বরং দক্ষিণের আনাতোলিয়া অঞ্চলে (অধুনা তুর্কিদেশের ভিতরে) এবং আরও পূর্বাঞ্চলে ছড়ানো । ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষার আদিরহস্যের এই সমাধান সত্যি প্রমাণ হলে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার উৎসমুখ ইয়োরোপ থেকে এশিয়ায় সরে আসছে । তার চাইতেও বড়ো কথা হলো : যাযাবর যোদ্ধার বদলে মাটি আঁকড়ানো চাষীর জীবনবেদ আধুনিক সমাজের মূল্যবোধের আদি ভিত্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে । তবে ইয়োরোপিয় ও আধুনিক মানবসভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে পুরনো প্রচলিত ধারণাগুলির আমূল সংস্কার করবার আগে এই বৈপ্লবিক মতামতের সমর্থক তথ্য ও যুক্তিগুলির বিশ্লেষণ দরকার, এবং তার জন্য ভাষাবিস্তারের এযাবৎ মেনে নেওয়া ব্যাখ্যার প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক সমর্থনগুলি বোঝা দরকার।

ইন্দো-ইয়োরোপিয় সভ্যতার আদি নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ভাষাবিদ্ বা শব্দতাত্ত্বিকেরা ইয়োরোপিয় ভাষাগুলির মধ্যে শব্দার্থ, ব্যাকরণ ও উচ্চারণগত মিল লক্ষ করবার পর থেকে । বিভিন্ন ভাষায় এক থেকে দশ অবধি সংখ্যার নামগুলি তুলনা করলেই ইয়োরোপিয় ভাষাগুলির নিজেদের মধ্যে ও সংস্কৃতের সঙ্গে মিল ও দূরপ্রাচ্যের ভাষা,

'চীনে/জাপানি'র সঙ্গে গরমিল স্পষ্ট হয়ে ওঠে

বাংলা	সংস্কৃত	ল্যাটিন	গ্রীক	প্রাচীন জর্মন	সুইডিশ	ইংরেজি	চীনে	জাপানি
এক	এক (একস্)	উনুস	হেইস	আইনস্	এত্/এন্	ওয়ান	ঈ	ইচি
দুই	দ্বি (দ্বা)	দুয়ো	দুয়ো	তহবাই	তহ্বো	টু	এর্	নি
তিন	ত্রি (তৃয়স্)	ত্রেস্	ত্রেইস	থ্রিয়া	ত্রে	থ্রি	শান	সান
চার	চতুর্ (চত্বরস্)	কোয়ার্ত্তূ	তেত্তারেস	ফিদহ্বোর	ফ্যিবা	ফোর	সি	শি
পাঁচ	পঞ্চ	কিংকে	পেনতে	ফিম্ফ্	ফেম	ফাইভ	হু	গো
ছয়	ষড়্	সেক্স্	হেক্স্	সাঈস	সেক্স্	সিক্স	লিউ	রোকু
সাত	সপ্ত	সেপ্তেম	হেপ্তা	সিবুন	শ্যিউ	সেহ্বেন	ক্কি	হাচি
আট	অষ্ট	অক্টো	অক্তো	আতাউ	ওত্তা	এইট্	বা	নিচি
নয়	নব	নেহ্বেম	এন্নেযা	নিউম	নিও/নিয়ে	নাইন	জিউ	কিউ
দশ	দশ	দেসেস	দেকা	তাইহুম	তিয়ে	টেন	শি	জিউ
ভারতীয় ভাষাপরিবার		ইয়োরোপিয় ভাষাপরিবার					দূরপ্রাচ্যের ভাষাপরিবার	
ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষাগোষ্ঠী								

শব্দগত মিল থেকেই ইয়োরোপিয় ভাষাগুলিকে বিভিন্ন পরিবারে ভাগ করা হয়েছিল। ফরাসি, ইতালিয়, স্প্যানিশ, পোর্তুগীজ এবং রোমানিয়ন সবচেয়ে প্রথমে ল্যাটিন বংশজাত রোমানস্ পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য হলো। পরে এর সঙ্গে স্লাভ (রুশ, চেক, পোলিশ, সার্বো-ক্রোয়েট ও বুলগারিয়ান) এবং জর্মনিক (জর্মন, সুইডিশ, নরওয়েজিয়ন ও ডেনিশ) পরিবার যোগ করে যে বৃহত্তর ভাষাগোষ্ঠী তৈরি করা হলো, অল্প কয়েকটা ব্যতিক্রম ছাড়া (হাঙ্গেরিয়ান, বাস্ক ও ফিনিশ) প্রায় সমস্ত ইয়োরোপিয় ভাষাই তার মধ্যে শামিল হলো। প্রাক্-রোমান কেল্ট্-এর সঙ্গে রোমান্স্ ও জর্মনিক ভাষার মিশেলে তৈরি ইংরেজিকে সোজাসুজি একটা পরিবারে ফেলা শক্ত হ'লেও সেটা বৃহত্তর গোষ্ঠীর ভিতরেই পড়ে। সারা ইয়োরোপ জুড়ে সম্পর্কের নাড়িতে বাঁধা আলাদা ভাষাগুলির বিচিত্র নকশা গড়ে উঠল কি ক'রে সেই ইতিহাসের ব্যাখ্যানেই ভাষাতত্ত্বের শুরু। রোমান্স্ ভাষাগুলির মিল সহজেই ল্যাটিন-জানা পণ্ডিতদের চোখে পড়ত বলে এই ভাষাপরিবারই প্রথম মডেল হিসাবে কাজ করে। ফরাসি, ইতালিয়, স্প্যানিশ ও পোর্তুগীজ যে একই আদিবংশজাত সেটা ল্যাটিন না জানলেও আন্দাজ করা শক্ত নয়। ভাষাবিদেরা এদের অন্তর্নিহিত মিলগুলির বিশ্লেষণ থেকে সেই আদিভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। এইভাবেই প্রাক্-ইন্দো-ইয়োরোপিয় (Proto-Indo-European) ভাষার এক ছবি, অসম্পূর্ণ হ'লেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুণসম্পন্ন, তৈরি হলো। এই আদিভাষীরা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়বার পরে ভৌগোলিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা প্রত্যেক অঞ্চলের ভাষাকে নিজস্বতা দিয়েছে ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা শেষ অবধি পরস্পরের দুর্বোধ্য, আলাদা ভাষায় পরিণত হয়েছে—অনেকটা যোগছিন্ন ভিন্নাঞ্চলবাসী স্বজনের মতো। এক আদিভাষাকে মূল হিসেবে ধরে ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষাগুলির এক সামগ্রিক বংশপরিচয় (Family Tree) প্রথমে সুস্পষ্টভাবে গড়ে তোলেন জর্মন

ভাষাবিদ্ আউগুস্ত শ্লাইশর (August Schleicher) ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। সময়ের সঙ্গে শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃতি পেয়ে এক ভাষার বহু ভাষায় বিবর্তিত হবার এই ছবি ভাষাবিদ্দের চিন্তা বা বিশ্লেষণার এক মূল কাঠামো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও শ্লাইশরের মডেল যে ভাষাবিস্তারের একমাত্র সম্ভাব্য পথ নয় সেটা খানিকটা চিন্তা করলে ধরা পড়ে। সমাজবিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা বাদ দিলেও (ভাষার বিবর্তনে সমাজতত্ত্ব টেনে আনা আধুনিক ঘটনা) শ্লাইশরের মডেলের একেবারে বিপরীতমুখী ছবি দিয়ে ভাষার সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্যর ব্যাখ্যা সম্ভব। এক আদি কেন্দ্র হতে বিকীর্ণ হবাব বদলে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন উৎসজাত ভাষা স্বেচ্ছায় (বাণিজ্যিক প্রয়োজনে) বা বাধ্য হয়ে (সামরিক আধিপত্যে) ঘনিষ্ঠ সংসর্গে কিছুদিন কাটাবার পরে তাদের মধ্যে যে শব্দবিনিময় ঘটবে, তার প্রভাব প্রথমে অত্যন্ত সীমিত হলেও সময়ের সঙ্গে ঢিল-ফেলা পুকুরের ঢেউয়ের মতো তা চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে, সমার্থক শব্দের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে একেবারে আলাদা গোত্রের দুই ভাষাতেও কিছুদিন পরে মিল দেখতে পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ ভৌগোলিক বা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা-উদ্ভূত বিকীর্ণতার বদলে রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রয়োজনে এককেন্দ্রমুখিতাই ভাষা-বিবর্তনের মূল কারণ হতে পারে। শ্লাইশরের শাখা-প্রশাখা মেলা বৃক্ষ-মডেলের দশ বছরের ভিতরে এই তরঙ্গায়িত প্রসারের মডেল পেশ করেন আর একজন জর্মন ভাষাবিদ্ য়োহানেস্ শ্মিট (Johannes Schmitt)। এই দুই মডেল নিয়ে বহু তর্ক হয়ে গিয়েছে, তবে এটুকু আন্দাজ করা শক্ত নয় যে স্থানকাল বিশেষে, ঐতিহাসিক কাবণে, এই দুই সম্ভাব্য পথের যে কোনোটার মাধ্যমেই বা দুইয়ের মিশ্রণে ভাষার ধীরগতি পরিবর্তন ঘটতে পারে। আধুনিক ভাষাগুলিতে দুইয়ের উদাহরণই প্রচুর। উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলিকে আদি সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষার সন্তান বলে ধরা যায় — উচ্চারণভঙ্গি, শব্দার্থ ও বাক্যরচনার তফাতগুলি আঞ্চলিক বিবর্তনের ফল। দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলিতে দ্রাবিড় ও সংস্কৃতের দীর্ঘ সহবাসের প্রভাব লক্ষ করা যায় — বাংলা ও পূর্ব ভারতীয় ভাষাতেও এরকম সহবাসী বিবর্তনের প্রভাব কম নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ইয়োরোপে এবং সারা পৃথিবীতেই দৈনন্দিন ব্যবহারে বহু ইংরেজি শব্দ আপনিই ঢুকে পড়েছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও (রক) সঙ্গীতের মাধ্যমে। ইংরেজিভাষী আমেরিকার অর্থবলে বলীয়ান প্রচার-মাধ্যমের দুনিয়াজোড়া প্রভুত্বের ফলে মানবসভ্যতার আত্মপ্রকাশের আধুনিক ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইংরেজি—ফরাসি, জর্মন, সুইড, ইতালিয়দের এ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই।

পুরনো দিনেও ভাষার জগতে এরকম প্রভুত্ব যে ঘটেনি তা মনে করবার কোনো কারণ নেই। সে-সময় অবশ্য বেশিরভাগ অর্থনৈতিক বা কৃষ্টিগত প্রভুত্ব আসত অসিধারে অথবা বর্শাফলকে। অর্থাৎ ভাষাবিবর্তনের আলোচনা শব্দ বিশ্লেষণাতেই থেমে থাকতে পারে না— সমাজের ইতিহাসে এসে পড়তে বাধ্য। ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষার আদি উৎস-সন্ধানে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়ে পড়তে হয় ; তখন একমাত্র অবলম্বন প্রত্নতত্ত্ব। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা ধ্বংসাবশেষ থেকে রোমান, গ্রীক, গল, কেল্ট্দের খ্রিস্টপূর্ব দু-হাজার বছর আগেকার ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে আসছিল। পুরাতত্ত্বের সেই স্বর্ণযুগে মনে হয়েছিল ইন্দো-ইয়োরোপিয় জাতির আদি

মানুষের খোঁজ পাওয়া তার মুখের ভাষা জানবার চাইতে সহজতর হবে । সেইসময় থেকেই প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ভাষার আদি-সন্ধানে যোগ দিতে শুরু করেন । ইতিহাস ছাড়িয়ে প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীন প্রস্তরযুগ অবধি পৌঁছলে প্রাক্-ইন্দো-ইয়োরোপিয়ভাষীদের সভ্যতার আদি পরিচয় প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের মধ্যে আপনিই ধরা দেবার কথা । পুরাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মূলসূত্র হিসেবে যে ধারণাগুলি কাজ করছিল, তা হলো :

১. ভাষাগত বা কৃষ্টিগত পরিবর্তন সমস্ত জাতি বা গোষ্ঠীবিশেষের মিলিত পরিভ্রমণ বা বিচরণের পরিণাম-বিশেষ এবং এই ভ্রমণপথে কুড়িয়ে বা খুঁড়ে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র ইত্যাদি থেকে সভ্যতার দেশকালে যাত্রাপথের এক প্রাথমিক বর্ণনা পাওয়া সম্ভব ।

২. স্মারক বস্তুগুলির এক এক বিশেষ ধরনের সমাবেশ জাতি বা গোষ্ঠীবিশেষের উপস্থিতির প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে ; অর্থাৎ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ধরে খুঁজে পাওয়া ভ্রমণপথকে আদি ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষার পদচিহ্নিত যাত্রাপথের প্রামাণ্য ছবি বলে ধরা যেতে পারে । ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষার আদি-সন্ধান এইভাবে ইন্দো-ইয়োরোপিয় জাতির আদি বাসস্থানের সন্ধান ও ওদের ভ্রমণপথের অনুসরণে পর্যবসিত হলো । শব্দের প্রাচীনতার চাইতে ইট, কাচ, মাটির ভাঁড় ও ধাতব বস্তুর বয়স স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও কম তর্কসাপেক্ষ ।

সেটা অবশ্য খুব শিগগিরই ভুল প্রমাণ হলো । তর্ক শুধু যে বেড়ে গেল তা নয়, তর্কটা শুদ্ধ পাণ্ডিত্য থেকে অতীত দেশগৌরবের খোঁজে নেমে এল । জর্মন পণ্ডিতেরা প্রায় এক শতাব্দী ধরে চেষ্টা করে গেলেন যাতে ইয়োরোপিয় জাতির আদিবাসস্থান উত্তর ইয়োরোপের কোথাও থাকে । পাণ্ডিত্যের নির্মোকে ঢাকা অপ্রামাণ্য ইচ্ছেগুলিই জর্মন জাতীয় দল (নাৎসি পার্টি) তাদের সরকারি মতামত হিসেবে গ্রহণ করল । উচ্চ নাসা, নীলাক্ষি পিঙ্গলকেশী আর্যপ্রভুদের ভাষাই হয়ে দাঁড়াল আদি ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষা । সেমিটিক (মধ্যপ্রাচ্য) গোষ্ঠীর ভাষাগুলি হীন, বর্বর দাসদের ভাষা হিসেবে বর্ণিত হলো । ভাষাবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের এই বীভৎস অপপ্রয়োগের রেশ নাৎসি জর্মনির পরাজয়ের পরেও বহুদিন পর্যন্ত পণ্ডিতমহলে স্বাস্থ্যকর, অনাবেগ আলোচনায় বা বিতর্কে বাধার সৃষ্টি করেছে ।

ইয়োরোপের সাধারণ পণ্ডিতসমাজে কিন্তু ইন্দো-ইয়োরোপিয়দের আদি নিবাস হিসেবে উত্তর ইয়োরোপ খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি । লণ্ডনের রয়্যাল অ্যানথ্রপলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের গর্ডন চাইল্ড় (Gordon Childe) ১৯২৬ সালে তাঁর 'দ্য এরিয়ানস' (*The Aryans*) বইয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে কৃষ্ণসাগরের উত্তরের স্তেপ অঞ্চল ছিল আজকের ইয়োরোপিয় জাতিগুলির আদি বাসভূমি । নব্য প্রস্তরযুগ ও তাম্রযুগের মাঝামাঝি কোনো একটা সময়ে, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগে, সেখান থেকে দলে দলে বেরিয়ে তারা ইয়োরোপের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে । চাইল্ডের বক্তব্যে পুরাতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব দুরকম যুক্তিই ছিল— দ্বিতীয়টা উদ্ভাবনী শক্তিতে চমকপ্রদ । নানা ভাষার মিলগুলি আহরণ করে ভাষাবিদেরা ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষার যে মৌল শব্দতালিকা তৈরি করেছিলেন, চাইল্ড় সেটাকে আদিভাষার অপরিবর্তিত অংশ হিসেবে ধরে অনুপস্থিত বা পরে সংযুক্ত নতুন শব্দগুলিকে বিভিন্ন ভাষার আদিধারা থেকে বেরিয়ে আসবার সময়-

নির্ধারণের কাজে লাগালেন। যেমন, লোহা ও তামা শব্দতালিকায় অনুপস্থিত অথচ অশ্ব ও চক্রের উল্লেখ বহুল। সুতরাং ছড়িয়ে পড়বার আগে, প্রাক্-ইন্দো-ইয়োরোপিয়ভাষীরা ঘোড়া পোষ মানিয়েছিল ও চাকাওয়ালা গাড়ি ব্যবহার করত ; লোহা বা তামার ব্যবহার এসেছে পরে। এই ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণগুলির সঙ্গে চাইল্ড্ পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ যোগ করতে থাকলেন—পরস্পরের পরিপূরক এই দুই অনুসন্ধানপদ্ধতির মিলিত যাত্রা শুরু হলো চাইল্ডের পৌরোহিত্যে। নানা জায়গার প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে তাম্রযুগের আরম্ভের সময়কার এক বিশেষ ধরনের মাটির পাত্র (ভেজা অবস্থায় দড়ি বা সুতো চেপে ডিজাইন করা) পাওয়া যাচ্ছিল। পূর্ব ও উত্তর ইয়োরোপে মাটির ঢিবির ভেতর এই মৃৎপাত্রগুলির সঙ্গে পাওয়া যেত যোদ্ধাদের কুঠার। এজাতীয় ঢিবির রাশিয়ান নাম 'কুরগান' ; এগুলিকে প্রাচীন সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের কবর বা স্মৃতিসৌধ (Burial Mounds) বলে ধরা হয়। চাইল্ডের মতে তাম্রযুগের প্রথমদিকে যেসব যাযাবর অশ্বারোহী যোদ্ধার দল কৃষ্ণসাগরের উত্তরে তাদের আদিবাস ছেড়ে নানাদিকে যাত্রা করেছিল, এই ঢিবিগুলিতে রয়েছে তাদের নেতাদের দেহ ও পার্থিব সম্পত্তির অবশেষ; অর্থাৎ 'কুরগান' যোদ্ধারাই হলো আদি ইন্দো-ইয়োরোপিয়। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে এই মতটা মেনে নেওয়া হয়েছে এবং পুরাতাত্ত্বিকেরাও এই বিবরণ মূলত সত্য বলে ধরে নিজেদের আবিষ্কারগুলি কুরগান অভিযানের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লস এঞ্জেল্স-এর মারিয়া গিমবুটাস (Mariya Gimbutas) চাইল্ডের আদি প্রমাণগুলির সঙ্গে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলি যুক্ত করে কৃষ্ণসাগরের উত্তর থেকে কুরগান আক্রমণের ঢেউ পশ্চিমের দুয়ারে আছড়ে পড়বার এক বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার সঙ্গে সাজিয়েছেন।

কুরগান অভিযানের বিপক্ষে সবচেয়ে সোচ্চার হলেন ডঃ কলিন রেনেফ্রু। চাইল্ডের দেওয়া কুরগান ঢিবির ব্যাখ্যা ওঁর মতে এমন কিছু প্রত্যয়ব্যঞ্জক নয়। দীর্ঘ অভিযানের পথে খসে পড়া যোদ্ধানেতার স্মৃতিস্তম্ভ হবার বদলে ওগুলি হয়তো স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর জমিদারদের কবর। এমনকি মৌলিক শব্দতালিকার যুক্তিও সেরকম শক্ত গাঁথুনির নয়। শব্দগুলির আদি অর্থ হয়তো সময়ের সঙ্গে বদলেছে কিছুটা; তাদের আদি উৎসের ভৌগলিক সীমানা খুব একটা নির্দিষ্ট নয়। শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়বার আগে আদিভাষার অভিধানে ঘোড়া বা চাকার উল্লেখও তাহলে তর্কসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কুরগান অভিযানের থিওরির দুর্বলতম অংশ হলো এই দলবদ্ধ সামগ্রিক অভিবাসনের কারণ সম্বন্ধে নীরবতা – আর সেটাই হলো ডঃ রেনফ্রুর অনাস্থার মূল ভিত্তি। প্রস্তরযুগের শেষে হঠাৎ দলকে-দল যোদ্ধা ঘোড়ায় চেপে পশ্চিমে যাত্রা করবে কোন উদ্দেশ্যে ? বা কেন? জনসংখ্যার যেরকম বিস্ফোরণ দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী মানুষকে বাড়িঘর ছেড়ে অজানার পথে ঠেলে বার করে, স্তেপ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ চারণভূমিতে সেরকম জনবৃদ্ধির কারণ কল্পনা করা শক্ত। সুতরাং যদিও ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে চাইল্ড-গিমবুটাসের কুরগান-অভিযান-কাহিনীর সুষ্ঠু পরিচ্ছন্নতা আকর্ষণীয়, বিশ্লেষক সমালোচকের কাছে তার ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তির অভাবটা একটু বেসুর বাজতে বাধ্য।

সত্যকথা বলতে কি প্রাচীন সমাজের ভাব-ভাবনা, মুখের ভাষা ও তার বিবর্তনের বিশ্লেষণ, সমাজ-ইতিহাস বা নৃতাত্ত্বিক ভাবনার সঙ্গে না মেলালে, শুধুমাত্র পুরাতাত্ত্বিক

চিহ্ন বা লিপি থেকে সম্পূর্ণতা পেতে পারে না। প্রত্নতত্ত্বের গবেষকরা উপলব্ধি করছেন যে খুঁড়ে পাওয়া জিনিসপত্রের সমাবেশকে বিশেষ এক গোষ্ঠীর বা তাদের কৃষ্টির প্রতিভূ হিসেবে ধরে নিয়ে এক সহজ সমীকরণের ভিত্তিতে যেসব প্রাগৈতিহাসিক জাতির শ্রেণীবিভাগ ও সংজ্ঞা তাঁরা স্থির করেছেন, সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসের আঙ্গিকে সেগুলির পুনঃ-পরীক্ষা প্রয়োজন। স্বভাবতই সেই সংজ্ঞায় ভর দিয়ে দাঁড়ানো একমাত্রিক ভাষা-ইতিহাস কার্ডবোর্ডের কেল্লার মতোই অবাস্তব। নতুন বহুমাত্রিক বিশ্লেষণে প্রত্নতাত্ত্বিক চিহ্নাদির সঙ্গে সে-যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মিল খুঁজতে হবে, সেই সঙ্গে জীবিকার বিবর্তন জীবনযাত্রায় ও দৈনন্দিন ভাষায় তার ছাপ রেখে যায় কিভাবে সেটাও বুঝতে হবে। নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিবরণ পরস্পরবিরোধী না হলে তবেই সেই মডেল বা বিবরণকে আস্থার সঙ্গে খানিকটা গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে।

কোনো এক অঞ্চলে ভাষাবিবর্তনের চার রকম পন্থা অধুনা-স্বীকৃত। ১. সহজতম হলো জনশূন্য অঞ্চলে মানুষের আদি উপনিবেশ গড়ে তোলা — প্রথম আসা মানুষের ভাষাই সেই অঞ্চলের ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। ২. যোগাযোগছিন্ন নিঃসঙ্গ স্বতন্ত্রতার মধ্যেও জীবনযাত্রার বিবর্তন ভাষাতে শ্লথগতি পরিবর্তন আনে– নতুন উদ্ভাবনা বা প্রযুক্তি নতুন শব্দের জন্ম দেয়, পুরনো অব্যবহৃত শব্দ লোপ পায়। এইভাবেই এক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ভৌগোলিক কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে কালে ভিন্ন-ভাষী হয়ে ওঠে (শ্লাইশরের মডেল)। ৩. ভিন্ন গোষ্ঠীর মিলনে তাদের ভাষার সমকেন্দ্রিক বিবর্তন ঘটে (শ্মিটের মডেল)। চতুর্থ পন্থাটি শ্মিটের মডেলের এক পরিবর্তিত রূপ এবং সবচেয়ে ব্যাপক বলে আধুনিক ভাষাবিদ্‌দের ধারণা। ৪. আংশিক বিনিময় মডেল। গণ-অধ্যুষিত অঞ্চলে নবাগত জাতি প্রতিষ্ঠা পাবার পরে অধিবাসীদের ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার আংশিক বিনিময় ঘটে এক চিত্র-বিচিত্র ভাষার সৃষ্টি করে। ভাষাবিবর্তনের অন্য মডেলগুলির সঙ্গে বিনিময় মডেলের তফাৎ হলো এর দ্রুততা। নতুন বৃত্তি, প্রযুক্তি, যুদ্ধকৌশল, রাজনীতি, সমাজসংগঠন ইত্যাদি নিয়ে আসে নতুন শব্দভাণ্ডার এবং তা সামগ্রিকভাবে পুরনো ভাষার অংশবিশেষকে প্রতিস্থাপিত ও বিস্তৃত করে। ফলে, অল্পসময়ের মধ্যেই নতুন প্রজন্মের এক নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়।

আধুনিক কোনো ভাষাই শুধুমাত্র একটা বিশেষ উপায়ে সুষ্ঠু পরিচ্ছন্ন পথে বিবর্তিত হয়নি। যুগে যুগে সভ্যতার বিভিন্ন স্তর থেকে আসা ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংঘাত ঘটেছে নানা ঐতিহাসিক কারণে। তাদের ভাষায় সেই বাঞ্ছিত/অবাঞ্ছিত মিলনের ছাপ রয়ে গিয়েছে। এই বিনিময়ের জটিলতাটুকু না থাকলে শুধুমাত্র বিকেন্দ্রিক ও সমকেন্দ্রিক বিবর্তনের পথ ধরে ভাষাগুলির আদি উৎসে পৌঁছানো যেত। কিন্তু ইন্দো-ইউরোপিয় ভাষার উৎস সন্ধানে ভাষাগত বিনিময় বাদ দেওয়া অসম্ভব। প্রাচীন প্রস্তরযুগ থেকে নানা জাতি বা গোষ্ঠী অবিচ্ছিন্ন ধারায় ইয়োরোপে এসেছে, কখনও আগ্রাসক হিসেবে, কখনও-বা আশ্রয়ের খোঁজে। বহুবার বহু গোষ্ঠী ইয়োরোপের ভিতরেই তাদের বাসস্থান পালটেছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা প্রাকৃতিক কারণে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ইয়োরোপিয় জাতিগুলির এক আদি জনক/জননী বা এক আদিভাষার খোঁজ করাও অর্থহীন। বহু জাতির, বহু ভাষার মিলনের এক ঘন বুনোটের মধ্যে লুকিয়ে আছে ভাষার

ইতিহাস ; যত্নের সঙ্গে সেটা খুলে মূল সূত্রগুলির পরিচিতি স্থির করতে হবে। তার আগে বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর মিলন বা সংঘাত ভাষাকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা বোঝা দরকার। পশুচারণ, শিকার ও আহরণ-বৃত্তি, চাষ-বাস অথবা শিল্পপণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্য—এর যে-কোনো এক বা একাধিক জীবিকাকে আশ্রয় করে এক স্থায়ী অর্থনীতি-নির্ভর সমাজ গড়ে ওঠে। খাদ্যবস্ত্রাদি জোগাবার ক্ষমতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও একটা স্থির সীমা অবধি বাড়তে থাকে এবং শেষ অবধি সেই অঞ্চলের জনবৃদ্ধির হার উৎপাদনক্ষমতার সঙ্গে একটা ভারসাম্যে পৌছায়। প্রযুক্তিগত বিপ্লব বা বহিরাক্রমণ না ঘটলে এই অবস্থা অনির্দিষ্টকাল অবধি স্থায়ী সভ্যতা হিসেবে চলতে পারে। এক বিশেষ জীবিকার সীমিত উৎপাদনক্ষমতায় থেমে থাকা, বহুযুগ ধরে স্থায়ী জনসংখ্যার আদিম সভ্যতার একক উদাহরণ সারা পৃথিবী জুড়েই পাওয়া গেছে। আধুনিক মানুষ তার কৌতূহল, পরোপকারস্পৃহা, লোভ ও সর্বগ্রাসী খিদে নিয়ে তাদের জীবনযাত্রা ওলট-পালট করে দেবার আগে পর্যন্ত এই স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎগুলি এক নির্দিষ্ট জনসংখ্যা সীমিত কিছু জীবিকার সাহায্যে বহুদিন অপরিবর্তিত রেখেছিল। তাদের ঐতিহ্য ছিল বংশপারম্পর্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, অটল। ভাষার চেহারাও ছিল মোটামুটিরকম অপরিবর্তিত। পরিবর্তন আসে যখন উন্নত সামরিক বলে বলীয়ান বাইরের লোকেরা পুরনো সমাজটার কর্তৃত্ব দখল করে। জীবনযাত্রা, ভাষা, জীবিকা ইত্যাদির অদলবদল সহজেই ঘটে যদি উন্নত সমর-কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে সুসংগঠিত সমাজব্যবস্থার ঐতিহ্যও বহিরাগত প্রভুর দল নিজেদের সঙ্গে নিয়ে আসে। বিজিত গোষ্ঠীর নিজস্ব, উন্নত পর্যায়ের সমাজসংগঠন থাকলেও বিজয়ী সমাজের রীতিনীতি গ্রহণে উৎসুক পরাজিত জাতি এক অনুকারী সভ্যতার সৃষ্টি করে; এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে ইয়োরোপিয় প্রভাব লক্ষ করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নতুন জীবনযাত্রার প্রয়োজনে নতুন ভাষা যে গড়ে ওঠে আধুনিক বাংলাব ইতিহাস তার এক ভালো উদাহরণ। ভারত-ভূমির সমস্ত ভাষাতেই এরকম সংঘাত বা মিলনের ছাপ পরিষ্কার : দ্রাবিড়-আর্য ; হিন্দু-আরব/পারসিক; ভারতীয়-ইংরেজ/ফরাসি/পোর্তুগীজ/ওলন্দাজ ইত্যাদি। প্রাক্‌দ্রাবিড় যুগে যে এরকম সংঘর্ষ ঘটেনি তা মনে কববার কারণ নেই। আদি বাসিন্দাদের সামাজিক বা ঐতিহ্যগত দৃঢ় সংহতি না থাকলে অবশ্য বাইরের আগ্রাসনের মুখে তাদের রীতিনীতি, ভাষা, ঐতিহ্য সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়– যেমন হয়েছে এবং আজও হয়ে চলেছে আমেরিকায় মায়া, আজটেক ও ব্রাজিলিয়ান জঙ্গলের অগুনতি আদিবাসী সভ্যতা; অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডে অ্যাবরিজিনরা; ভারতে, বার্মায় বহু পাহাড়ী, সাঁওতাল ও আদিবাসীর দল। তাদের ভাষা হয়ে দাঁড়ায় স্প্যানিশ, পোর্তুগীজ, ইংরেজি অথবা হিন্দি।

কৃষ্টি বা ভাষার অদলবদলের আর একটা বড়ো ও শান্তিপূর্ণ উপায় হলো বহিরাগত ও আদি বাসিন্দাদের মধ্যে বাণিজ্য বা শিল্প বা প্রযুক্তিগত আদানপ্রদান। সমাজের প্রয়োজন বুঝে সেই ফাঁকগুলি দখলের চেষ্টায় সফল হলে নবাগতদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে এবং তাদের ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রভাব ক্রমেই বাড়তে থাকে। ইহুদিদের আমেরিকায় ও তার আগে ইয়োরোপের নানা দেশে প্রতিষ্ঠালাভ তার সুন্দর উদাহরণ। ভাষা ও কৃষ্টির এইজাতীয় জবরদখলের সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে এলিট ডমিন্যান্স থিওরি (Elite Dominance Theory)। এলিট ডমিন্যান্স ছাড়া অন্য যেসব পদ্ধতিতে

ভাষার বিনিময় / রদবদল চলতে পারে তার একটাতে আদান-প্রদানের ধারা একেবারে উল্টো খাতে বয়। শক্তিশালী কেন্দ্রশাসিত বিশাল অঞ্চলে যখন কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়ে, সীমান্ত প্রদেশগুলি ক্রমেই বাইরের 'বর্বর' জাতির দখলে আসতে থাকে। এই ভাঙন কিছুদিন চলবার পরে ক্রমশ বর্বরদের জীবনীশক্তিতে উচ্ছল ভাষা ও রীতিনীতি আংশিকভাবে ক্ষয়িষ্ণু দরবারি সভ্যতার ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। বিনিময়ের অন্য পদ্ধতিকে ভাষাবদল না বলে ভাষাসৃষ্টি বলা যায়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এক কারবারি ভাষা তৈরি হতে পারে যাতে দুই ভাষা থেকে নেওয়া শব্দের শুধু ধ্বনিগত পরিবর্তন করে এক মিশ্র সহজিয়া রূপ দেওয়া হয়—একে 'পিজিন' (Pidgin) বা মিশ্র বা অশুদ্ধ ভাষা বলা যেতে পারে। পিজিন যখন কিছু অধিবাসীর মাতৃভাষা হয়ে দাঁড়ায়, সেটাকে 'ক্রিওল' (Creole) নাম দেওয়া হয়। ফারসির পিজিন-রূপ যখন ভারতীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা হয়ে দাঁড়ালো তখন থেকে ফারসির ক্রিওল সন্তান উর্দুর জন্ম। পশ্চিম ভারতে গোয়ানিজও ক্রিওল। ইদ্দিশ (Yddish) হিব্রু ও জর্মনভাষার ক্রিওল সন্তান। আমেরিকার লুইসিয়ানায়, ক্যারিবিয়ন ও দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলিতে ফরাসি, ইংরেজি, স্প্যানিশ ও পোর্তুগীজের নানা ক্রিওলাইজড় রূপ দেখতে পাওয়া যায়। জামাইকা-বারবাডোজের দ্বীপগুলি থেকে 'রেগে' (Reggae) সংগীতের ছন্দের সঙ্গে শিল্পে মুক্তি পেয়ে এই মিশ্র ভাষাগুলি ক্রমেই সুপরিচিত হয়ে উঠছে—উর্দু সাহিত্য ও সঙ্গীতে সে উত্তরণ ঘটে গেছে বহুদিন আগে।

ভাষা-বদলের এই মূল পদ্ধতিগুলিকে ইয়োরোপের ইতিহাস ও প্রাক্-ইতিহাসের ঘটনাবলীর সঙ্গে মিলিয়ে ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষাবিবর্তনের নির্ভরযোগ্য ছবি গড়ে তুলতে হবে। কুরগান আক্রমণের মাধ্যমে ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষার প্রসার এলিট ডমিন্যান্স-এর ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হলে দুটো জিনিস অন্তত প্রমাণ করা দরকার : ১. কুরগানরা সামরিক ক্ষমতায় তৎকালীন ইয়োরোপের জাতিগুলির চাইতে শক্তিশালী ছিল ; এবং ২. দু'পক্ষের সমাজব্যবস্থা, ভাষা বা রীতিনীতি পারস্পরিক আদান-প্রদান চালাবার মতো সুসংবদ্ধ অবস্থায় ছিল। এর কোনোটার স্বপক্ষেই সেরকম জোরালো যুক্তি/প্রমাণ পাওয়া যায় না। কুরগানদের যুদ্ধে বা অশ্বারোহণে উৎকর্ষ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। তাম্রযুগের আগে ইয়োরোপের কোথাও সামাজিক স্তরভাগ ছিল কিনা তাতে সন্দেহ আছে ; বরং বেশিরভাগ গোষ্ঠীই অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সাম্যবাদী ছিল বলে মনে হয়—ইদানীং খুঁজে পাওয়া শিকার-আহরণের জীবিকায় থেমে থাকা গোষ্ঠীগুলি অন্তত তাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে এলিট ডমিন্যান্স বা কেন্দ্রশাসিত সুবিশাল অঞ্চলের অবক্ষয়ের জন্য যেরকম সুসংবদ্ধ জটিল সমাজব্যবস্থা দরকার তাম্রযুগের ইয়োরোপে তার অস্তিত্ব কল্পনা করা শক্ত। বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল মূল উপজীবিকার অতি সামান্য অংশ, ফলে পিজিন ভাষা গড়ে উঠবার সুযোগও ছিল না। জীবিকা নির্বাহের জন্য যা কিছু আদান-প্রদান চলত, সম্ভবত সেটা হতো চাষবাসের নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে। এই ধারণার স্বপক্ষে প্রমাণ ও ইয়োরোপিয় ভাষা বা কৃষ্টির প্রসারে কৃষিজীবিকার প্রভাব আলোচনা করা যেতে পারে।

ইয়োরোপে গম ও বার্লির চাষ এবং ভেড়া ও পাঁঠা চরানো আরম্ভ হয় খ্রিস্টপূর্ব সাত হাজার বছর আগে। এই শস্য বা পশু কোনোটাই ইয়োরোপের নয়—বাইরের আমদানি। বংশপরম্পরা খোঁজ করে নিকটতম সম্ভাব্য উৎস পাওয়া যায় তুরস্কের

আনাতোলিয়া অঞ্চলে। এশিয়ার বহু জায়গাতেই গম/বার্লির চাষ ও মেষপালন প্রধান উপজীব্য ছিল কিন্তু আনাতোলিয়ার দুয়ার দিয়েই এরা ইয়োরোপে এসে পৌঁছেছিল। চাষ-আবাদ জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা হৈ হৈ করে বেড়ে উঠতে আরম্ভ করে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কাভালি স্ফোর্জা (Cavalli Sforza)হিসেব করে দেখিয়েছেন যে কৃষিকাজ জীবিকা হয়ে উঠবার পরে ১০ বঃ কিঃ মিঃ প্রতি একজন থেকে বেড়ে পঞ্চাশজন অবধি জনবৃদ্ধি স্বাভাবিক। ফলে চাষ-আবাদী জনতা ক্রমশই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই জাতীয় ডেমোগ্রাফিক গণনা থেকে কৃষিজীবী সমাজের তরঙ্গায়িত বিস্তারের এক মডেল খাড়া করা হয়েছে। প্রতি ২৫ বছর এক পুরুষ (generation) হিসেবে ধরে কাভালি স্ফোর্জা ও আমেরম্যান (Amerman) মনে করছেন ২৫ বছরে একবার অন্তত চাষীঘরের এক ছেলে তার বাবার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি নিজের ক্ষেত-খামার ও ভিটেবাড়ি তৈরি করতে চেষ্টা করবে—দরকার হলে বন কেটে বসত করে। অর্থাৎ ২৫ বছর অন্তর চাষবাসের একটা ঢেউ বসতির বা গ্রামের বাইরের দিকে ছড়াতে থাকবে। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে সে-যুগের জনপদের আকার অনুযায়ী চাষ-আবাদী সমাজের এই তরঙ্গায়িত বিস্তারের গতি স্থির করা হয়েছে গড়ে বছরে ১ কিলোমিটারের সামান্য কম (প্রতি ২৫ বছরে ১৮ কিঃ মিঃ)। অর্থাৎ আনাতোলিয়া থেকে চাষ-আবাদ-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ঢেউ ইয়োরোপের উত্তর উপকূলে এসে পৌঁছতে সময় লাগবার কথা প্রায় দেড় হাজার বছর—পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণাদিও সেই সাক্ষ্য দেয়।

ইয়োরোপে আবাদী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জটিল ইতিহাস যে এই সরল মডেলে সম্পূর্ণ নয়, তা অবশ্য বলা বাহুল্য। বিভিন্ন অঞ্চলে জমির চাষযোগ্যতা, আবহাওয়া, সেই সময়কার বিভিন্ন জীবিকা-নির্ভর সমাজের নানারকম সংগঠন ও নব্যব্যবস্থার প্রতিরোধ ইত্যাদি মিলিয়ে কৃষি-সমাজের অগ্রগতি জটিল করে তুলবে। স্থানীয় বাসিন্দারা নবাগতদের জন্য জায়গা না ছেড়ে দিয়ে প্রতিবেশীদের দেখাদেখি নিজেরাই চাষ-আবাদ আরম্ভ করলে পুরনো সমাজব্যবস্থার কাঠামো, ঐতিহ্যের স্বতন্ত্রতা নিয়ে টিঁকে থাকবে —নতুন বৃত্তি, নতুন ভাবনা, নতুন ভাষার লোক দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে না, বরং সামান্য প্রভাবিত হবে। এইজাতীয় শ্লথ অথচ ব্যাপক সিঞ্চনের মাধ্যমে ভাষা ও কৃষ্টির প্রসারকে অনেক বেশি বাস্তবানুগ মনে করা হয়। কৃষিজীবী সভ্যতার প্রসার ইয়োরোপে প্রথম ঘটেছিল গ্রীস দেশে; সেখান থেকে বলকান রাজ্যগুলিতে, মধ্য ইয়োরোপে ও ইতালিতে তরঙ্গায়িত প্রসার ও ধীর-আস্রবণের মাধ্যমে। যেসব অঞ্চলে স্থানীয় সমাজ কৃষিকাজ নিজেদের মতো করে মানিয়ে নিতে পেরেছিল তাদের মধ্যে ইন্দো-ইয়োরোপিয় গোষ্ঠীবহির্ভূত ভাষাগুলি আজও টিঁকে আছে : স্পেনের বাস্ক ও পুরনো আইবেরিয়ান, স্কটল্যাণ্ডে কেল্টযুগের আগেকার পিকটিশ ইত্যাদি ভাষাগুলি আজ আজব ব্যতিক্রম বলে মনে হলেও হয়তো আদি অধিবাসীদের ব্যাধ থেকে কৃষকে উত্তরণের ছবি থেকে এর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব।

কৃষিকাজের সঙ্গে ভাষা ও কৃষ্টির অনুপ্রবেশের বিশদ বিবরণ যেরকমই হোক না কেন, সমরাভিযান-ভিত্তিক থিওরির সঙ্গে তার মূল কাঠামোর তফাৎ বিস্তর। প্রথমত, বিদেশীরা ইয়োরোপে এসেছিল এশিয়ার আনাতোলিয়া থেকে—স্তেপ অঞ্চল থেকে নয়।

এই অভিবাসন ঘটেছিল প্রায় খ্রিস্টপূর্ব সাড়ে ছ'হাজার বছর আগে— কুরগান অভিযান থেকে কয়েক হাজার বছর পুরনো সে যাত্রাকাল। ঘটনার নেতৃত্ব নিয়েছিল ঘোড়সওয়ার যোদ্ধার বদলে নিরীহ চাষী পরিবার, যারা সমস্ত জীবনকালে অল্প কয়েক কিলোমিটারের বেশি চলাফেরা করবার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাদের সমাজও ছিল সমতাবাদী— অনেকটা ঢিলেঢালা গণতন্ত্রের আদলে গড়া—একনেতৃক দৃঢ় সংগঠনের যোদ্ধা-সমাজ নয় মোটেই। এই মডেল অনুযায়ী রাশিয়ার স্তেপভূমি ও পশ্চিমে ইয়োরোপের পারস্পরিক প্রভাবের চেহারা চাইলড্-গিমবুটাসের থিওবির একেবারে উল্টো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষা ও সভ্যতা রাশিয়া থেকে ইয়োরোপে আমদানি হয়নি, বরং চাষবাসের সঙ্গে পশ্চিম থেকে রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউক্রেন অঞ্চলের পুরনো কৃষিপ্রধান গ্রামে গম ও বার্লির বীজ যে বলকান অঞ্চল থেকে এসেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বলকানের অধিবাসীরা আনাতোলিয়ার শস্য উৎপাদন রীতি পেয়েছিল গ্রীকদের কাছ থেকে— অর্থাৎ 'আদি ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষী' স্তেপ অঞ্চলের লোকেরা যে ভাষায় কাজকর্ম চালাত তা হয়তো কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ থেকে বহু ঘুরপথে গ্রীস ও বলকান অঞ্চল পার হয়ে এসে পৌঁছেছিল।

খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছর আগেকার কুরগান অভিযানের ঘটনা সত্যি বলে ধরে নিলে তাম্রযুগের আরম্ভে ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষার ও লৌহযুগে উত্তর ইয়োরোপে কেল্ট ভাষার আকস্মিক আর্বিভাবের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন। এক রহস্যময় প্রাচীন জাতি কেল্টরা ইন্দো-ইয়োবোপিয়দের বন্যায় নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। ইন্দো-ইয়োরোপিয়দের ইয়োরোপে আবির্ভাব খ্রিঃ পূঃ ৬৫০০ বছর অবধি পিছিয়ে দিলে এই রহস্য-মুক্ত হয়ে ইয়োরোপের ইতিহাস এক ছেদহীন ধারাবাহিকতা লাভ করে। স্টোন হেঞ্জ্ (Stone Henge) ও অন্যান্য মেগালিথিক স্মৃতিস্তম্ভ যারা রেখে গিয়েছে তারা আজকের ইয়োরোপিয় জাতিগুলিব পূর্বপুরুষ, তাদের মুখের প্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপিয় ভাষার এক বিশেষ রূপই কেল্ট। ইন্দো-ইয়োরোপিয় সভ্যতার ইতিহাস তাহলে কৃষিজীবী সমাজের কাঠামোর ভিতরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংঘাত-জনিত ক্রমিক চেহারা-বদলের কাহিনী হয়ে দাঁড়ায়—শুধু বিচ্ছিন্ন কিছু গোষ্ঠী তাদের প্রাক্-ইন্দো-ইয়োরোপিয় চেহারা এখনও জিইয়ে রেখেছে। কোনোরকম বিশাল বহিরাক্রমণের বদলে কৃষিজীবী অঞ্চলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক বা সামরিক বা বাণিজ্যিক আদানপ্রদানই ভাষা ও সমাজবিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি। ইয়োরোপের বাইরেও এই থিওরি সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে শুধুমাত্র আনাতোলিয়াতেই পশুপালন ও কৃষি-কাজের আরম্ভ নয়। মধ্যপ্রাচ্যের পরিধির মধ্যেই অন্তত আরও দুই অঞ্চলে স্বনির্ভর কৃষিজীবী সমাজের অস্তিত্ব ছিল। ভূমধ্যসাগরের তীরে ৫০-১০০ কিঃ মিঃ চওড়া লেভান্ত (Levant; বর্তমান জর্ডন, লেবানন, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন, অধুনা ইজরেল) এবং ইরাকের জাগরোস (Zagros) অঞ্চলে চাষবাস ও পশুপালন-নির্ভর সমাজের অস্তিত্ব ছিল। কৃষি-সমাজের বর্ধিষ্ণুতার ঢেউ লেভান্ত থেকে দক্ষিণে আরব উপদ্বীপ হয়ে পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকায় আর জাগরোস থেকে কৃষিসভ্যতা দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভিতরে বিস্তারলাভ করেছিল বলে কল্পনা করা মোটেই শক্ত নয়। উত্তর সাহারায় কৃষিকাজ এসেছিল ইয়োরোপের সামান্য পরে এবং এই আর্বিভাব ইয়োরোপেরই আদলে ঘটেছিল

বলে ডঃ রেনফ্রুর ধারণা। সারা উত্তর আফ্রিকা জুড়ে আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষার (প্রাচীন মিশরীয়, বেরবের ও আরব অঞ্চলে উদ্ভূত সেমিটিক ভাষার এক মিশ্রণ) প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। লেভানতিন কৃষিজীবী সমাজের ভাষায় প্রাক্-আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষার মূল খুঁজে পাওয়া গেলে এই থিওরির স্বপক্ষে সেটা এক বড়ো যুক্তি হয়ে দাঁড়াবে। জাগরোস থেকে কৃষিসভ্যতার বিস্তার দক্ষিণ ইরান হয়ে পাকিস্তানে পৌঁছবার কথা। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিদ্ ডেভিড ম্যাক-অ্যালপিন (David McAlpin) ইরানের পশ্চিমে খুজিস্তানের ভাষা এলামাইটের (প্রাচীন এলাম রাজ্যের ভাষা) সঙ্গে ভারতবর্ষের দ্রাবিড় ভাষার মিল খুঁজে পেয়েছেন। এলামাইট ও দ্রাবিড়ভাষীদেব পূর্বপুরুষের কাঁধে ভর করে কৃষিসভ্যতার তরঙ্গ ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে এই দ্রাবিড় সভ্যতা আবার অধুনা-প্রচলিত ইন্দো-ইয়োরোপীয় (বা আর্য) সভ্যতা ও ভাষা দিয়ে প্রভাবিত ও প্রতিস্থাপিত হয়ে ভারতীয় ভাষা-সমূহের জন্ম দেয়।

দশ হাজার বছর আগে ইন্দো-ইয়োবোপিয়, আফ্রো-এশিয়াটিক ও দ্রাবিড় ভাষার আদিভূমি যে মধ্যপ্রাচ্যের বা পশ্চিম এশিয়ার কোথাও পরস্পর থেকে সামান্য দূরত্বের মধ্যে ছিল তা এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ প্রকল্পমাত্র। দুই সোভিয়েত ভাষাতাত্ত্বিক ভ্লাদিস্লাভ্ ম. ইলিইচ-স্ভিতিচ (Vladislav M. Iliych-Svitych) ও আরন দোলগোপোল্স্কি (Aron Dolgopolsky) প্রায় কুড়ি বছর আগে স্বতন্ত্র গবেষণার ফল হিসেবে ইয়োরোপিয়, আফ্রো-এশিয় ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর এক যৌথ আদিভাষার অস্তিত্ব ঘোষণা করে তার নাম দিয়েছিলেন নোস্ত্রাতিক (Nostratic) ভাষা। তাঁরাও আনাতোলিয়াকেই নোসত্রাতিকের জন্মভূমি বলে মনে করেছিলেন। রেনফ্রু নিজের সিদ্ধান্তে আসবার আগে এই মতামত সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না. কারণ সোভিয়েত ভাষাবিদ্দের কাজ সবেমাত্র পশ্চিমের পণ্ডিতসমাজে অনুবাদের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছে। তাছাড়া ভাষাগোষ্ঠীর যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব এর আগে রাশিয়াতেও পুরোপুরি স্বীকৃতি পায়নি।

ভাষার মিল ছাড়া বংশগত মিলের খোঁজ করে ভিন্নজাতির বিগত সম্পর্ক বার করা সবেমাত্র জনপ্রিয় হচ্ছে। আধুনিক প্রজননশাস্ত্র (Genetics)ও বংশাণু-বিশ্লেষণ (molecular genetic analysis) থেকে ভিন্নভাষী জাতিদেব সমকেন্দ্রিক উৎসের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালান উইলসন (Alan Wilson) এবং কাভালি স্ফোর্জা বর্তমান আদিবাসীদের রক্তের বর্গবিশ্লেষণ করে তাদের বংশগত নৈকট্যের অনুমান পাবার পন্থা আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ করে তাঁরা দেখিয়েছেন যে আফ্রো-এশিয়, দ্রাবিড় ও ইন্দো-ইয়োরোপিয় গোষ্ঠীর মানুষেরা রক্তের সম্পর্কে বাঁধা। যৌথ ভাষা-পরিবারের অস্তিত্ব তাহলে একেবারে ভিত্তিহীন কল্পনা নয়, এবং চাষবাসের বিস্তার থেকে ভাষাগুলির বিকিরণ, স্থানীয় বিবর্তন ও পরস্পরের সংস্পর্শে মাঝে মাঝে বিনিময়গত রদবদলের ফলেই হয়তো আধুনিক ভাষা-পরিবারগুলির উদ্ভব।

সবশেষে বিশ্বব্যাপী দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাক্-ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠীর ১০-১২ হাজার বছরের ইতিহাস মানুষের সামগ্রিক বিবর্তন ও সমাজ-ইতিহাসের যে সামান্য একটা অংশমাত্র সেটা খেয়াল রাখা দরকার। শরীরগঠনের দিক থেকে আধুনিক মানুষ হোমো স্যাপিয়েন্স্। স্যাপিয়েন্স্-এর আবির্ভাব হবার পর থেকেই যে ভাষাসৃষ্টির আরম্ভ সেটা

প্রায় সমস্ত আধুনিক পণ্ডিতেরাই মেনে নেন—গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসী ছাড়া। ইজরেল ও আফ্রিকার নানা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে মনে হয় প্রাক্-মানব থেকে আধুনিক মননশীল মানুষে উত্তরণ ঘটেছিল প্রায় এক লক্ষ বছর আগে। সেইসময় থেকেই আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেছে আদিমানুষের দল। এই বিস্তারের জৈবিক ও কৃষ্টিগত বিবর্তনের কাঠামোর মধ্যে বর্তমান মানুষের ভাষা ও ভাষাবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে। তার শেষকথা বলা হয়ে গিয়েছে মনে করবার কোনো কারণ নেই। সবেমাত্র ইয়োরোপিয় ভাষাগুলির আদি উৎস সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ থেকে মানুষের ভাষাবিবর্তনেব এক সাধারণভাবে প্রযোজ্য, ব্যাপক থিওরিতে এসে পৌঁছানো গিয়েছে। আনাতোলিয়ার আদি কেন্দ্র হতে ভাষাবিস্তারের যে সহজ ছবি আঁকা হয়েছে, বাস্তবানুগ সম্পূর্ণ বিবরণ তার চাইতে অনেক জটিল হয়ে দাঁড়াবে—তবে কৃষিসভ্যতার প্রসার সেই জটিল ইতিহাসের এক স্থায়ী অংশ হিসেবে থাকবে বলেই মনে হয়।

উল্লেখপঞ্জী :

1 V. Gordon Childe, *The Aryans,* Alfred A. Knopf, Inc., 1926.

2. George Cardona, Henry Hoenisgwald & Afred Senn, *(eds) Indo-European and Indo-Europeans* , University of Pensylvania Press, 1970

৩ Albert J. Ammerman & L.L. Cavali-Sforza, *The Neolithic Transition and the Genetics of Populations in Europe,* Princeton University Press, 1984

4. A. Colin Renfrew, *Archeology & Language . The Puzzle of Indo-European Origins* , Cambridge University Press, 1988

5. Mark Kaiser & V.Shevoroshkin, "NOSTRATIC" in *Annual Review of Anthropology,* vol. 17, pp. 309-329, 1988

6 J.P. Mallory, *In Search of the Indo-Europeans . Language, Archeology & Myth* , Thames & Hudson, 1989.

অরুণ দাশগুপ্ত

প্রাচীন ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা বিস্তার : হিন্দু ঔপনিবেশিকতা ও ভান্ ল্যেয়রের মতামত

এক

প্রাচীনকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার একটি সুপরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনা । ভারতবাসীমাত্রেই এ নিয়ে গর্বিত । ১৯৭৯-তে জাকার্তার ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অতিথি অধ্যাপকের কাজ নিয়ে গিয়েছিলাম। সে-সময়ে লক্ষ করেছিলাম ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার অতীত সম্পর্কের প্রসঙ্গ ওদেশের মানুষের কাছে কিছুটা অস্বস্তিকর । ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতিতে ভারতীয় উপাদান এত সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত যে এই প্রভাবের কথা অস্বীকার করা সম্ভব নয় । অনেক শিক্ষিত ইন্দোনেশিয়ান সরাসরি মেনে নেবেন ভারতের সঙ্গে ঐ দেশের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের কথা । কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁরা কোনো ভারতীয়ের কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছু শুনতে পছন্দ করেন না । তাঁরা ধরে নেন যে ভারতীয়রা আসলে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে আগ্রহী ; প্রকারান্তরে বোঝাতে চায় যে সুদূর অতীতে সংস্কৃতিতে অনগ্রসর ইন্দোনেশিয়ায় ভারতই প্রথম সভ্যতার প্রবর্তন করেছিল । খুব সঙ্গত কারণে ইন্দোনেশিয়ার দিক থেকে একটা প্রতিবাদ আকার নিতে থাকে ; উপস্থাপিত হয় এমন তত্ত্ব যে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে ভারতীয় প্রভাব বিস্তারলাভ করবার আগেই গড়ে উঠেছিল তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তা । এই মত অনুসারে ভারতীয় সংস্কৃতির উপাদানগুলি ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করার ফলে শুরু হয়েছিল স্থানীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে এক ধরনের ঘাত-প্রতিঘাত । এর থেকেই জন্ম নিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার মিশ্র সংস্কৃতি, যার মৌল উপকরণগুলি স্থানীয় এবং স্বতন্ত্র ।

বোঝা যাচ্ছে উভয়পক্ষের চিন্তার ভিতরে কাজ করে চলেছে প্রচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদ। ইন্দোনেশিয়ার স্বজাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য দেখানো দরকার যে ওদেশের সংস্কৃতির মৌলিকতা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত । অন্যদিকে ভারতের জাতীয় গৌরববৃদ্ধির জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে একদা আমাদের ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পরীতি দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল । খেয়াল করা উচিত ভারতে জাতীয়তাবাদী পরিমণ্ডলের মধ্যেই শুরু হয়েছিল 'বৃহত্তর ভারত' আন্দোলন এবং কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Greater India Society (১৯২৬) । প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে জাতীয়তাবাদী কাঠামোর মধ্যে থেকে ভারত-ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ইতিহাস বোঝা যাবে কি ? ইতিহাসের যে পর্যায়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত-প্রভাবিত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল সেই যুগে (অর্থাৎ খ্রিস্টিয় প্রথম থেকে তেরো শতক পর্যন্ত) কিন্তু জাতীয়তাবাদ ছিল না । 'নেশন' বলতে যা বুঝি তার উদ্ভব হয়েছে বিশ্ব ইতিহাসের আধুনিক পর্বে ।

ষোল শতকের আগে তার অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। প্রাচীনকালে ভারত একটি নেশন-স্টেট্ হিসাবে প্রতিবেশী নেশনগুলিকে প্রভাবিত করেনি। তখনকার সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পটভূমিকা ছিল ভিন্ন। দক্ষিণ-পূর্বের দেশগুলিতে ভারতীয় প্রভাবের স্বরূপ বুঝবার জন্যে তাই সঠিক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত খুঁজে নিতে হবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন সংস্কৃতির প্রকৃতি বিচারে একটি ভারত-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা আমরা স্বাভাবিক মনে করি। বর্মা ও থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, মালয় এবং ইন্দোনেশিয়াতে ভারতীয় সভ্যতার উপকরণ এত বেশি পরিমাণে ছড়িয়ে আছে যে পণ্ডিতেরা ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চল বাদে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে এক 'ইণ্ডিক্' সংস্কৃতিক্ষেত্রের অংশ বলে ধরে নিয়েছেন। উক্ত অঞ্চলে ভারতীয় লিপির প্রচলন, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিলালিপির আবিষ্কার, রাজতন্ত্র ও অনুশাসনের ক্ষেত্রে মানবধর্মশাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যচিন্তার প্রভাব, বৌদ্ধধর্মের বিস্তর, সর্বোপরি ভারতীয় শিল্পশৈলী অনুসারে নির্মিত ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শনগুলি এই মত সমর্থন করে। ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাকাতেই আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। এতে কোনো দোষ দেখি না। বহির্বিশ্বে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসারের গৌরবময় কাহিনী অবশ্য ভারতীয়রা বিস্মৃত হয়েছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুসন্ধানের ফলে এই অধ্যায়টি পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে। শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নয়, সিংহলে, আফগানিস্তানে, মধ্য এশিয়ায় এমনকি সুদূর চীন, জাপান, কোরিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির দিগ্বিজয়ের ইতিহাস ইউরোপিয়রাই আগে লিখেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাঁদের প্রাচ্য-সংস্কৃতিচর্চার অন্তর্গত।

'গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি' গঠিত হবার অনেক আগে দেখা দিয়েছিল বৃহত্তর ভারতের ধারণা। বস্তুত ভারতের জাতীয় আত্মসচেতনতার উম্মেষের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। সকলেরই মনে পড়বে স্বদেশীযুগে দ্বিজেন্দ্রলালের গান :

> একদা যাহার বিজয়সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়
> একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়
> সন্তান যার তিব্বত চীনে জাপানে গঠিল উপনিবেশ...

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় স্বদেশী যুগ অতিক্রান্ত হবার আগেই লেখেন ভারতীয়দের সমুদ্রযাত্রার প্রাচীন ইতিহাস। ভূমিকার তারিখ থেকে বোঝা যায় যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল ১৯১০ সালে। রাধাকুমুদ দাবি করেছেন যে প্রাচীনকালে সমুদ্রচর ভারতবাসী পেগু, কাম্বোডিয়া, জাভা, বোর্নিও এবং জাপানে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল। বাণিজ্যসূত্রে ভারতীয়রা বসতি স্থাপন করেছিল দক্ষিণ চীন ও মালয়ে, আরব ও পারস্যের শহরগুলিতে এবং পূর্ব আফ্রিকার উপকূল বন্দরগুলিতে।

একই বিষয়ে পড়ুন নগেন্দ্রনাথ বসুর রচিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' ("বৈশ্যকাণ্ড") :

'...কিয়াওচৌ...উপসাগরের চতুঃপার্শ্বে প্রায় ৬৮০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সমুদ্রযাত্রী ভারতীয় বণিকগণ ব্যবসা উপলক্ষ্যে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তত্রত্য চীনের সামন্তরাজগণ তাঁহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। বর্তমান য়ুরোপীয়

বণিককুলের ন্যায় প্রাচীন ভারতীয় বণিককুলও সাহস ও শক্তিপ্রভাবে তথায় রাজ্য পত্তনে সমর্থ হইয়াছিলেন ।...আরব সমুদ্র হইতে চীনসমুদ্র পর্যন্ত সকল বন্দরে তাঁহাদের গতিবিধি ছিল । তাঁহারা সকলেই হিন্দু' (৬১-৬২ পৃ) ।

লেখক দাবি করেছেন যে ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এই বক্তব্যকে সমর্থন করে।

সমাজতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ১৯১৫-১৬-য় জাপান ভ্রমণে গিয়েছিলেন । ১৯২৩ সালে প্রকাশিত 'বর্তমান জগৎ' গ্রন্থবলীর জাপান-খণ্ডে বিনয় সরকারের সঙ্গে জাপানি পণ্ডিত-অধ্যাপক হিরাই-এর কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে (১২১-১২৭ পৃ) । হিরাই-এর মতে খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকে কোরিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রবর্তিত হবার পূর্বেই ভারতের সঙ্গে জাপানের প্রত্যক্ষ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল ।

অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে পরাধীন ভারতবাসীর মনে প্রাচীন ভারতীয়দের সমুদ্র অভিযান এবং দূর-দূরান্তরে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কাহিনী যথেষ্ট উত্তেজনার উপকরণ জুগিয়েছিল । মনে রাখতে হবে যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ছিল ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতার যুগ । পরাধীন ভারতের কোনো কোনো জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকের চোখে পররাজ্য অধিকার ও উপনিবেশ গঠন নিন্দনীয় ছিল না । বরঞ্চ প্রাচীন যুগের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে গর্ব সহকারে বলা যেত যে হিন্দুদেরও একদা সমকালীন ইংরেজদের মতো সমুদ্রপারবর্তী সাম্রাজ্য এবং উপনিবেশ ছিল । ১৯২৬ সালে 'বৃহত্তর ভারত' বিষয়ে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য যখন 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হলো তখনও তার পিছনে একই মানসিকতা কাজ করে চলেছে। এই গবেষণা-সমিতির সর্বাগ্রগণ্যপণ্ডিত রমেশচন্দ্র মজুমদার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার প্রসার বিষয়ে তাঁর চার খণ্ডে লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থবলীর নাম দিয়েছিলেন: *Hindu Colonies in the Far East* (1927-1944) ।

কলকাতার 'বৃহত্তর ভারত সভা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কালিদাস নাগ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার বাগচি, বিনয়কুমার সরকার এবং অর্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলি প্রমুখ পাণ্ডিতেরা । পরবর্তীকালে নীহাররঞ্জন রায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ ও হিমাংশুভূষণ সরকার এই গবেষণার ধারাকে আরো প্রসারিত করেছিলেন । এই প্রসঙ্গে নাম করতে হয় দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর, যিনি একই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে সুমাত্রায় শ্রীবিজয় রাজ্যের উপর একটি প্রামাণিক পুস্তক রচনা করেছিলেন (১৯৪৯) । বলা বাহুল্য বর্মা, কাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলির নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতীয় গবেষকদের চোখে ততটা দৃশ্যমান ছিল না । এঁদের রচনায় ঐসব দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির উপস্থিতির উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বেশি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভারতবর্ষকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন ভারতীয় গবেষকেরা । রবীন্দ্রনাথের জাভা ভ্রমণের প্রাক্কালে 'বৃহত্তর ভারত সভা' একটি শুভযাত্রাসূচক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল (১৯২৭) । রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে তিনি ভারততীর্থ পরিদর্শনে যাচ্ছেন ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতির মূল্যায়নে ভারতকেন্দ্রিক প্রবণতার জন্যে বিচ্ছিন্নভাবে ভারতের জাতীয়তাবোধকে দায়ী করা চলে না । এর অপর একটি উৎস

আছে। ইতিপূর্বে বলেছি বহির্বিশ্বে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার সম্পর্কিত গবেষণায় ইউরোপিয় পণ্ডিতেরাই ছিলেন অগ্রবর্তী। জর্মনি, ফরাসি ও ওলন্দাজ গবেষকেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হিন্দু-বৌদ্ধযুগ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক সংস্কৃত ও পালি উপকরণের পর্যালোচনা করেছিলেন। বিশেষ করে দুজন পণ্ডিতের কথা বলতেই হয়। হল্যাণ্ডের N. J. Krom এবং ফরাসিদেশের George Coedes (সেডেস) সংস্কৃত ভাষায় রচিত আকরবস্তুর ভিত্তিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন যুগের ইতিহাস লিখেছেন। ১৯১৮ সালের একটি যুগান্তকারী ঘটনা জর্জ সেডেসের শ্রীবিজয় আবিষ্কার। *Le Royaume de Crivijaya* (BEFEO, XVIII, 1918) রচনায় সেডেস্ বৌদ্ধরাজ্য শ্রীবিজয়কে ইতিহাসের মানচিত্রে স্থাপনা করেছিলেন। ওলন্দাজ পণ্ডিত ক্রম্-এর *Hindoe-Javaansche Geschiedenis* (হিন্দু-জাভানীয় ইতিহাস) প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। ভারতীয় উপকরণের উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা থেকে স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নিয়েছিল একধরনের ভারত-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। বলা বাহুল্য রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী প্রমুখ ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা তাঁদের নিজেদের গবেষণায় ক্রম এবং সেডেসের সিদ্ধান্তগুলি কাজে লাগিয়েছেন। এইভাবে ভারতীয় এবং ইউরোপিয়দের যৌথ প্রয়াসে গড়ে উঠেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন যুগের ইতিহাসের ভারত-কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা।

দুই

সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসের বিশেষজ্ঞদের রচনায় প্রত্যাশিতভাবেই দেখা দিয়েছে ভারতকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া। কীভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্তারলাভ করেছিল এবং স্থানীয় রাষ্ট্র ও সমাজে তার অভিঘাত কতটা গভীর এ-বিষয়ে শুরু হয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিতর্কের মূল কথাগুলি উত্থাপন করতে চাই। প্রধানত ইন্দোনেশিয়াকে ঘিরে কী বিতর্ক উঠেছে এই প্রবন্ধে সেই আলোচনাই করতে চাই, যদিও প্রসঙ্গত সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কথাও এসে পড়বে।

প্রথমে দেখা যাক এই অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া বিষয়ে ভারতমনস্ক পণ্ডিতেরা কী বলতে চান। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্রভাব-বিস্তারের প্রাথমিক উদ্যোগ এবং অনুপ্রেরণা এসেছিল ভারত থেকে। দুঃসাহসিক ভারতীয় অভিযাত্রীরাই প্রাচীনকালে স্থলপথে এবং জলপথে ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে সংলাপ স্থাপন করেছিল। অনুমান করা হয় ভারতীয় নাবিক বা বণিক, ব্রাহ্মণ্যধর্মগুরু বা বৌদ্ধ শ্রমণ, অথবা ভাগ্যান্বেষী রাজপুত্রদের উদ্যোগে ঐসব দেশে ভারতীয়দের স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভারতীয় সভ্যতা প্রসারের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: 'ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের ধর্মপ্রচারের উৎসাহ, জনসংখ্যাবৃদ্ধির চাপ, বৈদেশিক আক্রমণ, ক্ষত্রিয় রাজপুত্র এবং অভিজাতবংশীয়দের অভিযানস্পৃহা বাণিজ্যবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইন্দোচীন ও পূর্বভারতীয় দ্বীপগুলির দিকে প্রবসন অভিলাষী ভারতীয়দের একটি প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল' (*Hindu Colonies in the Far East*, Calcutta, 1944-1963, p.8)।

অর্থাৎ প্রবাহের উৎস খুঁজতে হবে ভারতেই। ভারতবর্ষের সমাজে ও রাষ্ট্রে এমন

কতকগুলি পরিবর্তন ঘটেছিল যার ফলে একটি দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখী জনস্রোত সৃষ্টি হয়েছিল। এইভাবে যে প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়েছিল তাকে 'প্রভাব-বিস্তার' না বলে 'উপনিবেশগঠন' আখ্যা দেওয়া সঙ্গত। রাধাকুমুদ, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আলফ্রেড ফুশে (Foucher), জর্জ সেডেস প্রভৃতি বিদেশি ভারততত্ত্ববিদেরাও এই ঘটনাকে 'কলোনাইজেশন' বা উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠা বলেই চিহ্নিত করেছেন। সেডেস অবশ্য বলেছেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়ে ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা মাতৃভূমির সঙ্গে কোনো রাষ্ট্রিক যোগসূত্র রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি।

কত ভালো হতো যদি ভারতের ঐতিহাসিক আকরগ্রন্থগুলিতে এই চমকপ্রদ ঔপনিবেশিক অভিযানের সাক্ষ্য পাওয়া যেত। আশ্চর্যের বিষয় ভারতের কোনো অঞ্চল থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে অভিযান প্রেরণের নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায়নি। রমেশচন্দ্র মজুমদার আক্ষেপ করে বলেছেন যে একটি গৌরবময় অধ্যায় সম্পর্কে ভারতের ইতিহাস-সাহিত্যের এই বিস্ময়কর নীরবতা অস্বস্তিকর এবং পীড়াদায়ক। শুধু যে ভারতেই সাক্ষ্য মেলেনি তা নয়, ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় আগন্তুকদের দ্বারা নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা উপনিবেশ স্থাপন সম্পর্কে কিছু কিংবদন্তি ভিন্ন কোনো সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়নি। এখন যেহেতু ধরে নেওয়া হয়েছে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয়রাই বহন করে নিয়ে গিয়েছিল, কী উপায়ে বা পদ্ধতিতে সেই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। পণ্ডিতেরা তাই তথ্যের অসম্পূর্ণতাকে পূরণ করার চেষ্টা করেছেন থিয়োরি বা তত্ত্বের সাহায্যে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থানগুলির কোনো উল্লেখ নেই একথা বলা চলে না। রামায়ণে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, সিংহলী বিবরণে এবং পালি নিদ্দেশ গ্রন্থে জাভা, সুবর্ণদ্বীপ, সুবর্ণভূমি প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে। 'বৃহৎকথা', 'জাতক' এবং জৈনগ্রন্থ 'সমরাইচ্চকথায়' বণিকদের সমুদ্রযাত্রার অস্পষ্ট কাহিনীর ছায়াপাত ঘটেছে। লোকসাহিত্যে রাজ্যচ্যুত ক্ষত্রিয় অভিজাতদের সুবর্ণভূমির উদ্দেশে যাত্রার কথা পাওয়া যায়। এ-জাতীয় উপাদান অবশ্যই প্রাচীন সমুদ্রযাত্রার লোকস্মৃতি বহন করে, কিন্তু ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার প্রকৃত সম্বন্ধ বিষয়ে আলোকপাত করে না। তথাপি ওলন্দাজ ঐতিহাসিক C. C. Berg (ব্যের্খ) অনুমান করেছেন যে ভাগ্যান্বেষী ক্ষত্রিয় রাজারা সম্ভবত জাভায় রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর অনুমানের প্রধান ভিত্তি জাভার পঞ্জিসাহিত্য, যেখানে বারবার দেখা যাচ্ছে সমুদ্র অতিক্রম করে আসছে বিদেশী যোদ্ধা, যে যুদ্ধে জয়লাভ করে জাভার রাজকন্যাকে বিবাহ করে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় রাজ্য-প্রতিষ্ঠার এই ক্ষত্রিয় উদ্যোগের তত্ত্ব ডাচ্ পণ্ডিত ক্রম্ গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে সামরিক অভিযানের ফলে রাজ্যবিস্তার নয়, মুখ্যত সমুদ্রবাণিজ্যের মধ্য দিয়েই ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার যোগাযোগ শান্তিপূর্ণভাবে গড়ে উঠেছিল। ব্যবসা করতে এসে ভারতীয় বণিকেরা সম্ভবত উপকূলের বন্দরগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করে তারা একটি মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল। ক্রম্-এর ব্যাখ্যায় বণিকদের

উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে অপর একজন ডাচ্ ঐতিহাসিক F. D. K. Bosch (বস্খ্) এই মতকে 'বৈশ্যতত্ত্ব' আখ্যা দিয়েছেন ।

ফরাসি ঐতিহাসিক জর্জ সেডেস্ ক্রম্-এর বৈশ্যতত্ত্বকে সমর্থন করেছেন। সেডেস্ দেখিয়েছেন প্রাচীন ভারতে সোনার যথেষ্ট চাহিদা ছিল। সোনার প্রধান উৎস ছিল রোমান সাম্রাজ্য । সমুদ্রবাণিজ্যের মধ্য দিয়ে সোনা আমদানি করা হতো । খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে রোমান সম্রাটদের নির্দেশে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারত অভিমুখে সোনা রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায় । এর ফলে ভারতকে অন্যত্র সোনার অনুসন্ধান করতে হয় । এইভাবেই নজর পড়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির দিকে । প্রত্যাশিত স্বর্ণের উৎস সুবর্ণভূমি (বর্মা) এবং সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা) হয়ে দাঁড়ালো ভারতের সমুদ্রবাণিজ্যের গন্তব্যস্থল । একই সময়ে গভীর সমুদ্র পাড়ি দেবার মতো বড়ো জাহাজ নির্মাণ শুরু এবং মৌসুমীবায়ুর গতিপথ আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্রবাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল । বৌদ্ধধর্মে যেহেতু সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না সম্ভবত সেই কারণে এই ধর্ম জলপথে সহজেই ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছে গিয়েছিল । দক্ষিণ ভারতের নাবিকেরা শাস্ত্রীয় নিষেধকে নিশ্চয়ই তেমন গুরুত্ব দিত না, কেননা অচিরে বৌদ্ধধর্মকে অনুসরণ করে ব্রাহ্মণ্য শৈবধর্ম ইন্দোনেশিয়াতে আবির্ভূত হয় এবং জনপ্রিয়তায় অপরাপর ধর্মগুলিকে ছাড়িয়ে যায় ।

তিন

ভারতকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা প্রসঙ্গে যে বিশিষ্ট ওলন্দাজ ঐতিহাসিকের নাম করতেই হয় তিনি হলেন কর্নেলিয়াস ভান্ ল্যোয়র (১৯০৮-১৯৪২) । ১৯৩৪ সালে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত থিসিসেই ভান্ ল্যোয়র (Van Leur) ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু ঔপনিবেশিকতা বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন । তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল প্রাচীন এশিয়ার সমুদ্রবাণিজ্যের স্বরূপ । প্রসঙ্গত এসেছিল ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি প্রবর্তনের কথা । জীবিতকালে ভান্ ল্যোয়র নিজের দেশেও তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি পাননি । বলা বাহুল্য ডাচ্ ভাষায় লিখিত তাঁর নিবন্ধগুলির খবর তৎকালীন 'বৃহত্তর ভারত'-এর গবেষকদের মহলে পৌঁছয়নি । ভান্ ল্যোয়রের মূল্যবান লেখাগুলির একটি সংকলন ১৯৫৫ সালে ইংরাজি অনুবাদে প্রকাশিত হয় *Indonesian Trade and Society* নামে । এই বইটি সারা পৃথিবীর ঐতিহাসিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল । এই সাড়া-জাগানো বইটি এশিয়ার সমুদ্রবাণিজ্য নিয়ে গবেষণার একটি নতুন পর্বের সূচনা করে ।

ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের প্রচলিত ব্যাখ্যা ভান্ ল্যোয়র প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । ভান্ ল্যোয়রের বক্তব্য শোনা যাক ।

প্রথম কথা, ভারত থেকে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে যাবার পরিচিত সমুদ্রপথে যদি কোনো সামরিক অভিযান পাঠানো হতো তাহলে সম্ভবত তার কোনো পুরাতাত্ত্বিক চিহ্ন থেকে যেত—কোনো উৎকীর্ণ লিপি অথবা অনুরূপ ঐতিহাসিক দলিলে পাওয়া যেত তার উল্লেখ । দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে আসে তাঞ্জোরের উৎকীর্ণ লিপি (১০৩০) যেখানে চোলদের শ্রীবিজয় আক্রমণের (১০২৪) বিবরণ সংরক্ষিত আছে । দক্ষিণ ভারতের

সঙ্গেই যেহেতু ইন্দোনেশিয়ার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, আশা করা যেতে পারত ঐ অঞ্চল থেকেই পাওয়া যাবে ভারতীয়দের উপনিবেশ বিস্তারের ঐতিহাসিক প্রমাণ। কিন্তু তা পাওয়া যায়নি ।

কোনো ভারতীয় রাজ্য-প্রেরিত অভিযানের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য নেই, তবে কি বেসরকারি জনগোষ্ঠী স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে বসতি গড়েছিল ? ভান্ ল্যেয়র মনে করেন যে বড়ো আকারের ভারতীয় প্রবসন ঘটে থাকলে নবাগতরা অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসত তাদের নিজস্ব নগর গ্রাম ও প্রতিষ্ঠার প্রণালী, জাতিপ্রথা, হস্তশিল্প, গৃহনির্মাণরীতি, কথ্যভাষা, স্থানীয় প্রথা ও অনুশাসন, এমনকি রাষ্ট্রসংগঠনপদ্ধতি। একটি নতুন সমাজব্যবস্থা উপনিবেশ গঠনের মধ্য দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় স্থানান্তরিত হলে এইসব বৈশিষ্ট্য থেকে যাবারই কথা, অথচ গবেষকেরা এগুলির সন্ধান পাননি ।

বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দলবদ্ধভাবে দেশান্তরী হবার কথা বাদ দিলেও ধরা যেতে পারে যে বিচ্ছিন্নভাবে নাবিক ও বণিকেরা একে দু'য়ে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যপথ ধরে মালয়, সুমাত্রা, জাভা ও বোর্নিওর বন্দরগুলিতে জমায়েত হয়েছিল । ক্রমে ক্রমে ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রবন্দরগুলিতে গড়ে উঠেছিল বিদেশাগত বণিক-নাবিকের Kampong, যা ছিল এক-একটি ভিনদেশি লোকদের ঘনসংঘবদ্ধ পাড়া বা মহল্লার মতো । ভান্ ল্যেয়রের মতে বন্দরনিবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ইন্দোনেশিয়াতে ছড়ায়নি । উপকূলের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে বিদেশীরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করলেও যে বহিরাগত সংস্কৃতি দেশের অভ্যন্তরে বিস্তারলাভ করে না এর উদাহরণ ইন্দোনেশিয়ার চীনা কাম্পঙ্গুলি । দীর্ঘদিন পাশাপাশি থেকেও ইন্দোনেশিয়ার মানুষ চীনের সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়নি ।

ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের সমস্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভান্ ল্যেয়রের মনে এসেছে একটি মৌলিক প্রশ্ন : বণিকেরা কি উচ্চমার্গের সংস্কৃতির প্রকৃত বাহক হতে পারে ?

প্রথমে দেখা যাক ভারত থেকে কী ধরনের সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। ভারতীয় উপাদান পাওয়া যায় প্রধানত ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয় ভাবনায়, আচার অনুষ্ঠানে, রাজার অভিষেক-ক্রিয়ায়, শিলালেখ বা দানপত্রের লিপি ও ভাষায়, এবং সর্বোপরি শিল্পকলার ক্ষেত্রে। ইন্দোনেশিয়ার শিল্পের বলিষ্ঠ স্বকীয়তা মেনে নিয়েও বলতে হয় যে দেবদেবীর মূর্তি কল্পনায়, প্রাম্বানান্ মন্দিরগাত্রে রামায়ণ এবং বোরোবুদূরে বৌদ্ধজাতককাহিনী রূপায়নে যে শিল্পশৈলী ব্যবহার করা হয়েছে তা মূলত ভারতীয়। ভান্ ল্যেয়র বিশ্বাস করতেন যে এই জটিল আচার-অনুষ্ঠানধর্মী সংস্কৃতির বাহক হতে পারে একমাত্র ভারতীয় ব্রাহ্মণ, যে ছিল একাধারে ধর্মগুরু, পুরোহিত, রাজার প্রধান উপদেষ্টা এবং সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারে দক্ষ। মনে হয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে এসেছিল ভারতীয় মন্দিরশিল্পীরা যারা স্থানীয় কারিগরদের সাহায্যে দেবস্থানগুলির শিল্পরূপ দিয়েছিল। ভান্ ল্যেয়র জোর দিয়ে বলেছেন যে এই কাজ বণিকের দ্বারা সাধিত হতে পারত না, বিশেষ করে যখন মনে রাখি যে অধিকাংশ বিদেশাগত বণিক এবং নাবিক ছিল সমাজের নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষ । এদের অনেকেই ছিল ফিরিওয়ালা শ্রেণীর ক্ষুদ্র বিক্রেতা। একথা ঠিক বাণিজ্যই নির্মাণ করে যোগাযোগের সেতু। বিদেশে বণিকদের যাতায়াত এবং

বসবাসের মধ্য দিয়ে এক ধরনের সংস্কৃতি হস্তান্তরের কাজ চলতে থাকে। তবে সেই সংস্কৃতি চরিত্রগতভাবে ভিন্নস্তরের বস্তু। ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু সংস্কৃতি বণিকের দ্বারা বাহিত হয়ে থাকলে উপকূলের বাণিজ্যস্থানগুলিতে তার চিহ্ন পাওয়া উচিত ছিল, অথচ হিন্দু-বৌদ্ধযুগের সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলি আছে সমুদ্রতীর থেকে বহুদূরে, পর্বত ও ঘন অরণ্য-পরিবৃত দেশের অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে রাজধানীতে বণিকের যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল না এবং অন্যদিকে রাজকর্মচারীরাও বন্দরে-বাজারে যেত নিজেদের প্রয়োজনে, তবু মনে হয় ভান্ ল্যেয়রের মতামত সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত। ধর্ম, অভিষেক, শিল্পকলা এবং প্রস্তরগাত্রে সংস্কৃতলিপি উৎকীর্ণ কবার ব্যাপারে বণিকের কিছু করণীয় ছিল না। হিন্দু সংস্কৃতি স্থানান্তরিত করাব ক্ষেত্রে ধর্ম এবং ভাষার বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণের ভূমিকা মেনে নিতেই হয়।

ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির বাহকরূপে ব্রাহ্মণের গুরুত্ব প্রমাণিত করে ভান্ ল্যেয়র চলে আসেন তাঁর বক্তব্যের সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং চমকপ্রদ অংশে। ইন্দোনেশিয়া তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রাহ্মণের আবির্ভাব ঘটেছিল কীভাবে? ভারতীয় ব্রাহ্মণ দেশত্যাগী হয়েছিল কীসের গরজে? ভান্ ল্যেয়রের অনুমান তৎকালীন ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় ব্রাহ্মণেব বিশেষ অধ্যাত্মক্ষমতার কথা প্রচারিত হয়েছিল। সেখানকার মানুষ বিশ্বাস করত যে যাগযজ্ঞ ও অভিষেক প্রক্রিয়াব মধ্য দিয়ে এক-মাত্র ব্রাহ্মণই রাজাকে করতে পাবে মহিমান্বিত, মন্ত্রবলে অর্পণ করতে পারে দেবত্ব। সম্ভবত এই কারণেই ব্রাহ্মণকে আহ্বান করেছিল ইন্দোনেশিয়ার বাজন্যবর্গ প্রধানত প্রজাদেব চোখে রাষ্ট্রিক বৈধতা অর্জন কববার উদ্দেশ্যে। ভারতীয় উদ্যোগে নয়, ইন্দোনেশিয়াব নিজস্ব গরজে ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ কবেছিল দ্বীপান্তরেব বাজাবা এবং রাজমর্যাদাকাঙ্ক্ষী আঞ্চলিক দলপতিরা। ভান্ ল্যেয়র স্বীকার করেন যে এমনও হতে পারে যে ভারতীয় ব্রাহ্মণেরাও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজন্যবর্গের আনুকূল্য লাভেব প্রত্যাশী ছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা স্বেচ্ছায় এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বাজ্যে উপস্থিত হয়েছিল।

ইন্দোনেশিয়াব রাজন্যকুল এবং ভারতের ব্রাহ্মণ পুরোহিতের যৌথ উদ্যোগে যে সংস্কৃতি প্রবর্তিত হলো তাব উপযোগিতা কি শুধু উচ্চকোটি মানুষের জন্য? সমাজের অন্যান্য স্তরে কি এই সংস্কৃতির অভিঘাত পৌঁছয়নি? ভান্ ল্যেয়র ইন্দোনেশিয়ার হিন্দু সংস্কৃতিকে অভিজাত স্তরের সংস্কৃতি বলেই ধরে নিয়েছেন। তাঁর মতে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে এর বিশেষ যোগ ছিল না। বাইরে থেকে নেওয়া উচ্চমার্গের সংস্কৃতি ধীরে ধীরে নিম্নগামী হলেও হিন্দুধর্মের প্রভাবে ইন্দোনেশিয়ার নিজস্ব সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়নি। শাসকশ্রেণীর উদ্যোগে সমাজের উচ্চস্তরে বহিরাগত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল একথা মেনে নিয়েও বলতে হয় যে সাধারণ মানুষের জীবনে ইন্দোনেশিয়ার চিরাচরিত প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।

চাব

বলা যেতে পারে ইন্দোনেশিয়ার হিন্দু ঔপনিবেশিকতার ভারতকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে ভান্ ল্যেয়রই ইন্দোনেশিয়া-বিতর্কের সূত্রপাত করেন। অথচ তিনি প্রাচীন ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতিবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। ওলন্দাজ ইস্ট্ ইণ্ডিজ্ সরকারের

একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারি হিসাবে তিনি হল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক ইতিহাসে আগ্রহী হয়েছিলেন । এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তিনি তাঁর দেশের ঔপনিবেশিক ইতিহাস রচনার ইউরোপকেন্দ্রিক ঝোঁকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন যে ইন্দোনেশিয়া তথা এশিয়ার ইতিহাসের একটা নিজস্ব গতিপথ আছে। ইউরোপিয় ঐতিহাসিকেরা এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাসকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র এশিয়ায় ইউরোপিয় প্রাধান্যের যুগকে গুরুত্ব দেন । শুধু তাই নয়, ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ্ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবার ঘটনাটিকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে তুলে ধরা হয় । আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার রূপান্তরকে সম্পূর্ণভাবে ইউরোপিয় অভিঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা হয় । এই মতাদর্শ খণ্ডন করতে গিয়ে ভান্ ল্যেয়র হয়ে দাঁড়ান আধুনিককালে এশিয়ার ইতিহাসে ইউরোপকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান সমালোচক ।

ইউরোপকেন্দ্রিকতার প্রয়োগের অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসাবে এশিয়ার সমুদ্রবাণিজ্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন ভান্ ল্যেয়র । সুপ্রাচীন যুগ থেকে এশিয়ার সমুদ্রবাণিজ্য তার নিজস্ব ধারায় বিবর্তিত হয়ে চলেছে । ষোল শতকে পর্তুগীজেরা এই বাণিজ্যের কাঠামোয় কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি । সতেরো শতকে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের হস্তক্ষেপের ফলে কিছু আঞ্চলিক পরিবর্তন ঘটলেও আঠারো শতক পর্যন্ত মোটামুটিভাবে এশিয়ার ইতিহাসের স্বকীয়তা বজায় ছিল । কীভাবে বৈদেশিক শক্তির প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়েও ইন্দোনেশিয়া তার দীর্ঘ ইতিহাসে বারবার আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করেছে এই কথা বোঝাতে গিয়ে ভান্ ল্যেয়র প্রাচীনকালের হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাবের উল্লেখ করেন। বলা বাহুল্য, ভারতকেন্দ্রিক হিন্দু ঔপনিবেশিকতার তত্ত্বের প্রতিবোধ করতে গিয়ে ভান্ ল্যেয়র সংস্কৃতির সংঘাতের এক ভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন । তাঁর মতে প্রাচীনকালে ইন্দোনেশিয়ায় যা ঘটেছিল তাকে বলা যেতে পারে একধরনের culture borrowing, বা বাইরে থেকে ভিন্ন সংস্কৃতি ধার নেওয়া । ভারতীয়দের উদ্যোগে ইন্দোনেশিয়ায় 'হিন্দু উপনিবেশ' স্থাপিত হয় । ভারত তার ধর্ম ও সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয়ার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল একথা না বলে বরঞ্চ এটা বলাই যুক্তিসঙ্গত যে ইন্দোনেশিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষে আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় সেই সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল । যেহেতু প্রধানত উচ্চকোটির মানুষ ভারতীয় সংস্কৃতিকে বরণ করেছিল সেইজন্য ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতির কোনো কাঠামোগত বদল ঘটেনি । সমাজের নিচের তলাকার সাধারণ মানুষের জীবনে চিরাচরিত দেশজ সাংস্কৃতিক ধারা অব্যাহত ছিল ।

একটা নতুন কথা জোর দিয়ে বলতে গিয়ে ভান ল্যেয়র কিছুটা অতিশয়োক্তি এড়াতে পারেননি । তাঁর বক্তব্যের অসম্পূর্ণতা সমালোচকদের চোখে পড়েছে ।

ব্রাহ্মণদের ভূমিকাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেবার ফলে পুরোগামী বৌদ্ধ শ্রমণদের তিনি উপেক্ষা করেছেন । পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের সহযোগী ছিল ভাগ্যান্বেষী ক্ষত্রিয় রাজকুমার বা অভিজাতবংশীয়েরা। এ ছাড়াও পুরোহিত শ্রেণীবহির্ভূত উপাসক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের কথাও চিন্তা করা দরকার । ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতিতে ভারতীয় উপাদানের যে ব্যাপক অনুপ্রবেশের সাক্ষ্য পাওয়া গেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংস্কৃতি শুধুমাত্র অভিজাতস্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল এই বক্তব্যের পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন । সাধারণ মানুষও কম-বেশি ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এ মতকে অবহেলা করা

চলে না। এই প্রসঙ্গে জর্জ সেডেসের বক্তব্য গুরুত্ব পায়। সেডেস্ দেখিয়েছেন ভারতের প্রাক্-আর্যসমাজের মৌলিক জীবনধারা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতেও বিস্তারলাভ করেছিল। অর্থাৎ হিন্দু-বৌদ্ধযুগে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার নিচের তলার সমাজ ছিল একই ধাঁচের। উভয়ই ছিল অস্ট্রোনেশিয়ান সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই খ্রিস্টিয় যুগের কাছাকাছি সময়ে ভারত থেকে আগত মানুষগুলিকে ইন্দোনেশিয়ায় 'বিদেশী' বলে চিহ্নিত করা হয়নি। উভয় অঞ্চলের সংস্কৃতির মধ্যে একটা কাঠামোগত সাদৃশ্য ছিল। সুপ্রাচীনকাল থেকে উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াত ছিল, কিন্তু খ্রিস্টিয় যুগের সূচনায় উচ্চ সংস্কৃতির বাহক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের আগমনের ফলে ইন্দোনেশিয়ায় লক্ষণীয় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এইজন্যই খ্রিস্টিয় যুগের প্রারম্ভে ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু-বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছিল। নিচের তলার কাঠামোয় গভীরতর মিল থাকায় ইন্দোনেশিয়া খুব স্বাভাবিক কারণেই ভারত থেকে আহরণ করেছিল তার সাংস্কৃতিক সম্পদ, চীন থেকে নয়।

ভান্ লোয়রের বক্তব্য নতুন গবেষণা এবং আলোচনার ফলে সংশোধিত হবে এটাই প্রত্যাশিত। তথাপি তাঁর প্রধান কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে। ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতির স্বরূপ বিচারে তিনি একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন। এতদিন আমরা অভ্যস্ত ছিলাম ভারত থেকে ইন্দোনেশিয়ার দিকে তাকাতে। ভারত ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র। ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতি ছিল প্রাদেশিক অথবা ঔপনিবেশিক। এখন ভান্ লোয়রের প্রভাবে আমরা ইন্দোনেশিয়ার ভূমিতে দাঁড়িয়ে সেই দেশের প্রাচীন সংস্কৃতিকে বুঝবার চেষ্টা করব। ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে ভারতীয় সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতির বহির্বলয়মাত্র।

উল্লেখপঞ্জী :

নগেন্দ্রনাথ বসু, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', কলিকাতা, ১৯১১

F.D. K. Bosch, *Selected Studies in Indonesian Archaeology*, The Hague, 1961

George Coedes, *"Le royaume de Crivijaya"* (The Empire of Srivijaya). BEFEO (Bulletin of the French School of the Far East) XVIII. Hanoi, 1918

—, *The Indianised States of Southeast Asia*, Honolulu, 1968

Greater India Society Bulletin No. 1 (Ed. Kalidas Nag), 1926

D.G.E. Hall, *A History of South-East Asia*, London, 1968

N J. Krom, *Hindoe-Javaansche Geschiedenis*, The Hague, 1931

J. C. Van Leur, *Indonesian Trade and Society*, The Hague, 1955

—, *Eenige beschowingen bettreffende den Ouden Aziatischen handel* (Some Observations concerning early Asian trade), Middelburg 1934

R. C. Majumdar, *Ancient Indian Colonies in South-East Asia*, Baroda, 1955

—, *Hindu Colonies in the Far East*, Calcutta, 1963

R.K. Mookerji, *Indian Shipping: A History of the Seaborne Trade and Maritime*

Activity of the Indians from the Earliest Times, London, 1912
Nilakanta Shastri, *Sri Vijaya*, 1949
বিনয় কুমার সরকার, 'বর্ত্তমান জগৎ', কলিকাতা, ১৯২৩
অধীর চক্রবর্তী "প্রাচীন কম্বুজ তথা বৃহত্তর ভারত সংস্কৃতি প্রসঙ্গে", 'ঐতিহাসিক', এপ্রিল ১৯৮৮

অরুণ ঘোষ

রাম জন্মভূমি

রাম জন্মভূমি নিয়ে এখন দারুণ আন্দোলন চলছে । ধরেই নেওয়া হয়েছে যে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যাই রামের জন্মভূমি । কিন্তু এই বিশ্বাস কতটা সত্য ? আসল তথ্য কি ?

প্রথমেই বিচার করতে হবে যে রাম বলে কোনো ব্যক্তি কি আদৌ ছিলেন ? রামায়ণের গল্প কি শুধুই কাহিনী ? রামায়ণ কি আরব্যোপন্যাসের আলিবাবা বা আলাদীন বা সিন্দবাদের মতো সম্পূর্ণ কাল্পনিক ? তা তো মনে হয় না । রাম রঘুবংশের সন্তান। স্বয়ং কালিদাস রঘুবংশ নিয়ে কাব্য লিখেছেন । রঘুবংশের, ও তার সঙ্গে সঙ্গে, রামের অস্তিত্ব না থেকে থাকলে কেউ বসে বসে এ বংশাবলী কল্পনা করে গেছেন ও তা পুরাণ-ইতিহাসে স্থান পেয়েছে তা বিশ্বাস করা যুক্তি বিবেচনার বাইরে । তাই ধরে নিতে হবে যে রঘুবংশ বলে এক ইক্ষাকু বংশ ছিল ও রাম এই বংশের এক রাজা ছিলেন ।

এইরূপ ঐতিহ্যের ও বংশাবলীর কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না । একসময়ে কেউ কেউ বলেছিলেন যে ট্রয় ছিল না । শ্লিমান প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে, খনন করে, দেখিয়েছিলেন যে ট্রয় ছিল । তেমনই স্যার আর্থার এভানস্ দেখিয়েছিলেন যে ক্রিট ছিল । এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে ।

ভারতীয় ঐতিহ্যে বাল্মীকির রামায়ণ কিন্তু মহাকাব্য, ইতিহাস-পুরাণ নয় । মহাভারত ইতিহাস-পুরাণ । রামায়ণ তা হলে ইতিহাস-আশ্রিত কাব্য ।

আমাদের ঐতিহ্যে বলে যে রাম কৃষ্ণের আগের যুগের মানুষ । রাম ত্রেতাযুগের, কৃষ্ণ দ্বাপরের । পণ্ডিতেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ১৫০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বে ধরেন । তাহলে রাম অন্তত ১০০০ খ্রিস্টপূর্বের লোক, সম্ভবত ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বের ।

কিন্তু ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ বিস্তারিতভাবে অযোধ্যাতে, নন্দীগ্রামে, শৃঙ্গবেরপুরমে খনন করে অষ্টম শতাব্দী খ্রিস্টপূর্বের আগেকার কিছুই পাননি । আজকাল নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উন্নতির জন্য খননপ্রাপ্ত দ্রব্যের সঠিক সময় বেশ ভালোভাবেই বিচার করা যায় । কাজেই পুরাতত্ত্বের সিদ্ধান্ত-মতে বর্তমান অযোধ্যা রামের জন্মভূমি হতে পারে না । হয়তো রাম নামে কোনো এক রাজা অযোধ্যাতে রাজত্ব করেছিলেন, তিনি অনার্যদের সঙ্গে সংগ্রামেও লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি লঙ্কা-বিজয়ী, রাবণহন্তা রাম নন । কারণ রামায়ণের প্রধান গল্প রামের বানর-সেনার সাহায্যে সেতুবন্ধন করে স্বর্ণলঙ্কা অধিকারের ও রাবণকে হত্যা করার কাহিনী । আর এই রাম আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীর আগেকার লোক ।

এই রামের, লঙ্কার ও রাবণের সন্ধান তাহলে আমরা কেমন করে পাবো ? প্রথমে লঙ্কার কথা ধরা যাক । লঙ্কা সিংহলে হতে পারে না । পালি 'মহাবংশ' মতে যেদিন

বুদ্ধ মারা যান (৫৪৪ বা ৪৮৪ খ্রিঃ পূঃ) সেইদিন বিজয়সিংহ সিংহলে পদার্পণ করেন। তার আগে সিংহলের কোনো ইতিহাস নেই, ঐতিহ্যেও নয় ও প্রত্নতত্ত্ব মতেও নয়। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে পর্যটকদের আকর্ষিত করার জন্য সীতাওয়েওয়া (সীতার বন পুকুর) নামে এক জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে বটে কিন্তু তার পিছনে কোনো ঐতিহ্য নেই। ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বে সিংহলে কোনো শহর ছিল না, স্বর্ণলঙ্কা তো দূরের কথা। আর সিংহল একটা বড় দ্বীপ। কিন্তু রাবণের স্বর্ণলঙ্কা শুধু এক শহরমাত্র।

কোনো কোনো পণ্ডিতেরা বলেন যে লঙ্কা দণ্ডকারণ্যে ছিল। কিন্তু ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বে এখানে কোনো সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল না। প্রত্নতত্ত্বমতে ভারতবর্ষে প্রথমবার শহরের পত্তন হয় সিন্ধু-সভ্যতাতে। সেগুলির ধ্বংসের পর দ্বিতীয়বার শহরের গোড়া-পত্তন উদীচ্যে ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় খ্রিস্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীর পর থেকে। শহর সভ্যতা দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে পৌঁছুতে আরো অনেক সময় নেয়। দণ্ডকারণ্য ও সিংহলের মধ্যেও ১৫০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্ব মধ্যে স্বর্ণলঙ্কার মতো কোনো সমৃদ্ধশালী শহর ছিল না।

তাহলে স্বর্ণলঙ্কা কোথায় থেকে থাকতে পারে? যে সময়ের কথা আমরা ভাবছি তার আগে এরকম শহর শুধু সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চলে ছিল। এই সভ্যতার দুইটি বড়ো শহর ছিল হরাপ্পা ও মোহেঞ্জো-দাড়ো। স্থানীয় ভাষায় এখনও অবধি মোহেঞ্জো-দাড়োকে 'দ্বীপ' বলা হয়। তেলুগুভাষায় নদীমধ্যস্থ দ্বীপকে 'লঙ্কা' বলা হয়। অন্ধ্রের নদীগুলিতে এমন বহু লঙ্কা আছে। মোহেঞ্জো-দাড়ো সিন্ধুনদ ও পশ্চিম নারার মধ্যবর্তী এক দ্বীপ। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে মোহেঞ্জো-দাড়ো বর্ষাকালের প্লাবনে এক নদী-বন্দরে পরিণত হতো, 'ঋগ্বেদে' যাদের বলা হয়েছে 'শারদীয় পুর'। আর এইস্থানে বাঁধ ফেলা ও সেতুবন্ধন করা সম্ভব। কাজেই এটা খুবই সম্ভব যে মোহেঞ্জো-দাড়োই লঙ্কা ছিল। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত শশাঙ্কভূষণ রায় (এস. বি. রায়) তাঁর বই 'মোহেঞ্জো-দাড়ো—দা লঙ্কা অফ্ রাবণ'-এ এই প্রমাণ করবার প্রয়াস করেছেন। 'ঋগ্বেদ' মতে নার্মিনী নামে এক শহর (১,১৪৯,৩) অগ্নি পুড়িয়ে দেন। এই ঘটনা হনুমানের লঙ্কাদাহন মনে করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথও ভেবেছিলেন যে মোহেঞ্জো-দাড়োই লঙ্কা। আর্যদের সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে শিরাজ থেকে ইসফাহান যাবার পথে এই মনোজ্ঞ কথা তাঁর মনে হয়েছিল। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী 'পারস্যে' তিনি এই চিন্তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

লঙ্কার অধীশ্বর ছিলেন রাবণ। তামিলে ইরাইভান মানে প্রভুরাজ। ইরাইভান্ বা রাবণ হয়তো রাজা-জ্ঞাপক উপাধি। রাম দাশরথির সময় রাবণ ছিলেন দশানন। এও হয়তো আসল নাম নয়। এর মানে যাঁর চতুর্দিকের নজর আছে, অর্থাৎ এক অত্যন্ত করিৎকর্মা লোক। রাবণ ছিলেন ব্রাহ্মণ, পুলস্ত্যের পৌত্র, বিশ্রবার পুত্র, স্বয়ং ব্রহ্মার বংশধর। বাল্মীকি 'ব্রহ্ম-রক্ষ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কালক্রমে আর্যেরা এই শব্দকে রাক্ষসে পরিণত করেন ও বিজেতা-সুলভ মনোভাবের ফলে রাক্ষসের নামে নানা কুৎসা ও কালিমা লেপন করেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে সিন্ধু সভ্যতার শহরগুলির শাসকেরা পুরোহিত হয়ে থাকতে পারেন। ব্রাহ্মণ রাবণ তাহলে মোহেঞ্জো-দাড়ো-লঙ্কার এক প্রভু হতেই পারেন। পণ্ডিতেরা আরো ভাবেন যে সিন্ধু সভ্যতার অন্তত শাসকদের ভাষা দ্রাবিড় হয়ে থাকতে পারে।

লঙ্কা ও রাবণ যদি এই অঞ্চলের হয় তবে কি রাম সম্বন্ধেও তা বলা যায় ? এখানে কয়েকটি তথ্য খুবই প্রাসঙ্গিক ।

ক. রাবণ ব্রাহ্মণ ছিলেন । ব্রহ্মহত্যার পাপের জন্য রামকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। কোথায় ? না, হিংলাজে, যা আজকাল মরুভূমিতে । এই হিংলাজ বালুচিস্তানে, বা পাকিস্তানে, মোহেঞ্জো-দাড়ো থেকে খুব দূরে নয় ।

খ. কালিদাসের 'রঘুবংশে' আছে (১৩,৬০-৬৩) যে রামের পূর্বসূরীদের দেশ ছিল উত্তর কোশল-এ । এখানে সরযূ নদী ছিল । এই উত্তর কোশল কোথায় তা অনুমান-সাপেক্ষ । পণ্ডিতেরা বলেন যে উত্তর মদ্র ছিল বর্তমান বল্‌খ বা বাদাকশান অঞ্চলে। উত্তর কুরু ছিল ইরান-আফগানিস্তান-তুরান সীমান্তে । উত্তর পাঞ্চাল ছিল ইরানে জ্রাঞ্জিয়া অঞ্চলে (শৃঞ্জয় থেকে) । তাই পণ্ডিতদের অনুমান যে উত্তর কোশল বর্তমান ইরান-আফগান নদ হরিয়ুদ অঞ্চলে ছিল ।

গ. 'বাল্মীকি রামায়ণে' (২, ৬৮, ১৮- ১৯) ভরতকে কেকয় থেকে আনবার জন্য বশিষ্ঠ-প্রেরিত অশ্বারোহী দূতেদের সফরের রাস্তার এক বিবরণী আছে । পড়ে গোলমাল হয় । তাঁরা পাঞ্চালদেশ হয়ে হস্তিনাপুরে গঙ্গা পার হয়ে পশ্চিমমুখে কুরুজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যান । আরো বহুদূর গিয়ে ইক্ষুমতী নদী পার হয়ে বহ্লীক দেশের মধ্যে দিয়ে সুদামা পর্বতে উপস্থিত হন । তারপর বিপাশা ও শাল্মলী নদী অতিক্রম করে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে কেকয় রাজ্যের গিরিব্রজে উপস্থিত হন । এই সফর একেবারে অসম্ভব । বহ্লীক দেশ বর্তমান বল্‌খ্ বা বাদাকশান । বিপাশা নদী তার পূর্বে, পশ্চিমে নয় । ব্যাপার বুঝতে পারা যায় যদি বলা হয় যে দূতেরা পশ্চিমে নয়, পূর্বে গিয়েছিলেন, ও পাঞ্চালে নয়, উত্তর পাঞ্চালে ; সেখান থেকে কুরুজঙ্গলে নয়, উত্তর কুরু অঞ্চলে, যা হয়তো সেকালে অরণ্যসঙ্কুল ছিল (এখনও অনেকটা তাই) ; এবং সেখান থেকে বহ্লীক দেশ পেরিয়ে, শেষ পর্যন্ত বিপাশা শাল্মলী পেরিয়ে কেকয়ে । যদি আখেমেনিদাদের মানচিত্র দেখা যায় তবে পথটা হবে মর্গুস থেকে হরৈভ অঞ্চলে নদী ধরে ধরে, বাক্‌সট্রিসে (বহ্লীকে), তারপর গাণ্ডারার উত্তর দিয়ে 'হিন্দুস্' এ ।

ঘ. 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' রাম হচ্ছেন 'রাম মার্গবেয়' । অর্থাৎ মর্গুর লোক । আবেস্তায় এর নাম মোউরু । পরে এর নাম দাঁড়ায় মার্গুস বা মর্গুস ও মের্ভ, বর্তমান সোভিয়েট দেশের তুর্কমেন অঞ্চলে । শ্রীসুকুমার সেন তাঁর 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস'-এ এসব জানিয়েছেন । এই মতে রাম তাহলে মের্ভ বা মর্গুর লোক ছিলেন । এর পশ্চিমে ক্যাস্‌পিয়ান সমুদ্রের দক্ষিণে ছিল 'রগা' । এই রগা থেকেই কি রঘুবংশের উৎপত্তি ?

ঙ. আবেস্তায় এক 'রামন্'-এর কথা আছে । ইনি এক প্রাচীন দেবতা, শান্তির দেবতা । তাঁর সঙ্গী ছিলেন বায়ু । ভারতীয় ঐতিহ্যে হনুমান বায়ুর পুত্র । আবেস্তার প্রাচীন অংশগুলিতে রামের নাম আছে । জরথুস্ত্রের ধর্মীয় বিপ্লবের পূর্বে রামের সঙ্গে সঙ্গে আতশ্ (অগ্নি), হাওমা (সোম), মিথ্‌রা (মিত্র), বায়ু, বেরেথ্‌রাঘ্না (বৃত্রঘ্ন) প্রভৃতি দেবতার পূজা হতো । অসম্ভব নয় যে রাম এক শক্তিশালী কিন্তু শান্তিকামী রাজা ছিলেন যিনি পরে দেবতা হয়ে যান ।

চ. আবেস্তায় বশিষ্ঠও আছেন, বহিষ্ট নামে । জরথুস্ত্র নিজেও তাঁর উদ্দেশ্যে এক গাথা রচনা করেছিলেন—বহিস্টো-ইস্টি-গাথা ।

কাজেই এটা খুবই সম্ভব যে আদি রাম ছিলেন ইরানের লোক ও তাঁর কুলগুরু বশিষ্ঠও তাই ছিলেন । পরে এক রাম বর্তমান উত্তর প্রদেশের অযোধ্যাতে রাজত্ব করতেন। তিনি দক্ষিণে দ্রাবিড়দের পর্যুদস্ত করেছিলেন । কিংবদন্তীতে ও কবির কল্পনায় এই দুই রাম এক হয়ে গিয়েছিলেন ।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে সরযূ নদীকে আমরা কি করে বাদ দিতে পারি ? প্রত্নতত্ত্ব যাই বলুক সরযূ তো উত্তর প্রদেশে ? এখানেও এর যথার্থ উত্তর পাওয়া যাবে । ঔপনিবেশিকেরা বরাবরই নতুন আবাদস্থলের নাম কখনও কখনও তাঁদেব পুরোনো বাসস্থানের নামে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত । যেমন বিলেত থেকে আমেরিকায় গিয়ে ইংরাজ ঔপনিবেশিকেরা তাঁদের পুরানো স্মৃতি অবলম্বন করে নতুন শহর, অঞ্চল ইত্যাদির নামকরণ কবেছিলেন— নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, নিউ হ্যামপশায়ার ইত্যাদি । ভাবতে আর্য ঔপনিবেশিকেরাও তাঁদের ইরানের সরস্বতী (পরে হরহুভতী, আরো পরে হেল্‌মন্দ) পেলেন অধুনালুপ্ত পাঞ্জাবের-হরিয়ানার সরস্বতীতে ; আফগানিস্তানেব গোমতী কোশলের গোমতীতে; সপ্তসিন্ধুর ইরাবতী সুদূর ব্রহ্মদেশের ইরাওয়াডিতে; বর্তমান বিহারের বৈশালী আরাকানের বেশালীতে ইত্যাদি । তেমনি ইরানের সরযূ (পরে হরযু —যা থেকে আখেমিনিদ প্রদেশ হরাইভা-হোরাযু, হরিরুদ) হয়ে গেল কোশলের সরযূ। উল্টোভাবে ভারতের মদ্র, পাঞ্চাল, কোশল অঞ্চলের লোকেরা তাঁদেব পূর্বপুরুষদের বাসস্থানের নাম দিলেন, উত্তর মদ্র, উত্তর পাঞ্চাল, উত্তর কোশল ।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে বানরেরা কারা ছিলেন ? তাঁরা থাকতেন কিষ্কিন্ধ্যাতে ও এই কিষ্কিন্ধ্যা তো দক্ষিণ ভারতে ? কিন্তু পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে (৪, ৩, ৯৩) কিষ্কিন্ধ্যা স্থান পেয়েছে সিন্ধু ও তক্ষশীলা গণ-জনপদের মধ্যে । কিষ্কিন্ধ্যার সঙ্গে বর্ণু (বর্তমান বন্নু), কম্বোজ, শল্য, গান্ধারের নাম আছে । অর্থাৎ আদি-কিষ্কিন্ধ্যা ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতে, পরে ঔপনিবেশিকেরা দক্ষিণ ভারতে গিয়ে আর এক কিষ্কিন্ধ্যা স্থাপন করেন । এককালে এই আদি-কিষ্কিন্ধ্যার লোকেরা দ্রাবিড়ভাষী ছিলেন এখনও বালুচিস্তানের কালাট অঞ্চলের লোকেরা ব্রাহুই নামে এক দ্রাবিড় ভাষা বলেন । আদি রামেব সময়ের বন্য দ্রাবিড়দের (তখন বালুচিস্তানে খুব সম্ভবত বন-জঙ্গল ছিল) টোটেম-প্রতীক হয়তো ছিল বানর। যুদ্ধে তাঁরা হয়তো বানরেব লাঙ্গুল পরে যেতেন । জন্তু-জানোয়ারদেব ছাল পরে যুদ্ধে যাওয়া আদিম জাতিদের মধ্যে মোটেই দুর্লভ ছিল না ।

এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে বর্তমান অযোধ্যা রাবণ-দমনকারী রামের অযোধ্যা নয় । সেই রাম ইরানের বর্তমান হরিরুদ অঞ্চলের লোক । সেই রাবণ লঙ্কার অর্থাৎ মোহেঞ্জো-দাড়োর দ্রাবিড়-বাসী ব্রাহ্মণ অধীশ্বর । কবির কল্পনায় রাম সু-এর প্রতীক, রাবণ কু-এর । এই সু-এর কাছে কু-এর পরাজয়ই প্রত্যেক বৎসরে রামলীলাতে আমরা আনন্দ সহকারে উৎসব হিসাবে পালন কবি । রামের জন্মভূমি কোথায় ছিল তা এই পালাতে খুবই এক গৌণ ব্যাপার । যে-কোনো জায়গায় হলেও গল্পের রস-সম্ভোগে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না । সুধীজনেরা যদি তথ্যের সাহায্যে এইসব চিন্তা করে তাঁদের অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ও বদ্ধ-ভ্রান্ত-ধারণা-ধারী ভাইদের সংযত করেন তাহলে তাঁরা এক মহা উপকার করবেন ।

অশোক রুদ্র

মার্ক্‌স্‌বাদী ইতিহাসতত্ত্বে নতুন চিন্তা

একথা সুবিদিত যে জ্ঞানবিজ্ঞানেব অনেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য জগতে যখন কোনো নতুন ঢেউ বা আলোড়ন ওঠে তার স্পন্দন আমাদের দেশে এসে পৌঁছাতে বেশ কিছুকাল কেটে যায়। মার্ক্‌স্‌বাদ সম্বন্ধেও কথাটা সত্য। মার্ক্‌স্‌বাদের ক্ষেত্রেও আমাদের দেশের চিন্তাবিদরা প্রায়শই পাশ্চাত্য জগতের মার্ক্‌স্‌বাদী চিন্তাবিদ্‌দের অনুগমন করে থাকেন। এবং গমন ও অনুগমনের মধ্যে কালের ব্যবধানটা অনেক সময় বেশ দীর্ঘই হয়ে থাকে। এখনও ভারতবর্ষে মার্ক্‌সের চিন্তা বলতে বোঝা হয়ে থাকে এমন এক ভাবনাপুঞ্জ যাকে স্তালিনের আমলে 'মার্ক্‌সবাদ' আখ্যা দিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছিল। যাঁরা নিজেদের মার্ক্‌স্‌বাদী বলে মনে কবেন এবং যাঁবা প্রথমোক্তদের বিরোধিতা করেন, এই উভয় গোষ্ঠীর ধাবণার সম্পর্কেই এই কথা সত্য।

স্তালিনের পব অনেককাল কেটে গিয়েছে। দুনিয়ার নানান দেশে, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে, মার্ক্‌স্‌, মার্ক্‌সের চিন্তা, মার্ক্‌স্‌বাদ বলতে কি বোঝানো যেতে পারে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা, বিতর্ক ও আলোচনা চলেছে, অনেক প্রশ্ন তোলা হয়েছে। অধিকাংশেরই মীমাংসা এযাবৎ হয়নি। এমন অনেক ধারণা—যাদের মার্ক্‌স্‌বাদের কেন্দ্র বা ভিত্তি স্বরূপ বলে মনে করা হতো—তাদেবও নতুন করে পবীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। কিছু কিছুকে বর্জনও করা হচ্ছে।

এই ঘটনা অবশ্যই মার্ক্‌স্‌বাদী চিন্তামহলের সুস্বাস্থ্যের ইঙ্গিত দেয়। এই ধারণাকে বলবৎ করে যে মার্ক্‌স্‌বাদী চিন্তাব ক্ষেত্র আবার বৈজ্ঞানিক চিন্তার জগতের অংশীভূত হচ্ছে। মার্ক্‌স্‌ নিজে মানুষেব সমাজকে বোঝার জন্য অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কঠোবভাবে বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসরণ করেই গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু তাঁব জীবদ্দশাতেই তাঁব চিন্তাব ফলকে এমনভাবে 'অভ্রান্ত' সত্যেব গণ্ডী ও বন্ধনের মধ্যে আনার প্রচেষ্টা শুরু করা হয়েছিল যা বিজ্ঞানের চরিত্র বহির্ভূত। বিজ্ঞানে 'অভ্রান্ত সত্যের' কোনো স্থান নেই। অভ্রান্ত সত্যের ধারণাটা অতিলৌকিক চিন্তাব অন্তর্গত। ধর্মপ্রচারকেরা এইপ্রকার অভ্রান্ত সত্যের প্রচার করে গেছেন এবং এখনও করে থাকেন। কিন্তু ভ্রান্তিই বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষণ। বাস্তব দুনিয়াটাকে 'নিয়মের রাজত্ব' বলে মনে করা হলো বিজ্ঞানেব প্রাথমিক সূত্র। নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করাই বিজ্ঞানেব লক্ষ্য। কিন্তু বিজ্ঞান কখনই নিয়ম সম্বন্ধে শেষকথা বলার প্রচেষ্টা করে না। কাজ চালানোর জন্য আজ যে নিয়মকে সত্য বলে গ্রহণ কবা হয়, আগামীকাল তাকেই বর্জন করে এমন নতুন নিয়মকে গ্রহণ করা হয় যার প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপকতর।

বিজ্ঞানের এইভাবে পর্যায়ক্রমে ভ্রান্তির মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার ধাবণা বিষয়ে আমি

নতুন কিছুই বলছি না। কিন্তু যা ততটা সুপরিজ্ঞাত নয় তা এই যে মার্ক্‌স বিজ্ঞানের এই ধারণা অনুযায়ীই কঠোররূপে বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ফলে তিনি তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে যতবার নতুন তথ্য ও অধিকতর চিন্তার ফলরূপে তত্ত্বের পরিবর্তন করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন, ততবারই পরিবর্তন করতে দ্বিধা করেননি। ফলে তাঁর দীর্ঘজীবনের বিশাল ও প্রধানত অমার্জিত চিন্তাপুঞ্জের মধ্যে অনেক অন্তর্বিরোধ লক্ষিত হয়। যাঁরা নিজেদের মার্ক্‌সের অনুগামী বলে মনে করেন তাঁদের অনেকে 'তরুণ মার্ক্‌সের' মধ্যে খোঁজেন সাচ্চা মার্ক্‌স্‌বাদ। আবার অন্য কেউ ঐ একই সাচ্চা বস্তুর সন্ধান করেন 'ক্যাপিটাল'-এ বা 'গ্রুণ্ডরিসে'তে। যাঁরা মার্ক্‌স্‌বাদের বিরোধিতা করেন, তাঁদেরও অনেকে এইপ্রকার যুক্তি ব্যবহার করেন : দেখো, মার্ক্‌সের এই এই ভবিষ্যদবাণী ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দেখো, মার্ক্‌স্‌-দ্বারা সূত্রায়িত এই এই নিয়মকে অনুসৃত হতে দেখা যায়নি।

সুখের কথা এই যে, মার্ক্‌স্‌কে বৈজ্ঞানিক হিসাবে না দেখে ধর্মপ্রচারক হিসাবে দেখার প্রবণতা কমছে। এখন যে প্রবণতা পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী মহলে গুরুত্ব অর্জন করছে তাকে এইপ্রকার বাক্যে প্রকাশ করা যায় : 'সমাজের বিবর্তন বিষয়ে মার্ক্‌স সারাজীবন যে চিন্তা করে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে তুলনীয় মাপের চিন্তা তাঁর জীবদ্দশায় বা পরবর্তীকালে আর কেউ করে যেতে পারেননি। তাঁর চিন্তার থেকে আমাদের শেখার অনেক, অনেক আছে। তার মানে এই নয় যে, তাঁর প্রত্যেকটি কথাকে অভ্রান্ত বলে মনে করতে হবে। এবং মার্ক্‌সের অনুগামী বলে নিজেদের যাঁরা ঘোষণা করেননি এমন অনেক চিন্তাবিদ্‌দের থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে।'

মার্ক্‌স্‌বাদী-চর্চার মধ্যে বৈজ্ঞানিক নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর যে নানান বিভিন্ন বিষয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছে, তাদের মধ্যে একটি হলো মার্ক্‌স্‌বাদী ইতিহাসতত্ত্ব। এই তত্ত্বের অন্যতম প্রধান সূত্র ছিল এই যে, মানুষের সমাজের বিবর্তনের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ স্তর বা ধাপের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায়, সে ধাপগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে এক-একটি উৎপাদন ব্যবস্থা [১]। মার্ক্‌সবাদী মহলে বহুদিন একটি গৃহীত ধারণা ছিল এই যে, এই ধাপগুলি হলো : আদিম কৌমসমাজ, দাসসমাজ, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। এই তত্ত্বটির সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাববিস্তারকারী সূত্র পাওয়া যায় স্তালিনের লেখায়। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত 'ডায়ালেকটিক্যাল অ্যাণ্ড হিসটোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম্' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন :

> '... The primitive communal system is succeeded precisely by the slave system, the slave system by the feudal system, and the feudal system by the bourgeois system and not by some other.'

একই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় বুখারিন-এর 'হিসটোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম' নামক বইয়ে। পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে যত প্রচারমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে এই ধারণাটিকে একই প্রকার সরলতা সহকারে এতবার প্রকাশ করা হয়েছে যে, তা মার্ক্‌সের ইতিহাস-চিন্তার অন্যতম মূলস্তম্ভের মর্যাদা অর্জন করেছে।

শুধুমাত্র কয়েকটি বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থার পরম্পরাই নয়। আরও কিছু গভীর

ও জটিল ধারণাকে একই গুরুত্বসহকারে ঐ সাহিত্যে মার্কস্‌বাদের প্রাণকেন্দ্রে স্থাপন করে দেখা হয়েছিল। যথা, একটি উৎপাদন ব্যবস্থা যে তার পূর্ববর্তী উৎপাদন ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে শুধু তাই নয়, পূর্ববর্তী উৎপাদন ব্যবস্থা তার আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ পরবর্তী উৎপাদন ব্যবস্থাটির জন্ম দেয়। এই ছিল ঐ বিশেষ ইতিহাসতত্ত্বের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় প্রতিপাদ্য। উৎপাদন ব্যবস্থার ধারণাটার মধ্যেই কিছু নিয়মের ধারণা নিহিত আছে—যে নিয়ম অনুসারে কোনো এক উৎপাদন ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে, বিকাশ ঘটে, তারপর তা অবনয়নের পথে নামে, পরিশেষে অবলুপ্ত হয়ে পরবর্তী উৎপাদন ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটায়। এই নিয়মগুলির পশ্চাতে রয়েছে একদিকে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অপরদিকে ঐ বিরোধেরই প্রতিফলনস্বরূপ রয়েছে শ্রেণীসংগ্রাম।

খুব সংক্ষেপে, কয়েকটি আঁচড়ে, যে তত্ত্বটির রূপরেখা আঁকা গেল তার প্রয়োগের সর্বপ্রথম উদাহরণ মার্কসের নিজেরই কৃত ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণ। মার্কস্‌ যদিও সমগ্র মানবসমাজের সার্বিক ইতিহাসের পটভূমিতেই তাঁর সব কাজ করে গিয়েছেন তবু এই কথা সত্য যে তাঁর চিন্তাভাবনা ও সময়ের অধিকাংশই তিনি ব্যয় করেছেন ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণে। ধনতন্ত্রের মধ্যে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক কিভাবে দ্বান্দ্বিকতার সম্পর্কে সম্পর্কিত, কিভাবে তার ফলস্বরূপ একসময় এ উৎপাদন ব্যবস্থা বিকাশলাভ করে, পরে আবার তার সংকোচন ঘটে এবং পরে কিভাবে তা ধ্বংস হয়ে সমাজতন্ত্রের জন্মদান করার প্রতিশ্রুতি বহন করে—কঠোররূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করে তার প্রদর্শনই ছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার প্রধান লক্ষ্য। ধনতন্ত্রের ক্ষেত্রে মার্কস্‌ যে তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন তা যে ধনতন্ত্র-পূর্ববর্তী অন্যান্য উৎপাদন সম্পর্কগুলিতেও প্রযোজ্য হবে একথাটি মার্কস্‌বাদী মহলে ধরেই নেওয়া হয়েছিল। এবং এই ধরে নেওয়ার সপক্ষে মার্কসের বিভিন্ন লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়াও সম্ভব।

স্তালিনের কালের যান্ত্রিক চিন্তার কবল থেকে মুক্তিলাভ করার পর মার্কস্‌বাদী মহলে যে নতুন হাওয়ার চলাচলের কথা উল্লেখ করেছি তার প্রসাদে এখন আবিষ্কৃত হয়েছে যে, মার্কস্‌বাদী ইতিহাসতত্ত্ব বলতে অনেকদিন যা বোঝা হয়েছিল তার অনেকাংশের জন্য স্বয়ং মার্কস্‌কে দায়ী করা যায় না। যেমন, যে অপরিবর্তনীয় পরম্পরার কথা স্তালিনের উদ্ধৃত কথাটিতে পাচ্ছি তার ঐ প্রকার অমোঘতা-সমন্বিত কোনো উল্লেখ মার্কসের লেখায় কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁর যে উক্তিকে স্তালিনের ঐ উক্তির নিকটতম বলে মনে করা যেতে পারে তা হলো তাঁর প্রসিদ্ধ 'প্রিফেস টু দি কনট্রিবিউশানস্‌ টু দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি'-র অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত বাক্যটি :

> '...In broad outline, the Asiatic, the ancient, feudal & modern bourgeois modes of production may be designated as epochs marking progress in the economic development of society.'

মার্কসের এই উক্তি আর স্তালিনের উক্তিটির মধ্যে মিল যা আছে তা হলো ধাপের ধারণা এবং দাসসমাজ, সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র এই তিনটি ধাপের অস্তিত্বের স্বীকৃতি। মার্কসের উক্তিতে আদিম কৌম সমাজের উল্লেখ না থাকলেও অন্যত্র অনেক জায়গাতেই তিনি সেই সমাজের কথা আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিশেষভাবে যা লক্ষণীয় তা এই

যে, তিনি এক 'এশিয়াটিক' সমাজের উল্লেখ করেছেন যা স্তালিনের উক্তিটিতে নেই। বস্তুত ইউরোপের ইতিহাস প্রসঙ্গে মার্কসের লেখায় আদিম সমাজ-দাসব্যবস্থা-সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্র এই পরম্পরার ধারণা পাওয়া গেলেও তাঁর কোনো লেখাতেই তিনি কখনোই ভারতবর্ষ, চীন বা পশ্চিম ইউরোপ বহির্ভূত অন্য কোনো দেশ সম্পর্কে ঐ পরম্পরার উল্লেখ করেননি। শুধু উল্লেখ করেননি তাই নয়। যাঁরা ঐ পরম্পরা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন তাঁদের স্পষ্ট বিরোধিতাও তিনি করেছেন। উদাহরণত কোভালভস্কি নামক কোনো তাত্ত্বিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব বিষয়ে কিছু লিখলে তিনি প্রবল আপত্তি জানান[২]। ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশের জন্য মার্কস্ একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন, যা হলো 'এশিয়াটিক মোড অব প্রোডাকশান'। এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থা—এই শব্দবিন্যাসটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন লেনিন[৩]। কিন্তু ধারণাটি মার্কসের। ঐ উৎপাদন ব্যবস্থাটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যে পরম্পরা স্তালিনের উক্তিতে পাওয়া যায় তাকে সর্বদেশের প্রতি প্রযোজ্য তত্ত্বরূপে গ্রহণ করা হয় মাত্র ১৯৩১ সালে, লেনিনগ্রাদের একটি সম্মেলনে। তার আগে মার্কসের সমকালীন বা অনুগামী তাত্ত্বিকদের মধ্যে (এঙ্গেলস্, প্লেখানভ, লেনিন, ভার্গা ও অন্যান্য অনেক) আদিম সমাজ থেকে শ্রেণী সমাজের উদ্ভব; দাসব্যবস্থা, জার্মানদের আদিম সমাজ ও পরবর্তীকালের সামন্ততন্ত্র—এই তিনের মধ্যে সম্পর্ক ; এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রকৃতি ও প্রয়োগক্ষেত্র, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রচুর গবেষণা, বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছিল। ১৯৩১ সালের পূর্বোক্তি সম্মেলনে এইসবের উপর ধামাচাপা দেওয়া হয় এবং এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থার ধারণাটিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়[৪]। এই অবস্থার অবসান ঘটে ১৯৬৪ সালে। ১৯৩১-এর আগে যে বিতর্ক ঘটেছিল তাতে অংশগ্রহণকারীরা অধিকাংশই ছিলেন সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানী। ১৯৬৪ সালের পর থেকে যে বিতর্ক চলেছে তাতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানী যেমন কিছু আছেন তেমনি আছেন ফ্রান্স, হাঙ্গেরি, ইতালি প্রভৃতি দেশের মার্কসবাদী তাত্ত্বিক[৫]।

১৯৩১-এর পূর্ববর্তীকালীন ও ১৯৬৪-র পরবর্তীকালীন আলোচনার ভিত্তিতে মার্কসের ইতিহাস-বিষয়ক তাত্ত্বিক চিন্তা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত যা এখন নেওয়া সম্ভব তার কিছু আলোচনা করব। প্রথম, উৎপাদন-ব্যবস্থাভিত্তিক ধাপের ধারণায় মার্কস্ আস্থাশীল ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু ইউরোপের ইতিহাসে যে কয়েকটি ধাপ তিনি চিহ্নিত করেছেন তা অন্যান্য সব দেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে তিনি কখনোই মনে করতেন না। এই প্রসঙ্গে খুব পরিষ্কারভাবে তাঁর মতপ্রকাশ করে গিয়েছেন মার্কস্ নিজেই নিম্নলিখিত বাক্যপুঞ্জে :

> 'The chapter on primitive accumulation does not pretend to do more than trace the path by which, in Western Europe, the capitalist order of economy emerged from the world of the feudal order of economy—(to) metamorphose my historical sketch of the genesis of capitalism in West Europe into a historico-philosophic theory of the general path every people is fated to tread, whatever the historical circumstances in which it finds itself...(is) honouring me and shaming me too much.'[৬]।

দ্বিতীয়, উৎপাদন ব্যবস্থার পরম্পরা ভৌগোলিক ও অন্যান্য পরিবেশের দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এইপ্রকার পরম্পরা কতরকম দেখা গিয়েছে সে বিষয়ে এখনো এই ক্ষেত্রে গবেষণায় রত তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতৈক্য ঘটেনি। বিভিন্ন প্রকারের পরম্পরাগত পথের প্রস্তাব যা করা হয়েছে তাদের কয়েকটির উদাহরণ দিচ্ছি। Marian Sawer[৭]-এর মতে মার্ক্সের 'গ্রুণ্ডরিসে' ঘাঁটলে নিম্নলিখিত চারটি পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়: (ক) কৌম সমাজ-দাস সমাজ; (খ) কৌম সমাজ-এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থা; (গ) কৌম সমাজ-সামন্ততন্ত্র ও এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থার মিশ্রণ; (ঘ) কৌম সমাজ-সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্র। লেখিকার মতে (ক) পথটি ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অনুসৃত হয়েছিল। লক্ষণীয় যে পরবর্তীকালের সামন্ততন্ত্রে এই পথ গিয়ে পৌঁছায়নি। (খ) পথটি লেখিকার মতে চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতির ইতিহাসে অনুসৃত হয়েছিল। (গ) পথটি অনুসৃত হয়েছিল রাশিয়া প্রমুখ স্লাভ দেশগুলিতে। এই তিনটি পথের কোনোটিই আপন গতিতে ধনতন্ত্রে গিয়ে উপনীত হয়নি। ধনতন্ত্রে উপনীত হয়েছে যে (ঘ) শীর্ষক পথ তা কিন্তু দাসব্যবস্থাকে অতিক্রম করেনি। মার্ক্সের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব দাসব্যবস্থা থেকে ঘটেনি। ঘটেছিল জর্মন্ কৌম সমাজের থেকে।

আগেই বলা হয়েছে যে বিভিন্ন পথগুলির নির্ণয়ের ব্যাপারে এখনো মতৈক্য ঘটেনি। উদাহরণত, প্লেখানভ প্রমুখ তাত্ত্বিকেরা, যাঁদের সময় মার্ক্সের 'গ্রুণ্ডরিসে' আবিষ্কৃত হয়নি তাঁদের অনেকে নিম্নলিখিত দুটি পথের কথা বলেছেন: (ক) কৌম সমাজ-দাস ব্যবস্থা-সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্র; (খ) কৌম সমাজ-এশিয়টিক উৎপাদন ব্যবস্থা-সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতা। খুব হাল আমলের ফরাসি মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক Godelier-এর মতে 'গ্রুণ্ডরিসে' ঘাঁটলেও দুটির বেশি পথের সন্ধান পাওয়া যায় না[৮]। এক, ইউরোপের ইতিহাসে অনুসৃত পথ: কৌম সমাজ-এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থা-দাস ব্যবস্থা-সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্র। দুই, এশিয়ার ইতিহাসে অনুসৃত পথ: কৌম সমাজ-এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থা—এক বিশেষ গঠন সমন্বিত সামন্ততন্ত্র যা ধনতন্ত্রের জন্মদান করে না।

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে প্লেখানভ প্রমুখদের প্রথম পথটি স্তালিন কথিত পরম্পরার থেকে অভিন্ন। এবং Godelier-কথিত দুটি পথের প্রথমটি আর কিছুই নয়, স্তালিন-কথিত পরম্পরারই এক পরিবর্তিত আকার—কৌম সমাজ ও দাসব্যবস্থার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে।

সম্প্রতি আর এক তাত্ত্বিক, ইতালীর Melotti, মাত্র দুইটি বা চারটি নয়, বেশ অনেক কয়টি পথের আবিষ্কার করেছেন[৯] যার মধ্যে সামন্ততন্ত্রও আছে, এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থাও আছে, আবার সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাও আছে, যার তিনি নামকরণ করেন bureaucratic collectivism। আবার, ভারতবর্ষের মতো দেশের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত অনুন্নত বিকলাঙ্গ ধনতন্ত্রের স্থানও আছে।

তৃতীয় যে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তা এই। উৎপাদন ব্যবস্থার পরম্পরাকে মেনে নিলেও, একটি উৎপাদন ব্যবস্থা পরবর্তী উৎপাদন ব্যবস্থার জন্মপ্রদান করে এই তত্ত্বটি কতটা ধোপে টেঁকে? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দুই দশক আগে ইউরোপের ইতিহাসে সামন্ততন্ত্রের ধনতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়া বিষয়টির উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিতর্ক ঘটেছিল, যা মার্ক্সবাদী চিন্তাজগতে 'ডব্-সুইজি

বিতর্ক' নামে খ্যাত। এই বিতর্কে অনেক বিদগ্ধ মার্ক্সবাদী পণ্ডিত অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কোনো শেষ মীমাংসা হয়নি। এই বিতর্ক থেকে জানা যায় যে সামন্ততন্ত্রের অন্তর্গত কোনো দ্বান্দ্বিক নিয়ম অনুসরণ করে যদি ঐ বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে ধনতন্ত্রের জন্মপ্রদান করে থাকে তো সে বিষয়ে বিশদ কোনো আলোচনা মার্ক্স্ নিজেও করে যাননি, পরবর্তীকালের অন্য কোনো মার্ক্সবাদীও করে দেখাতে পারেননি। ইউরোপের দাসব্যবস্থার অবসান ও সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব—এ দুয়ের মধ্যে যদি কোনো উৎপাদন ব্যবস্থাগত দ্বান্দ্বিক নিয়ম কাজ করে থাকে তো সে বিষয়ে মার্ক্সবাদী পণ্ডিত-মহল আজও নীরব।

উপরে বিভিন্ন ধাপ সমন্বিত পথের যে উদাহরণ দেওয়া গিয়েছে তাতেই দেখা যায় যে Melotti, Sawer প্রমুখ অনেক মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকের মতে দাসব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্র এই দুইয়ের মধ্যে কোন দ্বান্দ্বিক নিয়মের যোগসূত্রই নেই। সেইপ্রকার যোগাযোগ ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের ছিল জর্মন কৌম সমাজের সঙ্গে। এই একই বিষয়ে অন্য কোনো কোনো মার্কসবাদী পণ্ডিত[১০] আরও এগিয়ে গিয়ে এই মত পোষণ করছেন যে কোনো এক উৎপাদন ব্যবস্থার ভিতরে দ্বান্দ্বিক কোনো নিয়ম নিশ্চয়ই কাজ করে যা তার উন্মেষ, উত্থান,পতন ও বিনাশ ঘটায়, কিন্তু পরবর্তী উৎপাদন ব্যবস্থার জন্মের সঙ্গে তা সম্পর্কিত নয়। বড়জোর বলা যেতে পারে যে, পরবর্তী উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের উপযুক্ত জমি পূর্ববর্তী উৎপাদন ব্যবস্থাটি করে দিয়ে যায়।

এযাবৎ আমরা উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে প্রধানত ছয়টির উল্লেখ করেছি, যাদের থেকে কয়েকটিকে বেছে নিয়ে এবং তাদের নানানভাবে সাজিয়ে বিভিন্ন পরম্পরাগত পথের কথা বলা হয়েছে। মার্ক্সবাদী সাহিত্যে এই ছয়টি উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে অন্য কোনো উৎপাদন ব্যবস্থার উল্লেখ কমই পাওয়া যায়। এরকম ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে মানুষের ইতিহাসে বুঝি এই ছয়টি ব্যতীত অন্য কোনো উৎপাদন ব্যবস্থার সম্ভাবনা নেই। বস্তুত, কোনো কোনো মার্কসবাদী তাত্ত্বিক (যথা, Hindess ও Hirst)[১১] যুক্তির মারপ্যাঁচ দিয়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে ছয়টি কেন, পাঁচটির বেশি উৎপাদন ব্যবস্থার কথা ভাবাই যেতে পারে না। এই পাঁচটি হলো, স্তালিনের উদ্ধৃত উক্তির অন্তর্গত পাঁচটি, যাদের মধ্যে এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থা অনুপস্থিত। এই যদি হয় এক মেরু, তো বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ Godelier বলেন, মার্ক্সের লেখায় স্লাভ, কেলট (Celt) প্রভৃতি নৃ-গোষ্ঠীদের সম্পর্কে আলোচনাকালে তাদের নিজস্ব পৃথক উৎপাদন ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর মতে, মার্ক্সকে অনুসরণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সমাজের জন্য পৃথক পৃথক উৎপাদন ব্যবস্থার কথা নিশ্চয়ই ভাবা যেতে পারে।[১২] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খুব সম্প্রতি এক তরুণ গবেষক পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসের মধ্যেই সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের অন্তর্বর্তীকালের জন্য একটি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন[১৩], যা উদ্ভূত হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে বাণিজ্যের মিশ্রণে। এখানে মনে রাখা যেতে পারে যে, ইউরোপিয় ইতিহাস সম্পর্কে প্রায় সব গবেষকই একমত যে সামন্ততন্ত্রের অবনয়ন এবং ধনতন্ত্রের বিকাশের মধ্যে ছিল কয়েকশত বৎসরের ব্যবধান। এই ব্যবধানের কালটিতে কোনো বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল না, এই ছিল মোটামুটি মার্ক্সবাদী মহলে সর্বজনগৃহীত মত।

ইউরোপিয় মার্ক্‌স্‌বাদী পণ্ডিত-মহলে যে ধরনের নতুন নতুন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তার কিছু আলোচনা এতক্ষণ করলাম। এবার আমি এমন কিছু প্রশ্ন তুলতে চাই যা আমার নিজস্ব, যা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, কিন্তু যার কোনো উত্তর এযাবৎ আমার চোখে অন্তত পড়েনি।

'জিজ্ঞাসা'য় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম : 'সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ শক্তিদের ঘাতপ্রতিঘাতে কি ধরনের চলৎশক্তি সমাজ প্রাপ্ত হয় তৎসংক্রান্ত সাযুজ্যের উপর ভিত্তি করে যদি সেই ব্যবস্থাদের সমগোত্র বা বিভিন্ন গোত্র বলে চিহ্নিত করা হয় তো সেই শ্রেণীবিভাগ হয় তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পক্ষে সুবিধাজনক। ইউরোপিয় ফিউড্যালিজম্‌ তার অভ্যন্তরীণ ঘাতপ্রতিঘাতজনিত শক্তির দ্বারা যেভাবে বিবর্তিত হয়েছিল অনুরূপ বিবর্তনের সম্ভাবনা অন্য দেশ ও কালের যে সমাজব্যবস্থায় অনুপস্থিত সেই ব্যবস্থাকে কোনো কোনো বাহ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ফিউড্যাল আখ্যা দিয়ে সেই সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ গতিপ্রকৃতি বোঝার ব্যাপারে কোনোই সুবিধা পাওয়া যায় না'[১৪]।

আমার এই মত অনুসারে ইতিহাসের বিভিন্ন স্থান ও কালের সমাজের উপর বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থার ধারণার প্রয়োগ করার আগে যা করা প্রয়োজন তা হলো বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থাগুলির ক্ষেত্রে কোনো সমাজ তার অভ্যন্তরীণ শক্তিদের ঘাতপ্রতিঘাতে কি ধরনের চলৎশক্তি প্রাপ্ত হয় তৎসংক্রান্ত নিয়মগুলি আবিষ্কার করা। আমার মতে এইপ্রকার নিয়ম যে আবিষ্কার করা যায় এই অনুমানটিই উৎপাদন ব্যবস্থার ধারণার সপক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি। এইপ্রকার নিয়ম যদি কাজ নাই করে তো উৎপাদন ব্যবস্থার ধারণাটার আর কোনো তাত্ত্বিক বা প্রয়োগিক মূল্য আছে বলে আমি মনে করি না। সেক্ষেত্রে নিছক নামকরণ নিয়ে লড়াইয়ের সার্থকতাই বা কি তাও আমার বোধগম্য নয়। যখন দেখা যায় যে, কোনো কোনো মার্ক্‌স্‌বাদী তাত্ত্বিক এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন—চীন হোক, জাপান হোক, ভারত হোক, মিশর হোক, আফ্রিকার কোনো অঞ্চল হোক, আমেরিকাব রেড্‌ ইণ্ডিয়ানদের কোনো সমাজ হোক সর্বত্রই ঐ একই উৎপাদন ব্যবস্থার অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছেন, আবার অন্য কোনো তত্ত্ববিদ্‌ ঐ একই বিস্তীর্ণ স্থান ও কাল জুড়ে যা পাচ্ছেন তার সবকিছুকেই সামন্ততন্ত্র বলে চিহ্নিত করছেন, তখন 'হযবরল'-এর নিম্নলিখিত পরিচয় প্রদান না মনে এসেই পারে না : 'আমার নাম হিজিবিজ্‌বিজ্‌, আমার ভায়ের নাম হিজিবিজ্‌বিজ্‌, আমার বাবার নাম হিজিবিজ্‌বিজ্‌, ...আমার পিশের নাম হিজিবিজবিজ্‌, ...আমার মামার নাম তকাই, আমার খুড়োর নাম তকাই, আমার মেশোর নাম তকাই, আমার শ্বশুরের নাম তকাই—... না না, আমার শ্বশুরের নাম বিস্কুট।'

বস্তুত, হাল আমলে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে মার্ক্‌স্‌বাদী মহলে যে আলোচনা ও বিতর্ক চলেছে তার অন্যতম প্রধান দুর্বলতা মনে হয় এই যে, উৎপাদন ব্যবস্থাগুলিকে যথেষ্ট গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে দেখা হচ্ছে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল বিন্যাসের চোখে।

ধনতন্ত্রের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব-সম্ভূত গতির উপরে মার্ক্‌স্‌ নিজে অনেক কাজ করে গিয়েছেন, তারপরেও অনেক কাজ করা হয়েছে। যদিও একথা বলা যাবে না যে, ঐ বিষয়ে কোনো তর্কাতীত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য উৎপাদন

ব্যবস্থাগুলির উপরে প্রায় কোনো কাজই করা হয়নি। মার্ক্‌স্‌ নিজেও করে যাননি, তাঁর পরেও কেউ ঐ কাজে বিশেষ হাত দেননি। দাসব্যবস্থার গতিধর্ম বিষয়ে কাজ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সামন্ততন্ত্রের গতিধর্ম নির্ণয়ের উপর খানিক কাজ হয়েছে। বছর কুড়ি আগে পোল্যাণ্ডের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে একটি তাত্ত্বিক কাজ করেছিলেন Witold Kula[১৫]। বছর কয়েক আগে ফ্রান্সের নর্ম্যাণ্ডির ইতিহাসকে ভিত্তি করে একটি বিকল্প তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন Guy Bois[১৬]। দুটি কাজই অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে করা এবং খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে এই কাজ দুটিকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করতে হয়। এই দুই গবেষকই আঞ্চলিক ভিত্তিতে কাজ করলেও তাঁদের সূত্রায়িত নিয়মগুলিকে সামন্ততন্ত্রের সাধারণ নিয়ম বলে তাঁরা উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু নিয়মগুলি দুটি ক্ষেত্রে একেবারেই ভিন্ন। সামন্ততন্ত্রের সাধারণ গতিনিয়ম যদি কিছু থেকে থাকে তো তা বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন চেহারা নিতেই পারে। কিন্তু এই দুটি বিশেষ কাজের ভিত্তিতে সেই সাধারণ গতিনিয়ম সম্পর্কে কোনো ধারণা করা সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিতীয় কথা এই যে, এঁদের দুজনেই যা সূত্রায়িত করেছেন সামন্ততন্ত্রের অধিষ্ঠানকালে তার গতিবিধি। সামন্ততন্ত্রের থেকে ধনতন্ত্রের উদ্ভব কিভাবে ঘটেছে বা কিভাবে ঘটতে পারে তার নিয়ম তাঁরা সূত্রায়িত করতে পারেননি।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আমার মনে জাগে এবং যার কোনো উত্তর আমি এখনো খুঁজে পাইনি, তা হলো এই। মার্ক্‌সের ইতিহাসতত্ত্বের অন্যতম প্রধান সূত্র বলে যাকে মনে করা হয় তদনুসারে ইতিহাসে গতিসঞ্চার করে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্পর্ক। কোনো বিশেষ উৎপাদন সম্পর্ক এক অবস্থায় তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎপাদিকা শক্তিদের বিকাশের সহযোগিতা করে। পরিবর্তিত অবস্থায় সেই উৎপাদন সম্পর্কই উৎপাদিকা শক্তিদের বিকাশে বাধাপ্রদান করতে শুরু করে। তখন প্রয়োজন হয় সামাজিক বিপ্লবের। যদি ঐ প্রকার বিপ্লব উৎপাদন সম্পর্ককে পরিবর্তিত করে বাধা অপসারণ করতে পারে, তবেই আবার নতুন করে উৎপাদিকা শক্তিদের বিকাশ শুরু হয়। এই তাত্ত্বিক বিষয়টিকে যে ভাষায় মার্ক্‌স্‌ নিজে[১৭] এবং পরবর্তীকালের বিভিন্ন মার্ক্‌স্‌বাদী পণ্ডিত আলোচনা করে গিয়েছেন, তা থেকে এইরূপ ধারণা হতে পারে যে, উৎপাদিকা শক্তিদের আছে এক প্রবণতা স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বনির্ভরভাবে বিকশিত হওয়ার। উৎপাদন সম্পর্কের সেরকম কোনো প্রবণতা নেই। উৎপাদন সম্পর্কে পরিবর্তনকে অনেক সময় আনতে হয় জোর করে। আমার প্রশ্নটা এই : উৎপাদিকা শক্তিদের বিকাশ স্বনির্ভর—এই কথাটা কি মেনে নেওয়া যায় ? সেই বিকাশের পশ্চাতে কি কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না ? উৎপাদন সম্পর্ক যদি উৎপাদিকা শক্তিদের অনুগমন করে তো উৎপাদিকা শক্তিদের গমন সম্ভব করে যে শক্তি তার উৎস কি ?

আমার অনুমান, অনেক মার্ক্‌স্‌বাদী তাত্ত্বিকই এই প্রশ্নের মোকাবিলা করবেন এইভাবে। তাঁরা বলবেন, উৎপাদিকা শক্তিদের বিকাশ অবশ্যই স্বনির্ভর নয়। এই বিকাশ ও উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন পরস্পর নির্ভরশীল, দ্বান্দ্বিকতার যোগে যুক্ত। এই উত্তর আমাকে খুব সন্তোষ প্রদান করে না। 'হিং টিং ছট্‌' মন্ত্র উচ্চারণের মতো 'দ্বান্দ্বিক' বা 'ডায়ালেক্‌টিক্যাল' শব্দ উচ্চারণের দ্বারা অনেক সমস্যাকেই ধামাচাপা দেওয়া হয়ে থাকে, আমার তাতে বিশেষ আস্থা নেই। এইক্ষেত্রে আমি আবারও প্রশ্ন তুলব, 'দ্বান্দ্বিক

সম্পর্ক তো বুঝলাম। কিন্তু এই সম্পর্কজনিত গতির সঞ্চার ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশ ও শিল্পবিপ্লবের সময়ে যেভাবে ঘটেছিল তা চীন, ভারত প্রভৃতি অন্য দেশে ঘটল না কেন, ইউরোপেই বা আরও আগে ঘটল না কেন ?' এখানে আবার কেউ কেউ সহজ সমাধানের পথ বাৎলে দেবেন : চীনে বা ভারতবর্ষে সম্ভব হলো না, তার কারণ ইউরোপিয় সাম্রাজ্যবাদ প্রদত্ত বাধা। এই উত্তরটি অধুনাকালে খুবই জনপ্রিয়। এমনকি পণ্ডিত মহলেও। শুধু আমাদের দেশে নয়, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও সত্যিই গ্রহণযোগ্য নয়। নিষ্ঠা সহকারে ইতিহাস পাঠ করলে স্পষ্টই দেখা যায় যে অতীতে, বির্ভিন্ন সময়ে, বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ও চীন পশ্চিম ইউরোপ থেকে অনেক দূর এগিয়ে থাকলেও ইউরোপিয় সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের বেশ কিছু আগে থেকেই বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, শিল্পে প্রায়োগিক বিদ্যার উৎকর্ষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপে প্রগতি তুলনাতীতভাবে বেড়ে গিয়েছিল। বস্তুত, ইউরোপিয় সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের বস্তুগত ভিত্তিই তো এই তুলনামূলক প্রগতি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, জাতীয়তাবাদী মন কিছুতেই একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চায় না : ইউরোপ কেন ভারতকে উপনিবেশে ও চীনকে আধা-উপনিবেশে পরিণত করতে সমর্থ হলো ? উল্টোটা ঘটল না কেন ? ইউরোপকে উপনিবেশে পরিণত করে কেন ঘটল না ভারতে বা চীনে শিল্পবিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ?

তৃতীয় একটি প্রশ্ন যা আমার মনে জাগে তাকে আমি যেভাবে সূত্রায়িত করছি সেইভাবে করা না হলেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা যে হয়নি তা নয়। কিন্তু ঠিক ঐ কারণেই, অর্থাৎ প্রশ্নটিকে এই বিশেষভাবে সূত্রায়িত না করার দরুনই, এই বিষয়ে মার্কস্‌বাদী আলোচনায় রয়ে গিয়েছে একটি ঘোলাটে ভাব। প্রশ্নটি এই। যখন বলা হয়, মানুষের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, তখন কি যে-কোনো শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের কথা বোঝান হয় ? আমার মনে হয়, মার্কস্ কখনই সেই মত পোষণ করেননি। আগেই বলা হয়েছে, ইতিহাসের চালিকাশক্তি[১৮]-রূপে কখনো মার্কস্ উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বিরোধকে চিহ্নিত করেছেন, কখনো তিনি শ্রেণীসংগ্রামকে ঐ চালিকাশক্তির ভূমিকা দিয়েছেন। এই দুটি সূত্রের মধ্যে যদি কোনো বিরোধ না থেকে থাকে তো মনে করতে হয় যে, কোনো এক শ্রেণী উৎপাদিকা শক্তিদের বিকাশের উদ্যোগে রত রয়েছে, অপর এক শ্রেণী সমাজের শীর্ষস্থান গ্রহণ করে অধিষ্ঠিত উৎপাদন সম্পর্ককে সংরক্ষণের মধ্যে নিজ স্বার্থ খুঁজে পাচ্ছে—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যে সংগ্রাম, তাকেই দেওয়া হয়েছে ইতিহাসের চালক-ভূমিকা। এই তত্ত্ব অনুসারেই মার্কস ধনতন্ত্রের উত্থানকালে বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকাকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দিত করেছিলেন। স্পষ্টতই তিনি সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে যে সংগ্রাম চলেছিল সে সংগ্রামকেই ইতিহাসের চালিকাশক্তিরূপে মনে করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতিকালের অনেক মার্কস্‌বাদী লেখক সামন্ততন্ত্রের অবনয়নের যুগে ইউরোপে যে কৃষি বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল এবং ফরাসি বিপ্লবে শহরবাসী শ্রমিক এবং গ্রামবাসী কৃষকেরা যেভাবে অংশগ্রহণ করেছিল তার আলোচনা এমনভাবে করে থাকেন যার থেকে মনে হতে পারে যে, আসল শ্রেণীসংগ্রামটা বুঝি ছিল একদিকে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী অপরদিকে নবোদ্ভিন্ন শিল্পের শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষক এই দুইয়ের মধ্যে। শুধু মনে হওয়ার

কথা নয়—কোনো কোনো মার্কস্‌বাদী পণ্ডিত ঠিক এই কথাটি বেশ পরিষ্কারভাবেই বলেছেন। যেমন ডব্‌ ও সুইজির যে বিতর্কের কথা আগে বলা হয়েছে[১৯] তাতে সুইজি প্রশ্ন রাখেন সামন্ততন্ত্রের চালিকাশক্তিরূপে কাজ করেছিল যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তার স্বরূপ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে ডব্‌ সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী ও সার্ফ বা ভূমিদাসদেব দ্বন্দ্বের কথা বলেন, বুর্জোয়া শ্রেণীর কথা বলেন না। এবং হিলটন্‌[২০] প্রমুখ আরো কোনো কোনো পণ্ডিত তাঁকে সমর্থন জানান। এই উত্তর আমাকে অবশ্যই বিভ্রান্ত করে। ঐ বিতর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্যের স্বপক্ষে কোনো বিস্তীর্ণ আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। ধনতন্ত্রের বিকাশের উপর যে বিশদ বিস্তীর্ণ আলোচনা ডব্‌ করেছেন, তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থে[২১] তাতেও কিন্তু স্পষ্টই দেখা যায় যে, উৎপাদিকা শক্তিদের বাহকের ভূমিকা ছিল বুর্জোয়াদের, ভূমিদাসদের নয়।

সমাজের সর্বনিম্নে স্থাপিত, সর্বাপেক্ষা শোষিত পীড়িত জনগণকে বৈপ্লবিক ভূমিকা প্রদান করার মধ্যে আমাব মনে হয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তির চেয়ে বেশি কাজ করে রোমান্টিক আবেগের প্রভাব। বঞ্চিত মানুষ সম্পর্কে এই একই ধরনের রোমান্টিক ধারণা সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের আচ্ছন্ন করে আমাদেব দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর মূল্যায়ন সম্পর্কিত আলোচনার জলকে ঘোলা করে দিচ্ছে। এই মহলে যে প্রবণতা খুব জাঁকিয়ে বসেছে, তা হলো রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগব, নিউ বেঙ্গল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাবৎ সমাজ সংস্কারকদের অবদানকে এককথায় নস্যাৎ করে দিয়ে সাঁচ্চা বিপ্লবের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করা সাঁওতাল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ওয়হাবি বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতিদেব। কিন্তু স্পার্টাকাসের পক্ষে সম্ভব ছিল না তৎকালীন দাসব্যবস্থার মধ্যে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা। তাকে আমরা মর্যাদা দিই মানুষের অবিনশ্বর স্বাধীনতাকামী সত্তার জ্বলন্ত মশাল হওয়ার জন্য। একই মর্যাদা প্রাপ্য বীরসা মুণ্ডা, তিতুমির প্রভৃতিদের। এই কথাটি আমাদের দেশের মার্কস্‌বাদী মহলে কেউ বলতে সাহস পাচ্ছেন না, পাছে তাকেও প্রতিক্রিয়াশীলদের দলে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু ইউরোপে এমন পণ্ডিতের অভাব নেই, যাঁরা ভুলে যাচ্ছেন না যে বিদ্রোহ আর বিপ্লব সমার্থক নয়। যে-কোনো শ্রেণী-বিদ্রোহই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে না। ফরাসি ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা কবেন তাঁদের মধ্যে অনেক মার্কস্‌বাদী পণ্ডিত[২২] এমনও বলেন যে, ফরাসি বিপ্লব বলে যে রক্তাক্ত ঘটনাবলী ইতিহাসে খ্যাত, সামন্ততন্ত্রের ধনতন্ত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য তার সত্যি কোনো প্রয়োজন ছিল না। সমাজের গঠনে যে যে পরিবর্তন ঐ বৈপ্লবিক রূপান্তব সূচিত করে তাদের অধিকাংশই ১৭৮৯ সালের অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

মার্কস্‌বাদী ইতিহাসতত্ত্ব বিষয়ে অন্য আলোচকদের ও আমার নিজের যেসব প্রশ্ন তুললাম তাব থেকে যদি কোনো পাঠক মনে কবে বসেন যে, আমি সমগ্র মার্কস্‌বাদী ইতিহাস চিন্তাকেই ভ্রান্তি বলে উড়িয়ে দিচ্ছি তো খুবই ভুল বুঝবেন। নতুন প্রশ্ন ওঠা পুরাতন উত্তরকে বাতিল করা—বিজ্ঞানের ধর্মই তো এই। সতর্ক পাঠক লক্ষ করবেন যে, যে প্রশ্নগুলি তুললাম তা তোলা সম্ভবই হতো না যদি-না দাঁড়াতে পারতাম এমন জমিতে যে জমি তৈরি করে গিয়েছেন কার্ল্‌ মার্কস্‌।

উল্লেখপঞ্জী :

১. 'উৎপাদন ব্যবস্থা' বলতে ইংরেজিতে Mode of Production বলতে যা বোঝায় তাই বোঝাচ্ছি। 'উৎপাদিকা শক্তি' বলতে বোঝাচ্ছি Forces of Production, 'উৎপাদন সম্পর্ক' বলতে বোঝাচ্ছি Relations of Production.

২. এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য :
'The work which stimulated many of Marx's strictures on applying the concept of feudalism to Asiatic Society was that of M.M. Kovalevsky on communal land tenure, a copy of which the author sent to Marx on publication in 1879 ... Marx rejected the inferences which had led Kovalevsky to this conclusion ... In general the Indian tax no more converted landed property into feudal property than did the land tax in contemporary France. The fact that the tax was used by the government as a payment to its appointees did not make the latter into feudal lords'— Marian Sawer, *Marxism and the Asiatic Mode of Production*, Martiners Nijhof, The Hague, 1977.
লেখিকা এই প্রসঙ্গে যে উৎসের সন্ধান দিয়েছেন তা হলো :
"Marx's Conspectus of Kovalevsky", *Sovetskie Vostokovedenie*, 1958. No. 4 and No. 5.

৩. লেনিন "Report on the Unity Congress"-এ লেখেন :
'To the extent that there existed (or if there existed) nationalisation of land in Muscovite Russia, then its economic foundation would have been the Asiatic Mode of Production.' *Collected Works* (Russian edition), Vol. IX (1930), p. 187.

৪. এই সম্মেলনের বিষয়ে অনেক বিবরণ পাওয়া যায় Marian Sawer-এর উপরে উল্লিখিত বইয়ে। নীচে উল্লিখিত Melotti-র বইয়েও বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

৫. ১৯৩১ সালের আগে পর্যন্ত বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হলো :
Plekhanov, Varga, Wittfogel, Riazanov, Madiar, Lominadze, Shmonin, Kokin, Papian, Dalin, Kantorovitch, Paul Fox ইত্যাদি।
১৯৬৪-র পর থেকে যে আলোচনা ও বিতর্ক ঘটেছে তাতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন সোভিয়েত য়ুনিয়নের Varga, Vasilev, Sedov, Kachanovsky, Stuchevsky; ফ্রান্সের Garaudy, Godelier, Suret-Canale; হাঙ্গেরির Tokei; ইংলণ্ডের Hobsbawm ইত্যাদি।

৬. দ্রষ্টব্য : Karl Marx, "Letter to the Editorial Board of *Otechestvenniye Zapiski*, No, 1877"; English translation in *Karl Marx and Friedrich Engels: Basic Writings on Politics & Philosophy*, Edited by Lewis S. Feuer. Fontana Boods, London, 1972, pp. 478-9.

৭. টীকা ২-এ উল্লিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৮. Godelier তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন ১৯৬৫ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত Seventh International Congress of Anthropology ও Ethnography-তে। পরে বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত যেসব লেখায় এ বিষয়ে তাঁর আলোচনা পাওয়া যায় তার মধ্যে নিম্নলিখিত বইটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য :
Centre d'Etudes et de Recherches Marxistes, *Sur les Societes Precapitalistes*, perface de Maurice Godelier, Editions Sociales, 1973.

৯. Umberto Melotti, *Marx and the Third World*; ইংরেজি অনুবাদ, The Macmillan Press Ltd., 1977.
১০. যথা, ফরাসি J.J. Goblot ও ইংরেজ Hobsbawm। প্রথমোক্তের নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য : "Pour une approche theorique de faits de civilisation", *La Pensee,* Nos.133/134/135 (1967).
১১. Barry Hindess and Paul Q. Hirst, *Pre-capitalist Modes of Producation,* Routledge & Kegan Paul. 1975.
১২. টীকা ৮ দ্রষ্টব্য।
১৩. Pierre Bezbach, *La Societe Feodo-Marchande,* Editions Anthropos, 1983.
১৪. "সামন্ততন্ত্র না ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ?" 'জিজ্ঞাসা', বর্ষ ২, সংখ্যা ৪।
১৫. Witold Kula, *An Economic Theory of the Feudal System,* 1962 (ইংরেজি অনুবাদ, Humanities Press, 1976.).
১৬. Guy Bois, *The Crisis of Feudalism* 1976. (ইংরেজি অনুবাদ, Cambridge University Press, এবং Editions de la Maison des Sciences de l' Homme, 1984.)
১৭. উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যায় মার্ক্সের নিম্নলিখিত উক্তিটি :
'At a certain stage of their development, the material productive forces of society come in conflict with the existing relations of production, or—what is but a legal expression for the same thing—with the property relations within which they have been at work hitherto. From forms of development of the process of production these relations turn into their fetters. Then begins an epoch of social revolution.' — Karl Marx, Preface to *A Contribution to the Critique of Political Economy.*
১৮. ইংরেজিতে যাকে motive force বলে তার কথা বোঝানো হচ্ছে।
১৯. দ্রষ্টব্য : Rodney Hilton, (editor), *The Transition from Feudalism to Capitalism,* Verso Edition, 1978
২০. টীকা ১৯-এ উল্লিখিত গ্রন্থে Rodney Hilton-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
২১. Maurice Dobb, *Studies in the Development of Capitalism,* Routledge & Kegan Paul, 1975.
২২. যথা, Francois Furet ও Denis Richet, *La Revolution Francaise.*

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

প্রাণ ও অপ্রাণের সীমান্তে : বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত

বসন্তের সেই ঝোড়ো সন্ধ্যায় আমাদের তর্কটা বেশ জমেছিল । গোসলাবকে ঠিক শহর বলতে ইচ্ছা করে না—বড়ো বাড়িঘর খুব বেশি চোখে পড়ে না, রাত নটা বাজতে না বাজতেই রাস্তাগুলো ফাঁকা, তাদের শাণ-বাঁধানো মসৃণ পিঠের উপর দিয়ে শীতের হাওয়া বইছে হাড়গুলোকে ঈষৎ কাঁপিয়ে দিয়ে, শুধু আমাদের জুতোর শব্দই নীরবতা ভঙ্গের অপরাধ করে চলেছে একঘেয়ে ছন্দে । পূর্ব জার্মানির সীমান্তের কাছাকাছি এই ছোট জনপদে আমরা দুজনে সেদিন একটি ছোটখাট কীর্তিরচনা করতে পেরেছিলাম—অন্তত অল্পক্ষণের জন্যও আমাদের পথ হারিয়ে গিয়েছিল । আমরা দুজনে, অর্থাৎ আমি আর শ্রীযুক্ত ফিরশভ । ফিরশভের পরিচয় এই যে তিনি মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক, সুরসিক এবং আড্ডাবাজ । পথ হারানোর দুটো কারণ ছিল; একটু আগেই গোসলারের পুরভবনের পাতাল-রেস্তোরাঁয় সান্ধ্য আহারটা বড়ো ভালো উৎরেছিল, আর হয়তো সেই কারণেই খুশিমনে অনেক বিষয়ে একমত হতে হতে আমরা এমন একটা বিষয়ে গিয়ে ঠোক্কর মেরেছিলাম যেখানে একমত না হওয়ার কিছু কিছু স্বাভাবিক কারণ ছিল । বিষয়টা ছিল প্রাণ আর অপ্রাণের সীমান্ত—পরলোকতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বিজ্ঞানের দিক থেকে । রাত হয়ে আসছিল, হাওয়ার দাপট ক্রমশ বাড়ছিল, আর ফিরশভকে আমি কোনোমতে বোঝাতেই পারছিলাম না যে জড়জগৎ আর প্রাণীজগতের মধ্যে সীমারেখা যথার্থই স্পষ্ট নয়, এমন কোনো প্রাণবস্তু নেই যার সাহায্যে ওই দুজগতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি ।

ইয়োরোপে আগেকার যুগে পদার্থের শ্রেণীভেদের প্রশ্ন উঠলে লোক জিজ্ঞাসা করত : 'এটা কি জন্তু, না সবজি, না খনিজ ?' এখনকার দিনে ব্যাপারটা আমাদের কাছে নিশ্চয়ই উদ্ভট ঠেকবে । তবু যখন 'প্রাণশক্তি' নামক বিশেষ কোনো সত্তার কথা আমরা বলি তখন একথা মানতেই হবে যে একদিকে 'জন্তু' আর 'সবজি', এবং অন্যদিকে 'খনিজ' এই দুই শ্রেণীর মধ্যে একটা মৌল পার্থক্যের কথাই আমরা বলছি । আজকের ভাষায় বলতে গেলে কথাটা দাঁড়ায়, যে-কোনো সপ্রাণ সংস্থার বিকাশ ও আচরণকে চালিত করছে এমন এক বিশেষ শক্তি, যাকে নিছক পদার্থবিজ্ঞান কিংবা রসায়নশাস্ত্রের সাহায্যে বোঝা যাবে না । মুশকিল হচ্ছে, এই 'প্রাণশক্তি'-র সঠিক কোনো সংজ্ঞা দেওয়াও সহজ নয়। তাতে অবশ্য সেদিন আমাদের খুব ক্ষতি কিছু হয়নি—মে মাসের সেই হিমাক্ত সন্ধ্যাকে একটু সমস্যা-ভারাতুর করে তুলেছিল মাত্র ।

শ্রীযুক্ত ফিরশভকে অবশ্য এ-ব্যাপারে মোটেই নিঃসঙ্গ বলা চলে না । স্মরণাতীত কাল থেকে 'প্রাণশক্তি', 'প্রাণবায়ু' ইত্যাদি শব্দ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের রূপকথার অঙ্গ হয়ে গেছে । বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীরও নাম করা যেতে পারে, যাঁরা এই রূপকথাকে আরও

বর্ণময় করে তুলেছেন। ঔপন্যাসিক ডি. এইচ. লরেন্সের মনে রক্ত সম্বন্ধে এক ধরনের মরমী দার্শনিকতা ছিল; তাঁর নিজের ভাষায় বলতে হয়[১]: 'মানসিক এবং স্নায়বিক চৈতন্য ছাড়াও আমাদের একটা রক্তগত সত্তা আছে, রক্তগত চৈতন্য আছে, এমনকি রক্তগত আত্মাও আছে।' ইউজিন হ্বিগনারের মতো বিশিষ্ট পদার্থবিদও একজায়গায় বলেছেন[২]: 'যাকে আমরা চৈতন্য বলি, সেই ঘটনার অপ্রতিরোধ্য সাক্ষ্যই বায়োটোনিক নিয়মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে।' এই বায়োটোনিক নিয়ম কি জিনিস? না, এমন কতকগুলি নতুন নিয়ম যা মূলত পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলী থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু তাদের বিরোধী নয়। খুব ভুল হবে না, যদি বলি বায়োটোনিক নিয়ম হলো প্রাণশক্তির রূপকথার বৈজ্ঞানিক সংস্করণ।

প্রাণতত্ত্বের এই পৌরাণিক ব্যাখ্যার ইতিহাস অবশ্যই চিত্তাকর্ষক।[৩] তবু শেষ পর্যন্ত এ প্রশ্নে আসতেই হয়: আজকের বিজ্ঞান এ-সম্বন্ধে কি ভাবছে? উদ্ভিদেরও যে প্রাণ আছে, একথা অধিকাংশ লোকেই মেনে নেবেন। তাই 'জন্তু' আর 'সবজিব' প্রভেদ নিয়ে উদ্বিগ্ন না হলেও চলবে। কিন্তু এ প্রশ্ন তো করা যায় যে, ধরুন, একটুকরো ফটকিরির সঙ্গে হামের যে ভাইরাস তার তফাৎটা কি? রসায়নের মাধ্যমিক পাঠ্যগ্রন্থে বলে যে জলের মধ্যে খানিকটা ফটকিরি গুলে নিয়ে তাতে যদি একটুকরো ফটকিরির কেলাস ডুবিয়ে রাখি, তবে সেই কেলাস আয়তনে বাড়বে। অর্থাৎ অন্তত বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, ভাইরাসের মতোই ফটকিরির কেলাসও বৃদ্ধির ক্ষমতা রাখে। অপরপক্ষে প্রাণতত্ত্ববিদ সাক্ষ্য দেবেন যে অবস্থা বিশেষে ভাইরাসকেও কেলাসিত করা যায়। এই 'খনিজ' চারিত্রটিতে সে ফটকিরির টুকরোর সমানধর্মা। অবশ্য জীবিত কোষের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে ভাইরাস নিজের অবিকল প্রতিরূপের জন্ম দিতে পারে। ফটকিরির টুকরোর মধ্যে এই জনন-ক্ষমতা নেই; অন্তত প্রচলিত অর্থে তাকে জননশীল বলা যায় না। আবার এও তো ঠিক যে বিশেষ বিশেষ জীবিত কোষের আতিথেয়তা ছাড়া ভাইরাসও জননে অক্ষম। এই কাজের জন্য তার চাই এমন জৈব অনুঘটক বা এনজাইম যা এই বিশেষ কোষের মধ্যেই পাওয়া সম্ভবপর। দেখা যাচ্ছে, এইসব প্রশ্নের শিকড় প্রাণতত্ত্বের বেশ একটু গভীরে ছড়িয়ে আছে। অন্যপক্ষে বলা যায়, 'নেতি নেতি' করে যে জানা, সেটা ঠিক বিজ্ঞানের জানা নয়। বিজ্ঞানী চান মনে মনে ছবি আঁকতে, মডেল তৈরি করতে। সেই মডেল তৈরির প্রথম ধাপ হচ্ছে কিছু কিছু সুস্পষ্ট ইতিবাচক লক্ষণ খুঁজে বার করা।

যে-কোনো সপ্রাণ সংস্থার একটা লক্ষণ হচ্ছে উঁচুদরের বিন্যাস ও জটিলতার একত্র সমাবেশ। আণবিক স্তরে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, ফটকিরির কেলাসের তুলনায় ভাইরাসের কেলাস অনেক বেশি জটিল। সবচেয়ে ছোটো যে ভাইরাস, তার মধ্যেও থাকে প্রায় দশ লক্ষ পরমাণু। আর এই সমস্ত পরমাণু এমনভাবে সাজানো থাকে যে হামের ভাইরাসের একটিমাত্র কণার সপুঙ্খ বর্ণনা দিলেই কার্যত অনুরূপ সমস্ত হামের ভাইরাসের কণার বর্ণনা দেওয়া হয়ে যায়। উচ্চতর কোটির জীবের মধ্যে এই বিন্যাস আরও অনেক বেশি লক্ষণীয়। চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে আচার্য বিনোবা ভাবের সঙ্গে চম্বলের একজন ডাকাতের যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, এটা বলে দেওয়া যায় যে এঁদের দুজনের শরীরেই যে-কোনো একটি প্রোটিনের গড়ন একই রকমের। চরিত্র-

লক্ষণ শুধু উত্তরাধিকারের দ্বারাই নির্ণীত হয় না—অতি জটিল জৈবসংস্থা হিসাবে পরিবেশের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া করতে করতে আমরা নিজের স্বভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গিকেও বেশ খানিকটা বদলে ফেলতে পারি। চেতন ও অচেতন স্তরে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—যার মধ্যে অনিশ্চয়তার উপাদান মোটেই নগণ্য নয়—সেই বদলকে নিয়ন্ত্রিত করে। তবু ওরই মধ্যে অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে তৈরি আমাদের এই শরীর মোটামুটিভাবে তার রাসায়নিক এবং ভৌত গড়ন বজায় রাখে ; অণুতে অণুতে ভ্যান ডার হ্বালস বলের দরুন আকর্ষণ ছিন্ন হতে জীবৎকাল কেটে যায়। ফলে দীর্ঘকাল ধরে আমাদের মধ্যে যে-কোনো একজনকে সহজেই একই ব্যক্তি হিসাবে চেনা যায়।[৪] অতিরিক্ত সুখ কিংবা দুঃখের মুহূর্তে আমাদের অধিবৃক্ক গ্রন্থির ক্ষরণ বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু তারই মধ্যে শরীরের অসংখ্য কোষ সুশিক্ষিত সৈন্যের মতো সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করে যায়—খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানকে জীর্ণ করে, তার মধ্যে যা কিছু কাজের জিনিস তা হজম করে, বাকি আবর্জনাকে বর্জন করে, বেঁচে থাকার পক্ষে অপরিহার্য বহু দ্রব্য প্রস্তুত করে, ভাইরাস আর জীবাণুর মতো বহিঃশত্রুর সঙ্গে নিয়ত লড়াই করে। এই কোষগুলি আবার বিভিন্ন আকার ও আয়তনের অসংখ্য অণুর সমষ্টি। এককথায় বলা যায়, প্রতিটি কোষ যেন মজবুত উপাদনে গড়া সুদৃঢ় একেকটি থলি। এই সুদৃঢ় প্রাচীরের ঠিক ভিতরেই থাকে বিশেষ এক ধরনের ফিলটার, পরিভাষায় যার নাম কোষ-কলা বা কোষ-ঝিল্লি। কোষের ভিতরে নানা ধরনের জৈব অণু তৈরি হয়, তাদের প্রতি কোষ-ঝিল্লির ব্যবহার পক্ষপাতদোষে বিশেষভাবে দুষ্ট। এদের মধ্যে অনেক অণুর পক্ষে কোষ-ঝিল্লি সম্পূর্ণ অভেদ্য। আবার অনেকগুলিকে সে অনায়াসে কোষের বাইরে কিংবা ভিতরে যাওয়া-আসা করতে দেয়। এই কোষ-ঝিল্লিতেই আবার আছে বিভিন্ন ধরনের বিপাকীয় পাম্প। তাদের কাজ হলো আশপাশের জৈব মাধ্যম থেকে নানারকম অণু সংগ্রহ করে এনে কোষের মধ্যে প্রয়োজনমতো তাদের কেন্দ্রীভূত করা। কোষের ভিতরে থাকে হাজার হাজার বড়ো বড়ো অণু, আবার অনেক ছোট অণুও। সব মিলিয়ে একেকটি কোষ যেন একেকটি জটিল রাসায়নিক কারখানা। নানা ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া সেখানে একই সঙ্গে ঘটে চলেছে : ছোট ছোট অণু থেকে গড়ে উঠছে বড়ো অণু আবার উল্টোটাও ঘটছে একই সঙ্গে।

এখন, এই গোটা ব্যাপারটার মধ্যে দুটো জিনিস লক্ষণীয় : (১) এমন একটা জটিল সংস্থার মধ্যে এতখানি শৃঙ্খলার উপস্থিতি, আর (২) এই বিশাল সুশৃঙ্খল সংস্থার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য নিশ্চয়ই অনেকখানি তথ্যের প্রয়োজন, যা ওই সংস্থার মধ্যেই সঞ্চিত থাকবে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টি এই দুটি বিষয়ের উপরেই বিশেষভাবে নিবদ্ধ হয়েছে।

প্রথমে শৃঙ্খলার কথাটাই ভাবা যাক : সচরাচর দেখা যায়, ভৌত বা রাসায়নিক পরিবর্তনের বশবর্তী যে-কোনো সংস্থাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ধিত হয়ে এমন একটা সাম্যের অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয় যাকে বলতে পারি চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার অবস্থা। এখানে সাম্য বলতে আমরা একদিকে সংস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে এবং অন্যদিকে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিমান বোঝাচ্ছি। আর বিশৃঙ্খলা কথাটার অর্থ এইরকম হতে পারে : (ক) যে-সব অণু বা পরমাণু দিয়ে সংস্থাটি তৈরি, তাদের সম্পূর্ণ অনিয়মিত গতি, অথবা (খ) সংস্থাটি যদি এমন হয় যে তার মধ্যে তথ্য সঞ্চিত আছে বা তার সাহায্যে তথ্য পাঠানো

যেতে পারে, তবে সেই সংস্থার মধ্যে ভ্রান্তি বা অপস্বরের প্রাবল্য, অথবা (গ) অন্য যে-কোনো অবস্থা যাতে কোনো-না-কোনো ভৌত বা রাসায়নিক ধর্মের মান সম্পূর্ণ অনিয়মিত হতে পারে। মোটরগাড়ি বা বাষ্পীয় শকটের ইঞ্জিনে যে সিলিণ্ডার থাকে তার ভিতরকার উত্তপ্ত গ্যাস হচ্ছে (ক) শ্রেণীর সংস্থার সুপরিচিত দৃষ্টান্ত। প্রথমে শুধু এই ধরনের সংস্থার কথাই ভাবা যাক। সকলেই জানেন, সিলিণ্ডারের ভিতরে একটি পিস্টন দণ্ড থাকে। সিলিণ্ডার এবং পিস্টন এমনভাবে সাজানো থাকে যে গ্যাসের চাপে পিস্টনটি শুধু একটি বিশেষ দিকেই চলতে পারে। গ্যাসের অণুগুলিকে একটি বিশেষ দিকে চালিত করাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এই সুনিয়ন্ত্রিত গতি শেষ পর্যন্ত ক্র্যাঙ্ক-শ্যাফটের মাধ্যমে গাড়ির চাকাতে সঞ্চারিত হয়, ফলে উত্তপ্ত গ্যাসের তাপশক্তি থেকে আমরা গাড়িচালানোর জন্য প্রয়োজনীয় গতিশক্তি পাই। ইঞ্জিনের প্রতিটি কর্ম-চক্রের শেষে যে গ্যাস পড়ে থাকে, তার মধ্যে আর অণুদের সেই সুশৃঙ্খল গতি দেখা যায় না। তাদের যে গতিশক্তি থাকে না তা নয়, তবে সে-শক্তি ব্যবহারের পক্ষে অনুপযুক্ত। এমনকি পিস্টনের গতিও কখনোই সম্পূর্ণ সুনিয়ন্ত্রিত হয় না, ফলে নিয়তই গ্যাসের অণুসমষ্টির মধ্যে বিশৃঙ্খলা বাড়তে থাকে। বিশৃঙ্খলা বাড়া মানেই হচ্ছে, শক্তি যতই থাকুক তার ব্যবহার্যতা কমে আসে। যে-কোনো বিচ্ছিন্ন সংস্থার ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটে থাকে। বিচ্ছিন্ন সংস্থা, অর্থাৎ এমন সংস্থা যা নিজের পরিবেশের সঙ্গে শক্তি বা পদার্থ বিনিময় করতে পারে না।[৫] থার্মস-বোতল হচ্ছে বিচ্ছিন্ন সংস্থার ভালো উদাহরণ। এই বিশৃঙ্খলা বাড়ার প্রবণতাকে বোঝাবার জন্য আমরা এনট্রপি নামক একটি ধর্মের অবতারণা করি। এনট্রপি হলো সংস্থার সামগ্রিক অবস্থার নির্দেশক একটি ধর্ম, যার সাহায্যে আমরা সংস্থাটিতে বিশৃঙ্খলার পরিমাণ মাপতে পারি। এবারে বলা যায়, বিচ্ছিন্ন সংস্থামাত্রেরই এনট্রপি বেড়ে বেড়ে শেষ পর্যন্ত চরমে গিয়ে পৌঁছয়। এটাই হলো তাপগতিবিজ্ঞানের বিখ্যাত দ্বিতীয় নিয়ম। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে বিচ্ছিন্ন সংস্থার মধ্যে আমরা সুবিন্যস্ত গড়নের প্রত্যাশা করতে পারি না। এই কথাটাকেই একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলতে পারি, সুবিন্যস্ত সংগঠন খুঁজে বার করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে এমন মুক্ত সংস্থার কথা ভাবতে হবে যা পরিবেশের সঙ্গে শক্তি এবং পদার্থ বিনিময় করতে পারে।

এবার আমরা আমাদের ফটকিরির কেলাসের কাছে ফিরে আসতে পারি। এই কেলাসকে টুকরো করে ভাঙতে ভাঙতে যদি আণবিক স্তরে চলে যাই, তবে দেখব তার ভিতরে আছে পটাসিয়াম সালফেট আর অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের অণুর যুগ্ম, আর প্রতিটি আণবিক যুগ্মের সঙ্গে চব্বিশটি করে জলের অণু। এই জলকে বলা হয় কেলাসনের জল। কম উষ্ণতায় ফটকিরিকে পাই নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতির কঠিনরূপে। আবার গরম করলে সে গলে যায়। অর্থাৎ যথেষ্ট কম উষ্ণতায় ফটকিরি একটি সুবিন্যস্ত স্বল্প-এনট্রপিযুক্ত সংগঠন। এবং যেহেতু বাইরের জগতের সঙ্গে সে তাপ আদানপ্রদান করতে পারে, সেইহেতু তাকে মুক্ত সংস্থাই বলতে হবে।

মুশকিল হচ্ছে, এই ধরনের সরল বিন্যাসকে জৈব সংগঠনের মডেল হিসাবে খাড়া করা যায় না। দৈনন্দিন জীবনে যে-ধরনের উষ্ণতায় আমরা প্রাণধারণ করি, সেই সাধারণ উষ্ণতায় বিপুল সংখ্যক অণু সম্মিলিত হয়ে অতি সুবিন্যস্ত, জটিল এবং নিপুণ অর্কেস্ট্রার মতো বহুধাক্রিয়াশীল এমন সব সংস্থার জন্ম দেবে যাকে আমরা সপ্রাণ জীব বলতে

পারি, এ-সম্ভাবনা নিতান্তই কম। ফটকিরির মতো মুক্ত সংস্থাকে সুবিন্যস্ত অবস্থায় রাখা যায়, যদি তার উষ্ণতা কম হয়। এ-ধরনের অবস্থায় বহির্জগতের সঙ্গে তার শক্তির বিনিময় হতে পাবে স্বল্প হারে, সাম্য বজায় রেখে। অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে তার উষ্ণতার প্রভেদ কম হওয়া চাই। উষ্ণতা বাড়লেই তার বিন্যাস বিপর্যস্ত হবে। এরকম কোনো ভৌতসংস্থার উপরে তাপগতিবিজ্ঞানের জ্ঞানপ্রয়োগ করে আমরা প্রাণের রহস্য কোনোদিনই বুঝতে পারব না। শুধু যে অকস্মাৎ প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ এভাবে হতে পারে না তাই নয়। সাম্যের অবস্থায় তাপগতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় নিয়মকে মেনে যে-ধরনের বিন্যস্ত সংস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব, তার মধ্যে জীবনের জটিলতা বা সহনশীলতা কোনোটাই থাকবে না। পৃথিবীতে প্রাণের অভিব্যক্তি অবশ্যই ঘটেছে মোটামুটিভাবে তিনশ কোটি বছর ধরে। কিন্তু এই দীর্ঘকালের পরিসরেও সে-ঘটনা যে সাম্যের অবস্থাকে আশ্রয় করে ঘটেছে এমন মনে হয় না।

তবে কি ধরে নেব যে জীবজগতে বিন্যাসের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে পদার্থবিদ্যার নিয়মকেই অগ্রাহ্য ক'রে? বেলজিয়ামের ব্রুসেলসে ইলিয়া প্রিগোজিন এবং তাঁর সহকর্মীবা মুক্তসংস্থার তাপগতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে যেসব গবেষণা করেছেন, তা এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।[৬] সেই গবেষণার একটা গুরুত্বপূর্ণ ফল এই : মুক্তসংস্থার তাপগতিবিজ্ঞানে একশ্রেণীর সংগঠন পাওয়া যাচ্ছে, বিন্যাসের ব্যাপারে যাদের ব্যবহার অবস্থাভেদে দু-রকম হতে পারে। সাম্যের অবস্থায়, বা তার কাছাকাছি অবস্থায়, এইসব সংগঠনে চূড়ান্ত অবিন্যাস দেখা যায়। আবার সাম্যের অবস্থা থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে সেই একই সংগঠন সুসংবদ্ধ চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে। এর মধ্যে পদার্থবিদ্যাকে অস্বীকার কববার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মুক্তসংস্থার তাপগতিবিজ্ঞান অতি সুনিশ্চিতভাবের পদার্থবিদ্যার অঙ্গ। কেবল সেই অঙ্গের অধ্যয়নে সাম্যের অবস্থার মধ্যেই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। সাম্যের অবস্থা থেকে দূবে, যেখানে আমাদের অধীতব্য মুক্তসংস্থা তার পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত চাপ, উষ্ণতা ইত্যাদি ব্যাপারে প্রতিমান রক্ষা করে চলে না, সংস্থার মধ্যে বেশ কিছু জটিলতা এসে যায়। সাম্যের অবস্থা সম্বন্ধে তাপগতিবিজ্ঞানে যে-অভিজ্ঞতা এতদিন ধরে সঞ্চিত হয়েছে, শুধু সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে অসাম্যের অবস্থার সহজাত জটিলতাকে বোঝা যায় না। ঠিক এই জায়গাতেই প্রিগোজিন এবং তাঁর সহযোগীদের চিন্তাভাবনা নতুনত্ব এনেছে। তাঁরা কাজ করেছেন প্রধানত কিছু অজৈব রাসায়নিক সংস্থাকে নিয়ে, কিন্তু জৈবসংস্থার ধর্মকে বোঝার ব্যাপারে সেই কাজের বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই প্রবন্ধের বাকি অংশটুকুতে আমরা তাঁদের কাজের কথাই বলব।

প্রথমেই মুক্ত সংস্থার তাপগতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। পরিবেশের সঙ্গে এই ধরনের সংস্থার আদানপ্রদান চলে দুভাবে : (ক) শক্তির বিনিময়, (খ) পদার্থের বিনিময়। এমনকি পদার্থের ভিতর দিয়েও শক্তির দেওয়া-নেওয়া চলতে পারে। আমরা যখন আহার করি, তখন খাদ্যবস্তুর আকারে শক্তিও আহরণ করি। সকলেই জানেন, খাদ্যবস্তুর অন্তর্গত শক্তির পরিমাপ করা হয় ক্যালরির এককে। 'একগ্রাম মাংসের মধ্যে এত ক্যালরি শক্তি আছে', এই উক্তির অর্থ : ওই একগ্রাম মাংসের অন্তর্গত শক্তিকে যদি পুরোপুরি তাপে রূপান্তরিত করা যায় তবে এতখানি তাপশক্তি পাওয়া যাবে। এক

ক্যালরি হলো সেই পরিমাণ তাপশক্তি যার সাহায্যে একগ্রাম জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পরিমাণে বাড়ানো যায় । পরিবেশ থেকে কিছুটা তাপশক্তি যখন কোনো মুক্ত সংস্থায় প্রবেশ করে, তখন তার খণ্ড অংশগুলির মধ্যে খানিকটা চাঞ্চল্য আসে। অসংখ্য অণুর সমষ্টি নিয়ে যদি কোনো রাসায়নিক সংস্থার কথা ভাবি, তবে তাপশক্তির প্রভাবে সেই অণুদের গড় বেগ বেড়ে যায়, তাপের বিন্যাসেও অনিয়ম বাড়ে । অর্থাৎ কোনো সংস্থাকে তাপশক্তি দেওয়া মানেই তার এনট্রপিকে বাড়িয়ে তোলা । তেমনি যদি বাইরে থেকে কোনোভাবে সংস্থার তাপশক্তির খানিকটা অংশ নিষ্কাশন করা যায়, তবে তার এনট্রপিও কমে যাবে । বিচ্ছিন্ন সংস্থার সঙ্গে মুক্ত সংস্থাব প্রভেদ এইখানেই—বিচ্ছিন্ন সংস্থার এনট্রপি কমাবার কোনো উপায় নেই, কেননা বাইরের জগতেব সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই । বিচ্ছিন্ন সংস্থার এনট্রপি তাই হয় বাড়বে, নযতো বড়জোর স্থিতিশীল থাকবে । এই শেষোক্ত অবস্থাকে বলা যেতে পারে অভ্যন্তরীণ সাম্যের অবস্থা । এই অবস্থা সম্ভবপর হয় তখনই যখন সংস্থার ভিতরে কোথাও কোনো দ্রুত বদল ঘটছে না এবং তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে চাপ, উষ্ণতা ইত্যাদি ধর্মের সাম্য আছে । এছাড়া অন্য যে-কোনো অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন সংস্থার এনট্রপি বেড়ে বেড়ে চরম মানে গিয়ে পৌঁছবে।

মুক্ত সংস্থার ক্ষেত্রে খানিকটা সময়ের মধ্যে এনট্রপির যে বদল হতে পারে, তাকে প্রিগোজিন দুই অংশে ভেঙে লিখেছেন :

[১] এনট্রপিব মোট বদল =— (ক) বহির্জগতের সঙ্গে বিনিময়ের ফলে এনট্রপির বদল + (খ) অভ্যন্তরীণ নানা প্রক্রিয়ার ফলে এনট্রপির বদল ।

এই (খ)শ্রেণীর বদল হতে পাবে বাসায়নিক নানা ক্রিয়ার ফলে, সংস্থার এক অংশ থেকে অন্য অংশে পদার্থের ব্যাপনের ফলে, কিংবা তাপ পরিবহনেব ফলে ইত্যাদি । অভ্যন্তরীণ অসাম্য থেকেই এইসব প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয় এবং এইসব প্রক্রিয়ার ফলে এনট্রপি সর্বদাই বেড়ে যায় । বিচ্ছিন্ন সংস্থায় (ক) শ্রেণীর বদল ঘটতে পারে না, ঘটে শুধু (খ) শ্রেণীর বদল । সেইহেতু সেখানে এনট্রপি হয় বাড়বে, নয় স্থিতিশীল থাকবে (যদি (খ) শ্রেণীব কোনো প্রক্রিয়া না ঘটে) ।

এবারে (ক) শ্রেণীর বদলের কথা ভাবুন । এই বদল যে সর্বদা ধনাত্মক হবে, এমন কোনো কথা নেই । একটু আগেই বলেছি, মুক্ত সংস্থা থেকে খানিকটা তাপশক্তি যদি নিষ্কাশন করে নিই, তবে তার এনট্রপি কমবে । এইভাবে (ক) শ্রেণীর বদলকে ঋণাত্মকও করে তোলা যায় । মনে করুন, এই নিষ্কাষণের হার এমন হলো যাতে আমরা লিখতে পারি :

[২] (ক) শ্রেণীর বদল =— {(খ) শ্রেণীর বদল }।

এক্ষেত্রে এনট্রপির মোট বদল হবে শূন্য । অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার ফলে এনট্রপি যে-হারে বাড়ছে, বাইরে থেকে ঠিক সেই হারে এনট্রপি নিষ্কাশন করতে পারলেই এটা সম্ভব হবে । ফলত, সমগ্র সংস্থাটি এমন একটা গতিশীল অবস্থায় থাকবে, অভ্যন্তরীণ সাম্যের অবস্থার সঙ্গে যার কোনো মিল নেই । বলা বাহুল্য, অভ্যন্তরীণ সাম্য এখানে আমরা মোটেই দাবি করছি না (তা করলে (২) নং সমীকরণের বামপক্ষ এবং ডানপক্ষ দুটোই শূন্য হয়ে যায় এবং কোনো প্রক্রিয়া সম্ভবপর হয় না) । আমরা চাইছি পরিবেশের সঙ্গে

বিনিময়কে এমন একটা পর্যায়ে আনতে, যাতে অভ্যন্তরীণ নানা বদল সত্ত্বেও সংস্থার মোট এনট্রপি অপরিবর্তিত থাকে।

এই যে অসাম্যের অবস্থার কথা বলা হলো, ভৌত বা রাসায়নিক সংস্থায় এ-ধরনের অসাম্য মোটেই বিরল নয়। তাপঘটিত ব্যাপন এই ধরনের একটি প্রক্রিয়া। ১৯১৭ সালে চ্যাপম্যান ও ডুটসন এ বিষয়ে যে পরীক্ষাটি করেন সেটি এইরকম। নলের-দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত দুটি আধারে হাইড্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস সমপরিমাণে মিশিয়ে নিয়ে একটি আধারকে ২৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং অন্যটিকে ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় কয়েক ঘণ্টা ধরে রাখা হলো। এবার আধার দুটিকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্রভাবে তাদের ভিতরকার গ্যাসীয় উপাদান বিশ্লেষণ করা হলো।। দেখা গেল, উষ্ণ আধারটিতে রয়েছে শতকরা ৪৪.৯ ভাগ হাইড্রোজেন আর ৫৫.১ ভাগ কার্বন-ডাই-অক্সাইড। অপরপক্ষে শীতল আধারটিতে পাওয়া গেল শতকরা ৪১.৩ ভাগ হাইড্রোজেন এবং ৫৮.৭ ভাগ কার্বন-ডাই-অক্সাইড। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অণুগুলি হাইড্রোজেনের অণুর তুলনায় বেশি ভারী। অতএব আমরা বলতে পারি যে ভারী অণুগুলি তুলনামূলকভাবে ভিড় করেছে ঠাণ্ডা আধারের দিকে, আর হাল্কা অণুগুলি একটু বেশি সংখ্যায় প্রবাহিত হয়েছে উষ্ণতর আধারের অভিমুখে। প্রথমে দুটি গ্যাস সর্বত্র সমপরিমাণে মিশে ছিল এবং গ্যাসের বণ্টনে কোনো বিন্যাস ছিল না। দুটি আধারের মধ্যে উষ্ণতার প্রভেদের ফলে শেষ পর্যন্ত গ্যাসের বণ্টনে একটা বিন্যাস এসে গেছে। সমগ্র প্রক্রিয়াটির উদ্ভব হয়েছে উষ্ণতার অসাম্য থেকেই। ফলত সংস্থাটির এনট্রপি কমে গেছে। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা ভারী গ্যাসকে হাল্কা গ্যাসের সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি।

জৈবসংস্থায় অসাম্যের প্রভাবে নানা ধরনের প্রক্রিয়া হামেশাই ঘটে থাকে। সংস্থার এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের যেখানেই অবস্থার কোনো তারতম্য থাকবে, সেখানেই এই ধরনের ক্রিয়া ঘটা সম্ভব। প্রতিটি জৈবকোষের ভিতরে বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে যেসব সামগ্রী তৈরি হয়, অভিস্রবণের মাধ্যমে তারা পরিবেশের মধ্যে বর্জিত হতে পারে, আবার অন্য কোনো প্রয়োজনে লাগলে কোষের ভিতরেই ব্যাপ্ত হতে পারে। কোষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাসায়নিক বিভবের তারতম্য থাকার ফলেই এইসব ক্রিয়া সম্ভবপর হয়। একটু তলিয়ে দেখলে মনে হবে, যে বহুধা-ক্রিয়াশীলতাকে জৈবসংস্থার অস্তিত্বের নামান্তরই বলা যায়, তার মূলে আছে ভৌত এবং রাসায়নিক নানা অসাম্যের বিচিত্র এবং জটিল সংস্থান।

এ পর্যন্ত যা বলা হলো, তাতে অবশ্য এইটুকুই বোঝা যায় যে মুক্ত সংস্থার তাপগতিবিজ্ঞানে সুবিন্যস্ত অবস্থার অস্তিত্বের সুযোগ আছে। প্রশ্ন উঠবে : যথার্থই কি দেখানো যায় যে বিশেষ বিশেষ মুক্ত সংস্থায় এই ধরনের সুবিন্যস্ত অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে এবং বজায় থাকছে ? সবচেয়ে ভালো হয় যদি মোটামুটিভাবে জটিল কোনো রাসায়নিক সংস্থার সাহায্যে এবংবিধ উদ্ভবের একটা মডেল খাড়া করা যায়, যার মধ্যে অন্তত বীজের আকারে আমরা জৈবসংস্থার তাপগতিবিজ্ঞানের প্রাথমিক লক্ষণগুলিকে চিনে নিতে পারব। এটা যদি করা যায়, তবে বোঝা যাবে যে অন্তত তাপগতিবিজ্ঞানের দিক দিয়ে জৈবসংস্থার মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে তার সরলতর অজৈব প্রতিরূপ খাড়া করা

অসম্ভব হয়ে ওঠে । আর, আমরা তো জানি, মুক্তসংস্থার পক্ষে অন্য একটা স্বাভাবিক অবস্থা আছে, যাকে বলেছি সাম্যের অবস্থা । এই অবস্থায় তার এনট্রপি চরমে ওঠে। সুতরাং প্রশ্নটা দাঁড়াবে : যে মুক্তসংস্থা সাম্যের অবস্থায় বিশেষভাবে অবিন্যস্ত সেই একই সংস্থা সাম্যের অবস্থা থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে সুবিন্যস্ত অসাম্যের অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে কি না । প্রাণ-বনাম-অপ্রাণের দ্বন্দ্বের নিরসন করতে হলে বিজ্ঞানী প্রশ্নটিকে এইভাবেই তুলবেন । এবং এই প্রশ্নেরই উত্তর প্রিগোজিন খুঁজেছেন তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে । তাঁদের এই কাজের কথা একটু বলে আপাতত এই প্রসঙ্গ শেষ করব ।

যে-ধরনের বদলের কথা আমরা ভাবছি, ভৌত সংস্থায় সে-জাতীয় বদল মোটেই দুর্লভ নয় । একটি পাত্রে খানিকটা জল রেখে নিচের দিক থেকে গরম করুন । সামান্য পরিমাণে তরল রঙ এনে পাত্রের জলে মিশিয়ে দিলে তরলের গতি স্পষ্ট দেখতে পারেন। পাত্রে নীচের দিকের জলের সঙ্গে উপরদিকের জলের উষ্ণতার তারতম্য যতক্ষণ কম আছে, দেখবেন রঙটা ধীরে ধীরে সবদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে । অর্থাৎ জলের অণুগুলি মোটামুটি এলোমেলোভাবে সর্বদিকে চলাফেরা করছে । এই অবস্থায় তাদের গতির মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা নেই । কিন্তু উষ্ণতার তারতম্য যদি বেশি হয় দেখবেন জলের মধ্যে পরিচলন শুরু হয়েছে—নিচের দিকের জল হালকা হয়ে উপর দিকে উঠছে এবং উপরকার ভারী জল নীচে নামছে, এইভাবে চক্রাকারে জলের মধ্যে পরিচলনের স্রোত বইছে । গতির এই যে বিন্যাস, এটা সম্ভব হয়েছে উষ্ণতার অসাম্য বেড়ে যাওয়ারই ফলে । এইটেই এর মধ্যেকার লক্ষণীয় ব্যাপার . সাম্যের অবস্থার কাছাকাছি বিন্যাসের অভাব, আর অসাম্য বাড়তে বাড়তে একটা ন্যূনতম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলে বিন্যাসের আত্মপ্রকাশ।

প্রিগোজিন এবং তাঁর সহকর্মীরা সাম্য থেকে অসাম্যে এবং অবিন্যাস থেকে বিন্যাসে এককালীন উত্তরণের যেসব মডেল দিয়েছেন, ওর মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার একটি মডেল খুবই চিত্তাকর্ষক । এটিও একটি মুক্তসংস্থা : খানিকটা আয়তনের মধ্যে পরস্পর ক্রিয়াশীল গুটিকতক রাসায়নিক দ্রবণ রয়েছে । পরিবেশের সঙ্গে সংস্থাটি এইসব দ্রবণের উপাদান বা দ্রব্য বিনিময় করতে পারে । এই মিশ্র সংস্থায় বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের, ফলে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে উপাদানগুলির ব্যাপন ঘটবে । ব্যাপনের হার নির্ভর করবে ঘনত্ব বদলের হারের উপর : যে-দ্রব্যের ঘনত্ব সংস্থার এক অংশ থেকে অন্য অংশে যেতে খুব দ্রুত বদলাচ্ছে, এই দ্রব্য বেশি তাড়াতাড়ি অধিক ঘনত্বের অঞ্চল থেকে কম ঘনত্বের দিকে ছড়িয়ে যাবে । একে বলা হয়, ফিকসের নিয়ম। এইভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দ্রব্যের ঘনত্ব বদলাবে ।

এ তো গেল ঘনত্বের বদল হওয়ার একটা উপায় । এছাড়া বিভিন্ন উপাদানের ঘনত্ব বদলাবার আরও একটা পন্থা আছে। যেসব দ্রব্য রাসায়নিক ক্রিয়াতে বেশি করে লিপ্ত হবে, তাদের ঘনত্ব বদলাবে বেশি হারে । সচরাচর রাসায়নিক ক্রিয়ার অংশভাক্ উপাদানগুলি রূপান্তরিত হয়ে নতুন উপাদানের জন্ম দেয়, ফলে তাদের ঘনত্ব কমেই যায় । কিন্তু এমন কিছু কিছু ক্রিয়া আছে, যাতে নতুন উপাদানের বদলে অংশভাক্ উপাদানগুলির মধ্যেই কোনো-একটি উপাদান নতুন করে তৈরি হয় । ফলে সেই বিশেষ উপাদানের ঘনত্ব বেড়েই যায় । এই ধরনের ক্রিয়াকে বলা হয় আত্ম-অনুঘটন । অর্থাৎ

কোনো একটি উপাদান যেন নিজের পরিমাণবৃদ্ধির অনুকূলেই কাজ করে। জৈবসংস্থায় এই ধরনের ক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

এবার মনে করুন, যেসব রাসায়নিক ক্রিয়া আমাদের মডেলে ঘটছে, তাতে অংশগ্রহণ করছে A, B, C, D, X এবং Y এই ছটি উপাদান। ক্রিয়াগুলি এইরকম :

$$A \leftrightarrows X, \qquad [৩ক]$$

$$B + X \leftrightarrows Y + C, \qquad [৩খ]$$

$$2X + Y \leftrightarrows 3X, \qquad [৩গ]$$

$$X \leftrightarrows D. \qquad [৩ঘ]$$
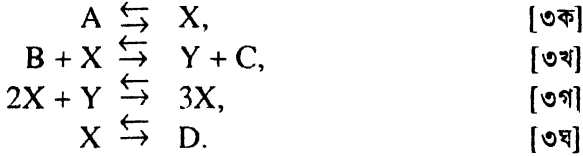
লক্ষ্য করে দেখুন, A থেকে X-এর দিকে যেমন তীরচিহ্ন আঁকা হয়েছে, তেমনি তার বিপরীত দিকে, অর্থাৎ X থেকে A-র দিকেও, তীরচিহ্ন রয়েছে। তার অর্থ এই : A নামক উপাদানটি যেমন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিকভাবে রূপান্তরিত হয়ে X নামক অন্য একটি উপাদানের জন্ম দিচ্ছে, তেমনি এই নবজাত উপাদান X-ও আবার রূপান্তরিত হয়ে A-র জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। খানিকটা পরিমাণে X তৈরি হয়ে যাওয়ার পর এই বিপরীত ক্রিয়া ঘটতে শুরু করবে এবং এরপর থেকে দুটি ক্রিয়াই একই সঙ্গে চলবে। প্রত্যেকটি ক্রিয়ার হার নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট উপাদানের ঘনত্ব, উষ্ণতা ইত্যাদি প্রাচলের ওপর। এই একই মন্তব্য উপরের চারটি ক্রিয়ার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কেবল এর মধ্যে (৩গ) ক্রিয়াটি একটু বিশিষ্ট : লক্ষ্য কবে দেখুন, এটি একটি আত্ম-অনুঘটন জাতীয় ক্রিয়া।

মনে করুন, এই জটিল সংস্থাটিতে উষ্ণতা সর্বত্র সমান এবং ব্যাপন ছাড়া অন্য কোনো ধরনের নাড়াচাড়া নেই। ৩ নং সমীকরণের যে-কোনো একমুখী ক্রিয়া এবং তার বিপরীত ক্রিয়া সমান হারে চলছে, ফলে সমগ্র সংস্থাটি তাপগতিবিজ্ঞানের দিক দিয়ে সাম্যের অবস্থায় আছে। এই অবস্থায় যে-কোনো একটি উপাদানের ঘনত্ব সামান্য বদলে দিলেও সংস্থার মোট অবস্থার বিশেষ বদল হবে না, সাম্যের অবস্থাই বজায় থাকবে।

এবারে সংস্থাটিকে সাম্যের এই অবস্থা থেকে বিচলিত করা যাক। নিষ্কাশন বা অন্য কোনো উপায়ে C এবং D এই দুটি উপাদানের ঘনত্ব যদি খুব কমিয়ে দিই, সংস্থাটি ভালো ভাবেই বিচলিত হবে। ফলে নানাধরনের অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। যেহেতু অনেকগুলি উপাদান রয়েছে এবং তাদের সংস্থান নির্ভর করছে ব্যাপন ও রাসায়নিক বদল এই দু-ধরনের ঘটনার উপর, সেইহেতু অসাম্যের বিকাশ নানাভাবেই হতে পারে। ধরা যাক, A-র ঘনত্ব যাতে সময়ের সঙ্গে না বদলাতে পারে তার ব্যবস্থা করা গেল। তেমনি A এবং X-এর ব্যাপনের হারকেও অপরিবর্তিত রাখার বন্দোবস্ত করা হলো। আর B-উপাদানটির ব্যাপনের হার এমনভাবে বাড়িয়ে দিলাম যাতে সে সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সংস্থাটির বিকাশের বিচিত্র সম্ভাবনাকে এইভাবে আমরা একটু সঙ্কুচিত করে দিলাম। ফলত কি কি ঘটতে পারে দেখা যাক। এই ঘটনাপ্রবাহগুলিকে প্রিগোজিন গাণিতিক দিক দিয়ে অনুধাবন করেছেন।

(১) B-উপাদানটির ঘনত্বকে অপবিবর্তিত রেখে Y-উপাদানের ব্যাপনের হার যদি বাড়িয়ে চলি, একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাব যখন সংস্থার সাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে-কোনো একটি উপাদানের পরিমাণ সামান্য অদলবদল করলেই সমগ্র সংস্থার রাসায়নিক সংগঠন ব্যাপকভাবে বদলাতে শুরু করবে। তারপর কিন্তু এমন একটা অবস্থা

আসবে যখন নতুন এক ধরনের শৃঙ্খলা দেখা দেবে । সেই শৃঙ্খলার একটা লক্ষণ হবে এই যে আধারের ভিতরে বিভিন্ন বিন্দুতে X -উপাদানটির ঘনত্বের প্রত্যাবৃত্তি দেখা যাবে। অর্থাৎ আধারের ভিতরে যদি ক্রমশ একই দিকে চলি, দূরত্বের সঙ্গে ঘনত্বের নিয়মিত হ্রাসবৃদ্ধি দেখতে পাব । একটা বিশেষ দূরত্ব বাদে বাদে ঘনত্বের একই মান পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, আধারের মধ্যে ঘনত্বের এই বণ্টন ঠিক কি চেহারা নেবে, সেটা নির্ভর করবে শুরুতে কিভাবে সংস্থাটিকে বিচলিত করেছি তার উপর । অর্থাৎ সংস্থাটি এক-ধরনের 'স্মৃতিশক্তি' অর্জন করবে।

(২) এবারে মনে করুন B. A , Y এবং X এই চারটি উপাদানের ব্যাপনের হার এমনভাবে সাজানো হলো যাতে B-র ব্যাপনের হার A-র ব্যাপনের হারের তুলনায় অনেক বেশি হয়, A- র হার হয় Y-এর হারের চেয়ে অনেক বেশি এবং Y ও X-এর ব্যাপনের হার পরস্পরের কাছাকাছি থাকে । । আবার দেখা যাবে সংস্থাটি অস্থির হয়ে গেল, কিন্তু তারপর একটা অবস্থা আসবে যার মধ্যে নতুন এক ধরনের শৃঙ্খলা আত্মপ্রকাশ করবে । এবারে দেখা যাবে, দেশে এবং কালে পর্যাবৃত্তভাবে সংস্থাটির রাসায়নিক সংগঠন বদলে চলেছে । অর্থাৎ যে-কোনো উপাদানের ঘনত্বের বদল ঢেউয়ের মতো প্রবাহিত হবে । বাতাসে যখন শব্দের ঢেউ প্রবাহিত হয়, তখন যে-কোনো বিন্দুতে বাতাসে ঘনত্ব সময়ের সঙ্গে বদলায়, আবার যে-কোনো মুহূর্তে বিভিন্ন বিন্দুতে তার ঘনত্বের প্রত্যাবৃত্তি দেখা যায় । এই ধরনের ঘটনাকেই আমরা ঢেউ বলি । আলোচ্য সংস্থায় বিভিন্ন উপাদানের ঘনত্বের বদল এইভাবে প্রবাহিত হবে ।

(৩) A-র ব্যাপনের হার যতক্ষণ মাত্রাতিরিক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ (১) এবং (২) শ্রেণীর বিন্যাসের বিস্তার আধারের খানিকটা অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে । সেই অংশের আয়তন এবং প্রত্যাবৃত্তির দূরত্ব ইত্যাদি নির্ভর করবে A,B -র ঘনত্ব, X-এর ব্যাপনের হার, ইত্যাদি প্রাচলের উপর । এবারে যদি A এবং B এই দুটি উপাদানের ব্যাপনের হার খুব বেশি বাড়িয়ে দিই, তবে সেই বিন্যাস সমস্ত আধার জুড়ে ছড়িয়ে যাবে । এবং সবশেষে যদি X এবং Y-এর ব্যাপনের হারকেও রাসায়নিক ক্রিয়াগুলির হারের তুলনায় অনেক বেশি করে দিই, (২)নং শৃঙ্খলার মধ্যে আঞ্চলিক প্রত্যাবৃত্তি একেবারে চলে যাবে এবং যে-কোনো মুহূর্তে সমস্ত সংস্থাটি একই দশায় থাকবে । অর্থাৎ কোনো একটি উপাদানের ঘনত্ব যখন এক জায়গায় বেড়ে বেড়ে সবচেয়ে বেশি হয়েছে, তখন অন্য সব জায়গাতেও তার মান সর্বোচ্চ হবে । অবশ্য এই সর্বোচ্চ মান যে সর্বত্র একই হবে এমন কোনো কথা নেই । ঘনত্বের এই যে সর্বব্যাপী স্পন্দন, এর পর্যায়কাল নির্ভর করবে সংস্থার মোট আয়তন (অর্থাৎ আধারের আয়তন), উপাদান সমষ্টি, ইত্যাদি সামুদায়িক ধর্মের উপর । শুধু তাই নয়, কোনো উপায়ে এই অবস্থা থেকে সংস্থাটিকে যদি বিচলিতও করি, অচিরে সেই বিচলন দমিত হবে এবং স্পন্দন পূর্ববৎ নিয়মিতভাবে চলতে থাকবে । এমন একটি স্পন্দমান স্থায়ী অবস্থা আমরা এখানে পাচ্ছি যাকে বাইরে থেকে দেখলে প্রায়-স্বয়ংক্রিয় মনে হবে । বলা বাহুল্য, এই অবস্থা সাম্যের অবস্থা থেকে একেবারেই আলাদা । যে-স্পন্দন এখানে ঘটছে, তাতে নিয়ত শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে । এবং সংস্থাটিতে এক ধরনের জটিল গতিশীল বিন্যাস দেখা দিয়েছে । এটা বললে ভুল হবে না যে প্রভূত অসাম্য এবং শক্তিক্ষয়ের ভিতর দিয়েই সেই বিন্যাস বজায় থাকছে।

গণিতের ভাষায় এই ধরনের স্পন্দনকে বলা হয় সীমা-চক্র ।

যে মডেলটির কথা এতক্ষণ বললাম, যে-কোনো জৈব সংস্থার তুলনায় তা অবশ্যই অনেক বেশি সরল । এমনকি একটিমাত্র জৈবকোষের মধ্যেও একই সঙ্গে যেসব ভৌত ও রাসায়নিক বদল ঘটে থাকে, তা এর চেয়ে বহুগুণ জটিল । তবু এ-কথাও ঠিক যে এই সরল সংগঠনের মধ্যে জৈবকোষের কিছু কিছু প্রাথমিক লক্ষণ রূপায়িত হয়েছে। সব মিলিয়ে যেটা লক্ষণীয়, সেটা হচ্ছে এই সংস্থার আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা । একের পর এক দশান্তরের ভিতর দিয়ে সংস্থাটি এমন এক অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে পারে যেখানে তার অভ্যন্তরীণ ঘটনাচক্রের একটা নিজস্ব হার, একটা নিজস্ব ছন্দ, তৈরি হয়ে যাবে। জৈবকোষের যে আত্মস্বাতন্ত্র্যকে আমরা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই, তারও বৈশিষ্ট্য ঠিক এইখানেই । প্রতিটি জৈবকোষে এমন এক বিশদ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে যাতে তার ভিতরকার বিচিত্র রাসায়নিক ক্রিয়া ঠিক প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব হারে চলতে পারে। যেমন ধরুন, অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট বা এ. টি. পি-র অণুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত থাকে । একদিকে এই রাসায়নিক উপাদান জৈবসংস্থাকে সক্রিয় রাখার জন্য প্রয়োজন, আবার অন্যদিকে এর আধিক্যও ক্ষতিকর হতে পারে । বিশেষ একটি প্রোটিন এই উপাদানটির প্রস্তুতির ক্রিয়ায় জৈব অনুঘটক বা এনজাইমের কাজ করে। জৈবকোষের ভিতরে এই প্রোটিনের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করেই জৈব সংস্থা এ.টি.পি-র উৎপাদনকে প্রয়োজনমতো বাড়াতে বা কমাতে পারে । গ্লাইকোলিসিস হচ্ছে আর একটি প্রক্রিয়া, জৈবকোষের শক্তির চাহিদা মেটানোর কাজে যার উপযোগিতা খুব বেশি । পরীক্ষা করে দেখা গেছে যেসব রাসায়নিক উপাদান এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, তাদের ঘনত্বে কালানুক্রমিক স্পন্দন হয়, আর সেই স্পন্দনের পর্যায়-কাল সুনির্দিষ্ট । সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে যদি কতকগুলি প্রাথমিক রাসায়নিক ক্রিয়াতে ভাগ করে নিই, তবে সেইসব ক্রিয়ার হার অন্য সূত্র থেকে জেনে নিয়ে আমরা গ্লাইকোলিসিসের গাণিতিক মডেল খাড়া করতে পারি । পরীক্ষার ফলাফলকে অঙ্কের এই হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেছে, এখানেও সীমা-চক্র জাতীয় স্পন্দন কাজ করে । অর্থাৎ প্রিগোজিনের দেওয়া মডেলের সঙ্গে গ্লাইকোলিসিসের গভীর একটা সাদৃশ্য আছে । এই যে আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়াকে একটা নির্দিষ্ট স্তরে বেঁধে রাখা, জৈবসংস্থার এই ক্ষমতাকে পরিভাষায় বলা হয় সমস্থিতি । দেখা যাচ্ছে, এমন অজৈব সংস্থার কথা আমরা ভাবতে পারি, যা জৈবসংস্থার এই বিশিষ্ট ধর্মকে বুঝতে সাহায্য করে ।

সরলতম সপ্রাণ সংস্থার গড়ন এবং ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে বিপুল জটিলতা দেখা যায়, তার বাস্তবধর্মী প্রতিরূপ গড়ে তোলা অবশ্যই এখনও আমাদের আয়ত্তের অনেকটা বাইরে । জৈবসংস্থামাত্রেই তার পরিবেশের সঙ্গে অজস্রভাবে যোগসূত্র রচনা করে । তার গড়নের মধ্যে, কাজের মধ্যে একটা অপরিমিত প্রাচুর্য আছে : প্রকৃতি যেন মুক্ত হাতে পরীক্ষা করছেন, কত বিচিত্রভাবে প্রাণ নামধেয় আশ্চর্য প্রচেষ্টাটিকে 'যাবচ্চন্দ্রার্ক মেদিনী' চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় । বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয় পাদে সেই পরীক্ষাগারের সিংহ দরজায় দাঁড়িয়ে আমরা তার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র পেতে শুরু করেছি। যেটুকু দেখা গেছে তাতেই আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নেই । মুক্ত সংস্থার তাপগতিবিজ্ঞান সেই আভাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । বিচিত্র প্রাণের কোনো সরলীকৃত যান্ত্রিক মডেল তৈরি করা

এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্যটা ঠিক উল্টো : ধাপে ধাপে সরল থেকে ক্রমশ জটিলের দিকে যাওয়া এবং পথিমধ্যে কিছু কিছু মৌল অন্তর্দৃষ্টি আহরণ করা।

উল্লেখপঞ্জী :

১. Bertrand Russell, *Portraits from Memory and Other Essays*, Simon and Schuster, New York, 1956, অত্যন্ত উপভোগ্য এই সংকলনের মধ্যে ডি. এইচ. লরেনস সম্বন্ধে প্রবন্ধটি দেখুন।

২. Eugene P. Wigner *Symmetries and Reflections Scientific Essays*, The M. I. T. Press, Cambridge, Mass, 1970; এই বইয়ের অন্তর্গত "The Probability of the Existence of a Self Reproducing Unit" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধটি নানা কারণে আগ্রহের দাবি রাখে, যদিও আমাদের প্রবন্ধের সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গির মৌল প্রভেদ আছে। সংসারে এমন কিছু সংগঠন যে আছে, যারা উপযুক্ত খাদ্য পেলে নিজেদের অবিকল প্রতিরূপের জন্ম দেবার ক্ষমতা রাখে, একজন পদার্থবিদ হিসাবে লেখক এটাকে প্রায় অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে করছেন।

৩. প্রাণবাদ (vitalism) বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী পাঠক নিম্নোক্ত বইদুটি পড়ে দেখতে পারেন : Francis Crick, *Of Molecules and Men*, University of Washington, Seattle, 1967 এবং Walter Elsasser, *The Physical Foundation of Biology*, Pergamon, London, 1958।

৪. এ-বিষয়ে পদার্থবিদ উগো ফানোর একটি সুন্দর উক্তি আছে : 'We could include, as an example of stability, the fact that each of us looks much the same for many years, yet we come from dust and return to dust, reminding us that the stability of molecular ground states is in fact circumvented in the course of molecular reactions'. *Physics Today*, September 1976, দ্রষ্টব্য।

৫. বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে বিশৃঙ্খলার যোগ মোটেই দুর্বোধ্য নয়। সংহত বিশৃঙ্খল খণ্ডগুলিকে সাজিয়ে সুবিন্যস্ত করে তুলতে হলে শক্তির প্রয়োজন, সেই বাড়তি শক্তি আসতে পারে বাইরে থেকেই। বিচ্ছিন্ন সংস্থার ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়।

৬. জৈবসংস্থাকে তাপগতিবিজ্ঞানের দিক থেকে মুক্ত সংস্থা হিসাবে দেখবার গুরুত্ব যাঁরা বিশেষভাবে অনুধাবন করেছেন, তাঁদের মধ্যে আরভিন শ্রোয়েডিঙ্গারের (Erwin Schrodinger) নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। তাঁর *What is Life?* (Cambridge University Press, London, 1945) এ বিষয়ে অগ্রণী রচনা। সাম্প্রতিককালে প্রিগোজিনের গোষ্ঠীর কাজ সম্বন্ধে জানতে হলে দ্রষ্টব্য P Glansdorff, I Prigogine, *Thermodynamic Theory of Structure, Stability and Fluctuations*, Wiley, New York, 1971 এবং *Physics Today*, November & December, 1972, দেখুন। শেষোক্ত রচনায় অনেকগুলি মৌল নিবন্ধের উল্লেখ আছে।

রেনেসাঁস

বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ইয়াকব বুর্কহার্টের মহাগ্রন্থ 'ইতালিতে রেনেসাঁসের সভ্যতা' প্রকাশিত হয় এখন থেকে একশ কুড়ি বছর আগে ১৮৬০ সালে। পরবর্তী দশবছরের মধ্যেও প্রকাশক এই বইটির এক হাজার কপি বিক্রি করতে পারেননি। নিট্‌সে কিন্তু পড়ামাত্র বুঝেছিলেন যে এটি একটি বীজগুণান্বিত গ্রন্থ ; এবং পরবর্তীকালের ভাবুকতার ইতিহাস এই সিদ্ধান্তের পরিপূর্ণ সমর্থক।

বুর্কহার্টের আগেও ভাসারি, বেইল, ভিকো, সিসমন্দি, মিশলে প্রমুখ অনেকেই রেনেসাঁস সম্পর্কে লিখেছেন, কিন্তু ইতিহাসের এই মহাবিস্ময়কর পর্বের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি প্রথম মেলে বুর্কহার্টের লেখায়। অতীতের এই যুগকে তিনি শুধু পাঠকের চেতনায় প্রত্যক্ষ করে তোলেননি; তিনি এমন একটি আদিরূপ কল্পনা করেছিলেন যেটিকে পরবর্তীকালের অনেক ভাবুক অন্যান্য দেশকালের আলোচনায় বিশেষ অর্থপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক মনে করেছেন। পনেরো শতকের ইতালির সঙ্গে উনিশ-বিশ-শতকের বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্য এবং অবস্থাগত পার্থক্য মনে রেখেও তাঁরা লিখেছেন চৈনিক এবং জাপানি, আরব এবং আফ্রিকান, মেক্সিকান এবং মার্কিনি, ভারতীয় এবং ইন্দোনেশিয় রেনেসাঁসের কথা। অর্থাৎ রেনেসাঁস শব্দটির প্রয়োগ এখন আর শুধু একটি বিশেষ দেশে এবং কালে আবদ্ধ নেই। মানবেতিহাসের ব্যাখ্যায় এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি আদিরূপ জাতীয় ধারণা; এবং বুর্কহার্টের মহাগ্রন্থটি এই ব্যাপক প্রয়োগেব মূল উৎস ।

অবশ্য রেনেসাঁসের প্রকৃতি নিয়ে বুর্কহার্টের পূর্বে ইউরোপিয় ভাবুকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ ছিল। এবং গত একশো বছরে এ সম্পর্কে বিতর্ক বেড়েছে বই কমেনি। এইসব বিভিন্ন বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের একটি কালক্রমানুযায়ী বিবরণ মেলে ওয়ালেস ফর্গুসনের *The Renaissance in Historical Thought : Five Centuries of Interpretation* কেতাবটিতে। বুর্কহার্টের ব্যাখ্যার পক্ষে-বিপক্ষে বিস্তর লেখা প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু যেমন মার্ক্সের বিশ্লেষণকে অবহেলা করে ধনতন্ত্রের আলোচনা আজকের দিনে অকল্পনীয় তেমনি বুর্কহার্টের আঁকা প্রতিকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় যে-কোনো দেশের রেনেসাঁস আলোচনায় অপরিহার্য। এই মহাগ্রন্থটির একটি প্রামাণিক বাংলা অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

* * *

বুর্কহার্টের বইটি যে বছর প্রকাশিত হয় বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সেটিও কম স্মরণীয় নয়। ১৮৬০ সালে বই আকারে বেরোয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী' এবং 'তিলোত্তমাসম্ভব'। তার দুবছর আগে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল', একবছর পরে (১৮৬১) মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' এবং

'কৃষ্ণকুমারী', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'(১৮৬১-৬২), এবং পাঁচবছর পরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী'। বাংলা সাহিত্যে কয়েক বছরের মধ্যে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো, এবং ব্যাপারটি যে মোটেই ঐকাহিক নয় সেটির প্রমাণ পাওয়া গেল প্রথমে 'বঙ্গদর্শনের' পৃষ্ঠায় (১৮৭২-৭৬), এবং তারপরে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র, বিপুল, অনপেক্ষ রচনাবলীতে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বসে বুর্কহার্ট পনেরো শতকের ইতালির যে ছবিটি এঁকেছিলেন তাঁর সমকালীন বাংলার অন্তত সাহিত্যিক বিস্ফোরণে তার কিছুটা আদল নজরে আসে।

কলকাতা ফ্লরেন্স নয়, বাংলাদেশ ইতালি নয়, উনিশ শতক পনেরো শতক নয়, এসব কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতালিয় রেনেসাঁসের নানা নতুন দিগন্ত প্রত্যক্ষীভূত হয়েছিল প্রধানত স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায়; উনিশ শতকের বাংলায় শিল্পীভাবুকদের নবনবোন্মেষশালী প্রতিভা এই দিকগুলিতে প্রকাশলাভ করেনি। কিন্তু ঐ শতকের শেষভাগে বাংলাভাষায় এবং সাহিত্যে যে অভূতপূর্ব সম্পন্নতা সাধিত হয়, যার উত্তরাধিকার রবীন্দ্রোত্তর যুগেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, জীবনানন্দ দাশ থেকে শামসুর রাহমান পর্যন্ত সক্রিয় এবং ফলপ্রসূ, তা এতই প্রত্যক্ষ যে কোনো যুক্তিতেই তাকে ঐকাহিক বা তুচ্ছ ভাবা চলে না। বাংলার রেনেসাঁসের অন্তত একটি দিক প্রামাণিক, স্বয়ম্ভর, বাকছলমুক্ত, শর্তনিরপেক্ষ, এবং ইতালিয় রেনেসাঁসের সমবৃত্ত !

বাংলার রেনেসাঁস নিয়ে বুর্কহার্টের সমতুল কোনো বই এতাবৎ লেখা হয়নি। তবে উনিশ শতকের কলকাতা সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ও হচ্ছে, এবং সেইসূত্রে নানাবিধ জিজ্ঞাসা ক্রমেই আকার নিচ্ছে। বাংলার রেনেসাঁসের যাঁরা সমকালীন সমালোচক তাঁদের প্রধান তিনটি যুক্তির উল্লেখ করি :

১. উনিশ শতকের বাংলায় যাকে রেনেসাঁস বলা হয় দেশের ভিতর থেকে তার উদ্ভব হয়নি; তা ঔপনিবেশিক শাসন এবং শোষণের ফল; সুতরাং তাকে যথার্থ রেনেসাঁস বলা চলে না।

২. এই অমূলপ্রত্যক্ষ রেনেসাঁসের প্রবক্তা এবং ভোক্তারা এসেছেন হিন্দুসমাজের মুখ্যত উপরতলার বামুনবদ্যিকায়েৎদের ভিতর থেকে, নিচেরতলার মানুষদের (অর্থাৎ অসৎশূদ্র, অধিকাংশ মুসলমান, চাষি, জোলা, কামার, কুমোর ইত্যাদি) সঙ্গে এর কোনো যোগ ছিল না; অর্থাৎ এটি আসলে স্রেফ ভদ্রলোক বা বাবুদের কাণ্ডকারখানা।

৩. এই বাবুরা শহরবাসী হলেও পশ্চিমী ইতিহাসের অর্থে প্রকৃত বুর্জোয়া নন; ব্যবসাবাণিজ্য, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, প্রযুক্তিবিদ্যা বা কলকারখানা গড়বার কাজে উদ্যোগী না হয়ে তাঁরা দালালি, জমিদারি, চাকরীবাকরি এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি পেশার অনুসরণ করেই জীবন অতিবাহিত করেছেন; অতএব সমাজব্যবস্থার রূপান্তরে তাঁদের ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য।

এইসব সমালোচনা কতদূর ধোপে টিঁকবে বলা শক্ত, কিন্তু তথ্য এবং যুক্তির ভিত্তিতে এদের মূল্যায়ন অপরিহার্য। তাছাড়া এইসব বক্তব্যের পিছনে ইতিহাস সম্পর্কে যেসব প্রকল্প সক্রিয় থেকেও অপরিস্ফুট সেগুলি নিয়েও তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ নিতান্ত জরুরি। 'জিজ্ঞাসা''র প্রথম সংখ্যা থেকেই সে আলোচনা শুরু করা গেল। ...

প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা

জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব

জিজ্ঞাসা ব্যাপারটি অন্তত তিনটি পরস্পরনির্ভর শর্তসাপেক্ষ : জিজ্ঞাসক, অর্থাৎ যিনি জিজ্ঞাসা করেন, জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ যা জিজ্ঞাসার বিষয়, এবং জ্ঞান, অর্থাৎ জিজ্ঞাসার ফল। কোনো কোনো দার্শনিক তিনটিরই অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়ী বটে, কিন্তু এখানে সে প্রশ্ন আমাদের আলোচ্য নয়। আমি, অর্থাৎ অন্যতম জিজ্ঞাসক ব্যক্তিটি আছি; যে জগৎ সম্পর্কে আমার জিজ্ঞাসা এবং আমি যার অংশ সেটিও আছে; এবং জিজ্ঞাসার ফলে কিছুটা জ্ঞানার্জন সম্ভব—লিখতে বসে এবং তার পূর্বে ভাবতে গিয়ে একথাগুলি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই । কিন্তু তারপরও বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়; এবং জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব ('ভিসেন্‌স্‌সোৎসিওলোগি') নিয়ে যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁরা এই সমস্যারাজীর বিষয়ে আমাদের জাগ্রত থাকবার নির্দেশ দিয়েছেন ।

জিজ্ঞাসক ব্যক্তিটি শূন্য থেকে উদ্ভূত হন না, শূন্যে বিরাজ করেন না । একটি নির্দিষ্ট দেশকালে তাঁর বাস; সেই দেশকালের সমাজসংস্কৃতি, বিশেষ করে তার ভাষা, ঐতিহ্য, বিশিষ্ট আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সাম্পর্কিক বিন্যাস এবং ঘটনাদি তাঁর অস্তিত্বকে নিরূপিত করে । সেই সমাজসংস্কৃতির ভিতরেও বিভিন্ন গোষ্ঠী, শ্রেণী, সম্প্রদায়, পরিবার, ধারণাসংস্থিতি, স্বার্থ, দল ইত্যাদি বিদ্যমান, এবং তাঁর পরিচয় কোনো-না-কোনোভাবে এগুলির দ্বারা চিহ্নিত। সমস্যা হলো, জিজ্ঞাসা মাত্রই কি জিজ্ঞাসকের এইসব বিশেষ সামূহিক প্রকরণের দ্বারা অনতিক্রম্যভাবে সীমাবদ্ধ, এবং তা যদি হয় তাহলে জিজ্ঞাসা-জাত জ্ঞানও কি এই জাতীয় সীমাকে অতিক্রম করতে অসমর্থ ?

বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে এই সমস্যা ততটা প্রবল ঠেকে না । বল-বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ইত্যাদির ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসক বাঙালি না ইংরেজ, মুসলমান না খ্রিস্টান, কায়স্থ না মাহার, স্ত্রী অথবা পুরুষ, ব্যবসায়ী পরিবারের অথবা চাষি পরিবারের সন্তান, এইসব তথ্য তাঁর উপস্থাপিত প্রকল্পাদির যাথার্থ্য নির্ণয়ে স্বীকৃতভাবেই অবান্তর । এক্ষেত্রেও প্রশ্নের উৎপত্তি এবং উত্তরের মননধারণ ব্যাখ্যায় পারিবেশিক-ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ অবান্তর নয় । কিন্তু এখানে প্রকল্পের প্রামাণিকতা নির্ধারণের সর্বসম্মত প্রণালীপদ্ধতি আছে । তাছাড়া গণিত এবং যুক্তিবিজ্ঞানের স্বয়ম্ভরতা প্রখ্যাত । কিন্তু যেখানে জিজ্ঞাসার বিষয় মানুষ স্বয়ং, বিশেষ করে মানুষের সমাজসংস্কৃতি, সেখানে কি জিজ্ঞাসুর পক্ষে তার বিশিষ্ট সমাজপ্রসঙ্গনিরপেক্ষ জিজ্ঞাসা এবং জ্ঞান আদৌ কল্পনীয় ? বিশ্বপ্রকৃতির ঘটনাদির অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও মানবীয় ঘটনাদির বৈশিষ্ট্য হলো তাদের অন্তর্লোক যার প্রকাশ এবং আর্থিকতা প্রতীকনির্ভর; এবং সামাজিক পরিবেশ ব্যতিরেকে প্রতীকের জন্মও যেমন অসম্ভব তার অর্থভেদও তেমনি অসাধ্য । তাছাড়া অমানবীয় জগৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাসায় উপাত্তরাজীর সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণই যথেষ্ট । কিন্তু ঔচিত্যজিজ্ঞাসা মানবীয় জগতের সঙ্গে সহব্যাপ্ত, অথচ অন্তত আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ঔচিত্যের ধারণা সমাজপরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন ।

উদাহরণ দিলে সমস্যাটি হয়তো একটু স্পষ্টতর হবে । বাংলাভাষার নিজের একটি

বিশিষ্ট চরিত্র গড়ে উঠেছে; কর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী ও জাতিভেদনির্ভর হিন্দুসমাজের একটি বিশিষ্ট চরিত্র আছে বলে অনেক সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন ; বুর্জোয়াশ্রেণীর কতগুলি বিশিষ্ট লক্ষণের এবং মূল্যমানের কথা বলা হয় । এখন কোনো জিজ্ঞাসু যদি একটি বাঙালি হিন্দু বুর্জোয়া পরিবারের সন্তান হন তাহলে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা তার দ্বারা প্রভাবিত হবার আশঙ্কা নেই বললেই চলে । কিন্তু তাঁর সমাজজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গ সম্পর্কিত প্রভাবকে একেবারে তুচ্ছ করা কি সঙ্গত ? অপরপক্ষে তুচ্ছ করা যায় না বলেই কি মানা চলে এই পরিপার্শ্ব তাঁর সমাজজিজ্ঞাসার নিয়ামক ?

এই সমস্যা নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকরা বিস্তর লিখেছেন এবং লিখছেন । মার্কস্ থেকে মানহাইম, হ্বেবার থেকে লেভি-স্ট্রাউস—বহু ভাবুকের রচনাবলীতেই এই জিজ্ঞাসার পরিচয় মেলে । মার্কস্‌পন্থীদের ভিতরে এই প্রসঙ্গ নিয়ে প্রথম মূল্যবান আলোচনা করেন লুকাচ; পরে এ-বিষয়ে আরো বিশদ বিচার করেছেন করশ, ব্লখ, কোলাকোভ্‌স্কি, হাবেরমাস প্রভৃতি দার্শনিক । এটির কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান আমাদের জানা নেই, তবে এই প্রসঙ্গে বিচার্য কয়েকটি সূত্র অবশ্য-উল্লেখ্য । গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধতা অথবা প্রকৃতিবিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা অনায়ত্ত হলেও সমাজজিজ্ঞাসারও কিছু কিছু বিশদ এবং প্রামাণিক পদ্ধতি গড়ে উঠেছে যা অবলম্বনের দ্বারা অন্তত তথ্যের সত্যতা এবং প্রকল্পের সামর্থ্য বিচার করা সম্ভব । তাছাড়া একদিকে বিভিন্ন সমাজসংস্কৃতির পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত ও আদানপ্রদান এবং অন্যদিকে প্রতিটি সমকালীন সমাজে বিভিন্ন (এবং বহুক্ষেত্রে বিরোধী) ভাব এবং স্বার্থসমূহের অনুনাদ, সংঘাত এবং অনুসৃতি ব্যক্তির চেতনাকে অভ্যাসের জড়তা এবং স্বগোষ্ঠীপোষিত সংস্কারের সঙ্কীর্ণতা থেকে ঊর্ধ্বে ওঠায় সাহায্য করতে পারে । সম্ভবত এক্ষেত্রে ভরসার সবচাইতে প্রধান উৎস মানুষের প্রাজাতিক জিজ্ঞাসাবৃত্তি নিজেই, যে বৃত্তির প্রবর্ধন এবং অনুশীলন শুধু জ্ঞানের বৃত্তকে প্রসারিত করে না, জ্ঞানে গভীরতা, সঙ্গতা পরিবর্তনশীলতা এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্যতা সঞ্চারিত করে । অন্তত জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব থেকে যেমন সমস্যার তেমনি এই-জাতীয় সম্ভাবনারও কিছুটা সন্ধান মেলে । ...

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

বাংলায় মননশীল সাহিত্যের অভাব

এই পত্রিকা প্রকাশের পিছনে যেমন একটি উজ্জ্বল প্রত্যাশা তেমনি একটি গভীর বেদনা সক্রিয় । প্রত্যাশার কথা প্রথম সংখ্যাতে পত্রসূচনায় জানিয়েছি । বেদনার কথা এবারে সংক্ষেপে বলি ।

এই বেদনার উৎস অভাববোধ । বাংলাভাষাকে ভালোবাসি, বাংলা সাহিত্য নিয়ে গর্ববোধ করি ; কিন্তু গত একশো/সোয়াশো বছরে আধুনিক বাংলায় কবিতা, গল্প , এমনকি উপন্যাস যেমন বিকাশলাভ করেছে তার তুলনায় বাংলা প্রবন্ধের অপুষ্টতা এবং দারিদ্র্য প্রায় একেবারেই ঘোচেনি । যাঁদের ভাষাজ্ঞান বাংলাতেই সীমাবদ্ধ তাঁদের কাছে এই

অভাব হয়তো খুব স্পষ্ট নয়; কিন্তু যাঁরা বাংলা ছাড়াও আধুনিক কোনো একটি প্রধান পশ্চিমী ভাষার চর্চা করেছেন তাঁদের পক্ষে স্বীকার না করে উপায় নেই যে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য নিতান্তই অপরিণত। দার্শনিকতা প্রবন্ধের প্রাণ ; তথ্য থেকে তত্ত্বে, বিবরণ থেকে বিশ্লেষণে, টীকাভাষ্য থেকে মৌলিক চিন্তায় উত্তরণের সামর্থ্যই প্রবন্ধকে পুষ্ট করে। অপরপক্ষে বাংলাভাষায় প্রবন্ধ নামে যা রচিত হয়ে থাকে তার মধ্যে অধিকাংশই বর্ণনাধিক্য, গ্রাম্যতা, ঐকাহিকতা এবং পরতন্ত্রতার দ্বারা চিহ্নিত। বাংলাভাষায় দার্শনিক নিতান্ত দুর্লভ। ইংরেজিতে কীটস্, ডিকেন্স অথবা জয়েসের পাশাপাশি হিউম, অ্যাডাম স্মিথ অথবা রাসেল, জার্মানে গ্যোয়েটে, রিলকে, টমাস মানের পাশাপাশি কান্ট, মার্কস্ অথবা হেবার বিদ্যমান। কিন্তু বাংলার রসসাহিত্যের পাশাপাশি মননশীল সাহিত্যের বিকাশ কতটুকু ?

এই অভাব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন ছিলেন এবং তাঁর অসামান্য প্রতিভার অনেকখানিই এই অভাব দূর করার কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। বহুক্ষেত্রেই তাঁর যুক্তি এবং বক্তব্য আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ঠেকে না; কিন্তু তাঁর কৌতূহলের বৈচিত্র্য, উদ্ভাবনার বৈশিষ্ট্য, পঠনপাঠনের ব্যাপ্তি, চিন্তার গভীরতা ও সূক্ষ্মতা, ভাষার বৈশদ্য, দীপ্তি ও ব্যঞ্জনা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে মহৎ সম্ভাবনা সূচিত করেছিল—এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। যে ভাষায় 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'সাম্য', 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং 'ধর্মতত্ত্বে'র মতো গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে সে ভাষার প্রকাশ-সামর্থ্য তুচ্ছ করবার মতো নয়। বঙ্কিমের পরে রবীন্দ্রনাথ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে পুষ্ট করার জন্য প্রয়াসী হন; তাঁর রচনাবলীর একটি বিরাট অংশ তারই প্রমাণ। কিন্তু এই দুই প্রতিভাধর ব্যক্তির অনুরাগী অধ্যবসায় সত্ত্বেও বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক রচনার একটি শক্তিশালী ধারা গড়ে ওঠেনি। সাংবাদিকতা, টীকাভাষ্য এবং রম্যরচনার মধ্যেই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য এতাবৎ মুখ্যত সীমাবদ্ধ। বাংলাভাষায় ক্রোচে, হুইটগেনস্টাইন, অথবা লেভি-স্ট্রাউস এখনো অকল্পনীয়।

মহৎ শিল্পীদের মতোই মহৎ ভাবুকদেরও ফরমাস দিলেই পাওয়া যায় না। কিন্তু যেটি আমাদের দায়িত্ব এবং হয়তো আমাদের অসাধ্য নয় সেটি হলো অভাবকে অভাব বলে চিনতে শেখা, এবং সেই অভাব নিবাকরণে উদ্যোগী হওয়া। বাংলাসাহিত্যে মননশীলতার অভাব অনস্বীকার্য। এই অভাবের একটি কারণ হয়তো আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যে ঐতিহ্যে বিদ্রোহ এবং প্রশ্নশীলতার পরিবর্তে দাস্য এবং ভক্তিকেই প্রধান মূল্য দেওয়া হয়েছে। আরেকটি কারণ সম্ভবত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় মুখস্থবিদ্যা ও রোমন্থনই শিক্ষক ও ছাত্রের প্রধান নির্ভর এবং যে ব্যবস্থায় মৌলিকতা ও অপরতন্ত্রতা অপাংক্তেয়। আরেকটি কারণও লক্ষণীয়। বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা ভাবুক ও কৃতবিদ্য তাঁরা অনেকেই শুধু ইংরেজিতে লিখে থাকেন ; যদি-বা তাঁরা বাংলাতে লেখেন, সে লেখা সম্ভাব্য পাঠকপাঠিকাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে ক্বচিৎ রচিত হয়। তাঁদের বাংলা প্রবন্ধে প্রচুর জল মেশানো থাকে। এই মনোভাব এবং আচরণের জন্য বাঙালি পাঠকপাঠিকারাও কম দায়ী নন। মৌলিক এবং মননশীল রচনা বিদগ্ধ এবং নিবিষ্ট পাঠক দাবি করে। জ্ঞানচর্চার জন্য যে অধ্যবসায় ও পরিশ্রম প্রয়োজন অধিকাংশ পাঠকপাঠিকা বাংলাভাষায় লেখা কোনো কিছু পড়বার জন্য সেই পরিমাণ অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম দিতে গররাজি। লেখক এবং পাঠক উভয়েই যদি বিবেকী

এবং দায়িত্বশীল না হন তাহলে এই আত্মঘাতী বৃত্ত থেকে উদ্ধারের উপায় দেখি না। অভাবের বেদনাবোধজাত এই পত্রিকার আহ্বানে কিছু বিবেকী লেখক ইতিমধ্যে সাড়া দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের এই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হবে কিনা সেটি অনেক পরিমাণে পাঠকপাঠিকাদের সাড়ার উপরে নির্ভর করে। বাংলাসাহিত্য যাঁদের কাছে বিনোদনের উপায়মাত্র আমাদের বেদনা, অভীপ্সা, শ্রদ্ধা এবং পরিশ্রম তাঁদের জন্য নয়। কিন্তু সেই পাঠকপাঠিকাদের সহযোগ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন—সমাজ, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের বহুমুখী বিকাশে অংশ নিতে যাঁরা যথার্থই আগ্রহী। ...

প্রথম বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

ভাষারহস্য

ভাষা মানব প্রজাতির সবচাইতে প্রধান ও বৈপ্লবিক উদ্ভাবন, এবং লিপির উদ্ভাবন মানুষের ইতিহাসে সবচাইতে স্মরণীয় ও বিস্ময়কর ঘটনা। ভাষাহীন অনুভূতি সম্ভব, কিন্তু ভাষা ছাড়া চিন্তা অকল্পনীয়। ভাষার সূত্রে যা ইন্দ্রিয়গোচর তা জ্ঞানের বিষয়ে কালোত্তীর্ণ হয়, বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ও ভাবনার আদানপ্রদান ঘটে, অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতুবন্ধ সম্ভবপর হয়ে ওঠে। লিপিবদ্ধ ভাষায় বিরচন মানবসভ্যতার প্রকৃত সূচক। এটির সাহায্যে উদ্বংশীয়দের অর্জিত জ্ঞান যেমন পরবর্তীদের বিকাশের উপকরণ হতে পারে, তেমনি প্রাতিস্বিক উপলব্ধি সামূহিক জীবনের বর্ধমানতায় অনুস্যূত হয়।

বাক্-প্রশস্তি তাই সব সভ্যতারই আদিপর্বে উদ্গীত। কিন্তু যদিও আমরা সকলেই কোনো-না-কোনো ভাষার মধ্যে জন্মগ্রহণ করি এবং ভাষার দ্বারা সম্পোষিত হই, ভাষার উদ্ভব, চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপ আজও অনেকটাই রহস্যাবৃত। যে কলমটি দিয়ে আমি লিখছি সেটি, কলম শব্দটি এবং ক,ল, ও ম এই তিনটি অক্ষরের সংযুক্তি তো একই কিছু নয়। আমাদের বাগানের পত্রভারানত আনীলহরিৎ উইলো গাছটি আমার মনে যে শান্ত প্রসন্নতার সঞ্চার করে সেই অনুভূতি এবং যে শব্দ বা অক্ষরসমষ্টি এই অনুভূতির নির্দেশক তারা তো পরস্পর থেকে পৃথক। প্রাকৃতিক পদার্থনিচয় ও ঘটনাবলী এবং চৈতনিক অন্তর্লেখের সঙ্গে ভাষার অনুবন্ধ কি শুধু প্রচলনির্ভর ? আবার অস্তিত্বের প্রতিটি বস্তু ও ঘটনা স্থানকালে বিশিষ্ট ; কিন্তু সামান্যার্থে শব্দের প্রয়োগ ভাষার লক্ষণ। ভাষার বাইরে সামান্যের কি কোনো অস্তিত্ব আছে ভাষা যার নির্দেশ দেয় ? আপনি আছেন, আমি আছি, অন্যেরা আছেন এবং ছিলেন, কিন্তু 'মানুষ' বলে সামান্য কিছুর কি আলাদা কোনো অস্তিত্ব আছে ? অথবা এটি আমাদের কল্পনামাত্র ? সেক্ষেত্রে কল্পনা ব্যাপারটি কী এবং তার সঙ্গে ভাষার সম্পর্কই বা কেমন ধরনের ? বিমূর্তন ভাষার বৈশিষ্ট্য ; কিন্তু যা বিশুদ্ধভাবেই বিমূর্ত (যেমন ন্যায়, শূন্যতা, আনন্ত্য) তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হয়েও কীভাবে অর্থবহ হয় ? অথবা প্রকৃতপক্ষে তা অর্থহীন ? আমাদের যেসব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে ভাষার মারফৎ আমরা অপরের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করি তাদের অনেকটাই কোনো অভিধার মধ্যে ধরা পড়ে না, এটি আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটিও কি

আমরা জানি না যে আমাদের সাধারণ প্রয়োগের তুলনায় কবি ও শব্দ-শিল্পীদের প্রয়োগে ভাষা অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে ওঠে যে অর্থসমৃদ্ধির অপর নাম ব্যঞ্জনা ? ভাষায় এই ব্যঞ্জনাগুণ কোন সূত্রে সঞ্চারিত হয় ? নাকি ব্যঞ্জনার প্রকল্পও আসলে নিরর্থ ?

ভাষার চরিত্র এবং ভাষা ও অস্তিত্বের সম্পর্ক নিয়ে এইসব প্রশ্ন ও এদের চাইতে জটিলতর অন্যান্য সমস্যা নিয়ে গত আড়াই হাজার বছর ধরে দার্শনিকেরা বিচার-বিতর্ক করেছেন ও করছেন । অনেক ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের মতে লিপিমালা উদ্ভাবনের পরে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রকে দার্শনিক জিজ্ঞাসাব উদ্ভবই মানুষের ইতিহাসে দ্বিতীয় মুখ্য বিপ্লব । প্রায় একই কালে ভারতবর্ষে, চীনে, মধ্যপ্রাচ্যে ও গ্রীসে এই বিপ্লব সূচিত হয় । কেন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় একই সময়ে দার্শনিকতার স্ফুরণ ঘটেছিল তা আমরা জানি না বটে, কিন্তু এইসব অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ প্রাগুক্ত অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এটি সকলেই স্বীকাব কবেন ।

বাক্য ও ঘটনাব সম্পর্কবিচারই যে দার্শনিক জিজ্ঞাসাব কেন্দ্রীয় বিষয় আমাদের শতকে এই ধাবণাকে যাঁরা যুক্তির দ্বারা উপস্থাপিত করেন লুডহ্বিক্ হ্বিটগেনস্টাইন (১৮৮৯-১৯৫১) তাঁদের মধ্যে প্রধান । আমার নিতান্ত সীমাবদ্ধ পঠনপাঠন থেকে অনুমান যে তাঁব প্রথম যুগের যুক্তিবিস্তারের সঙ্গে বঙ্গদেশীয় নব্যন্যায়ের কিছু মিল আছে । আশা রাখি কোনো যোগ্য দার্শনিক ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করবেন । ...

বাক্য যেখান থেকে ফিরে আসে, মনের দ্বারা যা প্রাপনীয় নয় এমন তুরীয়ের কথা ঋষিরা বলে থাকলেও তার অস্তিত্ব আমার অগোচর । কিন্তু বস্তুর জগৎ ও অনুভূতির জগৎ যে ভাষাব জগতের সঙ্গে একাত্ম নয় এটি অন্তত আমার কাছে স্পষ্ট । উনিশ শতকের একজন অখ্যাত মার্ক্স-অনুগামী যোশেফ ডিট্জেন জ্ঞানতত্ত্বের বিচার-প্রসঙ্গে অস্তিত্ব ও ভাষাব দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নিয়ে উল্লেখ্য কিছু বিচার করেছিলেন (J. Dietzen, *The Nature of Human Brainwork*, 1869; *A Socialist's Excursions into the Field of Epistemology, 1877*) । জগতে যা কিছু আছে ও ঘটে তাই অনন্য ও নিয়ত পরিবর্তনশীল । মানুষের মন ভাষার সাহায্যে এই নশ্বর ও বিচিত্র জগতে শৃঙ্খলা, সামান্যতা, নিত্যতা, ও কারণিকতার পরিকল্পনা করে । এই পরিকল্পনার উপযুক্তিমূল্য এবং নিজস্ব ইতিহাস আছে; কিন্তু মানুষ যখনই তার পরিকল্পনাকে জগতের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে তখনি সে নিজের রচনার বন্দী হয় । জগৎ সম্পর্কে কৌতূহল ও সংবেদনা এই বন্দীদশা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়; ভাষানির্ভর জ্ঞানের সঙ্গে অস্তিত্বের ঘাতপ্রতিঘাত অনবচ্ছেদ ও অন্তহীন । ডিট্জেনেব এই দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা এঙ্গেলস ও লেনিন কিন্তু গ্রহণ করেননি (দ্রষ্টব্য : Anton Pannekoek, *Lenin as Philosopher*, 1948) । তবে গত ষাটবছরে কোনো কোনো মার্ক্সপন্থী দার্শনিক এই তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন ।

এখন উনিশ শতকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অসামান্য বিকাশের কথা আমরা সকলেই জানি । কবিতার ক্ষেত্রে এটি হয়তো ততটা প্রত্যক্ষ নয় (মাইকেলের একশো বছর আগে ভারতচন্দ্রেব কবিকৃতি স্মরণীয়); কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠী, কেরি ও রামমোহনে যার সূচনা, কয়েক দশক পরে সেই বাংলাগদ্যের বঙ্কিমী বৈভবে উত্তরণ বঙ্গীয় তথা ভারতীয় ইতিহাসের এক অতুলনীয়, প্রায় অবিশ্বাস্য কাহিনী । যে আস্তিত্বিক প্রেষ ও মানসপ্রতিক্রিয়া এই বিকাশের প্রধান সূত্র বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আলোচনায় সেটির

বিশদ বিচার নিতান্ত জরুরি । এই প্রসঙ্গে নানা প্রশ্ন ওঠে । ভাষা ও সাহিত্যের মতো বঙ্গসংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও কি উনিশ শতকে তুলনীয় প্রবর্তনা-উদ্ভাবনা চোখে পড়ে ? এই প্রেষ সমাজের বিভিন্ন অংশে কী কী ভাবে অনুভূত হয় ? যে মনস্বীরা সচেতনভাবে এই প্রেষে সাড়া দেন তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে, চিন্তায় ও ব্যবহারে সেই প্রতিক্রিয়া কী কী ভাবে প্রকাশিত হয় ? ...

প্রথম বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা

শিক্ষা-সংকট

শিক্ষার সংকট এদেশে সম্প্রতিকালে এতই ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ যে অন্তত এই সংকটের অস্তিত্ব সম্পর্কে মতানৈক্যের আশঙ্কা করি না । সংকটের নিদান নির্ণয় এবং তা থেকে উত্তরণের উপায়-পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে । আলোচনা প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে যদিও এই সংকট ভারতবর্ষে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ, অন্যান্য দেশেও এটির উপস্থিতি মোটেই অননুভূত নয়, এবং ফলে সেইসব দেশেও এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়াদি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে । ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার উপরে জোর দিয়েও বোধহয় বলা চলে শিক্ষার বৈশ্বিক সংকট নিয়ে যাঁরা চিন্তা করছেন তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে পরিচয় এদেশের পক্ষে অবান্তর নয় ।

উনিশ শতক পর্যন্ত সবদেশেই নিয়মিত শিক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ ছিল সমাজের একটি সংখ্যাল্প গোষ্ঠীর মধ্যে । শিক্ষার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের চর্চা এবং সেই চর্চার দ্বারা ব্যক্তির ও সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন । অপর পক্ষে এটিও প্রচ্ছন্ন ছিল না যে নিয়মিত শিক্ষালাভ সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জনের অন্যতম প্রধান উপায় । সমাজে যাঁরা উপরতলার মানুষ তাঁদের সন্তানদের পক্ষেই নিয়মিত শিক্ষালাভ সম্ভব ছিল, এবং শিক্ষালাভের ফলে তাঁরা সমাজের উপরতলায় তাঁদের অবস্থানকে সুপ্রতিষ্ঠ করতেন । নিয়মিত শিক্ষাদানের জন্য গড়ে উঠেছিল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। এইসব প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণ ও প্রবর্ধন, উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার মান উঁচু রাখা —এসবই ছিল শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত এবং শিক্ষার ফলে লাভবান ব্যক্তিদের দায়িত্ব । প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর শিক্ষা নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে বিন্যস্ত ছিল ।

আমাদের শতকের দুই মহাযুদ্ধ-মধ্যবর্তীকালে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত হয় । শিক্ষা যে উনজনের বিশেষাধিকার নয়, তাতে যে সর্বসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরি, এই প্রত্যয়টি উনিশ শতকব্যাপী গণতান্ত্রিক ভাবান্দোলনের ফলে সাধারণ স্বীকৃতি অর্জন করে । শিল্পবিপ্লবের ফলে যেসব দেশের প্রভূত আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল সেসব দেশে ক্রমে সর্বসাধারণের জন্য আবশ্যিক ও অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয় । উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু পশ্চিমের অধিকাংশ দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করে । যেসব দেশ এখনো শিল্পোন্নত নয় সেসব দেশেও সর্বসাধারণের শিক্ষার অধিকার সম্প্রতিকালে অন্তত নীতি

হিসাবে অঙ্গীকৃত। এইসব দেশে অনেক ক্ষেত্রে সমাজের অর্ধেকের বেশি প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ এখনো নিরক্ষর, কিন্তু শিশু ও বালক-বালিকাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লক্ষণীয়। বস্তুত মুদ্রণশিল্পের উদ্ভাবনের ফলে মানুষের ইতিহাসে যেমন বহুমুখী রূপান্তর দেখা দিয়েছিল সর্বজনীন শিক্ষার বাস্তবায়ন ঘটলে তার চাইতেও সুদূরপ্রসারী পবিবর্তন দেখা দেবে এটাই প্রত্যাশিত। আমরা বিশ শতকের শেষভাগে সম্ভবত এক বিশ্বব্যাপী অভূতপূর্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রাক্‌কালে বাস করছি।

কিন্তু বর্তমানে বিপ্লবের সম্ভাবনার চাইতে সংকটের বাস্তবতাই বেশি প্রত্যক্ষ। সাধারণ শিক্ষার দ্রুত প্রসার পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই শিক্ষার মানকে নিম্নগামী করেছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, কিন্তু সেই অনুপাতে উপযুক্ত শিক্ষক মেলা কঠিন। ফলে বহু অযোগ্য লোক শিক্ষক-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হচ্ছেন। ক্লাসে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রবলভাবে বাড়ার ফলে বিবেকী-শিক্ষকও ছাত্রছাত্রীদের প্রতি প্রাতিস্বিক মনোযোগ দিতে অসমর্থ। অপবপক্ষে সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে বৈচিত্র্যের বিলোপ ঘটিয়ে প্রমিতকরণ প্রাধান্য পাচ্ছে, এবং মনের বিকাশের পরিবর্তে বাঁধাধরা নিয়মে প্রশ্নোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার খাতে ব্যয় যতই বাড়ছে ততই শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রনির্ভর হচ্ছে এবং ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উপরে আমলাতন্ত্র ও ক্ষমতায় আসীন দলের আধিপত্য আজ বহুবিস্তৃত। অপরপক্ষে শিক্ষাব সুযোগে আর্থিক উন্নতি অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন আজ অনেকটা অনিশ্চিত। শুধু এদেশে নয়, শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বিবর্ধমান। ফলে শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে সংশয়, এমনকি গভীর অনাস্থার মনোভাব দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে। সংকটের এইসব দিকের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য কোনো গ্রন্থ বা রিপোর্ট পড়ার প্রয়োজন হয় না ; পশ্চিমবঙ্গের স্ত্রী-পুরুষ বেশ কিছুকাল ধরেই হাড়ে হাড়ে এসব ব্যাপার টের পাচ্ছেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপায় নিয়ে চিন্তাব প্রয়োজন পূর্বেও ছিল, কিন্তু বর্তমানে এটি অত্যন্ত জরুরি। যদি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ শিক্ষার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে তাব জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়-জাতীয় প্রতিষ্ঠান, এবং পাঠ্যসূচি, পবীক্ষা ইত্যাদি অনুষ্ঠান কি অবশ্য-প্রয়োজনীয় ? অথবা এইসব প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে মানবিক বিকাশের পক্ষে বাধামাত্র ? যদি তারা অবশ্য-প্রয়োজনীয় না হয়, অথবা বিকাশের প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে তাদের বিকল্প কী পন্থার উদ্ভাবনা করা যায় যার অনুসরণের দ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব ? শিক্ষায় সর্বসাধারণের অধিকার অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ও প্রয়োজন। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞানচর্চার মান যাতে নিম্নগামী না হয় সেটিও তো দেখা দরকার। এই দুটি আপাতবিরোধী নীতিকে কীভাবে মেলানো যেতে পারে ? ...

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিলোপ সাধন অবাস্তব এবং অকাম্য মনে হতে পারে, কিন্তু বর্তমান সংকটের পরিস্থিতিতে অন্তত দুটি দিকে বিশেষ উদ্যোগের কি প্রয়োজন নেই ? প্রত্যেক সমাজেই অন্তত এমন কয়েকটি কেন্দ্র থাকা দরকার যেখানে একদিকে মনুষ্য-প্রজাতির সাংস্কৃতিক উত্তরলব্ধির অভিনিবিষ্ট চর্চা এবং অন্যদিকে সেই উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নতুন মানসসম্পদের রচনা সংযুক্ত কর্মীদের একান্ত দায়িত্ব। এই ধরনের কেন্দ্রই প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়। তবে একদিকে জ্ঞানচর্চায় সমর্পিত-জীবন

মনীষীদের সমাগম এবং অন্যদিকে তরুণ, অধ্যবসায়ী জিজ্ঞাসুদের সঙ্গে তাঁদের যথার্থ আত্মীয়তা ও ভাবনার আদান-প্রদান না ঘটলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণসঞ্চার সম্ভব নয়। জ্ঞানচর্চাকে যদি আমরা অর্থহীন পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত করতে না চাই তাহলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আমলাতন্ত্র, অযোগ্য-অধ্যাপক ও অনাগ্রহী ছাত্রছাত্রী, উপাধিদানের পাইকারি ব্যবস্থা এবং ভীড়াক্রান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সম্বন্ধীকরণের হাত থেকে মুক্ত করা জরুরি। কী উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আবার যথার্থ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র করে তোলা যায় সেদিকে মনোনিবেশ আমাদের মনীষীদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। যদি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুনরুজ্জীবন একেবারেই অসম্ভব ঠেকে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কীভাবে জ্ঞানচর্চার উপযোগী বিভিন্ন কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় সে বিষয়েও চিন্তা ও উদ্যোগ বিশেষ প্রয়োজন।

... দ্বিতীয় দিকটি হলো জনশিক্ষার। এই জনশিক্ষার দিকটি আমাদের দেশে আজও অবহেলিত। অথচ এদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কম নয় এবং বিভিন্ন রকমের কারিগর এখনো যথেষ্ট বর্তমান। তাঁদের মানবীয় সামর্থ্যকে কাজে লাগানোর জন্য উদ্যোগী কিছু সংগঠকের বিশেষ প্রয়োজন। পাঠাগার, শ্রমিক ইউনিয়ন, পঞ্চায়েৎ, আড্ডা, ক্লাব, সমাজসেবী সংঘ, সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতি ছোট-বড়ো প্রতিষ্ঠানকে জনশিক্ষার উদ্যোগে বিশেষ অংশ নিতে হবে। 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার লেখক ও পাঠকদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষণের কাজে নিযুক্ত। তাঁরা এবং অন্য যাঁরা তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন তাঁরা যদি ব্যক্তিগতভাবে এবং পরস্পরের সহযোগে জনশিক্ষার নেটওয়ার্ক রচনায় উদ্যোগী হন তাহলে হয়তো বর্তমান সংকট ব্যর্থতা ও অসহায়তাবোধের প্রসার না ঘটিয়ে ফলপ্রসূতার দিকে আমাদের কিছুটা এগিয়ে দেবে। ...

দ্বিতীয় বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

পিকাসো জন্মশতবার্ষিকী

সৃজনশীলতা মানুষের প্রাজাতিক বৃত্তি। যাকে সভ্যতা বলা হয়ে থাকে তার উদ্ভবের অনেক আগেই অজ্ঞাতনামা শিল্পীরা গুহার দেয়ালে ছবি এঁকেছিলেন, মেয়েরা রচেছিলেন ছড়াকাহিনী, রহস্যময় অন্তর্লোক আভাসিত হয়েছিল লোকনৃত্যে, মৃৎপাত্রের অলঙ্করণে। অভিভাবকরা যখন তাদের প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন না তখন শিশুদের কাণ্ড-কারখানাতেও কি এই স্বভাবজ সৃজনীবৃত্তির পরিচয় মেলে না ?

কিন্তু সেই বৃত্তিকে কতটা মূল্য দেন অভিভাবকেরা—শিশুর অথবা সমাজের ? যাতে আমরা অভ্যস্ত তা থেকে ভিন্নমুখী সম্ভাবনার উদ্ভাবন ও রূপায়ণই তো সৃষ্টি। কিন্তু অভ্যাস, শৃঙ্খলা, নিয়ম, পরম্পরা এসব ছাড়া পরিবার, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র, সমাজ কিছুই টেঁকে না। প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের প্রবণতা থাকে 'অভিনবকে' দমনের দিকে। সৃজনশীলতা অভিভাবকদের শঙ্কিত করে। কায়েমি ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাঁরা নিজেদের

উপরে আরোপ করেছেন শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগেই তাদের মন থেকে যাতে জিজ্ঞাসা, কল্পনা, উদ্ভাবনার শিকড় উৎপাটিত হয় তার জন্য তাঁরা বিশেষ সতর্ক ও সচেষ্ট। গতানুগতিকের নিরাপত্তায় প্রলুব্ধ অধিজন বহুক্ষেত্রেই এই অভিভাবকদের নেতৃত্ব মেনে নেন। যাঁরা পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও শৈক্ষিক নিয়মন সত্ত্বেও নিজেদের সৃজনশীলতাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তাঁরা শিল্পী, ভাবুক, উদ্ভাবক, পথপ্রদর্শক। তাঁদের অভাবে সমাজ স্থবির, অনাহিত, স্তরীভূত। ...

যে শিল্পীর সৃজনশীলতা আজ দীর্ঘকাল ধরে অপ্রতর্ক্য, এই শতকে চিত্রশিল্পের জগতে বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারে যাঁর ভূমিকা প্রায় তুলনাহীন, যাঁর জন্মশতবার্ষিকী এ-বছরের আন্তর্জাতিক পঞ্জিকার সম্ভবত সবচাইতে উল্লেখ্য ঘটনা সেই পাবলো পিকাসো আমাদেব যুগকে তাঁর শিল্পকর্মের দ্বারা যেমন সম্পন্ন করে গেছেন তাঁর প্রতিভা তেমনি আমাদের মনে অসংখ্য প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। মৃত্যুর পর শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহেই তাঁর নিজের যে কাজ পাওয়া গেছে পরিমাণে এবং বৈচিত্র্যে তা অবিশ্বাস্য : ১৮৮৫টি চিত্র, ১২২৮টি ভাস্কর্য, ৭০৮৯টি ড্রয়িং, ৩২২২টি সিরামিকস। এই তালিকাব বাইরে রয়ে গেছে বহু কাজ যা তাঁর জীবদ্দশায় বিক্রি হযে যায় এবং যা বিভিন্ন সংগ্রহশালায় বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত। গত বছর নিউইয়র্কের মিউজিয়ম অব্ মডার্ন আর্টে তাঁর যে প্রদর্শনীটি হয় ইতিহাসে এতাবৎ কোনো শিল্পীর তেমন প্রতিনিধিমূলক একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়নি। সেই বিরাট মিউজিয়ামের সমস্ত ঘরে ছিল শুধু পিকাসোর কাজ—সংখ্যায় এক হাজার—পৃথিবীর প্রত্যেক সংগ্রহ থেকে বাছাই করে আনা (শুধু সোভিয়েট ইউনিয়ন বারোটি ছবি শেষ পর্যন্ত দেয়নি)—এমনকি বার্সিলোনা মিউজিয়াম শিল্পীর আদিযুগেব পঞ্চাশটি ছবি এই প্রদর্শনীর জন্য ধার দেয়। প্রদর্শনীটিব কেন্দ্রে ছিল পিকাসোর নিজস্ব পিকাসো-সংগ্রহ। বাবস্থা কবেছিলেন মিউজিয়াম অব্ মডার্ন আর্টেব উইলিয়ম রুবিন এবং পরিকল্পিত পিকাসো মিউজিয়মের কিউরেটর ডমিনিক বুজো। আটবছর বয়সে আঁকা স্কেচ থেকে মৃত্যুর বছরখানেক আগে আঁকা আত্মপ্রতিকৃতি—নীল যুগ, গোলাপি যুগ, কিউবিস্ট ও জ্যামিতিক যুগ, কোলাজ, মঞ্চসজ্জা, মুরাল—আশীবছর ধরে অপরিমেয় বৈচিত্র্য এবং অনবচ্ছিন্ন অজস্রতায় তাঁর প্রতিভার ফসল. উইলিয়াম রুবিনের হিসাব অনুসারে, পঞ্চাশজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর সারাজীবনের কাজের যোগফলের সমতুল্য।

পিকাসো জন্মেছিলেন দক্ষিণ স্পেনের মালাগায়; তেইশ বছর বয়সে স্পেন ত্যাগ করে পারিতে চলে আসেন। এদেশে অনেকের ধারণা স্বদেশ ও স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে শিল্পীব সর্বনাশ। পিকাসোর প্রতিভা কি এই ধারণার সমর্থক ? স্পেনকে তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু স্পেনে তিনি ফিরে যাননি। এল গ্রেকোর মতোই তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর 'পিতৃভূমি' (Patria elegida)। গোইয়া যেমন তাঁব আত্মীয় তেমনি দেলাক্রোয়া, মানে, সেজান। তিনি যতটা স্প্যানিশ অন্তত ততটাই ফরাসি; দুইকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে তিনি বিশশতকী শিল্পমানসের প্রধান রচয়িতা ও প্রতিভূ; এবং সব পরিচয়ের উপরে তিনি অনন্য পিকাসো। তবে কি বিচ্ছিন্নতা সৃজনশীলতার প্রতিকূল নয় ?

স্বদেশ থেকে যিনি স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন তিনি কি প্রকৃতিপ্রেমে অযথা ধর্মবিশ্বাসে সরসতার সন্ধান করেছিলেন ? না, পিকাসোর প্রকৃতি তাঁর নির্মম শিল্পকর্মের উপাদান-

মাত্র। তিনি যত না প্রেমিক তার চাইতে অনেক বেশি প্রবলভাবে অনুসন্ধিৎসু, গবেষক, আবিষ্কারক। তাঁর শিল্পকর্মে প্রকৃতি সর্বদাই মানবীয় চেতনার অধীন ; তাঁর ছবিতে, ভাস্কর্যে বাইরের জগৎ যত বিচিত্ররূপে ধৃত তাদের বেশিরভাগই তাঁর নিজের উদ্ভাবিত। কোনো ধর্মবিশ্বাস তাঁকে অনুপ্রেরিত করেনি। ১৯৪৪ সালে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন বটে, কিন্তু তাঁর শিল্পকর্মে কম্যুনিস্ট ভাবনাচিন্তার প্রভাবও দুর্লক্ষ্য। কম্যুনিস্টরা তাঁর খ্যাতিকে কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু শিল্পের যে বিশুদ্ধ স্বয়ম্ভরতা পিকাসো-বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য সেটিকে নিয়ে গোঁড়া কম্যুনিস্টরা আগাগোড়া বিব্রত। অধিকাংশ দর্শকের মনে শিল্প যেসব অনুসঙ্গের সঙ্গে প্রায় অচ্ছেদ্যভাবে অনুবদ্ধ—স্বাজাতিক ঐতিহ্য, প্রকৃতির অনুকরণ, ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলন—সেগুলি কি তাহলে শিল্পসৃষ্টিতে এবং রসিকজনের উপভোগে অবান্তর বা আপতিক ?

আমাদের কালে সৃষ্টিশীলতার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যের সর্বোত্তম উদাহরণ পিকাসো। শুধু প্রকৃতি নয়, স্ত্রী-পুরুষকেও তিনি তাঁর শিল্পকর্মের উপকরণ হিসেবেই দেখেছিলেন। এই নির্মম একাগ্রতা, এই ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী প্যাশনকে সমাজ কি আদৌ তারিফ করত যদি-না তা ফলপ্রসূ হতো অক্লান্ত, অমিত সৃষ্টিশীলতায় ? ...

দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

ইনটেলেক্চুয়্যাল

বাংলায় বুদ্ধিজীবী নামে যে অর্বাচীন শব্দটির আকছার প্রয়োগ দেখা যায় সেটি স্বীকৃতভাবেই ইংরেজি 'ইনটেলেক্চুয়্যাল' শব্দের তর্জমাসূত্রে নির্মিত। কিন্তু মূল শব্দটি নিয়ে পশ্চিমে যেভাবে বিস্তারিত বিচার-বিতর্ক হয়েছে ও হচ্ছে বাংলায় তার সঙ্গে তুলনীয় কিছুই ঘটেনি। 'সংসদ বাংলা অভিধান' অনুসারে বুদ্ধিজীবীর অর্থ 'বুদ্ধিবলে বা বুদ্ধির কাজদ্বারা জীবিকার্জনকারী'। অপরপক্ষে 'শর্টার অকস্‌ফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি'র মতে 'মননের অনুশীলনে যাঁরা নিযুক্ত' তাঁরাই ইনটেলেক্চুয়্যাল। দুটি মোটেই এক ব্যাপার নয় বাংলা প্রতিশব্দটির ঝোঁক জীবিকার উপরে আর ইংরেজি শব্দটির ঝোঁক মননের উপরে। মননের প্রকৃতি কী, মনীষিতার লক্ষণাদি কী, সমাজে তথা ইতিহাসে মনস্বীদের ভূমিকাদি কেমনতরো—পশ্চিমে এসবই হচ্ছে ইনটেলেক্চুয়্যাল-সংক্রান্ত বিচার-বিতর্কের বিষয়বস্তু।

যে-কোনো সভ্য সমাজেই কিছু মানুষের উপস্থিতি লক্ষণীয়, সংখ্যাল্প হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষের তুলনায় যাঁদের প্রভাবপ্রতিপত্তিপ্রতিষ্ঠা অনেক বেশি। পশ্চিমে এঁদের নামকরণ হয়েছে এলিট। কিন্তু এঁরা সকলেই কিছু আর এক গোষ্ঠীর, এমনকি একধরনের মানুষ নন। এঁদের প্রতিপত্তির সূত্র যেমন বিভিন্ন, এঁদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং বহুক্ষেত্রে বিরোধও তেমনই প্রকট। এইসব নানা গোষ্ঠীর এলিটদের নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন হ্বেবার, ড্রাইটজেল, মস্‌কা, পারেটো, ল্যাসওয়েল, লার্নার, রথওয়েল, মিল্‌স্ প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক। সব সভ্যসমাজেই

ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যালরা এই এলিট গোষ্ঠীদের অন্যতম। যেসব বৈশিষ্ট্য এই গোষ্ঠীর মানুষদের চিহ্নিত করে এবং যাদের সূত্রে এঁদের প্রভাবপ্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলিকে বিশ্লেষকরা নানাভাবে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন। কেউ বলেছেন এঁরা 'সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার উদ্ভাবনমুখী বিকাশে এবং পরিচালনায় পারঙ্গম' (পারসন্‌স্) ; কারো মতে 'বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ ও মানবসমাজের ধারকসূত্রাদি নিয়ে তন্নিষ্ঠ চিন্তার সামর্থ্য'ই এঁদের বৈশিষ্ট্য (শিল্‌স্); আবার কারো বিচারে এঁরা হলেন 'বিমূর্ত ধারণাবলীর তত্ত্বাবধায়ক এবং নৈতিক মানের অতন্দ্র সংরক্ষক' (কোজার)।

কারা যে ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল তা নিয়ে পশ্চিমী চিন্তকদের মধ্যে মতৈক্য নেই বটে, কিন্তু কোনো কোনো মানসিক ক্রিয়া যে মনীষিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একথা তাঁরা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। এদের মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের স্বরূপ অন্বেষণ অথবা জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানের চর্চা মননের আবশ্যিক সর্ত। জ্ঞানান্বেষণের সূত্রে বিশেষ থেকে সামান্যে, প্রত্যক্ষ থেকে বিমূর্তে, প্রাতিস্বিক থেকে সার্বত্রিকে, তথ্য থেকে তত্ত্বে উত্তরণ ঘটে; আবার জিজ্ঞাসাই সেই সামান্য, বিমূর্ত, সার্বত্রিক তত্ত্বকে নানা পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে তার পরিবর্তন, সম্মার্জন, পরিবর্জন ঘটায়। এই ক্রিয়া যাঁদের জীবনের মুখ্য সাধনা তাঁরা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে সমঞ্জসার প্রয়োজনে নানাবিধ রীতিনীতি, মূল্যগ্রাম, কর্তব্যনির্দেশ এবং তাদের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে ওঠে; ভাষায় এদের সুস্পষ্ট রূপ দেওয়া এবং এদের সমর্থনে যুক্তিরচনা করাও মননের অন্যতম বিশিষ্ট ক্রিয়া। নীতিশাস্ত্রে বা ধর্মশাস্ত্রে মননের এই ঔচিত্য-অনৌচিত্য নির্ণয়নের দিকটি প্রকটিত। তৃতীয়ত, প্রচলিত রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠান-ব্যবস্থাদির ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করে বিকল্প সম্ভাবনার নির্দেশ দেওয়াও মননের স্বীকৃত দায়িত্ব। এটিকে যাঁরা প্রাধান্য দেন তাঁরা সমালোচক, সংস্কারক, বিপ্লবী অথবা ইউটোপিয়ান।

এখন এই তিনটি ক্রিয়া পরস্পরবিরোধী কি না তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে। জড়প্রকৃতির বিচারে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু মানুষ-সংক্রান্ত-আলোচনায় এই প্রশ্নকে আদৌ এড়ানো যায় না বলেই অনেকে দাবি করেন। অপরপক্ষে অনেক চিন্তকের যুক্তি অনুসারে যা আছে তাকে বোঝবার চেষ্টায় নিজেকে নিবদ্ধ রাখার দ্বারাই জ্ঞান নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করে। উচিত-অনুচিতের নির্ণায়ক আবিষ্কার জ্ঞানের অসাধ্য ; এইজাতীয় নির্দেশ দেওয়ার দায়িত্বকে জ্ঞানান্বেষণের সাধনায় প্রাধান্য দিলে চিন্তায় আবেগজাত অস্বচ্ছতা আসে; তাছাড়া কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর নির্দেশ তুল্যমূল্য। এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে গাইগার প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যালদের দুই পৃথক গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন। একদিকে আছেন 'অবজেকটিভ' অথবা 'অ্যাকাডেমিক' ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যালস, যাঁরা প্রকৃতির মতো মানুষ এবং মানুষের সমাজকেও শুধু উপাত্ত হিসেবে বিশ্লেষণ করেন, মানুষের ভালোমন্দ-সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কোনো মতামত দেন না। অপরদিকে আছেন 'সাবজেকটিভ ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যালস' যাঁদের বিশ্লেষণ স্বীকৃতভাবেই পক্ষপাতচিহ্নিত। শেষোক্তদের মধ্যেও দুটি ভাগের কথা বলা হয়ে থাকে। যাঁরা মোটামুটিভাবে প্রচলিত ব্যবস্থা, মূল্যগ্রাম এবং ধ্যানধারণাকেই যুক্তি দিয়ে সমর্থন করে থাকেন তাঁরা 'আইডিয়লজিস্ট' বা শাস্ত্রকার বা

শাস্ত্রভাষ্যকার। আর যাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থার প্রখর সমালোচক এবং বিকল্প ব্যবস্থার প্রবক্তা তাঁরা বিপ্লবী মনস্বী এবং তাঁদের সমষ্টিগত বিশেষ নাম 'ইনটেলিগেনট্‌শিয়া।'

শেষোক্ত শব্দটি উনিশ শতকেই প্রথম প্রচলিত হয় যদিও এই ধারণার আদিরূপের সাক্ষাৎ মেলে আঠারো শতকের বিপ্লবপূর্ব ফরাসি দেশে। উনিশ শতকে রুশদেশে যে বিপ্লবমুখী ভাবান্দোলন ঘটে তার প্রবক্তারা—চাদায়েভ, হারত্‌জেন, বাকুনিন, বেলিনস্কি ইত্যাদি—নিজেদের দেখতেন ইনটেলিগেনট্‌শিয়ার সদস্য হিসেবে—যে ইনটেলিগেনট্‌শিয়া 'বিবেকাহত', দেশ-জাতি-সমাজ-ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত, যে শ্রেণী থেকে তার উদ্ভব সেই শ্রেণীর বিরোধী। এঁদের উচ্ছিন্নতা এঁদের ভোগবৃত্ত হতে দেয়নি ; এঁদের বিবেক এঁদের যেমন উচ্ছিন্ন করেছে তেমনি সক্রিয় রেখেছে; সঞ্চার করেছে ইতিহাসকে রচনা করবার প্রত্যয়, এবং হয়তো তারই সঙ্গে এঁদের বস্তুজ্ঞানকে কিছুটা আচ্ছন্নও করেছে। বিশ শতকে এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকায় যে বিপ্লবী ভাবুকদের অভ্যুত্থান লক্ষণীয় এঁরা তাঁদের পূর্বসূরী।

এখন জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সম্পর্ক অস্পষ্ট নয়। যে ব্যবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় সেটি সম্পর্কে এবং রূপান্তরের প্রক্রিয়াপদ্ধতি বিষয়ে সম্যক ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান না থাকলে রূপান্তর ব্যর্থ অথবা বিপথগামী হতে পারে। কিন্তু পরিবর্তনের উপরে অত্যধিক জোর দিলে নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের একাগ্র চর্চা যে ব্যাহত হয়, এ আশঙ্কা সম্পর্কে অনেকেই অনবহিত। জানা আর বদলানো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত বটে; কিন্তু বিজ্ঞানী এবং বিপ্লবী একধরনের মানুষ নন। তাঁদের কাজের রকমও একেবারে আলাদা। তত্ত্ব এবং ক্রিয়াকে মার্কস একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন; কিন্তু 'প্রাক্‌সিসের' দাপটে মার্কসীয় সমাজবিশ্লেষণ যে কীভাবে ব্যাহত হয়েছে আজ সেটি স্পষ্ট। অথচ, অন্তত মানবসমাজবিষয়ক চর্চার ক্ষেত্রে যে-তত্ত্বজিজ্ঞাসা পরিবর্তনের দায়িত্ব এড়াতে চায় তা যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল, এমনকি বিকাশবিরোধী এ অভিযোগ অস্বীকার করা কঠিন। জ্ঞানচর্চার দায়িত্ব এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ—এ দুটিকে সংযুক্ত করবার দুরূহ সমস্যা বিশেষ করে এই শতকের মনস্বীদের ব্যাকুল করেছে। ..

দ্বিতীয় বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা

স্বাধীন ভারত ও বিকল্প সমাজাদর্শ

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পূর্ববর্তী কয়েক দশকে এদেশের শিক্ষিত এবং বিবেকী স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে বিদেশি শাসনই আমাদের অধিকাংশ প্রধান গলদের মূল কারণ এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জিত হলে এইসব গলদ সহজেই দূর করা যাবে। এই বিশ্বাস জাতীয় আন্দোলনে প্রেরণা যোগায়, বহু তরুণ আদর্শবাদীকে আকৃষ্ট করে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকতা ও গতি আনে, রাজনীতিকে স্রেফ ক্ষমতার লড়াইয়ে পর্যবসিত হওয়া থেকে অন্তত আংশিকভাবে রক্ষা

করে । এই বিশ্বাসে অনেকে স্বেচ্ছায় বহু ক্ষতি বরণ করেছেন, বিস্তর ঝুঁকি নিয়েছেন, কারাগারে অথবা নির্বাসনে বছরের পরে বছর কাটিয়েছেন, প্রাণের মূল্যে ঐকান্তিকতার প্রমাণ দিয়েছেন । তাঁদের বিশ্বাস প্রমাণসিদ্ধ হোক বা না-হোক, তাঁদেব নিষ্ঠা তৎকালেও যেমন আজও তেমনই শ্রদ্ধার্হ ।

অংশত জাতীয় আন্দোলনের চাপে, অংশত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের ফলে ইংরেজ এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয় । তারপর পঁয়ত্রিশ বছর কাটল । কিছু পরিবর্তন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবস্থাব কিছু উন্নতি অবশ্যই এদেশে ঘটেছে । কিন্তু প্রধান গলদগুলি দূর হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে একথা শক্তিতে আসীন রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা পর্যন্ত দাবি করেন না । দেশের জনসাধারণের প্রধান অংশ আজও নিরক্ষর, বুভুক্ষু, সুচিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত । গ্রামাঞ্চলে যারা গরীব চাষি এবং যারা ভূমিহীন খেতমজুর তাদের দুরবস্থা আগের তুলনায় বেড়েছে বই কমেনি । আইনত অস্পৃশ্যদেব কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা এবং মেয়েদের পুরুষদেব সঙ্গে সমতার অধিকার দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু বাস্তবে অস্পৃশ্যদের প্রতি 'উচ্চবর্ণের' হিন্দুদের এবং মেয়েদের প্রতি পুরুষদের মনোভাব খুব একটা বদলায়নি । হরিজনদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার খবর যেমন প্রায়ই কাগজে পড়া যায়, পণপ্রথার অভিশাপ আজও প্রায় তেমনই আগের মতোই অনড় । দেশের প্রায় সবক্ষেত্রে ঘুষ, দুর্নীতি, দুর্বলের উপরে শক্তিশালীর জুলুম, ধাপ্পা ও ফাঁকিবাজি কায়েম হয়ে বসেছে । ব্যাপক দারিদ্র্যের পাশাপাশি প্রকট বিলাস ও অপচয়, মেরুদণ্ডহীন চামচাদেব সংকীর্তনে পরিপুষ্ট রাজনৈতিক গুণ্ডাদেব বাহ্বাস্ফোট, অতিপ্রজ আমলাতন্ত্রের নির্দায়িত্ব অধিক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, শিক্ষাব্যবস্থাব আপজাত্য, শহরে ও গ্রামে উপার্জনহীন ও উপার্জনের সম্ভাবনাহীন প্রাপ্তবয়স্কদেব সংখ্যাবৃদ্ধি, বাইরে থেকে নেওয়া ঋণ এবং দানের নাগপাশে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের বন্দীদশা—স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতের এই নিরাশ্বাস রূপ দেখে মনে প্রশ্ন না উঠে পারে না—বিদেশি শাসন শেষ হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের কতটুকু কল্যাণ হয়েছে ?

দেশে যখন জাতীয় আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠছিল তখনই এদেশের কয়েকজন ভাবুক আমাদের গোড়ার গলদ সম্পর্কে সচেতন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন । বিদেশি শাসনের বিলোপ তাঁরা চেয়েছিলেন, বিলোপের দ্বারা সমস্যার সমাধান ঘটবে একথা তাঁরা মনে করেননি । তাঁরা জোর দিয়েছিলেন বিকল্প ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও নির্মাণের উপরে । বিকল্প ব্যবস্থার চেহারাটি কি হবে এবং সেটি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এ সম্পর্কে তাঁদের পারস্পরিক চিন্তায় পার্থক্য ছিল । কিন্তু আজকের ব্যবধান থেকে যখন তাঁদের ভাবনা এবং উদ্যোগের কথা স্মরণ করি তখন তাঁদের মধ্যে পার্থক্যের তুলনায় আত্মীয়তাই যেন স্পষ্টতর ঠেকে ।

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়—আমার সৌভাগ্য যে আমার তরুণ বয়সে এঁদের তিনজনকেই আমি দেখেছি এবং কিছু আগে-পরে এদের ভাবনাচিন্তা, উদ্যম-উদ্যোগের সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় হয়েছে । এঁদের পারস্পরিক পার্থক্য নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করেছি. এখানে সে প্রসঙ্গ তুলব না । কিন্তু 'জিজ্ঞাসা'র বর্তমান সংখ্যাটি সম্পাদনা করবার সময়ে এঁদের কথা যে কারণে মনে উঠেছে তার উল্লেখ করতে চাই ।

এঁরা তিনজনেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকেই দেখেছিলেন রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে নৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক

রূপান্তরের অঙ্গ হিসেবে । যে ব্যবস্থার ভিতরে তাঁদের জন্ম এবং বাস সেটিকে তাঁরা আমূল পালটাতে চেয়েছিলেন । তাঁদের কল্পিত আদর্শ-সমাজের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । সেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা খুব সীমাবদ্ধ; শক্তির সংগঠন সেখানে এতটা বিকেন্দ্রিত যে প্রাপ্তবয়স্ক সর্বসাধারণ সেখানে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াতে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে; প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগ সেই সমাজের বিকাশের উৎস; সম্পদ সেখানে সর্বজনীন হিতসাধনে নিয়োজিত, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উদ্দেশ্য বিবেকিতা, সৃজনসামর্থ্য ও দায়িত্ববোধের অনুশীলন । এঁরা একই সঙ্গে চেয়েছেন গ্রামভিত্তিক সমাজসংগঠন এবং তাতে বৈশ্বিকতাবোধের সঞ্চার ।

যেহেতু প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাব আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে তার জায়গায় বিকল্প আদর্শ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় এঁরা নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন, সেই কারণে তিনজনকেই ইউটোপিয়ান ভাবুক বলা সঙ্গত । কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা না ঘটা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার পরিবেশে কিছুই করা সম্ভব নয়, এমন কথা এঁরা মানেননি । কার্ল্ পপার যেভাবে কল্পভাবুক বা ইউটোপিয়ানদের সঙ্গে সংস্কারকদের মৌল বিরোধের কথা ব্যাখ্যা করেছেন, সে ভাবেব যুক্তি এঁদের ক্ষেত্রে সম্ভবত খাটে না । কাবণ বিকল্প ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা সত্ত্বেও এঁরা একদিকে সংস্কারে অনাগ্রহী ছিলেন না এবং অন্যদিকে বর্তমান ব্যবস্থাব ভিতরেই আদর্শ সমাজের মডেল নির্মাণে উদ্যোগী ছিলেন । ...

পুঁজিবাদী গণতন্ত্র এবং কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রতন্ত্র এই দুটি বিকল্পেব কোনোটিই এঁদেব কাছে সমর্থনযোগ্য ঠেকেনি । আমার মনে হয় বিশ শতকের ভারতবর্ষে রাষ্ট্রিক-সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে যে ধারাটি মৌলিকতা দাবি করতে পারে সেটি এই বিকেন্দ্রিত সমাজ সংগঠনের ভাবাদর্শ । পশ্চিমে সম্প্রতিকালে এটির স্বপক্ষে লেভি-স্ট্রাউস, শুমাকার প্রভৃতি লিখেছেন । তা নিয়ে পশ্চিমে বিতর্ক হচ্ছে । কিন্তু প্রায় শতাব্দীকাল ধরে ভারতবর্ষে বেশ কয়েকজন প্রথমশ্রেণীর ভাবুক এই বিকল্প সমাজাদর্শ উপস্থাপিত কবা সত্ত্বেও এখানকার রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে এই চিন্তাধারাব বিশেষ প্রভাব পড়েনি । প্রভাব পড়লে হয়তো স্বাধীনতাব পঁয়ত্রিশ বছর পবেও এদেশের সাধাবণ মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকত না । ...

তৃতীয় বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

সক্রেটিস বনাম যাজ্ঞবল্ক্য

একটি চলন্ত বিশ্ববিদ্যালয় । দেহ আছে, দেয়াল নেই; জ্ঞানান্বেষণে সমর্পিতপ্রাণ, কিন্তু উপাধিবিহীন; ছাত্রবেষ্টিত, অথচ উপার্জনবিমুখ; অমৎসর, তবু আপন সমাজে আজনবী; অনন্যতন্ত্র, অন্তর্দীপ্ত ও অকৈতব, এবং সেই কারণে ত্রস্ত ও শক্তিমান মূঢ়তার দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ।

কাহিনী অনুসারে তাঁর বাবা সফ্রনিস্কস্ ছিলেন ভাস্কর, মা ফিনারেটি ছিলেন ধাত্রী । তাঁর অনুরাগীদের ভিতরে অনেকে বিত্তবান, অভিজাত এবং প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে কখনো অর্থ অথবা ক্ষমতা অর্জনের সামান্যতম চেষ্টা করেননি । তাঁর

স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যকে বিদ্রূপ করেছেন আরিস্টফেনিস ও আমেইসপিয়াস । কিন্তু বিত্ত, প্রতিপত্তি, ভোগবিলাস যেমন তাঁকে আদৌ আকৃষ্ট করেনি তেমনি আত্মনিগ্রহে তিনি কোনো মহত্ত্ব খুঁজে পাননি । তাঁর জামা এবং জুতো ছিল না; কি শীতে কি গ্রীষ্মে একই বস্ত্র পরিধান করতেন; আন্টিফনের মতে কোনো ক্রীতদাসকে ঐ অবস্থায় রাখলে সে নিশ্চয় পালিয়ে যেত । অপরপক্ষে ধনী ও বিদগ্ধ বন্ধুদের ভোজনোৎসবে তিনি ছিলেন সবচাইতে প্রতীক্ষিত ও সম্মানিত অতিথি; প্রেম থেকে পলিটিক্স প্রায় যে-কোনো বিষয়েই তাঁর বক্তব্য সর্বদাই মৌলিক, সুবিন্যস্ত, জ্ঞানগর্ভ; প্রচুর সুরাপান সত্ত্বেও তাঁর অনাক্রম্য চিন্তনচর্যা অপ্রতিম । প্রকৃতপক্ষে বস্তুনির্ভর প্রয়োজনাদিকে তিনি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপিত করে নিয়েছিলেন । কারণ তিনি বুঝেছিলেন জ্ঞানান্বেষণের প্রথম ও অবিচ্ছেদ্য শর্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা, এবং বস্তুনির্ভরতা যত বাড়ে স্বাধীনতা ততই হ্রাস পায় ।

পশ্চিমী সভ্যতার ইতিহাসে মনীষিতার এই প্রাচীন, প্রায় আদি মডেল জন্মেছিলেন সম্ভবত ৪৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে; কিন্তু সক্রেটিসের জীবন থেকে বিচ্ছুরিত আলো আজও আমাদের স্পর্শ করে, ঘনায়মান অন্ধকারে পথ দেখায় । তিনি নিজে কিছুই লেখেননি । পথে, গাছতলায়, হাটবাজারে, আখড়ায়, আড্ডায় তাঁর প্রোজ্জ্বল যুক্তিশীল জিজ্ঞাসু উপস্থিতি । সেইসব স্থান থেকে তাঁর মনন যেমন বিচিত্র উপাদান আহরণ করেছে তেমনি পরিবর্তে উপহার দিয়েছে অফুরন্ত প্রশ্ন, অন্বেষণের সম্ভাব্য উপায়পদ্ধতির নির্দেশ, প্রকল্পবিচারের বিবিধ নির্ণায়ক, তত্ত্বের আড়ষ্টতায় প্রাণসঞ্চার করেছে তাঁর ডায়ালেকটিকস । শুধু আথেন্স নয়, মেগারা, থিব্‌স্ প্রভৃতি দূরাঞ্চল থেকেও তরুণরা এসেছেন তাঁর সঙ্গে ভাবনার বিনিময় করতে । নিজে না লিখে থাকলেও তাঁর জীবন, কার্যকলাপ এবং ভাবনাচিন্তার বিশদ বিবরণ বিধৃত হয়েছে দুই তরুণ অনুরাগী প্লেটো এবং জেনোফনের রচনায় । তাছাড়া ইস্কিনিস, আরিস্টটল প্রভৃতির সূত্রেও কিছু তথ্য মেলে ।

প্লেটোর বিবেচনায় যিনি ছিলেন 'তাঁর কালের সবচাইতে সত্যবাদী ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষ', পরবর্তীকালে সিসেরো যাঁর সম্বন্ধে লেখেন 'ইনিই দর্শনকে দ্যুলোক থেকে ভূলোকে নিয়ে আসেন', আত্মজ্ঞ হওয়াকেই যিনি মানবিক অনুশীলনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাঁকেই তাঁর সমকালীন রাষ্ট্র এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতারা অভিযুক্ত করেন প্রধানত দুটি অপরাধে । তরুণদের চরিত্র তিনি নাকি কলুষিত করেছেন; প্রতিষ্ঠিত দেবদেবী, পূজাপ্রকরণ, রীতিনীতিতে তিনি আস্থাহীন । শাস্তি মৃত্যুদণ্ড । কারাগার থেকে যাতে তিনি পালাতে পারেন তার পরিকল্পনা করেন অনুরাগী শিষ্যবৃন্দ; কিন্তু সক্রেটিস সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মৃত্যুদণ্ড মেনে নেন । যেমন জীবনে তেমনি মরণে তিনি এমন এক আদর্শ রেখে যান পশ্চিমে ভাবুকতার ঐতিহ্য যার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত । ব্রুনো, দিদ্‌রো, বেলিনস্কি, হার্তজেন, গ্রামসচি, সাখারভ—এঁরা সকলেই সক্রেটিসের উত্তরসূরী । মৃত্যু, কারাবাস, দারিদ্র্য, ব্যাধি, নির্বাসন, পুলিসি অত্যাচার কিছুই এঁদের সত্যনিষ্ঠাকে টলাতে পারেনি ।

উনিশ শতকে কিছু ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি এই ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । শ্রুতিকে নয়, শাস্ত্রকে নয়, লোকাচারকে নয়, প্রচলিত ব্যবস্থাকে নয়, জিজ্ঞাসাকে এবং বিবেককে তাঁরা তাঁদের জীবনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হন, অনুভব করেন প্রাতিস্বিকতার সম্ভাবনাসমৃদ্ধ প্রতিশ্রুতি, বুঝতে পারেন যে স্বাধীনতার ন্যূনতম শর্ত হলো

সত্যনিষ্ঠা, বাক্যে এবং আচরণে সততা। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি এই মডেল গ্রহণ করেননি। একদিকে ভূমার গদ্‌গদ ব্যাখ্যান আর অন্যদিকে সবরকম সুযোগসুবিধে অর্জনের ফন্দিফিকির আঁটা, বানোয়াট অধ্যাত্মতত্ত্বের আড়ালে সবরকম ঝুঁকি এড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা, লোকাচার, শাস্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে রফা করে চলা—এটিই মোটামুটি তাঁদের মডেল রয়ে গেল। এরজন্য শুধু ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে দায়ী করা স্রেফ আত্মপ্রতারণা। 'বৃহদারণ্যক উপনিষদে'র চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনায় বৈদেহ জনক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেন: 'আপনি সহস্র গাভী ও স্বর্ণের উদ্দেশ্যে রাজসভায় এসেছেন না সূক্ষ্ম তত্ত্ববিচারের প্রত্যাশ্যায় এসেছেন ?' যাজ্ঞবল্ক্য নির্দ্বিধায় উত্তর দেন : 'দুই-এর উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি।' তার আগে তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি দাবি করেন যে তিনি সকলের চাইতে জ্ঞানী, সুতরাং স্বর্ণসমেত সহস্র গাভী তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু বিদুষী গার্গী যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে ব্রহ্মণ্ কী উপাদানে নির্মিত তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন, বলেন অত বেশি প্রশ্ন কোরো না, করলে তোমার মুণ্ডটি খসে পড়বে। 'তারপরে বাচক্নবী গার্গী চুপ করে গেলেন।' ('বৃহদারণ্যক উপনিষদ', ৩য় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ১।।)।

যাজ্ঞবল্ক্যের মডেলটিই এদেশের গড়পড়তা বুদ্ধিজীবীর পছন্দ। একদিকে সর্বজ্ঞতার দাবি, অন্যদিকে সঙ্গত প্রশ্নকেও ভয় দেখিয়ে স্তব্ধ করা; একদিকে অমর্তের ঘোষণা, অন্যদিকে সহস্র গাভীর জন্য লোভ; একদিকে বাকসর্বস্বতা অন্যদিকে রাজসমর্থন যাচনা। সারাজীবন প্রেসিডেন্সি কলেজের নিশ্চিন্ত সরকারি চাকরির সঙ্গে মার্ক্সীয় বিপ্লববাদ ও শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বের সুপটু সমাবেশ; গাড়ি-বাড়ি-পুরস্কারের জন্য সরকারি-বেসরকারি কর্তাদের কাছে ধরাধরির সঙ্গে রামকৃষ্ণ-সারদামণির ফটোপূজার এবং নেতাজির মাহাত্ম্য সংকীর্তনের সমন্বয়। ভাষার সঙ্গে ভাবনার, মুখের কথার সঙ্গে প্রাত্যহিক আচরণের, অভিজ্ঞতার সঙ্গে তত্ত্বের অনুশীলিত বিষঙ্গ যেখানে বুদ্ধিজীবীর লক্ষণ বলে স্বীকৃত সেখানে অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক প্রভৃতি বাচস্পতিরা যে ক্রমেই সাধারণ মানুষের আস্থা হারাবেন এটা অস্বাভাবিক নয়। যা অসৎ তা অশ্রদ্ধেয়। শ্রদ্ধা অর্জনের জন্য চাই মননের কেন্দ্রে সততার প্রতিষ্ঠা। এটি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সমাজ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সক্রেটিস একাই ছিলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়, আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আজ পর্যবসিত হয়েছে এক-একটি রাজনৈতিক মল্লক্ষেত্রে। এই অবস্থাকেই কি আমরা আর্ত অসহায়তায় মেনে নেব ? রেখে যাব পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এই আপজাত্যের দায়ভাগ ? অথবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভিতরে ও বাইরে কিছু স্ত্রী-পুরুষ এই অবস্থাকে পরিবর্তনের দায়িত্ব এককভাবে এবং সমবেতভাবে নিজেরা গ্রহণ করবেন ? এই প্রশ্নের তীক্ষ্ণ চেতনা থেকেই 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার উদ্ভব। এই চেতনা ব্যাপকভাবে শিক্ষিত মনে সঞ্চারিত হোক, গড়ে উঠুক গ্রামে ও নগরে বিবিধ বৌদ্ধিক উদ্যোগ, প্রতিষ্ঠা পাক শিক্ষার কেন্দ্রে সক্রেটিসি প্রশ্নশীলতা ও সততা—চারবছর পত্রিকা প্রকাশের পর আজও এটিই আমাদের প্রধান কাম্য। ...

চতুর্থ বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা

রামমোহন ও তুহ্ফাৎ

'স্বাভাবিক ও সহজাত তাঁর প্রতিভা, বলশালী তাঁর বোধশক্তি, সুদৃঢ় তাঁর ইচ্ছাবৃত্তি—যে ইচ্ছাবৃত্তি স্বনিয়ন্ত্রিত, অনন্যতন্ত্র, এবং সর্বদাই ঊর্ধ্বগামী ও উদার উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত। স্বাধীনতা ছিল তাঁর আত্মার প্রবলতম প্যাশন—কর্মের এবং চিন্তার স্বাধীনতা। নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতারক্ষায় তিনি একাগ্রচিত্ত, মানসিক স্বাধীনতায় সামান্যতম হস্তক্ষেপও তাঁর পক্ষে অসহনীয়। অপরপক্ষে অন্য ব্যক্তিদের সমান অধিকার সম্পর্কে তিনি নিয়ত সচেতন—এমনকি তাঁদের স্বাধীনতা সম্পর্কেও যাঁদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সবচাইতে প্রকট।'

ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম পুরুষ রামমোহন রায় সম্পর্কে তাঁর তরুণ সহকর্মী উইলিয়ম অ্যাডাম আমেরিকার বস্টন শহরে ১৮৪৫ সালে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন উপরের অনুচ্ছেদটি তারই কয়েকটি বাক্যাংশের তর্জমা। ('এ লেকচার অন দ্য লাইফ অ্যাণ্ড লেবারস্ অব রামমোহন রয়', রাখালদাস সরকার-কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা, ১৮৭৯)। এই অসামান্য মানুষটি যে কীভাবে তরুণ বয়সে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন, গবেষকদের অনুসন্ধান সত্ত্বেও তার খুঁটিনাটির বেশিটাই এখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। তুহ্ফাৎ-এ যে মুক্তবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় কোথায় তার উৎস? বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন, এবং তৎকালীন বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে তিনি তাঁর স্বাধীনচিত্ততার প্রেরণা পাননি, এটা সুনিশ্চিত। পরবর্তীকালে রেনেসাঁস-উত্তর পশ্চিমি ভাবধারার সঙ্গে তাঁর গভীর ও ব্যাপক পরিচয় ঘটে; কিন্তু 'তুহফাৎ' প্রকাশের কালে ইয়োরোপিয় দর্শনচর্চা করবার মতো ইংরেজি জ্ঞান তাঁর আয়ত্তে আসেনি। সংস্কৃত, আরবি এবং ফার্সি তিনি যত্ন করে শিখেছিলেন; কিন্তু তাঁর সমকালে প্রচলিত হিন্দুধর্ম অথবা ইসলাম যে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল 'তুহফাৎ' থেকে এ অনুমানের সমর্থন মেলে না। এখানে তিনি স্পষ্টতই আপ্তবাক্য, ধর্মগুরু এবং ধর্মশাস্ত্রের প্রাধিকারকে অস্বীকার করেছেন। অতিপ্রাকৃতে, প্রত্যাদেশে, আচার অনুষ্ঠানে তিনি আস্থাহীন। স্বাধীন বিচারবুদ্ধিই তাঁর নির্ভর। মুতাজিলাপন্থীদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার কিছুটা সাদৃশ্যের কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। একটি গবেষণা-নিবন্ধে 'তুহ্ফাৎ'-এর উপরে সতেরো শতকে রচিত 'দাবিস্তান-ই-মজহব'-এর সম্ভাব্য প্রভাবের কথা আলোচিত হয়েছে। 'দাবিস্তান'-এ অন্য নানা ধর্মের সঙ্গে আকবর প্রবর্তিত দিন-ই-ইলাহির বিবরণ আছে। কিন্তু এই সাদৃশ্য ও সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে যে আলোচনাগুলি আমি পড়েছি সেগুলি বিশেষ গভীর বা বিশ্লেষণাত্মক বা প্রমাণসিদ্ধ বলে মনে হয়নি।

রামমোহন কত বছর বয়সে 'তুহফাৎ' লিখেছিলেন বলা শক্ত। 'তুহ্ফাৎ'-এ উল্লেখ আছে যে তিনি পূর্বে 'মুনাজারাৎ-উল আদিয়ান' নামে আরেকটি বই লিখেছিলেন। এই বইটির কোনো কপি এ-যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি। 'অ্যান অ্যাপিল টু দ্য ক্রিশ্চান পাবলিক' (১৮২০) পত্রিকার সূচনায় রামমোহন জানিয়েছিলেন যে খুব অল্প বয়সেই তিনি মূর্তিপূজার বিরোধিতা করে আরবি ফার্সিতে একটি বই লেখেন। এই বইটি 'মুনাজারাৎ'

হতে পারে, অথবা 'তুহ্‌ফাৎ'-ও হতে পারে । অসম্ভব নয় যে 'মুনাজারাৎ' যে সময়ে তিনি লিখেছিলেন তখন সেটিকে মুদ্রিত করা সম্ভব হয়নি, এবং ফলে সেটি বিলুপ্ত হয়েছে। 'তুহ্‌ফাৎ' তিনি ১৮০৩-০৪ সালে মুদ্রিত করান ; তখন তাঁর বয়স তিরিশের মতো । সংযোজন অংশের 'বাদ সাল্‌হা আজ ইবতিদা' বাক্যাংশের রাজেশ্বর মিত্র যে ব্যাখ্যা করেছেন তা যদি সঠিক হয় তাহলে 'তুহ্‌ফাৎ' তাঁর তরুণ বয়সের রচনা। স্যাণ্ডফোর্ড আর্নস্টি-কে লেখা রামমোহনের পত্র অনুসারে ষোলো বছর বয়সে রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম বইটি লেখেন; ফলে তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে, এবং তিনি গৃহত্যাগ করে দূর দূর দেশে পর্যটন করেন । আমার অনুমান ঘর থেকে বেরিয়ে এই দূর দূর দেশে ঘোরবার অভিজ্ঞতা রামমোহনের মনের প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, এবং 'তুহ্‌ফাৎ'-এ যে আশ্চর্য মুক্তবুদ্ধির পরিচয় মেলে এই পর্যটনের অভিজ্ঞতাই সম্ভবত তার অন্যতম প্রধান উৎস । ...

... 'তুহফাৎ'-এ রামমোহন শাস্ত্র প্রমাণকে আদৌ স্বীকৃতি দেননি । পরবর্তীকালে শাস্ত্র প্রমাণকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন । পরবর্তীকালের এই স্বীকৃতি 'তর্ককৌশল মাত্র' অথবা রামমোহনের চিন্তায় পরবর্তীকালে কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল, তা নিয়ে ব্যাখ্যাতাদের ভিতরে মতবিরোধ আছে । কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে ভারতবর্ষের বৌদ্ধিক ইতিহাসে 'তুহফাৎ' আধুনিক যুগের একটি বিশিষ্ট নির্দেশক চিহ্ন । সম্প্রতিকালে এদেশে ধর্মের নামে যেসব হানাহানি এবং আন্দোলন আবার দেখা দিয়েছে তাতে মনে হয় 'তুহফাৎ'-এর প্রাসঙ্গিতা এখনো ভারতবর্ষে কিছু কমেনি । ...

অষ্টম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা

জনজাগরণ ও নারীমুক্তি

সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই দেখা যায় যে প্রত্যেক সমাজে অপেক্ষাকৃত অল্প কিছু মানুষ নানা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে, কিন্তু বেশিরভাগ লোক বঞ্চিত দশাতেই জীবন কাটায় । এই অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কখনো কখনো ছোটখাটো বিদ্রোহ হয়েছে, কখনোবা ব্যাপকতর আন্দোলন; কালেভদ্রে কিছু বিবেকী ভাবুক প্রতিবাদ করেছেন এবং সাম্যাভিমুখী বিকল্প ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছেন ও দেখিয়েছেন; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের সংখ্যা ও অনুপাত কিছুটা বাড়লেও বঞ্চিত অধিজন বঞ্চিতই রয়ে গেছে। মাথার ঘাম ফেলে যারা ফসল ফলায়,যারা জাহাজের মাঝিমাল্লা, যারা পাথর ভেঙে পথ করে, ইঁটসুরকির বোঝা টেনে বাড়ি বানায়, খনি খুঁড়ে কয়লা বয়ে আনে, কিংবা যাদের জীবনের প্রধান অংশ কাটে পোয়াতি দশায় অথবা দমবন্ধ হেঁশেলে, উপরতলার মানুষদের অহোরাত্র সেবা করাই যাদের নির্যতি—প্রাচীন সব সভ্যতাতেও তারাই ছিল সমাজের বঞ্চিত অধিজন । কি মিশর-ব্যাবিলন-হরাপ্পায়, কি গ্রীস-চীন-পারস্য-রোম-পাটলিপুত্রে অভিজাত ঊনজন আর সর্বক্ষিপ্ত সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের ভিতরে অবস্থার পার্থক্য ছিল অনতিক্রম্য ।

সুযোগসম্পদের এই পরম্পরাপুষ্ট অসমবণ্টনে বাস্তব পরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রথম দেখা দেয় উনিশশতকী যন্ত্রবিপ্লবের ফলে। বিজ্ঞানের বিকাশ এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তার ব্যাপক প্রয়োগ শ্রমের উৎপাদনশক্তিকে দ্রুত বাড়াতে থাকে। যন্ত্রবিপ্লবের আগে বিভিন্ন সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ যে পরিমাণ সম্পদ উৎপাদন করত তা সমাজের উপরতলার কিছু মানুষের বর্ধমান চাহিদা মেটানো ও বিলাসিতার পক্ষে কমবেশি পর্যাপ্ত হলেও সর্বসাধারণের নিতান্ত মৌল প্রয়োজনগুলি মেটানোর পক্ষেও যথেষ্ট ছিল না। শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি দ্রুতগতিতে বিপুল হারে বাড়বার ফলে সব মানুষের মৌল প্রয়োজনগুলি মেটানো আর অসাধ্য মনে হলো না। যারা অসাম্য, বঞ্চনা, নিজেদের দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনাকে অমোঘ দৈবনির্দেশ বলে এতকাল মেনে এসেছিল তাদের অনেকের ভিতরে অধিকারবোধ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল, গড়ে উঠতে লাগল আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোর ন্যায়ভিত্তিক রূপান্তরের আন্দোলন।

যন্ত্রবিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে উনিশ শতক জুড়ে পশ্চিম ইয়োরোপে যে আন্দোলনের গোড়াপত্তন দেখি আমাদের শতকে সেটি ক্রমে পৃথিবীব্যাপী আন্দোলনের আকার নিচ্ছে। উপরতলার মানুষদের হাতে এখনো প্রচুর শক্তি কেন্দ্রিত; কিন্তু নীচেরতলা থেকে সংগঠিত প্রতিরোধ এখন দেশে দেশে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে নির্মীয়মান। না মিলমালিক না সরকারের পক্ষে ট্রেড ইউনিয়নের শক্তিকে আজ অগ্রাহ্য করা সম্ভব। কিন্তু সব সমাজেই বঞ্চিতদের ভিতরে যারা সবচাইতে সংখ্যাগুরু এদেশে এখনো পর্যন্ত তারা প্রায় অসংগঠিত। সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই মেয়েরা তাদের শ্রম এবং সেবা দিয়ে পারিবারিক জীবন ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে পোষণ করে এসেছে। কিন্তু কোনো সভ্য সমাজেই স্ত্রীলোকরা পুরুষের সমান অধিকার পায়নি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পুরাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়ে পর্যবসিত। দীর্ঘকাল ধরে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্ত্রীলোকদের নানাভাবে বঞ্চিত করে এসেছে। পদে পদে নিষেধের দেওয়াল তুলে, ঘরসংসারের কাজে এবং আচারঅনুষ্ঠানে মেয়েদের নিয়ত ব্যাপৃত রেখে, শিক্ষার এবং আত্মপ্রকাশের সুযোগ না দিয়ে স্ত্রীলোকদের অস্তিত্বকে রাখা হয়েছে সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতরে সীমাবদ্ধ, তাদের চেতনাকে করা হয়েছে জিজ্ঞাসাবিমুখ। এই নিতান্ত প্রতিকূল পরিবেশেও যে অল্পসংখ্যক নারী তাঁদের প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের পরিচয় রেখে যেতে পেরেছেন তাঁরা ব্যতিক্রম। তাঁদের ক্ষেত্রেও বিস্তারিত বিবরণ ক্বচিৎ মেলে। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই সন্তানধারণে, রান্নাবান্না এবং পুজোআচ্চায় জীবন কাটিয়ে বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়েছে।

পশ্চিমে যেমন সাধারণ মানুষের অধিকার তেমনই পূর্ণ মানবিকতায় স্ত্রীলোকদের দাবি উচ্চারিত হতে শুরু করে আঠারো শতকে। কলকাতার কিছু শিক্ষিত তরুণ উনিশ শতকের প্রথমভাগে টম পেইন-এর লেখা পড়ে মানবিক অধিকারের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন; এই 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর কথা আমরা জানি। কিন্তু পেইন-এর সমসাময়িক মেরি উলস্টোনক্রাফট-এর জীবন এবং বৈপ্লবিক রচনাবলী এদেশের শিক্ষিতজনের মনে আদৌ কোনো প্রভাব ফেলেছিল কিনা, তা অন্তত আমার জানা নেই। পেইন মানুষের অধিকারের কথা দৃপ্তভাষায় ঘোষণা করেছিলেন। আর সমান তেজস্বী প্রত্যয়ে, অনপেক্ষ অনুধ্যানে মেরি লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'ভিণ্ডিকেশান অব্ দ্য রাইট্‌স্ অব্ উওম্যান।'

তারপরও ইংল্যাণ্ডে মেয়েদের ভোটাধিকার অর্জন করতে সোয়াশো বছর লেগেছে।

এখনো পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজে মেয়েরা পুরুষদের চাইতে নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত, রাষ্ট্রিক -আর্থিক-সামাজিক বিন্যাসে মেয়েদের মানবিক অধিকারের অনেকটাই অস্বীকৃত, সুযোগসুবিধার প্রধান অংশ পুরুষদের একচেটিয়া দখলে । যেখানে আইন অনুসারে সমতার নীতি স্বীকৃত সেখানেও মেয়েদের বিকাশের পথে বাস্তব ব্যবহারে অনেক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দাঁড়িয়ে আছে । সাম্যের আদর্শ আঠারো শতকে ঘোষিত হয়েছিল বটে, কিন্তু পশ্চিমদেশগুলিতেও নারীমুক্তির আন্দোলনে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিগত তিন দশকে । পিছন ফিরে তাকালে মনে হয় আমাদের শতকে ঘনায়মান দুর্যোগের ভিতরেও যে প্রবাহগুলি মানুষের বিকাশের সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার একটি হলো শ্রমিক আন্দোলন, একটি ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তৃতীয়টি নারীমুক্তি আন্দোলন ।

ভারতবর্ষে নারীমুক্তি আন্দোলন এখনো নিতান্ত প্রাথমিক পর্যায়ে ঠেকে আছে । এদেশে মেয়েদের উপরে অত্যাচারের সীমা নেই; অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠলে এখনো পর্যন্ত এদেশে অধিকাংশ মেয়ের সামনে দুটি বিকল্প : গণিকাবৃত্তি অথবা আত্মহত্যা । যাঁরা সম্প্রতিকালে নারীমুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করেছেন তাঁদের সংখ্যা কম, সংগঠন দুর্বল, সমাজকে প্রভাবিত করবার সুযোগ ও সামর্থ্য খুবই সীমাবদ্ধ । অথচ সমাজের সকলক্ষেত্রে মেয়েদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা শুধু মেয়েদেরই বিকাশের অবম সর্ত নয়, পুরুষদের বিকাশের জন্যও এটি অত্যন্ত জরুরি । এই সরল সত্যটিকে সর্বসাধারণের চেতনায় জাগিয়ে তোলা স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই দায়িত্ব । ...

অষ্টম বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা

ইতিহাসের নতুন পর্ব ও মুক্তিসংগ্রামী সাখারভ

ফরাসি বিপ্লব শুরু হবার ঠিক দুশো বছর পরে ১৯৮৯ সালে মনে হয় আধুনিক ইতিহাসের আর এক নতুন পর্ব সূচিত হলো । পরম সৌভাগ্য মানি যে জড়বাদী এবং বিপ্লববাদী আমি পঞ্চভূতে বিলীন হবার আগেই এই সূচনা দেখে যেতে পারছি । একটি পর্ব অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে আগেই সমাপ্ত হয়েছিল । আমার শৈশবকালে যে সাম্রাজ্যে শুনতাম সূর্য নাকি কখনো অস্ত যায় না আমার যুবকালে সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্রুত বিলয় দেখে মানুষের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি আমার আজন্মের আস্থা ও আনুগত্য দৃঢ়তর হয়ে ওঠে । শুধু ব্রিটিশ নয়, ফরাসি এবং ডাচ সাম্রাজ্যও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী দশ বছরের ভিতরে বিলুপ্ত হয় । ...উপনিবেশতন্ত্রের অবসানে ভারতে, পাকিস্তানে, ভিয়েতনামে, সিঙ্গাপুরে ও মালয়েশিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায়, ফিলিপিনস্-এ প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম এক-একটি জাতীয় রিপাবলিক । তারা অধিকাংশই গণতন্ত্রী নয়, কিন্তু সকলেই রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বয়ম্ভর ।

দুই মহাযুদ্ধ যেমন পশ্চিমী সাম্রাজ্যব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে ব্যাপক রাষ্ট্রিক রূপান্তর সম্ভব করেছিল তেমনই ঐ দুই মহাধ্বংস সমাহারের সুযোগে অন্য আর এক ঐতিহাসিক বিপ্লব প্রথমে রাশিয়ায় এবং পরে মহাচীনে সংঘটিত হয় । উপনিবেশতন্ত্রের উচ্ছেদ

ঘটিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম জাতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এশিয়ার নেতাদের অনুপ্রেরণার একটি প্রধান উৎস ছিল আঠারো শতকের শেষপাদে সংসিদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার উদাহরণ। রুশ এবং চীন বিপ্লব অনেকখানি অনুপ্রেরণা পেয়েছিল ফরাসি বিপ্লব থেকে। তবে এই দুই বিপ্লবে যে রাজনৈতিক দলটি নেতৃত্ব দেয় সেটি স্বঘোষিতভাবেই ছিল মার্কসপন্থী। কার্ল মার্কসের চিন্তায় অনুপ্রেরিত রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৯৮ সালে; ১৯০৩ সালে এটি দু-টুকরো হয়; এবং লেনিনের নেতৃত্বে তার একটুকরো পরিচিত হয় বলশেভিক (বা সংখ্যাগুরু) পার্টি হিসেবে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে রাশিয়াতে জারশাসিত রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে পড়ার সুযোগ নিয়ে বলশেভিকরা জবরদস্তি ক্ষমতা দখল করে এবং বলশেভিক তথা কমিউনিস্ট পার্টির একচ্ছত্র নেতৃত্বে পরবর্তী দশকগুলিতে রুশদেশে রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধিত হয়। মহাচীনে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে মার্কসীয় চিন্তার প্রবর্তন করেন বিপ্লবী ভাবুক চেন তু-শিউ এবং লি তা-চাও। ১৯২১ সালে চেন তু-শিউকে সাধারণ সম্পাদক করে চীন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯২৭ সালে চেন তু-শিউ পদচ্যুত হন, এবং কিছু পরে ট্রটস্কির মতো তাঁকেও বিতাড়িত করা হয়। তিরিশের দশকে মাও সে-তুঙ হয়ে ওঠেন পার্টির নেতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে চার বৎসর ব্যাপী গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে তাদের শাসনাধীন পিপল্‌স রিপাবলিক অব চায়নার প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে। ফরাসি বিপ্লব আধুনিক ইতিহাসে বুর্জোয়াপর্বকে বিজ্ঞাপিত করেছিল। প্রথমে রুশ বিপ্লব এবং পরে চীন বিপ্লব ইতিহাসে কমিউনিস্ট পরিচালনাধীন নব সভ্যতার আবির্ভাবকে প্রখ্যাপিত করে। কমিউনিস্ট নন এমন বহু ভাবুকই সে-যুগে বিশেষ করে রুশ বিপ্লবকে স্বাগত করেছিলেন।

আমাদের তরুণ বয়সে রুশ বিপ্লব এবং সেই সূত্রে মার্কস্‌প্রোক্ত চিন্তাসমুচ্চয় আমাদের চেতনায় এবং জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। শিক্ষিত চিন্তাশীল বিবেকী মানুষদের কাছে মার্কস্‌তন্ত্রের আবেদনের সূত্র অনেকগুলি। মার্কস্‌ দাবি করেছিলেন যে তাঁর ইতিহাসবীক্ষা এবং সমাজবিশ্লেষণ সম্পূর্ণভাবেই যুক্তিসিদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক, এবং তরুণ বয়সে আমাদের মনে হতো এই দাবি নির্ব্যূঢ়। দ্বিতীয়ত, যে অশুভ আর্থ-রাষ্ট্র-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় আমাদের বাস তার মৌলিক ত্রুটি এবং অন্তর্দ্বন্দ্বকে মার্কস্‌ নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটন এবং আক্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর সেই উদ্‌ঘাটন-বিশ্লেষণ আমাদের ব্যর্থতাবোধকে অসহায় আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বৃহৎ ও শক্তিমান গণবিক্ষোভের চেতনায় উত্তীর্ণ করেছিল। তৃতীয়ত, ফরাসি বিপ্লবে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে আদর্শরাজি বিঘোষিত হয়—বুর্জোয়া ব্যবস্থা কায়েমি স্বার্থের কারণে যার বাস্তবায়নে অপারগ এবং প্রকৃতপক্ষে অনিচ্ছুক—সেগুলি মার্কস্‌-কল্পিত সমাজতান্ত্রিক বিকল্পব্যবস্থার প্রাণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে যেভাবে যন্ত্রে পর্যবসিত করেছে, সমাজতন্ত্র মানুষকে তা থেকে উদ্ধার করে তার স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতা ফিরিয়ে দেবে; লোভ এবং প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন ও যুক্তিসঙ্গত সহযোগ ও সমবায়ের প্রতিষ্ঠা করবে; গোষ্ঠী-সম্প্রদায়-শ্রেণী-জাতি ইত্যাদির সীমাবদ্ধ আনুগত্য থেকে সর্বমানবীয় ঐক্যবোধে সর্বহারাদের উত্তীর্ণ করবে—এই ধরনের প্রতিশ্রুতি ছিল মার্কসের ভবিষ্যকল্পনায়। এবং শুধু তত্ত্বচিন্তা হিসেবে নয় সর্বদেশে গ্রহণীয় বৈপ্লবিক কর্মসূচির নির্দেশক হিসেবেও মার্কস্‌-

তন্ত্র কয়েক প্রজন্মের জীবনযাত্রাকে অভিপ্লুত করেছিল ।

মার্ক্স্ চল্লিশ বছর ধরে বিস্তর লিখেছিলেন । ...স্বভাবতই মার্কসের বিভিন্ন সময়ের লেখার ভিতরে বেশ কিছু স্ববিরোধ আছে ; মূলগত ঐক্য থাকলেও আদি মধ্য এবং শেষপর্বের চিন্তার ভিতরে ঝোঁকের বেশ খানিকটা পরিবর্তন দেখতে পাই ; অনেক লেখাই খসড়া অবস্থায় পড়েছিল, তাঁর জীবদ্দশায় ছাপা হয়নি এবং তিনি নিজে পাণ্ডুলিপি ঘসামাজা করে যেতে পারেননি। অভিজ্ঞতা এবং সমালোচনার চাপে প্রথম এবং মধ্যযুগের বিবিধ সিদ্ধান্তের কিছু কিছু ত্রুটি এবং আতিশয্য তিনি তাঁর চিঠিপত্রের ভিতরে স্বীকার করেছেন । মার্ক্স্তন্ত্রের ব্যাখ্যায় পরবর্তীকালে ফলে নানা মতবিরোধ দেখা দিয়েছে । বার্নস্টাইন, কাউটস্কি, প্লেখানভ, মার্টভ, হিলফার্ডিং, রোজা লুক্জেমবুর্গ, আন্টন পানেকুক, লেনিন প্রমুখ মার্ক্স্-অনুগামীরা তাঁর চিন্তা থেকে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন । তাত্ত্বিক মার্ক্সবাদীদের ভিতরে বিতর্ক এখনো বেশ প্রবল— আলথুসারের ব্যাখ্যার পাশাপাশি যাঁরা হাবেরমাস, মারকুসা, এরিক ফ্রোম, আডোর্নো প্রভৃতির ব্যাখ্যা পড়বেন তাঁদের স্বতই মনে হবে খ্রিস্টপন্থী যেসুয়িট এবং ব্যাপটিস্টদের মতোই এইসব মার্ক্সপন্থীদের ভিতরে ব্যবধান অসেতুসম্ভব । বস্তুত মার্ক্স্পন্থা বলতে কী বোঝায় অধিকাংশ মার্ক্স্-অনুরাগীদের কাছে আজ তা নিতান্তই অস্পষ্ট ।

কিন্তু মার্কসীয় চিন্তাসমুচ্চয়ের যে ব্যাখ্যাটি বিশের দশক থেকে সবচাইতে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে সেটি হলো বলশেভিক নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ 'লেনিন'-এর ব্যাখ্যা । লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা রাশিয়াতে ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত তাঁর ব্যাখ্যাত মার্ক্স্বাদ কিছু রুশ বিপ্লবী ছাড়া আর কারো উপরেই বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে নি । পশ্চিম ইয়োরোপের অধিকাংশ মার্ক্স্পন্থী মনে করতেন রাশিয়ার পশ্চাৎপদ অবস্থা এবং জারিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকোপে লেনিন মার্কসের চিন্তার এক অতিবিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন । গুপ্তবিপ্লবী দল সংগঠন করে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত এবং বাস্তবায়িত করার যে তত্ত্ব তিনি খাড়া করেন রোজা লুক্জেমবুর্গ প্রমুখ মার্কসিস্টদের বিবেচনায় তা ছিল সম্পূর্ণভাবে মার্কসীয় দর্শন ও প্রয়োগপদ্ধতির পরিপন্থী । লেনিনব্যাখ্যাত মার্ক্স্তন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ফল বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রে সর্বহারার নামে ক্ষমতাজয়ী পার্টির সর্বগ্রাসী স্বৈরশাসনের প্রতিষ্ঠা । কিন্তু বলশেভিকরা ক্ষমতায় আসবার পর সোভিয়েট রাষ্ট্রের শক্তিসামর্থ্যের বেশ কিছুটাই কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে দেশে দেশে লেনিনব্যাখ্যাত মার্ক্স্বাদের প্রচারে নিয়োজিত হয় । ইয়োরোপে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেসব কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলো সেগুলির সংগঠনে ও নীতিনির্দেশে রাশিয়ার প্রভুত্বাত্মা ও কেন্দ্রাভিগ বলশেভিক পার্টির নিঃশর্ত নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ও প্রাধিকার স্বীকৃতিলাভ করে, মার্কসীয় চিন্তার অপরাপর ব্যাখ্যা দ্রোহাত্মক ষড়যন্ত্র হিসেবে আক্রান্ত হয় । পার্টির এই সর্বাত্মক জুলুমতন্ত্র চরম রূপ নেয় লেনিনের পরে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে এবং মার্ক্স্বাদের এই লেনিন-স্ট্যালিনী রূপই প্রচারের মাধ্যমে দেশে দেশে ছড়িয়ে যায় । মার্ক্স্ মারা গিয়েছিলেন ১৮৮৩ সালে; বিপ্লবপ্রচেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হয়ে তিনি তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিককে তার এগারো বছর আগে নিজেই পরিসমাপ্তির দিকে ঠেলে পাঠিয়ে দেন। অপরপক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্ক্স্বাদকে রাষ্ট্রীয় দর্শন বলে প্রতিষ্ঠা দেবার আট বছরের মধ্যেই বাহান্নটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় ; এরা সকলেই কমিণ্টার্নের

সদস্য এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের আজ্ঞাবহ, এদের মোট সদস্য-সংখ্যা ঐসময় দশ লক্ষ ছাপিয়ে যায় (কমিন্টার্নের পঞ্চম কংগ্রেসের রিপোর্ট, ১৯২৪)।

বুদ্ধ এবং খ্রিস্ট -প্রবর্তিত ধর্মের রাষ্ট্রিক স্বীকৃতি এবং ব্যাপক প্রচার ঘটে প্রবর্তকদের মৃত্যুর কয়েকশো বছর পরে। মার্ক্সের মৃত্যুর মাত্র চৌত্রিশ বছর পরেই মার্ক্সতন্ত্র হলো বলশেভিক রাশিয়ার রাষ্ট্রদর্শন, এবং কমিন্টার্নের মাধ্যমে তার লেনিনকৃত ভাষ্য সারা বিশ্বে প্রচারিত হতে শুরু করল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষপর্বে পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলি সোভিয়েট লালফৌজের ছত্রছায়ায় কমিউনিস্টদের দখলে আসে। আর তার চারবছর পরে মহাচীনে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ মার্ক্সের মৃত্যুর পরে সত্তর বছর পূর্ণ হবার আগেই তাঁর স্বঘোষিত প্রশিষ্যরা এশিয়া-ইয়োরোপের অনেকটাই নিজেদের আয়ত্তে আনে। এই বিস্ময়কর প্রসারের সঙ্গে একমাত্র ইসলামের তুলনা চলে। মহম্মদ মারা যান ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে; তার একশো বছরের ভিতরে দক্ষিণ ফ্রান্স এবং স্পেন থেকে উত্তর আফ্রিকা, মধ্য প্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ার অনেক অংশ ইসলামপন্থীরা কোরান এবং তরোয়ালের সাহায্যে জয় করে। ইতিহাসের সে আরেক মহাবিস্ময়কর অধ্যায়।

কিন্তু সম্প্রতি যা ঘটেছে এবং ঘটছে তা আরও বিস্ময়কর। ...চার দশকের বেশি সময় ধরে একচেটিয়া জুলুমতন্ত্র এবং মগজ ধোলাই করবার পর অকস্মাৎ প্রমাণিত হলো যে লালফৌজের ছত্রছায়া ছাড়া কমিউনিস্ট জুলুমশাহী আত্মরক্ষায় একেবারেই অসমর্থ। পোলাণ্ডে, হাঙ্গেরিতে, চেকোস্লোভাকিয়ায় —আলবেনিয়াকে বাদ দিলে সারা পূর্ব ইয়োরোপে—১৯৮৯ সালে খুব অল্পসময়ের ভিতরে কমিউনিস্ট জুলুমতন্ত্র প্রায় রাতারাতি ভেঙে পড়ল। হাঙ্গেরিতে কমিউনিস্ট পার্টি বিনা সংগ্রামে নিজেকে বিলুপ্ত করেছে; পোলাণ্ডে প্রথম স্বাধীন নির্বাচনে জিতেছে কমিউনিজম-বিরোধী সলিডারিটি সংগঠন; চেকোস্লোভাকিয়াতে জনসমর্থনে ফিরে এসেছেন দুবচেক; বার্লিন ওয়াল ভেঙে পড়েছে। একমাত্র রোমানিয়াতে রক্তপাত হয়েছে। কিন্তু কোথাওই কমিউনিস্ট জুলুমতন্ত্র ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সামনে নিজেকে অটুট রাখতে পারেনি। পূর্ব ইয়োরোপে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে এইসব নাটকীয় ঘটনাসমাবেশ থেকে নতুন কোন ধরনের ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটবে আজ বলা শক্ত। কিন্তু পূর্ব ইয়োরোপে রুশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের পতন এবং ঐসব দেশ থেকে জুলুমশাহীর উচ্ছেদ সব স্বাধীনতাকামীর মনেই আশার সঞ্চার করবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শতশতাব্দীর বিস্মৃতির তলে'। আর আমরা দেখতে পেলাম মানুষের প্রাজাতিক স্বাধীনতাবৃত্তিকে দীর্ঘদিনের জুলুম ও মগজধোলাই দিয়েও বিলুপ্ত করা যায় না। আমাদের জীবদ্দশায় পুরোনো এবং নতুন অনেক সাম্রাজ্যেরই বিলয় দেখলাম। এখন আর একটি সাম্রাজ্যের বিপর্যয় বাকি—শতাব্দীর শেষ দশকে কি ধনগর্বী মার্কিন সাম্রাজ্যতন্ত্রও ভিতরের চাপে শান্তিপূর্ণভাবে বিলুপ্ত হবে ?

১৯৮৯ সালের ঐতিহাসিক রূপান্তরের প্রকৃত নায়ক কমিউনিস্ট দেশগুলির জনসাধারণ। তবু একথাও অনস্বীকার্য যে মুক্তির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের স্বদেশবাসী বিশিষ্ট কয়েকজন বিবেকী ব্যক্তি। পোলাণ্ডের ওয়ালেসার কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। কিন্তু ইতিহাসের এই নতুন পর্বে যাঁকে মনে করি সবচাইতে স্মরণীয় পুরুষ তিনি হলেন সম্প্রতি প্রয়াত আন্দ্রেই দিমিত্রিয়েভিচ সাখারভ। ভাবতে বিস্ময় লাগে

মহাকাব্যের নায়কপ্রতিম এই মহামনীষী আমার সঙ্গে একই সালে জন্মেছিলেন। গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানে বুৎপত্তি অর্জন করে সাখারভ বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক পিটার ক্যাপিটজার অধীনে গবেষণা শুরু করেন। পরে তিনি লিও ল্যাণ্ডাউ এবং ইগর টাম-এর সহকারী হন। টাম এবং সাখারভ হাইড্রোজেন বোমার তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেন। সাখারভ চেয়েছিলেন পরমাণবিক শক্তিকে শান্তি ও সেবার কাজে ব্যবহার করতে; ক্রুশ্চভের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় সাখারভ হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের বিরোধী ছিলেন। কোয়ার্ক এবং অ্যান্টিকোয়ার্ক নিয়ে গবেষণা তাঁকে আধুনিককালের একজন প্রধান বৈজ্ঞানিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

কিন্তু পৃথিবীর সবদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে প্রয়াত মানুষটিকে আমরা স্মরণ এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করি তিনি শুধু পদার্থবিজ্ঞানী সাখারভ নন, তিনি আমাদের কালের সর্বোত্তম বিবেকী, সাহসী ও হৃদয়বান পুরুষ। তিনি কমিউনিস্ট জুলুমতন্ত্রের অধীনে বাস করেও ষাটের দশক থেকে নির্দ্বিধায় প্রকাশ্যভাবে মানবিক অধিকারের পক্ষে লড়াই করে এসেছেন।'প্রগতি, সহাবস্থান ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতা' বিষয়ে তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র ষাটের দশকেই প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে তিনি অক্লান্তভাবে শান্তি, স্বাধীনতা, ন্যায় এবং মানবাধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন — স্বদেশে এবং অন্যদেশে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির উদ্যোগে বিশিষ্ট অংশ নিয়েছেন— জুলুমতান্ত্রিক সরকারের শাস্তি তাঁকে নীরব বা নিরুদ্যম করতে পারেনি। ১৯৭৫ সালে নোবেল কমিটি তাঁকে শান্তির জন্য পুরস্কৃত বলে ঘোষণা করেন, কিন্তু সোভিয়েট সরকার তাঁকে পুরস্কার গ্রহণের জন্য যেতে দেননি। তাঁর শাস্তি হয়েছে অভ্যন্তরীণ নির্বাসন; তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে; অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ইয়েলেনা বোনার অনশন ধর্মঘট করেছেন। অবশেষে ১৯৮৬-র ডিসেম্বর মাসে তাঁকে সস্ত্রীক মস্কোতে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৮৮-র নভেম্বরে তিনি সোভিয়েট অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস্-এর সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যপদে নির্বাচিত হন। তিনি মস্কোর অন্যতম প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে কংগ্রেস অব্ ডেপুটিজ-এ যোগ দেন। তিনি চাইছিলেন সোভিয়েট শাসনব্যবস্থা থেকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিপত্তির অপসারণ। এইক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে গর্বাচভের বিরোধ যখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেইসময় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

যে দেশে শক্তিমান এবং বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষণের জন্য অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী লালায়িত সে দেশে সাখারভের মতো নির্ভীক, বিবেকী, স্বাধীনচিত্ত মনীষীর কথা স্মরণ করার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করি।

দশম বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

লেখক পরিচিতি

অমিতাভ চক্রবর্তী —

জন্ম : মাধিপুরা, বিহার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ ; ফ্রান্সে Ecole Polytechnique, Centre de Physique Theorique এ পদার্থবিদ্যায় গবেষক ; গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর ৭৫টি গবেষণা-নিবন্ধ বিভিন্ন গ্রন্থে এবং তাত্ত্বিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ।

অম্লান দত্ত —

জন্ম : কুমিল্লা, ১৯২৪ ; শিক্ষাবিদ্ ও অর্থবিজ্ঞানী ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ; সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি বই : 'দ্বন্দ্ব ও উত্তরণ'; 'গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' ; 'শান্তির সপক্ষে' ; 'ধর্ম ও যুক্তি' ; *The Third Movement : New Radicalism and Other Essays* ; *The Gandhian Way* ; *India's Economic Development Since the 19th Century* ; *Perspective of Economic Development*

অরুণ ঘোষ —

জন্ম : কলকাতা, ২২ আগস্ট, ১৯১৭ ; ইতিহাস এবং অর্থনীতি নিয়ে আজীবন চর্চা করেছেন ; প্রধান কয়েকটি বই : *Problems of Economic Planning* (1964); *The Changing Indian Civilization*, 2 vols (1976) ; *Science, Society and Philosophy* (1985).

অরুণ দাশগুপ্ত —

জন্ম : যশোহর, ৪ জানুয়ারি, ১৯২৫ ; বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্র : ইউরোপীয় যুগে ভারতের সমুদ্রবাণিজ্য ; ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস । জাকার্তার ইউনিভার্সিটি অব ইন্দোনেশিয়ায় অতিথি-অধ্যাপক (১৯৭৯-৮১) ; প্রকাশিত গ্রন্থ : (সহযোগী সম্পাদক) *Midnapore Salt Papers : 1781-1807*, (1954) ; (যুগ্ম সম্পাদক) *Ochterlony Papers* (1964) ।

অশোক রুদ্র —

জন্ম : রেঙ্গুন, ২৯ নভেম্বর ১৯৩০ ; সাহিত্যিক এবং অর্থনীতিবিদ ; বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ; আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন ; প্রধান কয়েকটি বই : *Relative Rates of Growth —Agriculture and Industry* (1967); *Indian Plan Models* (1975); *Indian Agricultural Economics—Myths and Realities* (1982); 'জাসমিন' (১৯৮২) ; ব্রাহ্মণ্য-ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন' (১৯৮৩) ; 'ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি' (১৯৮৫) ; 'সমাজে নারীপুরুষ ও অন্যান্য' (১৯৯০) ।

অসীম রায় —

জন্ম : ঈশ্বরগঞ্জ, মৈমনসিংহ ; হোবার্টে টাসমেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন ; অবিভক্ত বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে তাঁর অনেকগুলি গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । প্রধান প্রকাশিত গ্রন্থ : *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal* (Princeton, 1983; ভারতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭) ।

আরতি সেন —

জন্ম : কোন্নগর, হুগলি, ৬ মে, ১৯২৮ ; দার্জিলিং, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতীতে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষাগত বিষয়ে অধ্যাপনা-গবেষণারত ; বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে ।

উর্মিলা চক্রবর্তী —

জন্ম : পাবনা, ১১ আগস্ট, ১৯৪৬ ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা ; কবি ও প্রাবন্ধিক ; প্রকাশিত বই : 'খোঁড়াদের রাজ্যপাট' (কবিতা-সংকলন, ১৯৮৯) ।

এলিজাবেথ বাচ্‌কোভস্কি —

জন্ম : হাঙ্গেরি, ১৯৩৪ ; অস্ট্রেলিয়াতে চলে আসেন ১৯৫৭ সালে, তদবধি সেখানে বাস ; মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে M.A. (1973) এবং Ph.D (1977); গবেষণার বিষয় ছিল : (১) "গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালিতে রবীন্দ্রনাথের দেবতা" ; (২) "রবীন্দ্রপ্রতিভার শেষপর্ব : তাঁর কিছু ছবির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যকর্মের সম্পর্ক" । বর্তমানে মেলবোর্নে মেডিক্যাল লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত ।

কেতকী কুশারী ডাইসন —

জন্ম : কলকাতা, ২৬ জুন ১৯৪০ ; শিক্ষা : কলকাতা ও অক্সফোর্ড ; কবি, প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক ; আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন ; প্রধান কয়েকটি বই : 'বল্কল' ; 'সবীজ পৃথিবী' ; 'জলের করিডর ধরে' ; *Sapwood*; *Hibiscus in the North* ; *Spaces I Inhabit* ; 'নোটন নোটন পায়রাগুলি' ; 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে' ; 'ভাবনাব ভাস্কর্য' ; 'শিকড়বাকড়' ; *A Various Universe* ; *In Your Blossoming Flower-Garden* ; *I Won't Let You Go* (ভূমিকা ও টীকাসমেত নির্বাচিত রবীন্দ্র-কবিতার অনুবাদ) ।

গোপালকৃষ্ণ আদিগা —

জন্ম : মোগেরি, দক্ষিণ কর্ণাটক, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮ ; কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক ; প্রধান কয়েকটি বই : 'ভাবতরঙ্গ' (১৯৪৬) ; 'ভূমিগীতা' (১৯৫৮) ; 'বর্ধমান' (১৯৭২) ; 'চিন্তামনিয়ল্লী কন্দ মুখ' (১৯৪৭) ; 'সুবর্ণ

পুঁথলি' (১৯৯০) ; 'সমগ্র গদ্য' (১৯৭৭) । আপন ভাষায় ইনি সমকালের একজন প্রধান কবি এবং সাহিত্য-সমালোচকরূপে সর্বস্বীকৃত ।

গোলাম মুরশিদ —

জন্ম : বরিশাল, ১৯৪০ ; অধ্যাপনা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৮-৮৩ ; বাংলা অ্যাকাডেমি পুরস্কার (১৯৮২) ; ১৯৮৪ থেকে লণ্ডনে বেতার সাংবাদিকতা ও গবেষণা ; প্রকাশিত প্রধান কয়েকটি বই : 'রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ', 'পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা' (১৯৮১) ; *Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization* (1983) ; 'সংকোচের বিহ্বলতা : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া' (১৯৮৪) ; 'সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক' (১৯৮৫) ; 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদিপর্ব' (১৯৮৬) ; 'কালান্তরে বাংলা গদ্য' (১৯৯২) ।

গৌরকিশোর ঘোষ —

জন্ম : হাটগোপালপুর, ঝিনাইদহ, যশোহর, ২০ জুন, ১৯২৩ ; সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক ; স্বনামে ছাড়াও রূপদর্শী ও গৌড়ানন্দ ছদ্মনামেও লেখেন ; এমার্জেন্সির সময়ে 'আমাকে বলতে দাও' লেখার জন্য কারারুদ্ধ হন ; বাক্-স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের জন্য ম্যাগসাইসাই পুরস্কার (১৯৮১) পান ; সাহিত্য কর্মের জন্য আনন্দ ও বঙ্কিম পুরস্কার ; প্রধান কয়েকটি বই : 'এই কলকাতায়' ; 'রূপদর্শীর নকসা' ; 'জল পড়ে পাতা নড়ে' ; 'লোকটা' ; 'মনের বাঘ' ; 'সাগিনা মাহাতো' ; 'প্রেম নেই' ; 'এক ধরনের বিপন্নতা' ; 'ব্রজদার গুল্প সমগ্র' ; 'গৌড়ানন্দ কবি ভণে' ; 'কমলা কেমন আছে' ; 'তলিয়ে যাবার আগে' ; 'জোবনামা বা ফেরঙ্গ-মঙ্গলকাব্য' ।

জয়া মিত্র —

জন্ম : ধানবাদ, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ ; রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার ফলে চার বছর কারাবাস করেন ; পরিবেশদূষণ এবং পারমাণবিক শক্তিবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, 'রক্তকরবী' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ; প্রধান বই : 'উদ্দালক নামে ডাকো' (১৯৮৯) ; 'হন্যমান' (১৯৮৯) : অনুবাদ : 'কৃষণ চন্দরের আত্মকথা' (১৯৮৭) ; 'মান্টো এবং মান্টো' (১৯৯১) ।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকি —

জন্ম : দুর্গাপুর, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ, ১৯৩২ ; কবি, অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য (১৯৭৬-৮৪) , প্রধান কয়েকটি বই : 'হৃদয়ে জনপদে' (১৯৭৫) ; 'শব্দের সীমানা' (১৯৭৬) ; 'চাঁদ ডুবে গেলে' (১৯৮৪); 'আসন্ন বাস্তিল' (১৯৮৮) ; 'বাঙালীর আত্মপরিচয়' (১৯৯১) ; অনুবাদ : 'অ্যারিওপ্যাজিটিকা' (১৯৭১) ; 'স্যামসন অ্যাগনিস্টিজ' (১৯৭৩) ; 'শেক্সপীয়রের সনেট' (১৯৭৭) ।

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় —

জন্ম : ২৮ অক্টোবর, ১৯৩৩ ; বিশ্বভারতীতে ১৯৬৫ থেকে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ; তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যা, বিশেষত পরমাণুবিজ্ঞান নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করছেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর বহু গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । প্রধান কয়েকটি বই : 'মৌলকণা' (১৯৭৩) ; *The Theory of Auger Transitions* (1976) ; 'ইলেকট্রন ও তার বর্ণালী', ২ খণ্ড (১৯৯০-৯১) ।

দেবেশ রায় —

জন্ম : বাগমারা, পাবনা, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৩৬ : কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক; সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর ফেলো ; প্রধান কয়েকটি বই: 'মানুষ খুন করে কেন' ; 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' ; 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'; 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদিগদ্য' ; 'আঠার শতকের বাংলাগদ্য' ; 'সময় অসময়' ; 'উপন্যাস নিয়ে' ।

নিরঞ্জন ধর —

জন্ম : ফরিদপুর, পূর্ববঙ্গ, ১ আগস্ট, ১৯১৯ ; অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক ; প্রধান কয়েকটি বই : *Administrative System of E.I.Co 1774-86* (1962/1964); *Fundamentals of Social Education* (1971) ; *Bengal Renaissance and Vedanta* (1982) ; 'নব মানবতাবাদ' (১৯৬৯) ; 'বিবেকানন্দ—অন্য চোখে' (১৯৮৭) ।

প্রতিভা বসু —

জন্ম : হাঁসাড়া, বিক্রমপুর, ঢাকা, ১৩ মার্চ (২৯ ফাল্গুন) ১৯১৫ ; কথাসাহিত্যিক-রূপে বাংলাসাহিত্যে তাঁর স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত ; প্রায় একশোর কাছাকাছি উপন্যাস ও গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে ; তাদের ভিতরে বিখ্যাত কয়েকটি বই : 'মাধবীর জন্য' ; 'সুমিত্রার অপমৃত্যু' ; 'মনের ময়ূর' ; 'সমুদ্র হৃদয়'; 'অগ্নিতুষার'; 'উজ্জ্বল উদার' ; 'দ্বিতীয় দর্পণ' ; 'ঈশ্বরের প্রবেশ' । ছোটদের জন্য গল্পসংগ্রহ, কিশোর উপন্যাস এবং রহস্য উপন্যাস লিখেছেন ।

প্রবাল দাশগুপ্ত —

জন্ম : কলকাতা, ১৯৫৩ ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮০) এবং পুনের ডেকান কলেজে (১৯৮০-৮৯) অধ্যাপনা করবার পর বর্তমানে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর অ্যাপ্লায়েড লিঙ্গুইস্টিক্স-এ অধ্যাপক ; প্রকাশিত বই : 'কর্তার ক্রিয়াকর্ম' (১৯৮৭) ; *Projective Syntax Theory and Applications* (1989) ; এসপেরান্তো ভাষার অনুবাদ : *Primico* (1977) ; *Mi Juna* (1989).

বীণা আলাসে —

জন্ম : নাগপুর, ১৯৪৩ ; বিশ্বভারতীতে মারাঠি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক; বাংলা এবং মারাঠি দুটিতেই এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থ : 'কন্যাদান' ; 'গুলামগিরি' ; 'পূর্বিন্ধে লেনে' (মারাঠি) ; 'বঙ্গালি সাহিত্যাচে ইতিহাস' (মারাঠি)।

মলয় রায়চৌধুরী —

জন্ম : পাটনা, ১৯৩৯ ; ষাটের দশকে হাংরি আন্দোলনের নেতা ; কবি ও প্রাবন্ধিক ; প্রধান কয়েকটি বই : 'মার্কসবাদের উত্তরাধিকার' (১৯৬১) ; 'শয়তানের মুখ' (১৯৬৩) ; 'ইশতাহার সংকলন' (১৯৮৫) ; 'কবিতা সংকলন' (১৯৮৬) ; 'মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর' (১৯৮৭) ; 'হাততালি' (১৯৯১) *Autobiography* (1991).

মানসী দাশগুপ্ত —

জন্ম : কৃষ্ণনগর, ৫ নভেম্বর, ১৯২৮ ; কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক ; প্রধান কয়েকটি বই : 'ভেলা' (১৯৭১) ; 'কম বয়সের আমি' (১৯৭৫) ; 'সমাজমন' (১৯৭৭) ; 'রবীন্দ্রনাথ : এক অসমন্বিত দ্বন্দ্ব' (১৯৮৭) ; 'প্রেমে-অপ্রেমে নয়' (১৯৮৬) ; 'তৃণগুচ্ছ' (১৯৯০)।

লোকনাথ ভট্টাচার্য —

জন্ম : ভাটপাড়া, ৯ অক্টোবর, ১৯২৭ ; বিশ্বভারতীতে অধ্যয়নের পর প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট (১৯৫৬) করেন ; দীর্ঘকাল দিল্লিতে ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্টের ডাইরেক্টর ছিলেন ; কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ফরাসি এবং বাংলায় অনুবাদক ; প্রধান কয়েকটি বই : 'বাবুঘাটের কুমারী মাছ' (১৯৭১); 'ঘর' (১৯৭২) ; 'তিক্ততার এই রক্তে জন্ম' (১৯৭২) ; ফরাসি থেকে অনুবাদ : 'র‍্যাঁবো' (১৯৫৪) ; 'দেকার্ত' (১৯৭৩) ; 'আঁরি মিশো' (১৯৯০) ; তাঁর লেখা ছয়খানি বই ফরাসি অনুবাদে বেরিয়েছে।

শাঁওলী মিত্র —

অভিনেত্রী, পরিচালিকা এবং নাটক লেখিকা ; ১৯৮৩ সালে 'নাথবতী অনাথবৎ' নাটকটি লিখে এবং সেটির অসামান্য একক অভিনয় করে দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন, এজন্য শিরোমণি পুরস্কার পান ; ভারতের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে কথকতার বিভিন্ন ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা করেছেন ; নিজস্ব থিয়েটার গ্রুপের নাম 'পঞ্চম বৈদিক' ; মহাভারত-কাহিনী নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় মৌলিক নাটক : 'কথা অমৃত-সমান' (১৯৯১)।

শান্তনু দাশগুপ্ত —

জন্ম : ৯ অক্টোবর, ১৯৪৫ ; বৈজ্ঞানিক, গবেষক, গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্র ডি. এন. এ. ও মোলেকিউলার বায়োলজি ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গবেষণা

প্রতিষ্ঠান এবং সুইডেনের উপশালা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পর বর্তমানে ম্যারিল্যাণ্ডে ন্যাশন্যাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউটে গবেষকরূপে নিযুক্ত ; মোলেকিউলার বায়োলজি সংক্রান্ত পঁচিশটি গবেষণা-নিবন্ধের যুক্ত লেখক ।

সালাহ্উদ্দিন আহ্মদ —

জন্ম : ফরিদপুর, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ ; ঐতিহাসিক ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে কথ্য-ইতিহাস প্রকল্পের পরিচালক ; প্রধান বই *Social Ideas and Social Change in Bengal : 1818-35* (1965) ; *Bangladesh : Tradition and Transformation* (1987).

সুরেশ যোশী —

জন্ম : ভালোদ, সুরাট, ১৯২১ ; মৃত্যু ১৯৮৬ ; গুজরাটি সাহিত্যে আধুনিকতার অন্যতম প্রবর্তক ; বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুজরাটি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন ; ছোটগল্প, সাহিত্য সমালোচনা এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধের জন্য বিখ্যাত ; প্রধান কয়েকটি বই : 'গৃহপ্রবেশ' (১৯৫৭) ; 'জনান্তিকে' (১৯৬৫) ; 'কাব্যচর্চা' (১৯৭১) ; 'শৃন্বন্তু' (১৯৭২) ; 'চিন্তয়ামি মনসা' (১৯৮২) ; 'একদা নৈমিষারণ্যে' (১৯৮৩) ; 'মনীষা', 'ক্ষিতিজ', 'সেতু' ইত্যাদি সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করেন ।

সেলিনা হোসেন —

জন্ম : ১৪ জুন, ১৯৪৭ ; কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক ; ঢাকায় বাংলা অ্যাকাডেমির উপ-পরিচালক ; প্রধান কয়েকটি বই : 'উৎস থেকে নিরন্তর' (১৯৬৯) ; 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬) ; 'যাপিত জীবন' (১৯৮১) ; 'খোল করতাল' (১৯৮২) ; 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮২) ; 'স্বদেশে পরবাসী' (১৯৮৫) ; 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' (১৯৮৬) ; 'পরজন্ম' (১৯৮৬) ; 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' (১৯৮৯) ; 'একাত্তরের ঢাকা' (১৯৮৯) ; 'কালকেতু ও ফুল্লরা' (১৯৯২) ।

সেলিম আলদীন —

জন্ম : ১৮ নভেম্বর, ১৯৪৯ ; চেয়ারম্যান, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয, ঢাকা ; সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার ; বাংলা অ্যাকাডেমি পুরস্কার (১৯৮৪) ; প্রধান কয়েকটি বই : 'সর্পবিষয়ক গল্প ও অন্যান্য নাটক' (১৯৭৩) ; 'জণ্ডিস ও বিবিধ বেলুন' (১৯৭৫) ; 'ঢাকা' (১৯৯০) ; 'যৈবতীকন্যার মন' (১৯৯২) ; 'নন্দিকেশ্বরের অভিনয়দর্পণ' (১৯৮৭) ; 'কবি ও তিমি' (১৯৮৯) ।